নিউ ইয়র্ক টাইমস্
বেস্ট সেলিং লেখক

এলিজাবেথ গিলবার্ট

প্রেম পূজা ভোগ

ইতালি ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া জুড়ে একজন নারীর সবকিছু খুঁজে চলা

অনুবাদ : রাবেয়া রব্বানী

প্রেম, পূজা, ভোগ

ইটালি, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া জুড়ে
একজন নারীর
সবকিছু খুঁজে চলা

www.pathagar.org

Eat, Pray, Love

One Women's Search
for Everything Across Italy,
India and Indonesia

Elizabeth Gilbert

www.pathagar.org

নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলিং লেখক

এলিজাবেথ গিলবার্ট

প্রেম, পূজা, ভোগ

ইটালি, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া জুড়ে
একজন নারীর
সবকিছু খুঁজে চলা

অনুবাদ : রাবেয়া রব্বানী

সন্দেশ

www.pathagar.org

সন্দেশ
ISBN-978-984-92298-9-6
প্রেম, পূজা, ভোগ
এলিজাবেথ গিলবার্ট
অনুবাদ : রাবেয়া রব্বানী

Eat, Pray, Love by Elizabeth Gilbert
First published : 2006
Copyright © 2006 by Elizabeth Gilbert
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১৭

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

কোড : ১২৩৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র : সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৪৮০.০০ টাকা

www.pathagar.org

অনুবাদকের উৎসর্গ

সেইসব নারী যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমার শিক্ষক, যাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শক্তি আমি সবসময় ধারণ করতে চাই

নায়ার সুলতানা
মমতাজ বেগম
শরিফুন্নেছা
মোমেনা খাতুন
পুষ্প বিশ্বাস

www.pathagar.org

অনুবাদকের আরো বই :

- নিহত সূর্যের দেশ (ছোটগল্প)

www.pathagar.org

ভূমিকা

অথবা
কিভাবে বইটি সাজানো হয়েছে
অথবা
১০৯ তম গুটি

ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পবিত্র স্থান বা আশ্রমগুলোতে দেখতে পাবেন, অনেক লোক তাদের গলায় গুটির ছড়া পরে আছে। পুরোনো কিছু ছবিতে নগ্ন, রুগ্ন বা দেখতে ভদ্র যোগীদের; এমনকি মাঝে মাঝে নাদুশ-নুদুস, দয়ালু, জ্যোতির্ময় চেহারার যোগীদের গলায়ও এই মালা দেখা যায়। এই রকম গুটির ছড়াকে বলা হয় জপমালা। ভারতে কয়েকশ বছর ধরে এটা প্রচলিত। হিন্দু আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রার্থনামূলক ধ্যান করার সময় এই মালা মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে মালাটাকে একটা হাত দিয়ে ধরে রেখে, আঙুল দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরানো হয়। তারপর প্রতিটা গুটি স্পর্শ করে একই মন্ত্র পুনারাবৃত্তি করা হয়।

যখন মধ্যযুগের ধর্মযোদ্ধারা পবিত্র যুদ্ধের জন্য পূর্বে যেতেন তারা দেখতে পেতেন পূজারীগণ জপমালা দিয়ে প্রার্থনা করছে। ইউরোপ এই কৌশলে মুগ্ধ হয়ে ক্যাথলিক চার্চে প্রার্থনার একটি পদ্ধতি হিসেবে এটাকে গ্রহণ করে ।

গতানুগতিক জপমালা ১০৮ টা গুটি দিয়ে সন্নিবেশিত। বেশিরভাগ গুপ্ত দার্শনিকদের মতে ১০৮ সংখ্যাটা মঙ্গলজনক, তিন দ্বারা বিভাজ্য একটা ঠিকঠাক তিন দশক সংখ্যা, সংখ্যা তিনটা যোগ করলে দাঁড়ায় নয় যা তিনটা তিনের সমষ্টি এবং তিন অবশ্যই এমন একটা সংখ্যা যা দ্বারা সর্বোচ্চ ভারসাম্য নির্দেশ করা হয়। যারা পবিত্র ত্রিনিত্রি বা সহজ বারস্টল নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তারা ব্যাপারটা জানেন। যেহেতু এই পুরো বইটা আমার ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা নিয়ে লেখা, তাই আমি ঠিক করেছি আমার গল্পটাকে ১০৮ টা অংশে বিভক্ত করে একে জপমালার মতো একটা গঠন দেব। এই ১০৮ গল্পের মালাকে আরও তিনটা অধ্যায় ইটালি, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া এই তিন ভাগে ভাগ করা হবে। আত্ম অনুসন্ধানের সময় এই তিনটা দেশ আমি ঘুরেছিলাম। এইভাবে ভাগ করা মানে প্রতিটা ভাগে ৩৬ টা করে গল্প। ব্যাপারটা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে স্পর্শ করেছে, কেননা আমি আমার ৩৬ বছর বয়সে এই গল্পটা লিখছি।

এখন লুইস ফারাখানের মতো গাণিতিক ব্যাখ্যায় ব্যস্ত না হয়ে আমি সমাপ্তি করছি এই বলে যে, নিজের গল্পের গঠন জপমালার মতো দিয়ে আমি নিজেও খুব খুশি।

www.pathagar.org

কেননা তা আসলেই খুব সুগঠিত। আন্তরিক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে সব সময় একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম পালনের চেষ্টা থাকে। সত্যের খোঁজ করা মানেই তো নিয়মহীন পাগলাটে কিছু না। এমনকি এখন এই অস্থির যুগেও উদ্ভ্রান্তের মতো সত্য খুঁজে লাভ নেই। আমি লেখক এবং অন্বেষক দুইই। সে হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে এক্ষেত্রে যত দ্রুত জপমালা পদ্ধতিটা ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। যাতে আমি যা করতে চাই তাতে মনোনিবেশ করতে পারি।

সকল জপমালার একটা অতিরিক্ত গুটি থাকে। ১০৯ তম গুটি। যা ১০৮ গুটির বাইরে লম্বমান অবস্থায় ঝুলন্ত থেকে বৃত্তের ভারসাম্য রক্ষা করে। আমার মনে হতো এই গুটিটা একটা আকস্মিক বিরতি, দামি সোয়েটারের একটা অতিরিক্ত বোতামের মতো অথবা রাজকীয় পরিবারের ছোট ছেলের মতো। কিন্তু আপাত এর আরও উচ্চশ্রেণির পদমর্যাদা আছে। যখন আপনার আঙুল এই গুটিতে পড়বে আপনাকে ধ্যান থেকে বিরতি নিতে হবে এবং গুরুকে ধন্যবাদ জানাতে হবে।

তাই আমার ১০৯ তম গুটিতে আমি বিরতি নিচ্ছি। একদম শুরু করার আগেই। আমি সকল গুরু এবং শিক্ষক কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই বছর নানান রূপে আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন।

বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার গুরু যিনি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন, যিনি ভারতে থাকাকালীন সময়ে খুব আন্তরিকভাবে তার আশ্রমে আমাকে পড়াশোনা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। একই সাথে এই মুহূর্তে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি ভারতে থাকাকালীন আমার অভিজ্ঞতা লিখি একেবারে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কোনো আধ্যাত্মিক পণ্ডিত আমি নই কিংবা কারো প্রাতিষ্ঠানিক মুখপাত্রও নই। এইজন্য আমি আমার বইয়ে কোথাও আমার গুরুর নাম উল্লেখ করিনি– কারণ আমি তাঁর পক্ষে কথা বলছি না। সেটার জন্য তাঁর শিক্ষামূলক বক্তব্যই যথেষ্ট। আমি তাঁর আশ্রমের ঠিকানাও কোথাও উল্লেখ করব না। এভাবে সেই চমৎকার প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা ব্যতিরেকে আমি এই বইয়ে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গেছি যাতে স্পষ্ট হয় আমি সেই আশ্রম প্রচারণা এবং পরিচালনার সাথে যুক্ত নই।

একটা শেষ কৃতজ্ঞতা পেশ করছি– এই বইয়ে নানান কারণে অনেক ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতের আশ্রমে ভারতীয় এবং পশ্চিমা; যাদের সাথেই আমার পরিচয় হয়েছে আমি তাদের নাম বদলে দিয়েছি। ধর্মালয়ে নিশ্চয়ই কেউ একটা বইয়ের চরিত্র হতে যায় না, তাই তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমি এই কাজটা করেছি। বাস্তব পরিচয় প্রকাশে সংযত থাকার কৌশলে শুধু একটা মাত্র ব্যতিক্রম করেছি আমি আর তা হলো, টেক্সাসের রিচার্ড আসলেই রিচার্ড। সে টেক্সাস থেকেই এসেছে। আমি তার মূল নামটা বইয়ে রাখতে চেয়েছি কারণ ভারতে থাকাকালীন সময়ে আমার জন্য সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ ছিল।

শেষ একটা কথা আমি রিচার্ডকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার কি কোনো অসুবিধা আছে যদি আমি আমার বইয়ে উল্লেখ করি যে সে একসময় একজন মাতাল এবং ক্ষ্যাপাটে ছিল। সে বলেছিল তার কোনো সমস্যা নেই।

সে বলেছিল, 'আমি ভাবতে চেষ্টা করছি বিষয়টা লিখলে কেমন হবে, কেমনে শোনাবে।'

কিন্তু প্রথমে ইটালির গল্প...

www.pathagar.org

প্রথম অধ্যায়

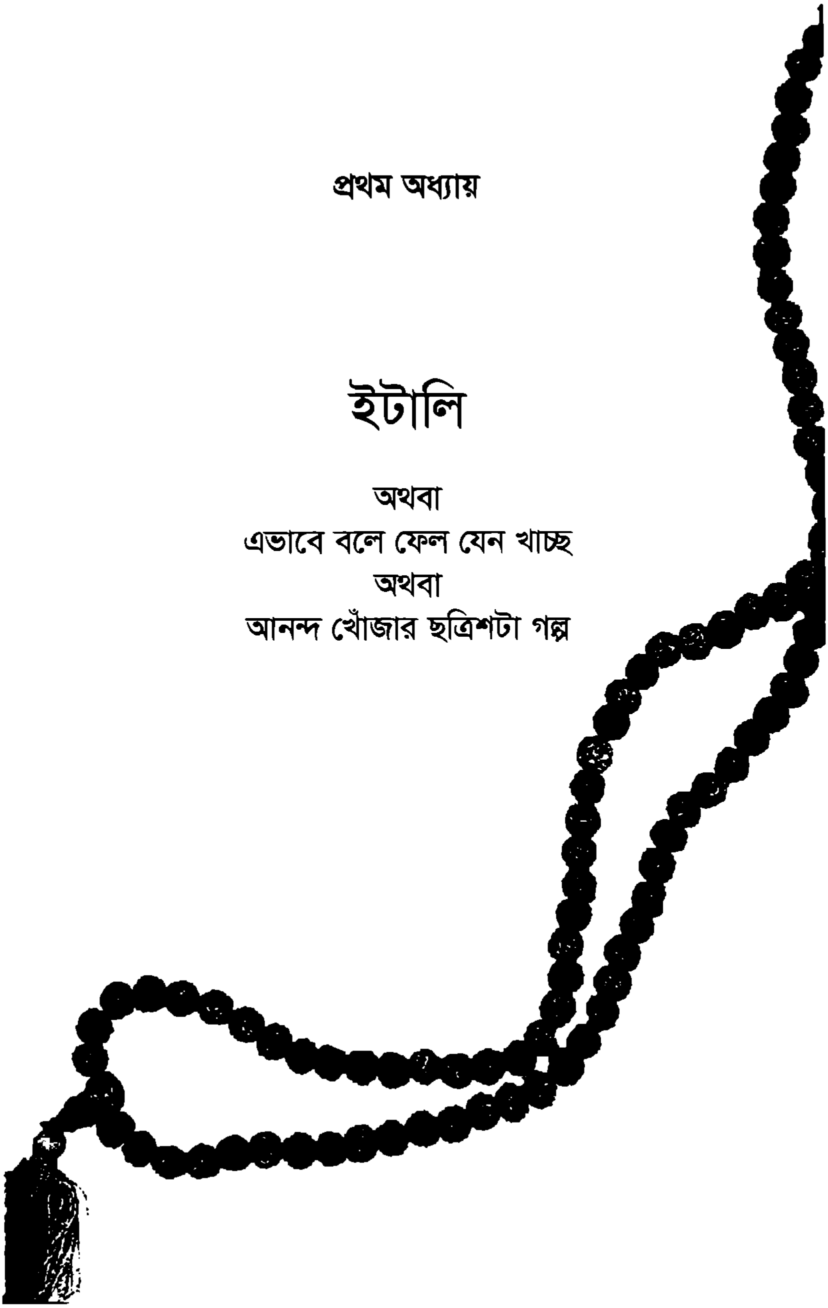

ইটালি

অথবা

এভাবে বলে ফেল যেন খাচ্ছ

অথবা

আনন্দ খোঁজার ছত্রিশটা গল্প

www.pathagar.org

সত্য বল, সত্য বল, সত্য বল

—শার্লি লুইস মোলার

www.pathagar.org

১

ঈশ! জিয়েবানি যদি আমাকে চুমু খেত!

কিন্তু অনেক কারণেই ভাবনাটা তেমন একটা যুতসই ছিল না। একে তো জিয়েবানি আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট তার ওপর বয়স বিশের কোঠায়। এই বয়সী ইটালিয়ান ছেলেদের মতো সেও তার মায়ের সাথেই থাকে। এই একটা কারণেই তার সাথে আমার সম্পর্কটা ঠিক জমে ওঠেনি।

আমি ত্রিশ পেরুনো, পেশাদার আমেরিকান। মাত্র কিছুদিন পূর্বে আমাকে একটা বিচ্ছিরী বিবাহবিচ্ছেদের লম্বা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এর পরপরই আরও একটা গভীর প্রেমে জড়ানো এবং সেটারও একটা নিষ্ফল সমাপ্তি। উফ! কী ক্ষতির ওপর ক্ষতি! কষ্টে ভেতরটা ভেঙে বুড়িয়ে গিয়েছিল। মনে হতো যেন আমার বয়স সত্তর হাজার বছর! এমন একান্ত দুঃখ ভুলতে নিষ্পাপ জিয়েবানির ওপর হামলে পড়াও তো ছিল নীতির বাইরে। এটা বলতেই হয় শেষ পর্যন্ত আমি এমন একটা বয়সে পৌঁছেছিলাম, যখন নারী নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করে, 'একজন বাদামি ভ্রূর সুদর্শন পুরুষ হারানোর ক্ষতি কি অন্য একজনকে দ্রুত বিছানায় নিলেই পোষে?' এ কারণেই আমি তখন বেশ কয়েক মাস যাবত নিঃসঙ্গ। এটাই কারণ, যার জন্য পুরো বছরটা আমি কুমারী থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

কেউ কেউ তো অযাচিত প্রশ্ন করেই বসত– তো তুমি ইটালিতে কেন এসেছ?

কিন্তু টেবিলের ওপাশের প্রশ্নকর্তা যদি হতো সুদর্শন জিয়েবানি। তখন আমি কেবল বলতে পারতাম– চমৎকার প্রশ্ন করেছ।

জিয়েবানি আমার ভাষা সঙ্গী। ব্যাপারটা চটকদার শোনালেও দুর্ভাগ্যবশত তেমন কিছুই নয়। আসলে তখন ভাষা শেখার উদ্দেশ্যেই আমাদের কয়েক দিন আগে পরিচয় হয়েছে। আমরা প্রথমে ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলতাম। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম এবং শিখতাম। তারপর আমরা ইংরেজিতে কথা বলতাম এবং সে আমার কাছ থেকে শিখে নিত।

পিজা বার-বিনির সেই বড় ইন্টারনেট ক্যাফেটাকে ধন্যবাদ। রোমে আসার কয়েক সপ্তাহ পরে সেখানেই তো আমি জিয়েবানিকে খুঁজে পেয়েছিলাম। কারণ সেটার অপর পাশের ঝরনাটায় একটা ভাস্কর্য আছে যে, একটা যৌন আবেদনময় মৎস্য কুমার শঙ্খের খোলে ফুঁ দিচ্ছে। সেখানে জিয়েবানি বুলেটিন বোর্ডে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল– কথোপকথন পদ্ধতিতে ভাষা শেখার জন্য একজন স্থানীয়

www.pathagar.org

ইটালিয়ান একজন স্থানীয় ইংরেজ খুঁজছে। তার আবেদনের পাশেই একইরকম আরও একটা বিজ্ঞপ্তি ছিল। দুটো বিজ্ঞপ্তিই টাইপো থেকে শুরু করে প্রতিটা অক্ষর একইরকম ছিল। যোগাযোগের ঠিকানাটা ছিল কেবল আলাদা। একটা বিজ্ঞপ্তিতে ইমেইল ঠিকানা ছিল জিয়েবানি নামে অন্যটা ছিল দারিও নামে। বাড়ির ফোন নম্বর আবার একটাই ছিল।

আমার সহজাত অনুমান ক্ষমতা দিয়ে আমি একই সাথে উভয়কেই ইটালিয়ান ভাষায় মেইল করেছিলাম, আপনারা কি ভাই?

আমাকে চমকে দিয়ে জিয়েবানি জবাবে লিখেছিল, এর চেয়েও বেশি কিছু। আমরা যমজ।

আসলেই বেশ ভালো। লম্বা, তামাটে এবং সুদর্শন। একেবারে একইরকম পঁচিশ বছর বয়সী যমজ এরা। বিশাল বাদামি আর্দ্র চোখের মণিগুলো আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল। ছেলেগুলোর সাথে সরাসরি পরিচিত হওয়ার পর আমার আফসোস লাগছিল, আহারে! সে বছর কুমারী থাকার পণটা যদি একটু বদলে নেওয়া যেত। যেন এমনিতে আমি পুরোপুরি কুমারীই থাকতাম, শুধু থাকত মাত্র একজোড়া সুদর্শন, পঁচিশ বছর বয়সী, যমজ প্রেমিক। কিছুটা আমার ঐ বন্ধুর মতো যে নিরামিষাশী কেবল একটু আধটু বেকন খায়। আহ! নিজের অজান্তেই পেন্টহাউজের ম্যাগাজিনের জন্য আবার কবিতাও লিখে ফেলছিলাম–

ঝিকিমিকি, রোমান ক্যাফের মোমের আলো-ছায়া
অসম্ভব বলা
ঠিক হবে কোনো জনের হাতে আদর করা।
কিন্তু না
একদম না...

আমি আকাশ কুসুম ভাবনা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার রীতিমতো জটিল জীবনকে আরও জটিল করে তোলার কোনো মানে হয় না। ভাবছিলাম, এটা আমার প্রেম খোঁজার সময় হলো! এই সময়টা আমার উপশম আর শান্তি খোঁজার। নিঃসঙ্গতা থেকেই যা কেবল পাওয়া যায়।

যাহোক, তখন, নভেম্বরের মাঝামাঝিতে, লাজুক পড়ুয়া জিয়েবানি আমার খুব ভাল একজন বন্ধু। আর দারিও, দুই ভাইয়ের মধ্যে আমুদে উচ্ছল যে, তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম আমার বয়সে কিছু ছোট কিন্তু প্রিয় বান্ধবী সোফির সাথে। ইটালির সন্ধ্যাগুলোতে তাদের ভাষা শিক্ষা চর্চাটা হয়ত একেবারে অন্যভাবে হতো। কিন্তু আমি আর জিয়েবানি কেবল হাঁটতাম। হাঁটতাম আর খেতাম। পিজ্জা ভাগ করে খাওয়া, কিছু মার্জিত ব্যাকরণ ঠিক করে নেওয়া, এইতো চলছিল। সেদিনের রাতটাও আলাদা কিছু ছিল না। নতুন প্রবাদ প্রবচন আর তাজা মজারেলার সাথে একটা মহনীয় সন্ধ্যা।

তখন কুয়াশাচ্ছন্ন মধ্যরাত, আমি আর জিয়েবানি রোমের ছিপছিপে গলি ধরে আমার এপার্টমেন্টের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। রাস্তাগুলো পুরোনো ভবনগুলোর চারপাশে এঁকে বেঁকে যাওয়া, ঠিক যেন ছায়া সুনিবিড় দেবদারুর বনের চারপাশে সর্পিল হ্রদ।

www.pathagar.org

আমরা আমার দরজার কাছে ছিলাম, মুখোমুখি। উফ! বিদায় জানাতে আমাকে উষ্ণ আলিঙ্গন করেছিল সে। একটু অবশ্য উন্নতি হয়েছিল। প্রথম কয়েক সপ্তাহ সে তো শুধু হাত ঝাঁকিয়ে দিত। আমার ধারণা আমি যদি ইটালিতে আরও বছর তিনেক থাকতাম, সে হয়ত বড়জোর তার শরবতের পেয়ালা এগিয়ে দিত চুমু খেতে। কিন্তু সে তো আমাকে চুমু খেতে পারত! সেই মুহূর্তে, সেই রাতে, আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

তখনও একটা সুযোগ ছিল। আমি বলতে চাচ্ছি সেই জোছনায় আমাদের শরীর দুটো যেভাবে সেঁটে ছিল একে অপরের সাথে... অবশ্য এটা একটা বড় ভুল হতো... কিন্তু ঈশ! তখনও যে একটা দারুণ সুযোগ ছিল। সেই মুহূর্তে কিছু একটা করার! ভাবছিলাম, সে হয়ত নিচের দিকে ঝুঁকছে এবং...

নাহ! সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল সেই অস্বস্তি থেকে।

সে বলেছিল, শুভ রাত্রি, প্রিয় লিজ।

বুওনা নত্তি, কারো নিও, আমি ইটালি ভাষায় জবাব দিয়েছিলাম।

আমি হেঁটে হেঁটে আমার চার তলা এপার্টমেন্টে চলে এসেছিলাম। একা। নিজের ছোট কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। রোমে আমার জন্য আরো একটা নিঃসঙ্গ রাত অপেক্ষা করছিল। আরো একটা লম্বা রাত ছিল আমার সামনে, তখন কিছু ইটালিয়ান প্রবাদ আর অনুবাদের বই ছাড়া আমার বিছানায় কেউ ছিল না, কিচ্ছু ছিল না।

আমি একা, আমি একা, আমি সম্পূর্ণ একা।

সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে আমি আমার কাঁধ থেকে ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে নিজের কপালটা মেঝেতে চেপে ধরে স্রষ্টার কাছে একটা উষ্ণ প্রার্থনা নিবেদন করেছিলাম।

প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর ইটালিয়ান ভাষায় শেষে পুরো মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃতিতে।

২

ইতোমধ্যে মেঝেতে প্রার্থনারত অবস্থাটা আমাকে তিন বছর আগের সেই সময়ে নিয়ে গিয়েছিল যেখান থেকে মূল কাহিনির শুরু। সেই মুহূর্তটায়, নিজেকে আবিষ্কার করেছিলাম সেই একইরকম দেহ ভঙ্গিমায়, হাঁটু গেড়ে, মেঝেতে, প্রার্থনারত অবস্থায়।

তিন বছর আগের দৃশ্যগুলো অবশ্য অন্যরকম ছিল। সে সময় রোমে নয়, আমি ছিলাম নিউইয়র্কের শহরতলীতে। একটা বিশাল বাড়ির ওপর তলার গোসলখানায়। বাড়িটা তখন খুব সম্প্রতি আমি আর আমার স্বামী কিনেছিলাম। শীতল আবহাওয়ার নভেম্বর মাস, রাত তিনটা। আমার স্বামী তখন বিছানায় ঘুমাচ্ছিল। পর পর সাতচল্লিশতম রাতের মতো আমি গোসলখানায় লুকাচ্ছিলাম এবং আগের রাতগুলোর

www.pathagar.org

মতোই ফোঁপাচ্ছিলাম। ভীষণ রকমই ফোঁপাচ্ছিলাম। আসলে সেটা ছিল কান্নার একটা বিশাল হ্রদ এবং আমার শ্লেষ্মাগুলো ছড়িয়ে পড়ছিল গোসলখানার টালিতে। আমার সকল লজ্জার, ভয়ের এবং দ্বিধা আর অনুশোচনার যথার্থ হ্রদ ছিল সেটা– আমি আর সংসার করতে চাই না।

ব্যাপারটা স্বীকার করতে না চাইলেও সত্যটা আমার ভেতর থেকে ছাপিয়ে উঠেছিল।

'আমি আর সংসার করতে চাই না। আমি এই বিশাল বাড়িটাতে থাকতে চাই না। আমি সন্তান চাই না।'

আট বছর হয় আমি আর আমার স্বামী একসাথে ছিলাম আর ছয় বছর হয় আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আমাদের বিবাহিত জীবন এই সাধারণ ধারণায় গড়ে উঠেছিল যে ত্রিশের কোঠা পার করার পর আমি হয়ত থিতু হয়ে একটা সন্তান চাইব। আমরা দুজনই আশা করেছিলাম ততদিনে ঘোরা ফেরায় আমার মন উঠে যাবে। বাচ্চা-কাচ্চা, ব্যস্ত বড় বাড়ি, পেছনের বারান্দার বাগান, হাতের তৈরি ভারী কাঁথা, চুলায় কিছু সেদ্ধ হওয়ার শ্রুতিমধুর শব্দে খুশি থাকব। বিষয়টা হলো, আমার মায়ের ছবিটাই এক্ষেত্রে সঠিক প্রতিচ্ছবি। এটা বোঝার জন্য যে কতটা পার্থক্য আমার আর সেই শক্তিশালী মহিলার মধ্যে যিনি আমাকে বড় করেছেন। কিন্তু আমি খুশি হইনি, আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম এগুলো কি আসলে আমি চাই! বিশ শেষ হতে না হতেই ত্রিশ আমার ওপর মৃত্যুদণ্ডের মতো নেমে এসেছিল এবং খেয়াল করেছিলাম আমি আসলে সন্তান কামনা করছিলাম না।

আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন আমি নিজেই সন্তান চাইব। কিন্তু এমনটা ঘটেনি। আমি জানি কোনো কিছু চাইলে কেমন লাগে। বিশ্বাস করুন আমি বেশ ভালোভাবেই জানি প্রত্যাশার অনুভূতিটা কেমন। কিন্তু আমার মধ্যে সেটা ছিল না। আমার বোন তার প্রথম সন্তানকে স্তন্য দেওয়ার ব্যাপারে একটা কথা বলেছিল, বাচ্চা নেওয়া আর নিজের মুখে ট্যাটু আঁকা এক কথা। তোমাকে অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে তুমি আসলেই তা চাও কিনা। কথাটা আমি ভুলতে পারছিলাম না।

তখন কিভাবে আমি পিছু হটব। সব যেখানে ঠিকঠাক ছিল। এক বছরের পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে কয়েক মাস আমি গর্ভধারণের চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, এই ঘটনা ছাড়াও আমি দেহ মনে গর্ভকালীন অসুস্থতা অনুভব করছিলাম, ঘাবড়ে গিয়ে প্রতিদিন সকালের নাস্তা বমি করে ফেলে দিচ্ছিলাম। এবং প্রতিমাসে ঋতুস্রাব হওয়ার পরে আবিষ্কার করছিলাম নিজের অজান্তেই ফিসফিস করছি– ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, আমাকে আর একটা মাস বাঁচতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

আমি নিজেকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে, ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। গর্ভধারণ করার চেষ্টা করার সময় সব মহিলারা নিশ্চয়ই এরকম অনুভব করে। এক্ষেত্রে 'পরস্পর বিরোধী' শব্দটা আমি ব্যবহার করতাম। আরও কেটে ছেঁটে বলা যায় ভয় খাওয়া, এর বিপক্ষে অন্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমি নিজেকে বোঝাতে চাইতাম আমার অনুভূতিটা গতানুগতিক। যেমন, সেসময় একজন আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে গিয়ে জেনেছিলাম, দুই বছর চেষ্টার পর তখন সে প্রথম বারের জন্য মা

www.pathagar.org

হয়েছে। তাও আবার উচ্চমূল্যে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার পর। সে বলেছিল আমাকে, সে নাকি সব সময় একজন মা হতে চেয়েছিল। স্বীকার করেছিল, সে লুকিয়ে লুকিয়ে বাচ্চাদের জামা কিনে বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখত যাতে তার স্বামী দেখতে না পায়। তার চেহারায় আমি আনন্দ দেখেছিলাম। আমি চিনি এই চেহারা। ঠিক একইরকম আনন্দ এক বসন্তে আমার চেহারাতেও ঝলকে উঠেছিল। যখন আমি জানতে পারি, যেখানে আমি কাজ করি তারা আমাকে নিউজিল্যান্ড পাঠাচ্ছে বিশাল আকৃতির স্কুইড খোঁজা সম্পর্কে কলাম লেখার জন্য। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যতদিন পর্যন্ত স্কুইডের ওপর কলাম লেখার মতো আবেগ সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে না আসে ততদিন আমার গর্ভধারণ ঠিক হবে না।

আমি আর সংসার করতে চাই না।

না। মোটেই না।

আমার স্বামী অন্য ঘরে আমাদের বিছানায় ঘুমচ্ছিল। আমি একই সাথে তাকে ভালোও বাসতাম আবার তাকে সহ্য করতেও পারছিলাম না। পারছিলাম না তাকে জাগিয়ে আমার কষ্টের কথা জানাতে। এক্ষেত্রে আমার সমস্যাটাই বা কি দেখাতাম। এক মাস কাল দূরত্ব বজায় রেখে আমার পাগল মহিলার মতো আচরণ সে দেখে যাচ্ছিল। আমরা দুজনই শব্দটাতে একমত ছিলাম কিন্তু আমি শুধু তার সাথে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। দুজনেই জানতাম কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে আমার ভেতর এবং সে এ-ব্যাপারে তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। আমরা ঝগড়া করছিলাম, কাঁদছিলাম আর হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম যেন আমাদের সংসার ভেঙেই গেছে। আমাদের দৃষ্টি ছিল উদ্বাস্তুদের মতো।

অনেক কারণে আমি আর এই লোকের স্ত্রী থাকতে চাচ্ছিলাম না। কারণ খুব ব্যক্তিগত বলে এখানে উল্লেখ করতে পারছি না। সমস্যা অনেকটাই আমার নিজের কিন্তু কিছু তো তারও ছিল। এটাই স্বাভাবিক। একটা বিয়েতে দুইটা নির্বাচন, দুইটা মত, দুইরকম সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা এবং সীমাবদ্ধতা থাকবে। আমি মনে করি না তার সমস্যাটা আমার বইয়ে আলোচনা করা উচিৎ হবে। কাউকে বলবও না এটা বিশ্বাস করতে আমি পক্ষপাৎ শূন্য একটা কাহিনি মেলে ধরতে সক্ষম। তাই আমার ব্যর্থ বিয়ের ধারাবিবরণী এখানে না বলাই থাকলো। আমি এখানে ঐ সব কারণ ও আলোচনা করব না কেন আমি তখনও তার স্ত্রী হিসেবে থাকতে চাচ্ছিলাম অথবা তার সকল গুণাবলি অথবা কেন আমি তাকে ভালোবাসতাম কিংবা কেন তাকে আমি বিয়ে করেছিলাম এবং কেন তাকে ছাড়া জীবনের কথা ভাবতে পারতাম না। আমি এসবের কিছুই প্রকাশ করব না। এটা বলাই যথেষ্ট সেই রাতে সব দিক দিয়ে সেই ছিল আমার বাতিঘর আর সেই ছিল আলবাট্রস। ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে থাকাটা যেমন অসম্ভব ছিল, থাকার চেয়ে ছেড়ে যাওয়াও তেমন অসম্ভব ছিল। আমি কোনো কিছু বা কাউকে ধ্বংস করতে চাইনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম কোনো শব্দ না করে, আগপিছ না ভেবে, পেছনের দরজা গলে বেরিয়ে যেতে এবং তারপর দৌড় না থামাতে যতক্ষণ না আমি গ্রিনল্যান্ড পৌঁছাই।

আমি জানি আমার গল্পের এই অংশটা আনন্দের নয়। আমি এটা এখানে এজন্য উল্লেখ করছি কারণ কিছু একটা ঘটেছিল সেই গোসলখানার মেঝেতে যা আমার জীবনের

www.pathagar.org

মোড় পাল্টে দিয়েছিল। প্রায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঐ বিশেষ ঘটনার মতো যেন একটা গ্রহ তেমন কারণ ছাড়াই তার কক্ষপথ থেকে ছিটকে পরে মহাশূন্যে এবং এর গলিত মূল অংশটা জায়গা বদলে নতুন মেরু ঠিক করে নেয়, সতর্কভাবে এর গঠন আমূল বদলে নেয়, যেন হঠাৎ গ্রহটার ভর পাল্টে গোলাকার থেকে আয়তাকার হয়ে যায়।

ঠিক তেমনটাই হয়েছিল যখন আমি প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলাম, ঈশ্বরের বরাবর।

৩

সেটাই ছিল প্রথমবার। আর যেহেতু এই প্রথমবারের মতো আমার বইয়ে 'ঈশ্বর' এই ভারী শব্দটার সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি আর যেহেতু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় শব্দটা অসংখ্যবার আসবে তাই এটাই সংগত যে কিছু মুহূর্ত স্থির হয়ে ব্যাখ্যা করি এই শব্দ দ্বারা আসলে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি। পাঠক যেন বুঝতে পারেন সামনে তারা কতটা বিরক্ত হতে যাচ্ছেন।

আসুন তর্কটা অন্য সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখি যে ঈশ্বর আছেন কি নেই। না, তার চেয়েও ভাল হয় আসুন আমরা এই তর্কটা এড়িয়ে যাই। আমি আগে ব্যাখ্যা করে নেই কেন আমি ঈশ্বর শব্দটা ব্যবহার করি যেখানে আমি অনায়াসে ব্যবহার করতে পারি জেহোবা, শিবা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা জিউস। এর পরিবর্তে তাঁকে আমি ঈশ্বর বলতে পারি যেভাবে প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থে বলা আছে। আমি মাঝে মাঝে যে অবর্ণনীয় সত্তাকে অনুভব করি ঈশ্বর শব্দটা দিয়েই তার সবচেয়ে কাছাকাছি ধারণা দেওয়া যাবে। কিন্তু অন্য শব্দগুলোর সাথে আমার ব্যক্তিগত কোনো সংযোগ নেই। সেগুলো আমার কাছে আমার ভাবনার মতো কোনো সত্তার আমেজ আনে না। এবং, আমি কখনোই সেই নামগুলোর প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে পারি না। আমার একটা বিশেষ নাম চাই, ব্যক্তিগত পরিপূর্ণ মনোযোগের জন্য। এই কারণে যখন আমি প্রার্থনা করি মহাবিশ্ব, হে সর্বশক্তি, হে মহান সত্তা, হে পরিপূর্ণ, আলো, হে উন্নত ক্ষমতা এসব বলি না। আমার বিশ্বাস জনেস্টিক গসপালের দ্য শেডো অব টার্নিং-এ ঈশ্বরের সবচেয়ে কাব্যিক রূপ আছে আমি সেখান থেকেও কোনো নাম নেই না।

আমি এইসব বিষয়ের বিপক্ষে নই। আমার মনে হয় তারা সব সমান কেননা স্রষ্টার সত্তা বর্ণনাতীত। এই শব্দগুলো এমন ব্যাখ্যাহীন সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করতে একই সাথে সক্ষম এবং অক্ষম। কিন্তু আমাদের সবার একটা আরামদায়ক নাম চাই এই অবর্ণনীয় ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য। ঈশ্বরই একটা নাম যেটাতে আমি স্বস্তি পাই। আমি এটাও স্বীকার করছি আমি তাকে সে (পুরুষার্থে) ডাকি, এটা আমার কাছে তেমন কোনো ব্যাপার না কারণ এটা একটা সুবিধাজনক ব্যক্তিগতভাবে বেছে নেওয়া সর্বনাম। কোনো যথার্থ সংজ্ঞা বা বৈপ্লবিক কিছু না। আমি ব্যাপার মনে করি না লোকজন যদি ঈশ্বরকে সে (নারী অর্থে) বলে থাকে। এ-ব্যাপারেও আমি সমান

www.pathagar.org

মনে করি। সমানভাবে যথার্থ আবার অন্যায্যও। সর্বনাম ব্যবহার না করে নিজের সুবিধা হয় এমন একটা নাম আমার কাছে দারুণ, ঐশ্বরিক উপস্থিতির একটা ছোট্ট আদব বজায় থাকে তাতে।

ধর্মীয়ভাবে নয়, সামাজিকভাবে আমি একজন খ্রিস্টান। প্রটেস্টান্ট হোয়াইট অ্যাঙ্গলো সেক্সান পরিবারে আমার জন্ম। এবং যতক্ষণ আমি শান্তির শিক্ষক যিশুকে ভালোবাসতাম এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু পরিস্থিতিতে তিনি (যিশু) কি করতেন তা নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত ছিলাম! ততক্ষণ আমি খ্রিস্টান ধর্মের সেই স্থির নিয়ম থেকে বের হতে পারিনি যা মানতেই হয় আর তা হলো যিশুই ঈশ্বরের একমাত্র পথ। কঠোরভাবে বলতে গেলে আমি নিজেকে খ্রিস্টান বলতে পারি না। আমি জানি মুক্ত আর মহান চিন্তার বেশির ভাগ খ্রিস্টান আমার অনুভূতিটা মেনে নেবেন আবার বেশির ভাগ খ্রিস্টান অন্যের কঠোর বিশ্বাস নিয়ে মাথাও ঘামান না। তবে এখানে কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে সেজন্য আমার অনুশোচনা রইল আর আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তাদের ভাবনার সাথে আমার মিল নেই বলে।

প্রথাগতভাবে আমি সকল ধর্মের অতিপ্রাকৃত রহস্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। আমি সব সময় রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে সাড়া দিয়েছি কেউ যদি কখনো বলেছে যে ঈশ্বর কোনো অন্ধ বিশ্বাসীদের মূর্তিতে কিংবা আকাশের ঐ পারে নেই, বরং আমাদের খুব নিকটে বেষ্টন করে আছেন তিনি। আমরা কল্পনাও করতে পারি না এতটা কাছে, আমাদের হৃদয়ে শ্বাস ফেলছেন তিনি। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে প্রভাবিত হয়েছি তাঁর দ্বারা যে তার নিজের ভেতরটা চষে পৃথিবীতে আমাদের জন্য বার্তা এনে দিয়েছেন যে ঈশ্বর হচ্ছে সর্বোচ্চ ভালোবাসার অভিজ্ঞতা। পৃথিবীতে প্রতিটা ধর্মের ইতিহাসে এমন রহস্যময় ঐশ্বরিক সাধকগণ জানিয়েছেন ঠিক এই একই অভিজ্ঞতার কথা। দুর্ভাগ্যবশত এদের গ্রেফতার করে বা মেরে ফেলে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনো আমি তাদের নিয়ে খুব ভাবি।

শেষে আমি ঈশ্বর সম্পর্কে যে ধারণায় পৌছেছি তা খুব সাধারণ। এটা এমন যে, আমার একটা দারুণ কুকুর ছিল। সে পাউন্ড হতে এসেছিল। সে দশটা ভিন্ন জাতীর সংমিশ্রণ ছিল, কিন্তু মনে হয় উত্তরাধিকার সূত্রে সে ভাল জিনিসগুলোই পেয়েছিল। তার রঙ ছিল বাদামি। যখন লোকজন জিজ্ঞেস করত কোন জাতের কুকুর এটা? আমি সবসময় এক রকম উত্তরটাই দিতাম। এটা একটা বাদামি কুকুর। একইরকমভাবে যখন প্রশ্ন ওঠে তুমি কেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস কর? আমার উত্তর সহজ, আমি মহান ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।

৪

গোসলখানার মেঝেতে প্রথমবারের মতো সরাসরি ঈশ্বরের সাথে কথা বলার ব্যাপারটা নিয়ে এই পর্যন্ত আমি অনেক সময় ব্যয় করে ফেলেছি এবং ঐশ্বরিক ব্যাপারে আমার

www.pathagar.org

মতামত ব্যাখ্যা করেছি। সেই কালো নভেম্বরের দুঃসময়ে আমি কিন্তু ধর্মতত্ত্বে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী ছিলাম না। তখন আমি কেবল নিজের জীবন বাঁচাতে মরিয়া ছিলাম। খেয়াল করেছিলাম যে, আশাহীন আমি হতাশার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছি যে আমার জীবন হুমকির মুখে। আমার ধারণা কোনো বইয়ে আমি এমনটা পড়েছিলাম যে, ঠিক এই রকম ভয়াবহ অবস্থাতেই মানুষ ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

আমি ফুঁপিয়ে একসা হয়ে ঈশ্বরকে যা বলেছিলাম তা অনেকটা এরকম, হ্যালো, ঈশ্বর, আপনি কেমন আছেন? আমি লিজ, আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

ঠিক তাই, আমি মহাবিশ্বের স্রষ্টার সাথে এমন ভাবে কথা বলছিলাম যেন এইমাত্র কোনো ককটেল পার্টিতে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। আমরা জীবনে যা জানি তাই দিয়েই কিন্তু কাজ চালাই এবং এগুলোই সেই শব্দ যা আমি কোনো সম্পর্কের শুরুতে ব্যবহার করি। আবার হয়তোবা 'আমি সব সময় আপনার কাজের ভক্ত' এই ধরনের কথা বলতে চাইনি বলেও আসলে এসব বলছিলাম।

আমি বলেছিলাম, এই মধ্যরাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। এবং আমি দুঃখিত এর আগে কখনোই আপনার সাথে সরাসরি কথা বলিনি। কিন্তু সবসময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি সে সকল আশীর্বাদের জন্য, যা আপনি আমার জীবনে দিয়েছেন।

এই ভাবনা আমার ফোঁপানিকে আরও গতি দিয়েছিল। ঈশ্বর অপেক্ষা করছিলেন আর আমি নিজেকে টেনে একসাথে জড়ো করে চালিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনি তো জানেনই প্রার্থনাতে আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন? আমার সাহায্যের খুব, খুব প্রয়োজন। আমি জানি না আমি কি করব। আমি একটা উত্তর চাই। দয়া করে আমাকে বলুন আমি কি করব। দয়া করে আমাকে বলুন আমি কি করব...

প্রার্থনাটা ছোট হয়ে যে সারাংশতে দাঁড়িয়েছিল তা বারবার বাজছিল, দয়া করে বলে দিন আমি কি করব?

আমি জানি না কতবার আমি চেয়েছিলাম। আমি কেবল জানি আমি এভাবে তা চেয়েছিলাম যেন কেউ জীবন ভিক্ষা চাচ্ছে। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে থেমে না গেলে হয়ত এই কান্নাটা চলত অনন্তকাল।

সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে আমি আবিষ্কার করেছিলাম, আমি আর কাঁদছি না। একেবারে এমন ফোঁপানির মাঝামাঝি সময়ে আমি থেমে গিয়েছিলাম। যেন আমার দুঃখ আমার ভেতর থেকে শুষে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি মেঝে থেকে আমার কপাল তুলে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম হয়তবা তখন এমন এক সত্তাকে দেখতে পাব যে আমার কান্না বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে কেউই ছিল না। আমি কেবল একাই ছিলাম। আসলে ঠিক একা নয়, আমাকে ঘিরে কিছু একটা ছিল। যাকে এক থলি নীরবতা দিয়ে তুলনা করা যায়, এমন নীরবতা যা খুব কমই অনুভব করা যায়। আমি তা থেকে ভয়ে চিৎকার করে বের হতে চাচ্ছিলাম না। আমি স্থির ছিলাম। জানি না আবার কবে আমি তেমন নীরবতা অনুভব করব।

তারপর আমি একটা স্বর শুনতে পেয়েছিলাম। পাঠক দয়া করে উৎকণ্ঠিত হবেন না। এটা হলিউড চার্লস হেস্টনের ওল্ড টেস্টামেন্টের গলার স্বর না, যে স্বরটা

www.pathagar.org

আমাকে বাড়ির পেছনে বেসবলের মাঠ বানাতে বলবে। এটা খুব সম্ভবত আমার নিজের কণ্ঠ যা আমার ভেতর থেকে আমার সাথে কথা বলছিল। কিন্তু সেটা ছিল আমার সেই স্বর যা আমি আগে কখনো শুনিনি। সেটা আমার কণ্ঠই ছিল, কিন্তু একেবারে পরিণত ধীর এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। কখনো শুধু ভালোবাসা আর স্থিরতা বোধ করলেই আমার কণ্ঠ যেমন শোনাত সেটা ছিল সেই রকম একটা স্বর। আমি কিভাবে সেই মমতা-মাখা উষ্ণতার বর্ণনা দেব, যেভাবে কণ্ঠটা আমাকে উত্তর দিয়েছিল, চিরদিনের জন্য ঐশ্বরিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস খোদাই করে দিয়েছিল?

কণ্ঠটা বলেছিল, বিছানায় যাও লিজ।

আমি শ্বাস ফেলেছিলাম।

আসলে তখনকার মতো সেটাই তাৎক্ষণিক সমাধান ছিল যা আমি করতে পারতাম। আমি হয়ত অন্য কোনো উত্তর গ্রহণ করতাম না। একটা দারুণ গমগমে কণ্ঠ যদি এর বদলে বলত, তোমার অবশ্যই তোমার স্বামীকে তালাক দেওয়া উচিত কিংবা তোমার স্বামীকে অবশ্যই তোমার তালাক দেওয়া উচিত না। কারণ সেটা সত্যিকারের বিচক্ষণতা নয়। সত্যিকারের প্রজ্ঞা শুধু কোনো বিশেষ মুহূর্তের জন্য সম্ভাব্য উত্তরটা দেবে।

বিছানায় যাও লিজ– বলেছিল, ভেতরের কণ্ঠটা। আরো বলেছিল, কারণ এখন নভেম্বর মাসের বুধবার রাত তিনটা বাজে, তোমার এখন এই উত্তর জানাটা জরুরী না। বিছানায় যাও লিজ কেননা আমি তোমাকে ভালোবাসি। বিছানায় যাও লিজ কেননা উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এখন যা করতে পারো সেটা কেবল কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া নিজের ভাল যত্ন নেওয়া। বিছানায় যাও কেননা সুসময় আসলে তুমি আরও শক্তিশালী হবে, ব্যাপারটা সামলে নিতে পারবে এবং সুসময় আসছে খুব শীঘ্রই। কিন্তু আজ রাতে নয়। তাই– বিছানায় যাও লিজ।

যদিও একদিকে এই ছোট অধ্যায়টাতে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের স্বর্গীয় কথোপকথনের অভিজ্ঞতার সকল ধরনের ছাপ রয়েছে। একাকী আত্মা, গভীর রাত, সাহায্য প্রার্থনা, সাড়া দেওয়া কণ্ঠ, রূপান্তরের অনুভূতি। তবুও আমি এটাকে আমার জন্য ধর্মীয় কথোপকথন বলব না কিংবা গতানুগতিকভাবে নিজের পুনর্জন্ম বা রক্ষা পাওয়াও বলব না বরং সেই রাতে যা হয়েছিল তাকে আমি বলব ঐশ্বরিক কথোপকথনের একটা শুরু। একটা পরীক্ষামূলক উক্তির প্রথম শব্দ যা আমাকে ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল।

৫

লিলি টমলিন একবার একটা কথা বলেছিলেন, কোনো কিছু খারাপ হওয়ার আগেভাগেই আরও খারাপ হয়ে যাওয়া। আহা! ব্যাপারটা যদি আমি আগেই কোনোভাবে বুঝতাম! আমার মনে নেই সে রাতে আমার কতটা ঘুম হয়েছিল কিন্তু

www.pathagar.org

খুব বাজে সাতটা মাসের পর আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। শেষমেশ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ভেবেছিলাম খারাপ দিন তো শেষ, যা হওয়ার তাতো হয়েই গেছে। আমার সেই দুর্বল ধারণাতেই পরে প্রমাণ হয়েছিল, বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে আমি আসলে কত কম জানি।

দ্য নিউইয়র্কার ম্যাগাজিনে একসময় একটা কার্টুন দেখেছিলাম, সেখানে দুজন মহিলা কথা বলছিল। একজন অপরজনকে বলছিল, তুমি যদি আসলেই কাউকে বুঝতে চাও তোমার তাকে ডিভোর্স দিতে হবে।

অবশ্যই আমার অভিজ্ঞতা ছিল উল্টো। আমি বলব, তুমি যদি কাউকে আর না চিনতে চাও, তোমার তাকে ডিভোর্স দিতে হবে। কারণ, আমার স্বামী আর আমার মধ্যে এমনটাই ঘটেছিল। আমার বিশ্বাস আমরা দুজনই দুজনকে চমকে দিয়েছিলাম।

সমঝোতার মাধ্যমে কত দ্রুত আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে চেনা মানুষ থেকে সবচেয়ে অপরিচিত আগন্তুকে পরিণত হয়েছিলাম তা আর কি বলব। অপরিচিত হতে থাকার সেই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে আমরা দুজনেই এমন কিছু করছিলাম যা আরেকজনের পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল। সে স্বপ্নেও ভাবেনি আমি তাকে আসলেই ছেড়ে যেতে পারি আর আমিও কল্পনা করিনি যে তাকে ছেড়ে যাওয়াটা সে এতটা কঠিন করে দিতে পারে।

কিছু বাস্তব জ্ঞান আর এক সময় একে অপরকে ভালোবাসার কিছু সুনাম থেকে আমার একটা সাধারণ ধারণা ছিল যখন আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে যাব আমাদের বৈষয়িক বিষয়গুলো একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে মিটমাট করতে কয়েক ঘণ্টা সময়ই লাগবে। আমার প্রাথমিক পরামর্শ ছিল আমরা বাড়িটা বিক্রী করে দেব এবং সকল সম্পত্তি আধা-আধি ভাগ করে নেব কিন্তু এটা আমি করতে পারিনি, আমাদের অন্যভাবে এগুতে হয়েছিল। তার কাছে এই পরামর্শ ঠিক মনে হয়নি তাই আমি আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। এমনকি আধা-আধি ভাগ করার বিষয়টাও আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম। কি হতো যদি সে সকল সম্পত্তি নিয়ে নিত আর আমি সকল বদনাম? আসলে সেটাও তো কোনো সমঝোতায় গড়াত না। তখন আমি এমনিতেই লোকসানের মধ্যে ছিলাম। আপনি কিভাবে এমন একজনের সাথে দর কষাকষি করবেন, একদিন যে আপনাকে তার সর্বস্ব দিতে চেয়েছিল। তার পরবর্তী প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমার তখন আর কিছুই করার ছিল না। তাকে ছেড়ে যাওয়ার অপরাধ বোধ থেকে এক কানাকড়ি নিতেও আমার বাধছিল। এছাড়া আমার নতুন পাওয়া আত্মিক অনুশীলন আমাকে এই ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর করেছিল যে, আমি যুদ্ধ করব না। তাই আমার অবস্থান ছিল এমন– না পারছিলাম নিজেকে তার কাছ থেকে বাঁচাতে না পারছিলাম যুদ্ধ করতে। অনেক দিন পর্যন্ত আমার কাছের আপন মানুষদের এমন অনেক পরামর্শ ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এমনকি একজন উকিলের সাথে পরামর্শ করা থেকেও নিজেকে বিরত রেখেছিলাম। এ-ক্ষেত্রে আমি পুরোপুরি গান্ধী হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম নেলসন মেন্ডেলা। সে সময় এটা বুঝিনি যে গান্ধী এবং মেন্ডেলা দুজনই কিন্তু আইনজীবী।

মাসের পর মাস চলে গিয়েছিল। আমার জীবন শূন্যে ঝুলে ছিল, আমি মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম এরপর কি হবে। আমরা কেবল

www.pathagar.org

আলাদাই থাকছিলাম কিন্তু কোনো সমাধানই হচ্ছিল না। নানান খরচের বিলের স্তূপ জমছিল, ক্যারিয়ার থেমে ছিল, বাড়িটা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছিল আর আমার স্বামীর নীরবতা কেবল আনুষ্ঠানিক যোগাযোগেই ভাঙ্গছিল, মনে করিয়ে দিতে আমি কতটা স্বার্থপর, কতটা অপরাধী।

এবং এরপরই এলো ডেভিড। সেই কুৎসিত বিবাহবিচ্ছেদের সেই বছরে সব আঘাত আর জটিলতা বহু গুনে বাড়িয়ে দিয়েছিল ডেভিড নামক নাটক। যে মানুষটার প্রেমে আমি এভাবে পড়েছিলাম যেন আমি আমার বিয়ে থেকে ছুটি নিয়েছি। প্রেমে পড়া বলতে আমি বলব, আমি আমার বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে ঝাঁপ দিয়ে ডেভিডের বাহুতে এভাবে পড়েছিলাম যেভাবে কার্টুন সার্কাসে একজন পারফর্মার উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিয়ে এক কাপ পানিতে পড়ে যায় আর একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমার বিয়ে থেকে মুক্তি পেতে আমি ডেভিডের সাথে এভাবে সেঁটে ছিলাম যেন আমি সেইগন শহরে বিপদগ্রস্থ একজন অসহায় আর সে একটা শেষ হেলিকপ্টার। সেই বিচ্ছিরি শৃঙ্খল থেকে মুক্তির সমস্ত আশা আর খুশি নিয়ে আমি তার ওপর হামলে পড়েছিলাম। আমি তাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু আমি যদি শক্তিশালী কোনো শব্দ বেছে নেই যা দিয়ে বোঝাতে পারি ডেভিডকে কতটা ভালোবাসতাম সেটা হবে 'প্রচণ্ড।' আর এরকম ভালোবাসা পালন করাটাও সবচেয়ে কঠিন।

হ্যাঁ। আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে ডেভিডের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সে একজন চমৎকার যুবক। জন্মগতভাবে নিউইয়র্কবাসী, একজন অভিনেতা, একজন লেখক। তার তরল বাদামি ইটালিয়ান চোখ দিয়ে আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত। একই সাথে সে ছিল ফুর্তিবাজ, স্বাধীন, নিরামিষাশী, মুখরা, আধ্যাত্মিক এবং আকর্ষণীয়। নিউইয়র্কবাসী একজন যোগী, একজন বিদ্রোহী কবি। ঈশ্বরের নিজস্ব সুদর্শন সৈনিক। তার জীবনধারা ছিল জীবনের চেয়ে বড়, বড়র চেয়ে বড়, অন্তত আমার কাছে। প্রথমবার আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী সুসান তার কথা আমার মুখে শুনেছিল, আমার মুখে উচ্চমাত্রার প্রেমময় সম্ভাষণ লক্ষ্য করেছিল, সে বলেছিল, হে ঈশ্বর, মেয়ে তুমি অনেক বিপদে আছ।

আমার লেখা একটা নাট্যধর্মী গল্পে ডেভিড অভিনয় করছিল এবং সেখান থেকেই ডেভিডের সাথে আমার পরিচয়। সে সেই চরিত্রটাতেও অভিনয় করছিল যা আমি তৈরি করেছিলাম। প্রচণ্ড রকম ভালোবাসায় এমন হয় তাই না? এরকম প্রেমে আমরা বিপরীত জনের কাছে যা যা চাই তা মিলিয়ে একটা চরিত্র তৈরি করি এবং ভেঙে পড়ি যখন তারা সেই চরিত্রে অভিনয় করতে অপারগ হয়ে যায়।

কিন্তু কি দারুণ সময়ই না আমরা এক সাথে কাটাতাম। প্রথম মাসগুলোতে সে ছিল আমার প্রেমময় নায়ক আর আমি ছিলাম আর জীবন্ত স্বপ্ন। অমন অদ্ভুত উত্তেজনা আমি কখনো কল্পনাও করিনি। আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার করেছিলাম। নানান ধরনের ভ্রমণে বেরিয়ে যেতাম। কোনো কিছুর চূড়ায় উঠে আবার অন্য কিছুর মাঝে ডুব সাঁতার দিতাম। পরিকল্পনা করতাম পুরো পৃথিবীটাই ঘুরে বেড়াব একদিন। বেশিরভাগ যুগল তাদের হানিমুনে যতটা না মজা করে তার চেয়েও বেশি মজা করতাম কেবল মোটর বাইকের লাইনের দাঁড়িয়ে। আমরা একে অপরকে একই ডাক নাম দিয়েছিলাম যাতে আমাদের মধ্যে কোনো দূরত্ব না থাকে। প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি

www.pathagar.org

এবং রাতের আহার সব এক সাথেই হতো। সে আমাকে বই পড়ে শোনাত, আমার কাপড় পরিষ্কার করে দিত। প্রথমবার অত্যাশ্চর্য সোনার পাথর বাটির খবরটা দিতে ফোন করেছিলাম সুসানকে। বলেছিলাম, এইমাত্র একজন পুরুষ আমার কাপড় ধোপাখানায় নিয়ে এসেছে আর সে নিজ হাতে ময়লা রগড়ে দিয়েছে। সব শুনে সে আবার বলেছিল, হে ঈশ্বর! তুমি অনেক বিপদে আছ।

লিজ এবং ডেভিডের প্রথম গ্রীষ্মটা ছিল প্রতিটা প্রেমের গল্পের দৃশ্যগুলো যেমন দেখতে ঠিক তেমন। সৈকতে পানির ঝাপটা, হাতে হাত রেখে সোনালি গোধূলিতে দৌড়ে যাওয়া। আমি তখনও ভাবছিলাম আমার বিবাহবিচ্ছেদটা হয়ত ভালোভাবেই সম্পন্ন হবে। এ কারণে আমি আমার স্বামীকে সেই গ্রীষ্মকালটায় কোনো চাপ দেইনি যাতে আমাদের দুজনের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যাই হোক তেমন প্রেমের আনন্দের মধ্যবর্তী সময়ে সেই আইনী বাজে ব্যাপারগুলো মনে রাখা সহজ ছিল না। তারপর সেই গ্রীষ্ম শেষ হলো।

২০১১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আমি আমার স্বামীর সাথে সামনাসামনি শেষ সাক্ষাৎ করেছি। তখনো বুঝতে পারিনি এরপর থেকে আমাদের পক্ষে মধ্যস্থতা করবে উকিল। আমরা নৈশভোজ করেছিলাম একটা রেস্টুরেন্টে, আমি আমাদের বিচ্ছেদ নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা যা করেছিলাম তা হলো ঝগড়া। সে আমাকে জানিয়েছিল আমি একজন মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক এবং সে আমার সাথে আর কথা বলবে না। এর দুদিন পর, নির্ঘুম একটা রাত কাটিয়ে সকালে উঠে জেনেছিলাম, ছিনতাই করা প্লেনটা আমাদের শহরের সব চেয়ে লম্বা দালানে ধ্বসে পড়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে আমার স্বামীকে আমি হয়ত ফোন করতাম, জানতে চাইতাম সে ঠিক আছে কিনা এবং আমরা দুজন সেই ধ্বংসযজ্ঞের পর হয়ত একই সাথে কাঁদতাম। কিন্তু আমি তার কাছে যাইনি। সেই সপ্তাহে এরকম মারাত্মক দুর্ঘটনার পর নিউইয়র্কের মানুষরা যখন হিংসা দ্বেষ ভুলে এক হয়ে গিয়েছিল, আমি আমার স্বামীর কাছে ফিরে যাইনি। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের মাঝে আর কিছুই বাকি ছিল না।

বললে অত্যুক্তি হবে না, এর পরের চার মাস আমি ঘুমাতে পারিনি। আগে ভেবেছিলাম আমি কিছুটা ভেঙে পড়েছি কিন্তু আপাত আমার সমগ্র পৃথিবীর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার জীবন আসলেই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। এখন ভেবে গুটিয়ে যাই, সেই মাসগুলোতে ডেভিডের সাথে থেকে ওর ওপর কী বিচ্ছিরী চাপ দিয়েছিলাম। নাইন ইলেভেনের এবং স্বামীর সাথে বিচ্ছেদের পর আমার ব্যাপারে ডেভিডের বিস্ময়টা এখন আমি বুঝতে পারি। সে আবিষ্কার করেছিল, যাকে সে সবচেয়ে সুখি এবং আত্মবিশ্বাসী মহিলা হিসেবে জানত, ব্যক্তিগতভাবে সে মূলত খাপছাড়া অনুশোচনার একটা গর্ত ছাড়া আর কিছুই না। আমি কান্না থামাতে পারিনি যখন সে পাল্টা বদলা নিতে শুরু করেছিল। সে সময় আমিও দেখতে পাচ্ছিলাম আমার প্রেমাস্পদ আবেগপ্রবণ নায়কের চরিত্রের আর এক অচেনা রূপ। সেই ডেভিড যেন একেবারে অসামাজিক, একটা আমেরিকান বাইসন সাপের চেয়েও যে বেশি শীতল, যার একান্ত নির্জনতা দরকার।

ডেভিডের সেই হঠাৎ সমস্ত আবেগ থেকে সরে যাওয়াই হয়ত সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ছিল। এমনকি সবচেয়ে ভাল পরিস্থিতিতেও আমার মনে হতো এই পৃথিবীর

www.pathagar.org

আমি সবচেয়ে স্নেহ পিপাসু জীব। ডেভিড সোনার ডিম পাড়া একটা রাজহাঁস আর আমি একজন ডিম সংগ্রহকারী, আমাদের আড়াআড়ি একটা সম্পর্ক। সেটাই ছিল আমার সবচেয়ে বাজে অবস্থা। আমি ছিলাম হতাশ এবং নির্ভরশীল। কারো কোল-জুড়ে দু'তিনটা অকালে জন্ম নেওয়া শিশুর চেয়ে আমার বেশি যত্নের দরকার ছিল। তার মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা আমাকে আরও অভাবী করে দিচ্ছিল এবং আমার নিষ্ক্রিয়তা তাকে আরও কয়েক পা করে এগিয়ে দিচ্ছিল বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে। আমার অমন কান্নার অজুহাতে সে দূরে সরে যাচ্ছিল। আমি তাকে মিনতি করেছিলাম, কোথায় যাচ্ছ, আমাদের কি হয়েছে?

আসল ব্যাপারটা ছিল, আমি ডেভিডের প্রতি আসক্ত ছিলাম। নিজের স্বপক্ষে বলতে পারি, ডেভিড এটা লালন করত, যাকে বলে একটা বিধ্বংসী পুরুষ সত্তা। কিন্তু তখন তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে যেটা স্বাভাবিক সেরকম একটা পরিণতির দিকেই সব গড়াচ্ছিল।

মোহের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রেমের লক্ষণ হচ্ছে আসক্তি। এরকম হয় যখন আপনার ভালোলাগার কেউ আপনাকে নির্দিষ্ট মাত্রার উত্তেজক, বিভ্রান্তিমূলক কোনো নেশা ধরিয়ে দেয়। আপনি নিজের কাছে স্বীকার করতে ভয় পান কিন্তু মনে মনে সেটা আপনি চাইছিলেন। কিছু কড়া দাগের আবেগ, বজ্রপাতের মতো চোখ ধাঁধানো ভালোবাসা এবং মস্তিষ্কে দারুণ উত্তেজনার ঘূর্ণি। আপনি ক্ষুধার্ত, নেশাতুর আবেশ নিয়ে দ্রুত সেই মানুষটার তীব্র মনোযোগ ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। যখন সেই মাদক আপনি আর পাবেন না বুঝতে পারেন, আপনি দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়েন, পাগলাটে হয়ে যান, জ্বলে পুড়ে যান।

তার ওপর মনটা অভিমানে ভরে যায়। যে এক সময় এই নেশার দ্রব্যটা সরবরাহ করছিল, অভ্যস্ত করিয়েছিল, অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, আফসোস এখন সে এই চমৎকার কাজটা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। কোনো মূল্যেই সে জিনিসটা আর আপনাকে দিচ্ছে না– কিন্তু এতো কিছুর পরও আপনার মনে হচ্ছে যে জিনিসটা আসলে সে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে কারণ একসময় সে তো আপনাকে তা বিনামূল্যেই দিত।

পরবর্তী পর্যায়ে আপনি নিঃস্ব বোধ করছেন, কোণায় বসে কাঁপছেন, শুধু সেই জিনিসটা ফিরে পেতে আপনি আপনার আত্মা বিক্রি করতে, প্রতিবেশীর ঘরে ডাকাতি করতেও উদ্ধত। অথচ আপনার প্রেমাস্পদ আপনার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। আপনাকে একদিন যে পাগলের মতো ভালোবেসেছিল সে যেন আপনাকে চিনতেই পারছে না।

হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে আপনি তাকে অভিযুক্ত করতে পারছেন না। আমি বোঝাতে চাচ্ছি নিজেকে যাচাই করুন তো একবার। আপনি নিজেই আসলে ভেতরে ভেতরে তালগোল পাকিয়ে থাকা জগাখিচুড়ী নন কি? আপনি কি নিজেই নিজের চোখে অপরিচিত নন? আসলেই তাই। নিজেকে পুরোপুরি আর ক্ষমাহীন অবমূল্যায়ন করে আপনি এখন মোহের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছেন।

ব্যাপারটা হলো, আমি এমন শান্তভাবে বিষয়টা নিয়ে লিখতে পারছি, তা এটাই প্রমাণ করে যে, সময় কতটা দুঃখ ভোলাবার শক্তি রাখে! আমি তখন ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারিনি।

www.pathagar.org

আমার বিয়ের ব্যর্থতার পর ডেভিডকে হারানো, তার পরপর আমার শহরে সন্ত্রাসী হামলা, তারপর বিবাহবিচ্ছেদের কুৎসিত জটিলতা। আমার বন্ধু ব্রায়ান জীবনের এই অভিজ্ঞতাকে তুলনা করেছিল, যেন টানা দুবছর ধরে প্রতিদিন গাড়ি দুর্ঘটনা হচ্ছে। যাহোক যা হয়েছে তা আরও দুর্বিষহ।

ডেভিড এবং আমি দিনের বেলা আমাদের বিভিন্নরকম আনন্দ উৎসব চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু রাতের বেলা, তার বিছানায় সে ছিল একটা জড় পদার্থ। আর আমি, পারমানবিক শীতে একমাত্র জীবন্ত কেউ। সে বাস্তবিকভাবেই আমার সান্নিধ্য থেকে একটু একটু করে অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল। প্রতিদিন আরও, আরও ক্ষত বিক্ষত হতাম আমি। আমার কাছে তা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। যেন সেটা ছিল একটা নির্যাতন কুঠরি। আমি ডেভিডের সুন্দর, প্রবেশাধিকারহীন শরীরের পাশে শুয়ে ভয়াবহ একাকীত্বের ঘূর্ণির আবর্তে ঘুরতে থাকতাম। আমার আত্মহননের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো গতি খুঁজে পেত। শরীরের প্রতিটা অংশ আমাকে ব্যথা দিত। যেন আমি একটা পুরোনো ধাঁচের স্প্রিং সর্বস্ব মেশিন। যাকে অতিরিক্ত কাজের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং যা এখন তার সহ্যের বাইরে। যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে মেশিনটা। কেউ পাশে না দাঁড়ানোই ভালো। আমার মনে হতো নিরাশার আগ্নেয়গিরির মতো কোনো কিছু থেকে পালাতে গিয়ে, শরীর থেকে আমার মাথার অংশ উড়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ সকালেই ডেভিড দেখতে পেত, আমি তার বিছানার নিচে মেঝেতে শুয়ে আছি, গোসলের তোয়ালেতে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে।

সে জিজ্ঞেস করত, কি হয়েছে এখন আবার?

হ্যাঁ। আর একজন পুরুষ পুরোপুরি আমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিল। আমার ধারণা আমি সে সময় প্রায় ত্রিশ পাউন্ড ওজন হারিয়েছিলাম।

৬

সব কিছুই খারাপ ছিল না সেই বছরগুলোর।

ঈশ্বর কখনোই আপনার জন্য অন্তত একটা বিস্কিটের বাক্স না খুলে মুখের ওপর ধড়াম করে দরজা বন্ধ করবেন না। সেই দুঃখগুলোর ছায়াতেই চমৎকার কিছু ঘটতে শুরু করেছিল আমার জীবনে। যেমন শেষমেশ আমি ইটালি ভাষা শিখতে শুরু করেছিলাম, একজন ভারতীয় গুরু খুঁজে পেয়েছিলাম তারপর ইন্দোনেশিয়ার এক কবিরাজ আমাকে তার সাথে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

আমি ধারাবাহিকভাবে ব্যাপারগুলো বর্ণনা করব।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা শুরু হয় ২০০০ সালের শুরুতে। তখন আমি ডেভিডকে ছেড়ে জীবনে প্রথম নিজের জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে পাই। আমার সাধ্যের বাইরে ছিল সেটা কারণ তখনো আমি শহরতলীর একটা বড় ফ্লাটের জন্য টাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম,

www.pathagar.org

যদিও সেখানে কেউ থাকত না। আমার স্বামী সেটা বিক্রি করতে দিচ্ছিল না, কারণ তখনও আমি চেষ্টা করছিলাম আইনগত এবং আইনজীবীর খরচগুলো দুজনের মধ্যে নিজেই বেশীটুকু দিতে। আবার এ দিকে বেঁচে থাকার জন্য আমার নিজের একটা শোবার ঘর অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। তখন আমার সেই অ্যাপার্টমেন্টটাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম আরোগ্য নিকেতন বা মুমূর্ষ রোগীর চিকিৎসালয় হিসেবে। দেয়ালগুলোকে কোমল রঙ দেওয়া, প্রায় প্রতি সপ্তাহে নিজের জন্য ফুল কেনা, যেন আমি আমাকেই হসপিটালে দেখতে যেতাম। নতুন বাসার উপহার হিসেবে আমার বোন আমাকে একটা পানি গরম রাখার বোতল দিয়েছিল তাই শীতল বিছানায় আমার একা থাকতে হতো না। প্রতি রাতে জিনিসটা আমি আমার হৃদয়ের কাছে নিয়ে শুতাম। যেন খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলাম, এখন শুশ্রূষা করছি।

ডেভিড এবং আমার ছাড়াছাড়ি হওয়াতে ভাল না মন্দ হয়েছে জানি না তবে এখন মনে করা কঠিন সেই মাসগুলোতে কতবার আমরা আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম আর কতবার আবার মিলিত হয়েছিলাম। ব্যাপারটা একটা ছকের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যখন আমি ডেভিডের কাছ থেকে দূরে সরে যেতাম। নিজের শক্তি আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতাম এবং তখন আমার প্রতি তার প্রেমের আগুন আবার জ্বলে উঠত। তারপর সম্মানের সাথে, নম্রতার সাথে, বুদ্ধিমত্তার সাথে আমরা আলোচনা করতাম– এসো। আবার চেষ্টা করি।

কিছু সুস্থ সুন্দর পরিকল্পনা দিয়ে নিজেদের মধ্যেকার অসামঞ্জস্য আর সমস্যার সমাধান করতে চাইতাম। কেননা দুজন মানুষ যারা একে অপরকে ভালোবাসতো তারা চাইবেই চিরকাল এভাবে সুখে শান্তিতে থাকতে, তারা কিভাবে সেই রূপকথার স্বপ্নটা ভেঙে দিতে পারে? ব্যাপারটা কঠিন তাই না? নতুন আশা নিয়ে আবার দুজন এক হয়ে প্রেমে উত্তাল কয়েকটা দিন বা কখনো কয়েক সপ্তাহ কাটাতাম তারপর আবার সেই একইভাবে ডেভিড আবার আমার কাছ থেকে সরে যেত এবং আমি তার সাথে সেঁটে থাকতাম। কিংবা আমি সেঁটে থাকতাম আর সে সরে যেত। আমরা খুঁজে পেতাম না ঠিক কোন ঘটনায় এই সমস্যাটা শুরু হতো, গতি পেত। আমি আর একবার বিধ্বস্ত হয়ে সব শেষ করে দিয়েছিলাম, আর সেও চলে গিয়ে সব শেষ করে দিয়েছিল।

ডেভিড ছিল আমার দুর্বলতা।

তবে যখন আমরা আলাদা হয়েছিলাম, প্রথমে খুব কষ্টকর ছিল ব্যাপারটা! আমি একা থাকা শুরু করেছিলাম, বুঝতে শুরু করেছিলাম শুধু আমার শরীর না, আমার ভেতরটাও নতুন করে বাড়ি পাল্টিয়েছে। যদিও তখনো আমার জীবন দেখে মনে হচ্ছিল নিউ জার্সি টার্নপিকের ছুটিতে রাস্তার জ্যামে কয়েকটা যানবাহনের একযোগে দুর্ঘটনা হয়েছে কিন্তু সাথে এটাও অনুভব করতে শুরু করেছিলাম যে, আমি একটা স্বতন্ত্র সত্তা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পথের কিনারে দাঁড়িয়ে দুলছিলাম। আমি আমার বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে বা ডেভিডের নাটক নিয়ে আর আত্মহত্যার প্রবণতায় ভুগছিলাম না। সেই দিনগুলোতে আবির্ভূত স্থান, কালের প্রতিটা প্রকোষ্ঠ নিয়ে আমি আসলে আনন্দিত ছিলাম। সেজন্যই আমি আমার নিজেকে নতুন করে মৌলিক প্রশ্ন করতে পারছিলাম,

www.pathagar.org

তুমি কি করতে চাও লিজ?

বেশিরভাগ সময় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহস পেতাম না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রশ্নটার অস্তিত্ব নিয়ে শিহরিত হতাম। অবশেষে খুব সাবধানে উত্তর দেওয়া শুরু করেছিলাম। শিশুর পা ফেলার মতো আস্তে আস্তে। নিজেকে এগুতে দিচ্ছিলাম, যেমন,

আমি যোগসাধনা করতে চাই।

আমি তাড়াতাড়ি এই অনুষ্ঠান থেকে বেরুতে চাই, যাতে বাড়ি গিয়ে আমি একটা উপন্যাস পড়তে পারি।

আমি এক বাক্স পেনসিল কিনতে চাই।

এসব উত্তরের সাথে প্রতিবারই নতুন একটা অদ্ভুত উত্তর থাকত। আর তা হলো– আমি ইটালিয়ান ভাষা শিখতে চাই।

অনেক বছর ধরে আমি ইটালিয়ান ভাষা শিখতে আগ্রহী। এটা এমন একটা ভাষা যা আমার কাছে গোলাপের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু কখনো তা শেখার পেছনে কোনো বাস্তবিক কারণ খুঁজে পাইনি। এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত অনেক কাজই ছিল, যেমন একসময় শেখা ফ্রেঞ্চ আর রাশিয়ান ভাষা ঝালিয়ে নেওয়া? কিংবা স্প্যানিশ শিখে আমেরিকায় আমার হাজার হাজার সহকর্মীর সাথে যোগাযোগ করা? ইটালিয়ান ভাষা শিখে আমি কি করব? এমন তো নয় আমি সেখানে চলে যাচ্ছি। তাই তার চেয়েও বাস্তবসম্মত চিন্তা হবে কোনো বাদ্যযন্ত্র শেখা।

কিন্তু সব কিছুর বাস্তবিক লাভের সাথে কি যোগ থাকতেই হবে। বহু বছর তো এমন হিসাব মিলিয়ে জীবন যাপন করেছি! কাজে, উৎপাদনে, কখনো বাস্তবতার সাথে কোনো বিতর্কে মোড় নেইনি। ভালোবাসার মানুষের যত্ন নিয়েছি। আমার ঋণের তথ্য, ভোট দেওয়া এসব কিছুই ঠিকঠাক চালিয়ে গেছি। সারা জীবনটাই কী দায়িত্বের সুতোয় বেঁধে রাখতে হবে? জীবনের এত এত ক্ষতির তালিকার মধ্যে ইটালিয়ান ভাষা শেখার ব্যাপারটার লাভ-ক্ষতির বিবেচনা করা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না ইটালিয়ান শেখা ছাড়া সেই মুহূর্তে আর কি আমাকে এর চেয়ে বেশি আনন্দ দেবে? ভাষা শেখা তো কোনো বিশেষ গন্তব্য ছিল না। এমন তো নয় আমি হঠাৎ বলছিলাম, সেই বত্রিশ বছর বয়সে আমি নিউইয়র্ক শহরের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে অধ্যক্ষ ব্যালেরিনা হতে চাই। ভাষা শেখাটা এখানে এমন একটা কিছু যা আমি আসলে নিজের জন্য করতে চাচ্ছিলাম।

তাই ভাষা শেখানোর সেই ধরনের চলতি একটা প্রতিষ্ঠানে আমি ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। মজার ব্যাপার হলো তাকে স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের রাতের স্কুলও বলা হতো। আমার বন্ধুরা ব্যাপারটা খুব হাস্যকর হিসেবে নিয়েছিল। নিক জিজ্ঞেস করেছিল, বুঝতে পেরেছি তুমি ইটালিয়ান কেন শেখ। ইটালি আবার ইথিওপিয়াকে আক্রমণ করলে যাতে তখন লাভবান হতে পার এবং যাতে দুইটা দেশের মানুষের একটা ভাষার ওপর তোমার দখলদারিত্ব নিয়ে সুবিধা আদায় করতে পার। তাই না?

কিন্তু আমি তা ভালোবাসতাম। প্রতিটা শব্দ আমার কাছে চড়ুইয়ের গানের মতো জাদুকরী, ত্রিতালের মতো। ক্লাস শেষে বৃষ্টির মধ্যে আমি বাড়ি ফিরে যেতাম। গরম স্নানের প্রস্তুতি নিতাম। তারপর বুদবুদে ভর্তি গামলায় শুয়ে ইটালিয়ান অনুবাদের বই

www.pathagar.org

থেকে নিজেকে পড়ে শোনাতাম। আমার মাথা থেকে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যথা চলে যেত। আর সেই একবুক ব্যথা আমি ভুলে যেতাম। শব্দগুলো আমাকে আনন্দে হাসাত। আমার সেল ফোনের উদাহরণ দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম যেমন, 'ইল মিউ টেলিফোনিও, আমার ছোট্ট কিশোরী টেলিফোন।' আমি সেইরকম একজন বিরক্তিকর মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম যে কিনা সারাক্ষণ শুধু বলে 'চাও'!

মনে হয় আমি অতিমাত্রায় বিরক্তিকরই ছিলাম কেননা যে কোনো ইটালিয়ান শব্দ উচ্চারণের পর তার সাথে সবসময় ব্যাখ্যাও করতাম শব্দটার উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে। একটা প্রবাদ বা প্রবচনটা যা মধ্যযুগীয় ভেনিসিওরা ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ অভিবাদনের জন্য ব্যবহার করত, 'সুনো ইল সুও শিয়াবো।' অর্থ হচ্ছে 'আমি তোমার দাস।' শুধু এই শব্দগুলো উচ্চারণ করতেই আমার নিজেকে সুখি আর কামময়ী মনে হতো। আমার বিবাহবিচ্ছেদের উকিল আমাকে চিন্তা করতে নিষেধ করেছিল। সে বলেছিল তার একটা মক্কেল ছিল, যে জন্মসূত্রে কোরিয়ান, একটা বিচ্ছিরি বিবাহবিচ্ছেদের পর সে আইনানুযায়ী নিজের একটা ইটালিয়ান নাম ঠিক করেছিল। আর তা শুধু নিজেকে সুখি আর আবেদনময়ী হিসেবে ভাবতে।

আমিও ভাবতে শুরু করেছিলাম, আমার আসলে ইটালি চলে যাওয়া দরকার।

৭

আর একটা লক্ষণীয় বিষয় ঐ সময় ঘটছিল, যা ছিল আত্মিক নিয়মানুবর্তিতার এক নব্য অভিজ্ঞতা। আমার জীবনে সত্যিকারের জীবন্ত ধর্মীয় গুরুর সন্ধান পেয়ে আমি যেন আশ্রয়, সাহায্য পেয়েছিলাম। এই জন্য আমি সব সময় ডেভিডকে ধন্যবাদ জানাই। ডেভিডের এপার্টমেন্টেই আমি আমার গুরুর সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। সেই এপার্টমেন্টের ঘরগুলোতে হাঁটতে হাঁটতে একটা জ্যোতির্ময় চেহারার সুন্দর মহিলার ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। কে উনি?

ডেভিড বলেছিল, উনি হচ্ছেন আমার আত্মিক শিক্ষক।

কিছুক্ষণের জন্য আমার হৃদয় তার স্পন্দন থামিয়ে, স্পষ্টভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। এরপর সে উঠে দাঁড়িয়ে ভীতি দূর করেছিল। একটা গভীর শ্বাস নিয়ে ঘোষণা করেছিল, 'আমার একটা আত্মিক শিক্ষক চাই।' হ্যাঁ আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, আমার হৃদয় কথাটা আমার মুখ দিয়ে বলাচ্ছিল। নিজের ভেতরে অদ্ভুত অংশটা অনুভব করছিলাম এবং আমার মন আমার শরীর থেকে এক মুহূর্তের জন্য বের হয়ে এসে মুখের চারপাশে প্রদক্ষিণ করেছিল। বিস্মিত আর নীরব কণ্ঠে বলেছিল, তুমি চাও?

আমার হৃদয় উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ।

তারপর আমার মন আমার হৃদয়কে জিজ্ঞেস করেছিল, কবে থেকে।

তখন আমি উত্তরটা জানতাম, 'গোসলখানার মেঝে থেকে।'

www.pathagar.org

ও ঈশ্বর! আমি একজন আত্মিক গুরু চাচ্ছিলাম। আমি দ্রুত কল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছিলাম এমন কেউ থাকলে কেমন হতো! আমি কল্পনা করছিলাম সেই আলোকিত চেহারার মহিলাটি আমার এপার্টমেন্টে কয়েক সপ্তাহ ধরে আসছেন, বসছেন, চা খাচ্ছেন এবং কথা বলছেন আধ্যাত্মিকতা নিয়ে। তিনি আমাকে কিছু কাগজ পড়তে দিয়েছেন এবং আমি ধ্যানের সময় যে অস্থিরতা অনুভব করতাম তার ব্যাখ্যা করছেন।

আমার সকল জল্পনা কল্পনা মাটিতে মিশে গিয়েছিল যখন ডেভিড সেই মহিলার আন্তর্জাতিক অবস্থানের কথা বলেছিল। তার হাজার হাজার শিক্ষার্থী আছে যারা অনেকেই নাকি তাঁকে মুখোমুখি কখনও দেখেনি। সে আরও বলেছিল, নিউইয়র্কে প্রতি মঙ্গলবার রাতে একটা সম্মেলন হয় যেখানে তার ভক্তরা দলবদ্ধভাবে ধ্যান করে, জপ করে। ডেভিড বলেছিল, যদি একটা ঘরে কয়েকশো মানুষ মিলে একসাথে ভজন করাটা তোমার কাছে খারাপ না লাগে তাহলে চলে এসো মাঝে মাঝে।

এর পরের মঙ্গলবার আমি তার সাথে গিয়েছিলাম। সেই সাধারণ মানুষের মুখে ঈশ্বরের গান শুনে খারাপ লাগা দূরে থাক আমার বরং মনে হয়েছিল আমার আত্মাও সেই জপে স্পষ্টভাবে জেগে উঠেছে। আমি বাসায় হেঁটে ফিরছিলাম, মনে হচ্ছিল আমার ভেতর দিয়েও বাতাস প্রবাহিত হতে পারে, আমি যেন কাপড় শুকাতে দেওয়া দড়িতে উড়ন্ত পরিষ্কার লিনেন কাপড়, যেন নিউইয়র্ক শহরটা একটা চালের গুঁড়ার তৈরি কাগজ আর আমি এতই হাল্কা যে, সেই কাগজের তৈরি এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে অনায়াসে ছুটে চলতে পারি। আমি প্রতি মঙ্গলবারে সেই ভজন শুনতে যাওয়া শুরু করলাম। প্রতিদিন সকালে ধ্যান করা শুরু করলাম সেই গুরু যেটা শিখিয়েছিলেন। সেই রাজকীয় মন্ত্র, 'ওঁম নামাহ শিবাহ।' অর্থ হচ্ছে আমি সেই ঐশ্বরিক সত্তাকে সম্মান জানাই যা আমার অন্তরে বিরাজ করে। তারপর আমি প্রথমবার সেই গুরুকে শিষ্যদের সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে শুনেছিলাম। তার কণ্ঠস্বর আমার সারা শরীরে ঠাণ্ডা ঝাঁকুনি দিয়ে শিহরিত করেছিল এমনকি আমার মুখের ত্বকেও তার আবেশ ছিল এবং যখন আমি শুনেছিলাম ভারতে তার একটা আশ্রম আছে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যত দ্রুত পারা যায় আমার সেখানে যেতে হবে।

৮

এর মধ্যে ম্যাগাজিনের একটা কাজে আমাকে ইন্দোনেশিয়া যেতে হয়েছিল, ঠিক যখন বিবাহবিচ্ছেদের বেড়াজালে আমি ভঙ্গুর, একাকী আর বন্দিনী আর এসব কিছুর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ভারাক্রান্ত। তখন একটা নারীবাদী পত্রিকার সম্পাদক আমাকে বলেছিল, সে আমাকে বালিতে একটা যোগসাধন ভিত্তিক ছুটিতে পাঠাতে পারে যদি আমি তাকে সাম্প্রতিক বিষয় সংক্রান্ত একটা পর্ব-ভিত্তিক প্রশ্ন করি। যেমন

www.pathagar.org

কোনো অদ্ভুত খবর আছে কী? বা জেমস ব্রাউনের কী পতন হবে? ইত্যাদি। বালিতে যাওয়ার পর সেখানকার যোগশাস্ত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আমাদের একদিন বলেছিল, আপনারা যারা যারা এখানে আছেন তারা কি নবম প্রজন্মের একজন বালিনিজ কবিরাজের সঙ্গে দেখা করতে চান?

উত্তর অপ্রয়োজনীয়। আমরা সবাই এক রাতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

কবিরাজ আকারে ছোটখাটো, হাসিখুশি চোখের, বাদামি বর্ণের এক বৃদ্ধ, যার প্রায় সবগুলো দাঁতই নেই। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আসলেই তিনি প্রায় সব দিক থেকেই স্টার ওয়ারের চরিত্র ইয়োডার মতো দেখতে। তাঁর নাম কেটুট লেয়র। তিনি ভাঙা ভাঙা খুবই মজার ইংরেজি বলেছিলেন। কবিরাজ কোথাও আটকে গেলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য অবশ্য সেখানে একজন অনুবাদকও ছিল।

যোগসাধক আমাদের আগেই বলে দিয়েছিলেন আমরা প্রত্যেকে একটা সমস্যা বা একটা করে প্রশ্ন তাঁকে করতে পারব আর তিনি হয়ত আমাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারবেন। আমি কয়েকদিন ধরে চিন্তা করেছিলাম কি প্রশ্ন করা যেতে পারে। আমার প্রাথমিক ভাবনাটা ছিল একেবারে বাজে। যেমন, 'আপনি কি এমন কিছু করতে পারবেন যাতে আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে দেয়? আপনি কি এমন কিছু করতে পারবেন যাতে ডেভিড আবার আগের মতো আমার প্রতি যৌন আকাঙ্ক্ষা বোধ করে?'

আমার নিজের চিন্তার ওপর লজ্জা হয়েছিল। ছি! আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসে এক বৃদ্ধ কবিরাজকে যা বলতে চেয়েছিলাম তা সবই পুরুষের সাথে আমার সম্পর্ক নিয়ে মধ্যস্থতা বিষয়ক। তবে যখন বৃদ্ধ আমাকে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমি কি চাই?' আমি অন্য ধরনের সত্যিকারের কিছু শব্দ খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, আমি ঈশ্বরের সাথে একটা অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা চাই। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি এই পৃথিবীর ঐশ্বরিকতা বুঝতে পারি, তারপর তা আবার হারিয়ে ফেলি, কারণ আমার ক্ষুদ্র বাসনা আর ভয়গুলো আমাকে ছেঁকে ধরে। আমি সারাক্ষণ ঈশ্বরের সংস্পর্শে থাকতে চাই কিন্তু কোনো সন্ন্যাসী হতে চাই না কিংবা সকল পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে চাই না। আমার ধারণা আমি যা চাই তা হলো কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে এই পৃথিবীতে আনন্দের সাথে বেঁচে থাকা যায়।

কেটুট বলেছিলেন তিনি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর একটা ছবিতে এঁকে দিতে পারবেন। তিনি আমাকে একটা ছবি দেখিয়েছিলেন যেটা তিনি একবার ধ্যানের মধ্যে এঁকেছিলেন। সেটা ছিল একটা উভয়লিঙ্গ মানুষের শরীর। মানুষটা দুই হাত জড়ো করে প্রার্থনারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। যার চারটা পা এবং কোনো মাথা ছিল না। যেখানে মাথা থাকার কথা সেখানে ছিল কিছু বুনো ঝোপঝাড়, ফার্ন আর ফুল। হৃদয়ের ওপর ছিল একটা ছোট হাস্যরত মুখ। কেটুট তার অনুবাদকের মাধ্যমে বলেছিলেন, তুমি যে ভারসাম্য চাও তা তৈরি করতে তোমাকে এমন হতে হবে। তোমাকে মাটিতে এমন সুঠামভাবে পা রাখতে হবে যেন তোমার পা দুটি নয়, চারটা। সেভাবেই তুমি এই পৃথিবীতে থাকতে পারবে কিন্তু তোমাকে তোমার মাথা দিয়ে পৃথিবীকে দেখা বন্ধ করতে হবে। দেখতে হবে তোমার হৃদয় দিয়ে আর সেভাবেই তুমি ঈশ্বরকে জানবে।

www.pathagar.org

তারপর তিনি আমার হাত দেখতে চেয়েছিলেন। আমি আমার বাম হাতের তালু তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিলাম এবং তিনি আমার বিষয়গুলো এভাবে বর্ণনা করেছিলেন যেন তিনি একটা ধাঁধার তিন টুকরো আলাদা নকশা একসাথে জড়ো করে সমাধান করছেন। তিনি শুরু করেছিলেন এভাবে,

তুমি একজন বিশ্ব ভ্রমণকারী।

আমি ভেবেছিলাম বালিতে আমাকে দেখে তিনি হয়ত এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কথাটা বলছেন যে আমি একজন ভ্রমণবিদ। তাই আমি এই বক্তব্যে প্রথমে তেমন গা করিনি। তিনি আরও বলেছিলেন,

আমার দেখা তুমি সবচেয়ে ভাগ্যবতী মানুষ। তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, তোমার অনেক বন্ধু হবে, অনেক অভিজ্ঞতা হবে। তুমি পুরো পৃথিবী দেখবে। তোমার জীবনে একটাই সমস্যা আর সেটা হলো, তুমি অতিরিক্ত চিন্তা কর। তুমি অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ এবং ভীতু। আমি যদি তোমাকে নিশ্চয়তা দেই তোমার জীবনে আসলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

আমি ইতস্তত হয়ে এভাবে মাথা ঝাঁকিয়েছিলাম যার অর্থ দাঁড়ায়, 'না বিশ্বাস করব না।'

তোমার কাজ হচ্ছে সৃষ্টিশীল কিছু করা, তুমি হয়ত একজন শিল্পী এবং তার জন্য তুমি ভাল বেতনও পাও। তুমি অর্থে বিত্তে সহজাত, হয়ত অনেক বেশি অভ্যস্ত। তবে একটা সমস্যা হলো অচিরেই তুমি সকল টাকা-পয়সা হারাবে।

আমার বিবাহবিচ্ছেদের কথা মনে করে আমি বলেছিলাম, মনে হয় ছয় থেকে দশ মাসের মধ্যে এটা হতে পারে।

কেটুট সবজান্তার মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ। মানে এরকমই হওয়ার কথা। কিন্তু দুশ্চিন্তা কর না। সব টাকা হারিয়ে ফেলার পর তুমি আবার সব কিছু ফিরে পাবে। তুমি ভাল থাকবে। তোমার দুটো বিয়ে হবে। একটা অনেকদিন টিকবে আর একটা টিকবে না এবং তোমার দুটি সন্তান হবে।

আমি বিয়ের ব্যাপারটার ব্যাখ্যা চেয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তিনি আমার হাতের রেখার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'অদ্ভুত।' এমন কিছু আপনি আপনার হস্তরেখাবিদ বা দাঁতের চিকিৎসক এর কাছে শুনতে চাইবেন না। তিনি আমাকে বলেছিলেন সোজাসুজি ঝুলন্ত বাতির কাছে যেতে যাতে তিনি ভালোভাবে আমার হাত দেখতে পারেন। তারপর ঘোষণা করেছিলেন, আমি ভুল বলেছি। তোমার কেবল একটা বাচ্চা হবে, খুব সম্ভবত একটা মেয়ে আর তাও যদি তুমি চাও। কিন্তু কিছু একটা আছে।

তিনি ভ্রূ-কুঁচকে আবার একটু দেখে শেষে নিশ্চিন্তের সাথে বলেছিলেন, খুব দ্রুত একদিন তুমি আবার বালিতে আসবে। তোমাকে আসতেই হবে। এখানে তিন থেকে চার মাস থাকবে। তুমি আমার বন্ধু হবে। খুব সম্ভবত তুমি আমার পরিবারের সাথে থাকবে। আমি তোমার কাছে ইংরেজি শিখব। আমি আসলে এমন কাউকে পাইনি যার সাথে ইংরেজি অনুশীলন করা যায়। আমার ধারণা শব্দের ক্ষেত্রে তুমি পারদর্শী। আমার ধারণা যে সৃষ্টিশীল কাজটা তুমি কর তা শব্দ সম্পর্কিত। হ্যাঁ ঠিকই আছে সেটা শব্দই।

www.pathagar.org

তারপর তিনি দাঁড়িয়ে এভাবে করমর্দন করেছিলেন যেন সব চূড়ান্ত।
আমি বলেছিলাম,
আপনি যদি ব্যাপারটা গুরুত্বসহকারে নেন তাহলে আমিও সেভাবেই নেব জনাব।
তিনি দাঁতহীন হাসি দিয়ে বলেছিলেন,
ঠিক আছে আবার দেখা হবে।

৯

তখন আমি এমন একজন মানুষ যাকে একজন নবম প্রজন্মের কবিরাজ বলেছে বালিতে যাওয়া যার ভাগ্যের লিখন এবং আমি নাকি তার সাথে চার মাসের মতো থাকব। ভাবতেই মনে হয়েছিল আমার তা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এভাবেই আমার সারা বছর জুড়ে ভ্রমণের ইচ্ছার পালে হাওয়া লেগেছিল। এরপর দেখা গেল আমার নিজের একটা কাজে সত্যিই আমাকে বালিতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল। সেটাই ছিল কেটুটের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ। যদিও আমি জানতাম না তা কিভাবে সম্ভব। আমার জীবন তখন এমনিতেই বিশৃঙ্খল আর অগোছালো। শুধু কি একটা উচ্চমূল্যের বিবাহবিচ্ছেদ, ডেভিডের সাথে ঝামেলা মেটানোর ছিল, আমার তখনো একটা ম্যাগাজিনে চাকরি করতে হতো। আর সেটা আমাকে বাধা দিচ্ছিল চার মাসের জন্য অন্য কোথাও যেতে। কিন্তু আমাকে সেখানে ফিরে যেতেই হতো। তাই নয় কী? সে কি এমনটাই ভবিষদ্বাণী করেনি? সমস্যা হলো আমি ভারতেও আমার গুরুর আশ্রমে যেতে চাচ্ছিলাম। ভারতে যাওয়া একটা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আরও ঘোলাটে ব্যাপার, আমি ইটালি যাওয়ার জন্য অনেক আগে থেকেই মরিয়া ছিলাম যাতে আমি ইটালি ভাষা অনুশীলন করতে পারি। এছাড়া আমি তো সব সময় এই ইচ্ছাই লালন করেছি, কিছুটা সময় এমন একটা সংস্কৃতিতে সময় কাটাবো যেখানে সৌন্দর্য আর শান্তির চির সহবাস।

ইচ্ছাগুলো একটার সাথে আর একটা জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ইটালি আর ভারতের ব্যাপারটা। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আমার যে অংশটা ভেনিসের ভেইল খেতে চায়? না সেই অংশ যে ভারতের কোনো আশ্রমে সন্ন্যাসীরা জেগে ওঠার আগে দিনভর প্রার্থনা বা ধ্যানের উদ্দেশ্যে অনেক দূর হেঁটে যেতে চায়? একবার মহান দার্শনিক কবি রুমি তার শিষ্যদের উপদেশ দিতে বলেছিলেন, 'জীবনে সবচেয়ে বেশি যে তিনটা জিনিস চাও তার তালিকা তৈরি কর। যদি তালিকার কোনো একটা উপাদানের সাথে আর একটা উপাদানের বিভেদ হয়, মানে একটা পেতে গেলে আর একটা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে বুঝে নেবে তুমি নিজেই নিজের অসুখি সত্তার জন্য দায়ী।' তিনি শিখিয়েছিলেন, যেকোনো একটা চাহিদাকে লক্ষ্যবিন্দু করে জীবন যাপন করা ভালো। কি লাভ আছে একাধারে একটা উচ্চশ্রেণির জীবন যাপনের মাঝে। কিংবা কীইবা হবে নিজেকে পার্থিব দৃষ্টিতে বিত্তশালী হিসেবে

www.pathagar.org

তৈরি করে, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে নিজের সাথে কিছু বেমানান জিনিসের ভারসাম্য বজায় করে চলা হয়। যেখানে জীবন যাপনের সার্থকতার জন্য কোনো কিছুই বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না। যেন সব চাই।

আমার ব্যাপারটাও ঠিক তেমন ছিল। আমি দুটোই উপভোগ করতে চাচ্ছিলাম। একদিকে পার্থিব সুখ অন্যদিকে সবচেয়ে সেরা ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা। মানব জীবনের দ্বৈত সত্তা। আমি যা চাচ্ছিলাম তাকে গ্রিক ভাষায় বলে 'কালোস কাই আগাথছ' ভাল এবং সৌন্দর্যের একমাত্র ভারসাম্য। বিগত জটিল মাসগুলোতে আমি এই দুটো জিনিসই পাচ্ছিলাম না। কেননা আনন্দ এবং উৎসর্গ এই দুটির উৎকর্ষতার জন্যই চিন্তামুক্ত একটা কোণ চাই এবং আমি তখন বাস করছিলাম একটা ক্রমাগত চলন্ত বিশাল দুশ্চিন্তার বর্জ্য চূর্ণকরণ যন্ত্রের ভেতর। আনন্দ আর উৎসর্গের ভারসাম্য মাত্রা এবং কাল নির্ধারণের জন্য সেই কৌশলটা জানা চাই। অল্প সময় বালিতে থেকে আমার মনে হয়েছিল হয়ত বালীবাসিরাই আমাকে তা শেখাতে পারে। কিংবা কবিরাজ নিজে।

তাই আমি বাছাই করা ছেড়ে দিয়েছিলাম– ইটালি, ভারত কিংবা ইন্দোনেশিয়া কোথায় যাব? এবং সমানভাবে মেনে নিয়েছিলাম আমি তিনটা দেশেই যেতে চাই। চার মাস করে এক একটা দেশে সব মিলিয়ে এক বছর। অবশ্যই এটা এক বাক্স পেনসিল কেনার চেয়ে বড় স্বপ্ন কিন্তু সেটাই আমি চাচ্ছিলাম এবং আমি জানতাম আমি এই বিষয়ে লিখতেও চাই। দেশগুলো ভ্রমণ করাই মুখ্য ছিল না। তা তো আমি আগেও করেছি। এর চেয়েও বেশি ছিল এক একটা দেশে নিজের এক একটা সত্তার সাথে পরিচিত হওয়া, দেশগুলোর ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সেই বিশেষ কাজে আমাকে ভালোভাবেই সাহায্য করেছে। আমি ইটালির আনন্দের কৌশল জানতে চেয়েছিলাম, ত্যাগের কলা শিখতে চেয়েছিলাম ভারতে এবং ইন্দোনেশিয়াতে এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা। এরপরই খেয়াল করেছিলাম সবগুলো দেশের নাম কাকতালীয় ভাবে আই দিয়ে শুরু হয়। এবার ভাবুন এই সুযোগে আমার বুদ্ধিমান গাধা বন্ধুদের আমাকে খেপানোর লাগাম কিরকম ছিঁড়ে গিয়েছিল। তারা বলা শুরু করেছিল, আমি যখন তিনটা আই-এ যেতে চাই, তাহলে কেন আমি ইরান, আইভরি কোস্ট এবং আইসল্যান্ডে যাচ্ছি না। এর চেয়ে ভাল হতো যদি আমি মহান ত্রি 'আই' এর প্রার্থনালয়ে যাই। আইস্লিপ, আই ৯৫, এবং আইকা। আমার বান্ধবী সুসান আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান খুলতে যার নাম হবে 'দেশ-কালের সীমানা বিহীন ডিভোর্সি মেয়ের দল।' কিন্তু এইসব কৌতুক নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কারণ আমি কোথাও যাওয়ার মতো তখনো স্বাধীন ছিলাম না। তারও অনেক পরে আমি আমার বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বের হতে পেরেছিলাম।

আমি আমার স্বামীকে আইনানুগ চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলাম। সেই দুঃস্বপ্ন থেকে বের হতে আমি মারাত্মক সব কাজ করছিলাম যেমন, কাগজ পেশ করা বা তার বেআইনি মানসিক অত্যাচারের জন্য লিখিত আইনি অপবাদমূলক অভিযোগ পাঠানো। এমন সব কাগজপত্র যেখানে বিজ্ঞতার ছিটেফোঁটা ছাপও নেই। জাজকে যেখানে বলার উপায় নেই, 'এই যে শোনেন, এটা আসলে একটা জটিল সম্পর্ক। আমি নিজেও অনেক ভুল করেছি, এবং এ বিষয়ে আমি দুঃখিত কিন্তু আমি সর্বোপরি মুক্তি চাইছি।'

www.pathagar.org

আমি এখানে আমার সুধী পাঠকদের জন্য একটা নীরব প্রার্থনা করছি, আপনাদের কারোই যেন কখনোই নিউইয়র্ক শহরে বিবাহবিচ্ছেদ না হয়।

২০০৩ সালের বসন্তে সব কিছু অসহ্য পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। দেড় বছর পার হয়ে গিয়েছিল, আমার স্বামী শেষমেশ বোঝাপড়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। হ্যাঁ, সে টাকা চাচ্ছিল, সাথে বাড়িটাও এবং ম্যানহাটন এপার্টমেন্টের ভাড়াটাও। সেগুলো যা এক সময় আমাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে এমন কিছুও চাইছিল যা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। তা হলো বিবাহিত অবস্থায় আমার লেখা একটা বইয়ের রয়ালটির অংশ। ভবিষ্যতে যদি তা দিয়ে ফিল্ম বানানো হয় সেটার অংশ, আমার অবসর ভাতার একটা অংশ ইত্যাদি। এবং তখন আমাকে আপত্তি জানাতে সোচ্চার হতে হয়েছিল। মাসের পর মাস দুই পক্ষের উকিলের দেন দরবারের পর কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ সমঝোতা উপস্থাপিত হতো। দেখে মনে হতো আমার স্বামী তখন একটু পরিবর্তিত বোঝাপড়ায় যেতে চাচ্ছেন। যেটা উচ্চমূল্যের হলেও হয়ত আমি হাসি মুখে মেনে নিতাম কিন্তু তার চেয়েও ব্যয়সাপেক্ষ ছিল দিনের পর দিন আদালতে যাওয়া এবং শুধু সময়ের অপচয় না আত্মার অপচয়ও কি কম ছিল! সে যদি সহজেই সাক্ষর করত তাহলে আমার যা করার ছিল তা হলো সব দিয়ে দেওয়া আর চলে আসা। সেটা আমার জন্য ভাল হতো। কিন্তু যে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল তাতে আমাদের সম্পর্ক একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রতা বলে আর কিছুই বাকি থাকেনি। আমি তখন একটা জিনিসই খুঁজছিলাম আর তা হলো 'দরজা।'

প্রশ্ন ছিল, সে কি সাক্ষর করবে? অনেক সপ্তাহ ধরে সে লড়ে যাচ্ছিল। সে যদি সেই সমঝোতায় রাজি না হতো আমাদের আবার আদালতে বিচারে হাজির হতে হতো। এক একটা শুনানি মানে বাকি টাকাগুলো আইনি খরচায় নষ্ট করা। তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো একটা বিচার কার্য মানে আর একটা বছর। একেবারে ভয়াবহ অবস্থা। তাই আমার স্বামী যে সিদ্ধান্তই নিত তা আমার আর একটা বছরের ভাগ্য নিশ্চিত করছিল। ভাবতাম আমি কি সত্যিই পারব ইটালি, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ায় যেতে। নাকি কোথাও কোনো আদালত কক্ষে শুনানিতে বসে থাকাই আমার ভাগ্য?

প্রতিদিন চৌদ্দবার আমি আমার উকিলকে ফোন করতাম- 'কোন খবর আছে?' আর প্রতিদিনই সে আমাকে নিশ্চয়তা দিত সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং যখনই সে জানতে পারবে চুক্তি সাক্ষর করেছে সে আমাকে ফোন করবে। আমার অস্থিরতা এমন ছিল যেন আমাকে অধ্যক্ষের অফিসে ডেকে আনা হয়েছে আর বায়োপসির ফল বিশ্লেষণ করছে। আমি মানুষকে এটা বোঝাতে ভালোবাসতাম যে, আমি শান্ত আছি। ভাল আছি। কিন্তু সেটা সত্য ছিল না। রাতের পর রাত, অভিমানে আমি নিজের জীবনকে একটা নরম বল বানিয়ে তাকে ব্যাট দ্বারা আঘাত করে গেছি। আসলে বেশির ভাগ সময় আমি বিষণ্ন আর বেদনার্ত থাকতাম।

এর মধ্যে ডেভিড আর আমার আবার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। সে সময় বুঝতে পারছিলাম না যেটা হয়েছে সেটা ভাল না মন্দ। কারণ আমরা তখনও সেই সম্পর্কের বৃত্ত থেকে পুরোপুরি বের হতে পারছিলাম না। তখনো প্রায়ই তার ভালোবাসায় আমি সব ছেড়ে দিতে রাজী ছিলাম আবার একই সাথে চাইতাম আমার আর সেই লোকটার

www.pathagar.org

মধ্যে যত বেশি মহাদেশ বা সমুদ্র পরিমাণ দূরত্ব আনা যায় ততই ভালো। হয়ত সুখ শান্তির খোঁজে আমি তাকে ভুলে যেতে চাচ্ছিলাম।

তখন আমার মুখে বলিরেখা পড়ে গেল। দুই ভ্রূর মাঝখানে, কান্নার এবং দুশ্চিন্তার খোঁদাই করা স্থায়ী বলিরেখা।

এ সবের মাঝে তখন আমার কয়েক বছর আগের লেখা একটা বইয়ের পেপারব্যাক এডিশন প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্য একটা ছোট প্রচারণায়ও যেতে হয়েছিল। সেই ভ্রমণে আমি আমার সাথে আমার বন্ধু ইভাকে নিয়েছিলাম। ইভা আমার বয়সী হলেও লেবাননে বৈরুতে বেড়ে উঠেছে। এর মানে কানেক্টিকাটের মাধ্যমিক স্কুলে আমি যখন খেলাধুলা করছিলাম বা গানের জন্য অডিশন দিচ্ছিলাম, সে তখন বেঁচে থাকার লড়াই করতে, বোমা থেকে রক্ষা পেতে, রাতের পর রাত ধরে কোনো আশ্রয়স্থলে লুকিয়ে ছিল। আমি নিশ্চিত না তবে শুনেছি খুব কম বয়সে এরকম দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে বড় হওয়া মানুষ হয়ত অনেক শক্ত হয় কিন্তু ইভা সে হিসেবে বেশ শান্ত হৃদয়ের। আমি তাকে ডাকি, 'মানব জাতির ব্যাট ফোন।' ঈশ্বরের ব্যক্তিগত দূরালাপনের নম্বর। পবিত্রতার সার্বক্ষণিক বিশেষ সরু পথ।

আমরা কানসাস গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি আমার ক্লেদাক্ত বিশৃঙ্খল বিবাহবিচ্ছেদ চুক্তির স্বাভাবিক মানসিক চাপে ছিলাম, সাক্ষর করবে নাকি করবে না? ইভাকে বলেছিলাম,

আমার মনে হয় আমি আদালতে আর একটা বছর ঝুলে থাকা সহ্য করতে পারব না। এখন এখানে একটা স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ দরকার। আমার ইচ্ছা হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে একটা আর্জি পেশ করি।

তো করছ না কেন?

প্রার্থনার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মতামত ইভাকে ব্যাখ্যা করেছিলাম। বিশেষ করে ঈশ্বরের কাছে কোনো একটা কিছু চাইতে আমার ভাল লাগে না। আমার কাছে মনে হয় এটা বিশ্বাসের দুর্বলতা। আমার এরকমটা বলতে ভাল লাগে না, 'ঈশ্বর আপনি কি এটা বদলে দেবেন কিংবা আমার জীবনের সেই জিনিসটা বদলে দেবেন যা আমার জন্য কঠিন?' কেননা কে জানে? ঈশ্বর হয়ত চান আমি সেই বিশেষ সমস্যাটা মোকাবেলা করি। এর চেয়ে আমি আমার জীবনে যাই ঘটুক তা ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবেলা করার শক্তি প্রার্থনা করে স্বস্তি পাই। এরপর যা হয় হোক।

ঈভা শান্তভাবে শুনে বলেছিল,

তুমি বোকার মতো কথা বলছ।

তুমি কি বলতে চাও।

তুমি কোথা থেকে এই ধারণা পেলে যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আর্জি পেশ করা যাবে না। তুমি সৃষ্টির অংশ, লিজ। তুমি এই সৃষ্টির একটা উপাদান, সৃষ্টির সকল কার্যে তোমার অংশগ্রহণ বা ভূমিকা আছে এবং তোমার অনুভূতি তুমি জানাও। তোমার মতামত পেশ কর, মামলা তৈরি কর। বিশ্বাস কর এটা গুরুত্ব পাবে।

সত্যি? এটা আমার জন্য একটা ভাল খবর।

সত্যি। শোনো এই মুহূর্তে যদি ঈশ্বরের কাছে একটা আর্জি পেশ কর তাতে তুমি কি উল্লেখ করবে?

www.pathagar.org

কয়েক মুহূর্ত ভেবে একটা নোট বুক বের করে এটা লিখেছিলাম,

প্রিয় ঈশ্বর,
ব্যাপারটা একটু দেখুন আর সাহায্য করুন। আমি আর আমার স্বামী বিবাহিত জীবনে ব্যর্থ হয়েছি এবং এখন আমি বিয়েটা ভেঙে দিতেও ব্যর্থ হচ্ছি। এই বিষাক্ত প্রক্রিয়া আমাদের এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভোগাচ্ছে।

আমি জানি আপনি যুদ্ধ আর ভয়াবহ দুর্ঘটনা নিয়ে ব্যস্ত এবং সেই ব্যাপারগুলো একটা অসফল দম্পতির চলন্ত ঝামেলার চেয়ে গুরুতর। কিন্তু আমার মতে একটা গ্রহের স্বাস্থ্য প্রতিটা নির্দিষ্ট উপাদানের সাথে জড়িত। এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি আত্মা দ্বন্দ্বের মধ্যে একসাথে বন্দি হয়ে থাকবে, সমস্ত বিশ্ব এর সাথে দূষিত হতে থাকবে। একইরকম যদি দুটি আত্মা বিভেদ থেকে মুক্তি পায় এর সাথে পুরো বিশ্বের স্বাস্থ্য উন্নতি হবে, ঠিক যেভাবে এক একটা সুস্থ কোষ পুরো শরীরের স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে কাজ করে।

আমার বিনীত অনুরোধ যে আপনি এই বিভেদের অবসান ঘটাবেন যাতে আরও দুটি আত্মা সুখি ও মুক্ত হতে পারে, যাতে অনেকদিন ধরে ভুক্তভোগীর কষ্ট কমানোর সাথে পৃথিবীরও কিছু তিক্ততা ও দ্বন্দ্বের সমাপ্তি হয়।

বিনীত
ধন্যবাদ ও সম্মান জানাই
এলিজাবেথ এম. গিলবার্ট

আমি ইভাকে এটা পড়ে শুনিয়েছিলাম। সে তার মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানিয়েছিল।

সে বলেছিল,

আমি এখানে সাক্ষর করব।

আমি তার দিকে আর্জিটা আর একটা কলম এগিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে গাড়ি চালাতে এতো ব্যস্ত ছিল যে ফুরসত পাচ্ছিল না। সে বলেছিল, ধরে নাও আমি এতে সাক্ষর করেছি। আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এটা সাক্ষর করেছি।

ধন্যবাদ ইভা। আমি তোমার সমর্থনের প্রশংসা করি।

এখন আর কে এটা সাক্ষর করবে?

আমার পরিবার, আমার বাবা আমার মা আমার বোন।

ঠিক আছে। তারা করেছে। ধরে নাও তাদের নাম এখানে যুক্ত করা হয়েছে। আমি আসলেই অনুভব করতে পারছি তারা সাক্ষর করেছে। তারা এখন তালিকায় আছে। ঠিক আছে? আর কে আছে যে সাক্ষর করার মতো। নাম বলতে থাক।

আমার ধারণা অনুযায়ী যারা যারা এটা সাক্ষর করতে পারে আমি তাদের নাম বলছিলাম। আমি আমার পরিবারের সকল মানুষের নাম, আমার বন্ধু আর আমার সহকর্মীদের নাম উল্লেখ করছিলাম। প্রতিটা নামের পর ইভা নিশ্চিত সুরে বলছিল,

হ্যাঁ সে এখন সাক্ষর করল।

www.pathagar.org

এর মাঝে মাঝে তার নিজের লোকজনের নামও বলছিল। যেমন হ্যাঁ আমার বাবা মা এইমাত্র সাক্ষর করল। তারা একটা যুদ্ধে বাচ্চাদের বড় করেছে। কারণহীন যেকোনো যুদ্ধ তারা ঘৃণা করে। তারা তোমার বিবাহবিচ্ছেদের সমাপ্তি দেখে খুশিই হবেন।

আমি আমার চোখ বন্ধ করে আরও কিছু নাম মনে করতে চাচ্ছিলাম। আমি বলেছিলাম,

আমার ধারণা বিল ও হিলারি ক্লিনটন এটা এখন সাক্ষর করেছেন।

সে বলেছিল,

কোনো সন্দেহ নেই। শোনো লিজ যে কেউ এটা সাক্ষর করবে। তুমি কি বুঝতে পারছ? যে কাউকে ডাক, জীবিত বা মৃত এবং সাক্ষর সংগ্রহ করতে শুরু কর।

সেইন্ট ফ্রান্সিস আসিসি এটা এই মাত্র সাক্ষর করেছেন।

অবশ্যই তিনি করেছেন!

এটা বলে ইভা নিশ্চয়তার সাথে তার হাত স্টিয়ারিংয়ে চাপ দিয়েছিল। আর আমি আমার কল্পনার গাড়ি ছুটিয়েছিলাম।

আব্রাহাম লিংকন এই মাত্র এটা সাক্ষর করেছেন! এবং গান্ধী এবং মেন্ডেলা এবং সকল শান্তিকামীরাও। এলানর রুজবেল্ট, মাদার তেরেসা, বনো, জীমী কার্টার, মুহাম্মদ আলী, জ্যাক রবিনসন এবং দালাই লামা... এবং আমার দাদি যিনি ১৯৮৪ সালে মারা গিয়েছিলেন এবং আমার দাদা যিনি এখনো বেঁচে আছেন...এবং আমার ইটালিয়ান শিক্ষক এবং আমার চিকিৎসক এবং আমার সহকর্মী...এবং মার্টিন লুথার কিং, যে আর, এবং ক্যাথরিন হ্যাপবার্ন...এবং মার্টিন স্করসস...এবং আমার গুরু, অবশ্যই...এবং জোয়ান এডওয়ার্ড, জোয়ান ওফ আর্ক, এবং এম এস কার্পেন্টার, আমার চতুর্দশ এর শিক্ষক, আং জিম হেন্সন...

নামগুলো আমার ভেতর থেকে হুড় হুড় করে বের হচ্ছিল। এক ঘণ্টা যাবত আমার পেট থেকে সমানে বেরিয়ে আসছিল, আমরা যাচ্ছিলাম কানসাস এবং আমার শান্তির জন্য আর্জির পৃষ্ঠা অদৃশ্য সাক্ষরে ভরে গিয়েছিল। ইভা নিশ্চিত করেছিল– হ্যাঁ সে সাক্ষর করেছে, হ্যাঁ সে সাক্ষর করেছে– এবং অনেক শুভ আত্মার সম্মিলিত মঙ্গল কামনার ভেতরে থেকে আমি অনেক সুরক্ষিত অনুভব করছিলাম। ।

তালিকা শেষমেশ সমাপ্ত হয়েছিল। আমার দুশ্চিন্তারও এর সাথে অবসান হয়েছিল আর ঘুম পেয়েছিল। ইভা বলেছিল,

ছোট একটা ঘুম দিয়ে নাও। আমি চালাচ্ছি গাড়ি।

আমি আমার চোখ বন্ধ করতে শেষ নামটা ভেসে উঠেছিল, মাইকেল যে ফক্স এটা সাক্ষর করেছে। আমি বিড়বিড় করে ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলাম। জানি না কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম হয়ত শুধু দশ মিনিট কিন্তু তা ছিল খুব গভীর। যখন জেগে উঠেছিলাম ঈভা তখনো গাড়ি চালাচ্ছিল আর গুনগুন করে গান গাচ্ছিল আর আমি হাই তুলেছিলাম। আমার মুঠোফোনটাও বাজছিল। সেটা সেই ভাড়া গাড়ির ছাইদানিতে উত্তেজনায় যেন লাফাচ্ছিল। আমি চিনতে পারছিলাম না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে বুঝতে পারছিলাম না ফোনের কাজটাই বা কী।

ইভা বলেছিল, ধরো। উত্তর দাও।

www.pathagar.org

আমি ফোন উঠিয়ে হ্যালো বলতেই শুনতে পেয়েছিলাম, আমার উকিল বলছে, সুসংবাদ! তোমার স্বামী এই মাত্র সাক্ষর করেছে।

১০

এর কয়েক সপ্তাহ পর থেকে আমি ইটালি থাকা শুরু করি।

সেসময় আমি আমার চাকরি ছেড়ে দেই, বিবাহবিচ্ছেদের ঝামেলা মিটমাট করি ও আইনী সকল বিলের মূল্য পরিশোধ করি, আমার বাড়ি ছেড়ে দেই। অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দেই, বাদ বাকি যা ছিল তা আমার বোনের বাড়িতে জমা রেখে কেবল দুটি স্যুটকেস গুছাই। আমার ভ্রমণের বছর শুরু হয়ে যায়। একটা ব্যক্তিগত স্পষ্ট টলটলে অলৌকিক ঘটনার জন্য আমি অপ্রস্তুত ছিলাম না। আমি আমার ভ্রমণকালীন সময়ে যে বইটা লিখব তা আমার প্রকাশক অগ্রিম কিনে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, ইন্দোনেশিয়ান সেই কবিরাজের ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী আমি আবার সব কিছু ফিরে পেয়েছিলাম। অন্তত এক বছর চলার মতো যথেষ্ট অর্থ।

তখন আমি রোমের অধিবাসী। একটা ঐতিহাসিক ভবনে ছোট একটা স্টুডিওর মতো অ্যাপার্টমেন্ট আমি পেয়েছিলাম। দ্য স্প্যানিশ স্টেপ থেকে কয়েক সরু ব্লকের পর, দ্য এলিগেন্ট বর্গিজ ভবনের শোভাময় ছায়ার নিচে সাজানো, পিজ্জা ডেল পপোলোর রাস্তার উল্টো পাশে যেখানে প্রাচীন রোমানরা রথ প্রতিযোগিতা করতেন। অবশ্যই সেই শহরটা আমার শহরের আশপাশের মতো আঁকাবাঁকা আর ঝকমক নয় যে লিংকন টানেলের প্রবেশদ্বার থেকেই দেখা যাবে, কিন্তু তবুও তা চলার মতো।

১১

রোমে প্রথমে যে খাবারটা খেয়েছিলাম সেটা তেমন কিছু না। শুধু কিছুটা হাতের তৈরি পাস্তা, স্পেগেটি কার্বনারা সাথে ছিল পালং ভাজি আর রসুন। মহান রোমান্টিক কবি শেলী একবার তার ইংল্যান্ডবাসী একজন বন্ধুকে ইটালিয়ান কুজিন নিয়ে লিখেছিলেন, 'এখানে উচ্চপর্যায়ের যুবতীরা আসলেই একটা জিনিস খায়, তুমি ভাবতেও পারবে না তা কি– রসুন।' শুধু একটু চেখে দেখতে আমি শালুকও খেয়েছিলাম। শুনেছি রোমানরা অদ্ভুত রকম গর্বিত তাদের শালুক নিয়ে। আর একটা চরম চমক ছিল। যেটা পরিবেশনকারী বিনামূল্যে নিয়ে এসেছিল। একটা ধুন্দুল ফুল ভাজি মাঝখানে পনিরের টুকরা দিয়ে মোড়ানো। এত সাবধানে সেটা বানানো হয়েছিল যে বোঝাই যাচ্ছিল না সেটা ডাল থেকে ছেঁড়া হয়েছে। স্পেগেটির পর খেয়েছিলাম ভেড়ার

www.pathagar.org

মাংস। আমি এক বোতল হাউজ রেডও খেয়েছিলাম, সেটা শুধু আমার নিজের পছন্দে। সাথে খেয়েছিলাম জলপাই তেল এবং লবণের সাথে কিছু গরম রুটি। মিষ্টি খাবারের মধ্যে খেয়েছিলাম তরিমিসু।

সেই খাবারটা খাবার পর রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরেছিলাম। রাস্তার পাশের এক বহুতল বাড়ি থেকে কোলাহল ভেসে আসছিল, অনেকটা সাত-আট বছর বয়সীদের একটা জটলা- কোনো জন্মদিন ছিল হয়ত। হাসি চিৎকার আর হুটোপুটির শব্দ। আমি সিঁড়ি বেয়ে আমার এপার্টমেন্টে পৌঁছেছিলাম। নতুন বিছানায় শুয়ে বাতি নিভিয়ে অপেক্ষা করছিলাম কান্না আর দুশ্চিন্তা শুরু হওয়ার- বাতি নেভানোর পর যেটা গতানুগতিক একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আসলে আমি ভাল বোধ করছিলাম। আসলেই চমৎকার বোধ করছিলাম। যেন ভেতরের সন্তুষ্টির প্রথম লক্ষণ ছিল সেই অনুভব।

আমার ক্লান্ত শরীর, ক্লান্ত মনকে জিজ্ঞেস করেছিল, এটাই কি তুমি চাইছিলে তাহলে?

কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি কেননা আমি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

১২

পশ্চিমা বিশ্বের দেশে কিছু জিনিস সব সময় একইরকম দেখতে হয়। এই যেমন দেখতে একইরকম আফ্রিকান একটা লোক সবসময় কম মূল্যে একইরকম ডিজাইনের ব্যাগ ও সানগ্লাস বিক্রি করে, একইরকম গুয়েতেমালান যন্ত্রী সবসময় তার বাশের বাঁশি দিয়ে এই সুরটা বাজায়, 'আমি শামুক না হয়ে বরং চড়ুই হতাম।' কিন্তু এমন কিছু জিনিস আছে যা শুধু রোমেই দেখা যায়। যেমন স্যান্ডউইচ বিক্রেতা খুব সহজাতভাবে প্রতিবার দেখা হলে আমাকে 'সুন্দরী' বলে ডাকত। বলত, 'তুমি এই পানিনোটা কি ঠাণ্ডাই খাবে না সেঁকে দেব? বেলা? কিংবা যেমন সব জায়গায় কপোত কপোতি দেখতে পাওয়া। যেন প্রেমের প্রতিযোগিতা লেগেছে, একে অপরকে পেঁচিয়ে বেঞ্চিতে বসে থাকা, চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়া, কোণায় বসে অবিরত একে অপরের সাথে শরীরের সাথে মিশে যাওয়া, নাক টিপে দেওয়া।

আর আছে ফোয়ারা। পিংকি দ্য এলডার একবার লিখেছিলেন, 'কেউ যদি খেয়াল করে ইটালিতে জনগণের জন্য কি পরিমাণ পানি কিভাবে সরবরাহ করা হয়েছে, কি গোসলের জন্য, কি চৌবাচ্চা হিসেবে, কি খাল বানিয়ে, কি বাগানে বা কি আবাসে। যদি হিসাব করে কেউ দেখে এই পানির উৎস কত দূরে। কত খিলানের পিছন থেকে পর্বত চিরে, উপত্যকা বেয়ে এসেছে এই পানি। কি উন্নত এই ব্যবস্থাপনা। তাহলে সে স্বীকার করবেই পৃথিবীতে এর চেয়ে চমৎকার আর কিছু নেই।'

এর কয়েক শতক পর আমি তখন আমার প্রিয় ঝর্নায় আমার কিছু প্রতিযোগী পেয়েছি। সেটা বিলা ভর্গিজে। ঝর্নার একেবারে মাঝখানে একটা ব্রোঞ্জের তৈরি মজার

www.pathagar.org

পারিবারিক স্থাপত্য। বাবা যেন একজন ফউন (প্রাচীন ইটালিয়ান দেবতা। যার শিং এবং ছাগলের মতো লেজ আছে। কান কিছুটা উঁচু বাকি বাদ মনুষ্যাকৃতি) আর মা সাধারণ মানবী। তাদের একটা বাচ্চা আছে যে আঙুর খাচ্ছে। বাবা মা অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুখোমুখি হয়ে একে অপরের কনুই মোচড়াচ্ছে। দুজনই পেছনে হেলান দিয়ে আছে। আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে দেখে বলা যাচ্ছিল না খুনসুটিতে তারা একে অপরকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে না দোল খাচ্ছে আনন্দে। কিন্তু কি কসরতই না করছে তারা। আর এক দিকে বাচ্চাটা তাদের কবজির মাঝে বসে, একেবারে তাদের মধ্যখানে, তাদের ধস্তাধস্তিতে অক্ষত অবস্থায় আঙুরের থোকা চিবুচ্ছে। তার ছোট চঞ্চল পা নিচের দিকে ঝুলে আছে আর সে খাচ্ছে। সে তার বাবার মতো একজন ফউন হয়েছে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতে আবহাওয়া উষ্ণ আর নিষ্প্রভ হয়ে আসে। রোমে যাওয়ার চার দিন পার হয়ে গিয়েছিল। কোনো চার্চ বা জাদুঘরের দরজায় আমার ছায়া পড়েনি, না আমি কোনো গাইডবুক অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু সেদিন অনবরত উদ্দেশ্যহীন হেঁটেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা ছোট জায়গা পেয়েছিলাম। বন্ধুসুলভ এক বাস চালক আমাকে বলেছিল রোমের সবচেয়ে মজার জেলাটো নাকি সেখানে পাওয়া যায়। তাকে বলা হয়, 'এল জেলাটো ডি সান ক্রিসপিনো।' আমি নিশ্চিত না তবে আমার মনে হয় এর অনুবাদ হবে 'ক্রিসপি সেইন্টসদের আইসক্রিম।' আমি মধু আর হেজেলনাটের স্বাদের একটা খেয়েছিলাম। সেই একইদিনে আমি আবার গিয়েছিলাম তরমুজ আর আঙুরের স্বাদেরটা খেতে। তারপর রাতের আহারের পর ঐ রাতেই আমি আবার হেঁটে হেঁটে সেখানে ফিরে গিয়েছিলাম দারুচিনি আর আদার স্বাদের একটা নমুনা নিতে।

আমি প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকার একটা করে কলাম পড়তে চেষ্টা করছিলাম। সেটা যত বড়ই হোক। তখন আমার অনুবাদের ডিকশনারিতে প্রতিটা শব্দ দেখে নিতাম। একদিনের খবর বেশ মজার ছিল। কল্পনার বাইরে নাটকীয় হেডলাইন, অবেসিটি! আই বাম্বিনি ইটালিনি সনো ই পিউ গ্রাসি ডি ইউরোপা! আমি অল্প অল্প করে বুঝতে পারছিলাম, 'স্থূলতা!' আমার মনে হয়েছিল লেখাটাতে প্রচার করা হয়েছে ইটালিয়ান বাচ্চারা ইউরোপের সবচেয়ে মোটা বাচ্চা। হ্যাঁ। পড়ে দেখেছিলাম তাই, ইটালিয়ান বাচ্চারা জার্মান বাচ্চাদের চেয়ে লক্ষণীয় রকম মোটা এবং খুবই লক্ষণীয় রকম মোটা ফ্রেঞ্চ বাচ্চাদের চেয়েও। সেই লেখা অনুযায়ী ইটালির বড় শিশুরাও ভয়াবহ রকম মোটা রোগে আক্রান্ত। পাস্তা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এই দায় অস্বীকার করেছিল। ইটালির বাচ্চাদের মোটাজনিত প্রবণতার এই আশঙ্কাজনক পরিসংখ্যান তার আগেরদিন নাকি ফাঁস করেছিল– ইউ এন আ টাস্কফোর্স ইনটারনেজিওনাল। পুরো লেখাটার পাঠোদ্ধার করতে আমার প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছিল। পুরোটা সময় আমি একটা পিজা খাচ্ছিলাম আর রাস্তার ওপারের একটা বাচ্চা ছেলের একরডিয়ান বাজানো শুনছিলাম। হয়ত জিপ্সি বলে আমার কাছে শিশুটাকে বেশি মোটা লাগেনি। আমি নিশ্চিত নই লেখাটার শেষ লাইন আমি ঠিকঠাক পড়েছিলাম কিনা কিন্তু মনে হচ্ছিল সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কথা এমন ছিল যে, এই অবেসিটি থামাতে একটাই উপায় আছে আর তা হলো অতিরিক্ত

www.pathagar.org

ওজনের ওপর কর ধার্য করা? ভাবছিলাম, 'এটা কী সত্য হতে পারে? যেভাবে খাচ্ছি সেভাবে কিছু মাস গেলে আমিও কি ওদের ছাড়িয়ে যাব না?'

পোপের প্রতিদিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতেও দৈনিক পত্রিকা রোজ পড়া জরুরী। রোমে প্রতিদিন পোপের স্বাস্থ্যের গতিবিধি জানা হয়, একেবারে আবহাওয়ার মতো কিংবা টিভির সময়সূচীর মতো। যেমন, আজ পোপ ক্লান্ত, গতকাল পোপ এর চেয়ে কম ক্লান্ত ছিলেন। আগামীকাল আশা করি আজকের মতো ক্লান্ত থাকবেন না।

ভাষার ক্ষেত্রে দেশটা আমার কাছে রূপকথার দেশের মতো। যে মানুষ সব সময় ইটালিয়ান ভাষা শিখতে চেয়েছে, তার জন্য রোমের চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? যেন আমার নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য কেউ একটা দেশ আবিষ্কার করেছে যেখানে প্রত্যেকে এই জাদুকরী ভাষাটা ব্যবহার করে। যেন পুরো সমাজ ষড়যন্ত্র করেছে আমাকে ইটালিয়ান শেখাবে। আমি যতক্ষণ সেখানে থাকব তারা তাদের দৈনিক পত্রিকা ইটালিয়ান ভাষায় প্রকাশ করতেও পিছপা হবে না। তাদের বইয়ের এমন দোকান আছে যেখানে কেবল ইটালিয়ান ভাষার বই পাওয়া যায়। একদিন আমি এমন একটা বইয়ের দোকানের হদিশ পেলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল মুগ্ধতার এক দেশে আমি প্রবেশ করেছি। সব কিছুই ইটালি ভাষায় ছিল এমনকি ড. সিউস। আমি এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম বইগুলো কেউ দেখলে ভাবতো আমি হয়ত এই ভাষাভাষী। ওহ আমি যে কতটা চাইতাম সবটা ইটালিয়ান শিখে ফেলতে তা কিভাবে বোঝাই! অনুভূতিটা আমার ছোট বেলার স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছিল। তখন আমার বয়স চার, তেমন পড়তেও পারতাম না কিন্তু শেখার জন্য অস্থির ছিলাম। আমার মনে আছে মায়ের সাথে ডাক্তারের ওয়েটিংরুমে বসে মুখের সামনে একটা গৃহ সজ্জার বই ধরে ছিলাম, আস্তে আস্তে পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিলাম এবং আশা করছিলাম ওয়েটিং রুমের বড়রা যাতে ভাবে আমি আসলেই পড়ছি। সেসময়ের পর এত তীব্রভাবে ইটালি শেখার ক্ষুধা বোধ করেছি। সেই বইয়ের দোকানে আমি কিছু আমেরিকান কবিদের বই পেয়েছিলাম। পৃষ্ঠার এক দিকে মূল ভাষায় ছাপার ওপর পাশে তা ইটালিয়ান ভাষায় অনুদিত। রবার্ট লোয়েল আর লুইস গ্লার্কের সমগ্র কিনেছিলাম আমি।

সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সর্বত্র। সেদিন আমি যখন একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসেছিলাম। তখন একটা কালো পোশাকে ছোট খাট বৃদ্ধা মহিলা এসেছিলেন। আমার পাশে বিশ্রাম নিতে বসে মাতব্বরির স্বরে আশেপাশের কিছু নিয়ে কথা বলছিলেন। আমি আমার মাথা দুলিয়ে, নিশ্চুপ আর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে খুব সুন্দর ইটালিয়ান ভাষায় ক্ষমা চেয়ে বলেছিলাম, 'আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি ইটালিয়ান ভাষা জানি না।' তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যেন কাঠের চামচ থাকলে তা দিয়ে তখনই আমাকে আঘাত করতেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন 'তুমি বোঝো!' কথাটা ঠিক। তিনি ঠিক বলেছিলেন, 'আমি বুঝি।' তারপর তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমি কোথা থেকে এসেছি। আমি তাকে বলেছিলাম আমি নিউইয়র্ক থেকে এসেছি। আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি কোথাকার?' আহ! তিনি রোমের। শুনে আমি বাচ্চাদের মতো তালি দিয়েছিলাম। আহ রোম! সুন্দর রোম! আমি রোমকে ভালোবাসি! মহনীয় রোম! তিনি আমার প্রাচীন গদগদে সংশয়বাদী

www.pathagar.org

কথা শুনেছিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি বিবাহিতা কিনা। আমি তাকে বলেছিলাম আমি তালাকপ্রাপ্ত। সেই প্রথমবার আমি কথাটা কাউকে বলেছিলাম তাও ইটালিয়ান ভাষায়। এরপর অবশ্যই জানতে চেয়েছিল, পেরকে? কেন? আসলে যে কোনো ভাষায়ই এর উত্তর দেওয়া কঠিন ছিল। আমি তোতলাতে তোতলাতে শেষে বলতে পেরেছিলাম।

আমরা সম্পর্কটা ভেঙে দিয়েছি।

তিনি মাথা নেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপর হেঁটে হেঁটে রাস্তার ওপারের বাস স্টপে চলে গিয়ে বাসে উঠেও গিয়েছিলেন। একবার ফিরে আমার দিকে তাকাননি পর্যন্ত। তিনি কি আমাকে পাগল ভেবেছিলেন? আমি তার জন্য বিশ মিনিট অপেক্ষা করেছিলাম। ভেবেছিলাম তিনি হয়ত ফিরে এসে কথা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি। তার নাম ছিল কেলেস্তে।

সেদিন আরো কিছুক্ষণ পর আমি একটা লাইব্রেরি খুঁজে পেয়েছিলাম। আহ আমি যে কি পরিমাণ পছন্দ করি লাইব্রেরি তা বোঝাই কি করে! একে তো রোম শহর! তার ওপর পাঠাগারটাও খুব সুন্দর একটা পুরোনো ভবনে স্থাপিত, তারপর ভিতরে একটা বাগান। রাস্তা থেকে তাকালে যদিও বাগানের অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। চারপাশে কমলাগাছ ঘেরা বাগানটা একদম চারকোণা, মাঝখানে একটা ঝরনা। সেই ঝরনাটা পরে রোমে আমার প্রিয় জিনিসগুলোর একটা হয়ে উঠেছিল। চোখ বুজে বলতে পারি এমন জিনিস আমি আগে কখনো দেখিনি। সেটা পাথরে মোড়ানো রাজকীয় কোনো ফোয়ারা না। একেবারে ছোট, সবুজ, শ্যাওলা ধরা প্রাকৃতিক ঝরনা। সাথে অবিন্যস্ত ফার্ন ঝোপ। অনেকটা ইন্দোনেশিয়ার কবিরাজের আঁকা প্রার্থনারত শরীরের মাথা দিয়ে গজানো ঝোপঝাড়ের মতো। ফুলেল গুল্মের মাঝখান থেকে যখন জল প্রস্রবিত হয়ে পাতায় পাতায় বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছিল তখন সবকিছু ছাপিয়ে পুরো বাগানে একটা মধুর শব্দ গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

একটা কমলাগাছের নিচে বসে আমি আগের দিনের কেনা কবিতার বই খুলেছিলাম। লুইস গ্লার্কের। প্রথম কবিতা প্রথমে পড়েছিলাম ইটালি ভাষায়, পরে ইংরেজিতে। একটা লাইনে এসে আমি কিছুক্ষণ থেমে গিয়েছিলাম, ডাল সেন্ট্রো ডেল্লা মিয়া ভিটা ভেনে উনা গ্র্যান্ড ফনটানা।

আমার জীবনের মাঝখান থেকে, একটা বিশাল ঝরনার প্রস্রবণ হয়েছে...

আমি বইটা কোলে রেখে মুক্তির আনন্দে কাঁপছিলাম।

১৩

সত্যি বলতে আমি পৃথিবীর সেরা ভ্রমণকারী নই।

আমি জানি কারণ আমি অনেক দেশ ঘুরেছি এবং আমি এমন সব মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি যারা আসলেই এই কাজে পটু। এমন কিছু ভ্রমণবিদদের

www.pathagar.org

সাথে পরিচিত হয়েছি যারা শারীরিক দিক দিয়ে খুব বলিষ্ঠ। তারা যদি একটা জুতার বাক্স করে কলকাতার নর্দমার পানিও খায়, তবু তারা সুস্থ থাকবে। যে মানুষজন নতুন জায়গা থেকে আমাদের কয়েকজনের মতো নতুন রোগ তুলে নেবে না বরং তুলে নেবে নতুন ভাষা। সেই মানুষগুলো জানে কিভাবে একটা বিপজ্জনক সীমান্তরক্ষীকে হাত করতে হয় কিংবা ভিসা অফিসের আমলাকে পটাতে হয়। তারা হবে এমন উচ্চতা আর গায়ের রঙের যে সব খানে স্বাভাবিকভাবে খাপ খাইয়ে যাবে। তুরস্কে তারা হয়ে উঠতে পারবে টার্কস, মেক্সিকোতে মেক্সিকান, স্পেনে লোকে যাদের বাস্ক ভেবে ভুল করবে, উত্তর আমেরিকায় মাঝে মাঝে যারা আরব বলে পার পেয়ে যায়।

আমার এ ধরনের কোনো গুণ নেই। প্রথমত আমি কয়েক জাতির শংকর নই। লম্বা, সোনালি চুল, গোলাপি গায়ের রং। আমি ক্যামেলিয়া বর্ণের নই আমার ত্বকের রঙ ফ্লেমিংগো পাখির মতো।

আমি যেখানেই যাই সেখানে উৎকট রকম ফুটে থাকি। যখন আমি চীনে ছিলাম, মহিলারা রাস্তায় আমার দিকে এগিয়ে এসে আঙুল তুলে বাচ্চাদেরকে আমাকে এভাবে দেখাতো যেন আমি চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে আসা কোনো জীব। এবং তাদের সেই বাচ্চাগুলো যারা কখনোই লাল মুখের, হলুদ চুলের এমন কাউকে দেখেনি, তারা ভয়ে কান্নায় ফেটে পড়ত। চীনের এই ব্যাপারটা আমার একদম ভাল লাগত না।

কোনো জায়গায় যাওয়ার আগে সেই জায়গা নিয়ে গবেষণায়ও আমি ভাল নই। চলার পথে যা চোখের সামনে পড়ে তাই মুগ্ধ হয়ে দেখার প্রবৃত্তি আমার। এভাবে ভ্রমণ করলে যা হয় তা হলো, ট্রেন স্টেশনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি করবেন কোথায় যাবেন এই নিয়ে অযথা সময় নষ্ট কিংবা অতিরিক্ত হোটেল বিল খোয়ানো কেননা আপনি বেশি চেনেন না। দিক ও ভূগোল সম্পর্কে আমার অল্প জ্ঞানের মানে এটাই যে, আমি ছয়টা মহাদেশ ঘুরেছি শুধু এই দ্বিধা আর ধারণা নিয়ে যে আমি কোথায় সময়টা দেব? জ্ঞানের পাশাপাশি ভ্রমণের ক্ষেত্রে অতি জরুরী হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারা। আমি তাতেও ব্যর্থ। আমি কখনোই নিজের মুখের রেখা এমন স্বাভাবিক রাখতে শিখিনি যাতে ভেতরের চিন্তা মুখের রেখায় না প্রকাশ পায়। বিদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যেটা খুব জরুরী। আপনি যদি এমন ভাবনা চিন্তাহীন মুখভঙ্গি করতে পারেন তবেই না মনে হবে আপনি সেখানকার কেউ। যেকোনো জায়গায়, সবখানে, এমনকি জাকার্তার দাঙ্গার মাঝেও এটা কাজে দেয়। ধুর! যখন আমি কি করছি বা কি করতে হবে না জানি তাহলে আপনি আমাকে দেখেই তা বুঝতে পারবেন। আমি যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ি কিংবা ভয়ে অস্থির হয়ে যাই, আমাকে তাই দেখায়। যখন হারিয়ে যাই একইভাবে আমাকে দেখেই বোঝা যাবে যে আমি হারিয়ে গেছি। আমার প্রতিটা চিন্তার স্বচ্ছ পরিমাপক আমার চেহারা। ডেভিড একবার এটা ধরেছিল।

আর সেই দুর্দশা! তার কথা কি বলব! ভ্রমণ আমার পরিপাকতন্ত্রে কিভাবে কিভাবে হামলা করেছে! আমি আসলে তা বলতে চাই না, কি রকম বিদ্রোহ করতে পারে জীবাণুরা। এটা বলাই যথেষ্ট আমি পরিপাকতন্ত্রের প্রতিটা সমস্যায় সর্বোচ্চ

www.pathagar.org

পরিমাণ ভুগেছি। লেবাননে এক রাতে, আমি ভয়াবহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ভাবতেই অবাক লাগে যেকোনো ভাবে আমার ইবোলা ভাইরাসের পশ্চিম-পূর্ব সংস্করণ আক্রমণ করেছিল। হাঙ্গেরিতে একটা বিশেষ রকম পেটের নাড়িভুঁড়ির আভ্যন্তরীণ ইনফেকশন হয়েছিল। এরপর চিরতরে 'সোভিয়েত ব্লক' সম্পর্কে আমার অনুভূতি পাল্টে গেল। আফ্রিকা ভ্রমণের প্রথম দিন আমার পশ্চাৎ ভাগের বাঁধন একরকম ছুটে গিয়েছিল। সে কি বলব! ভেনিজুয়েলার জঙ্গলে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল কারণ আমাকে মাকড়শা কামড় দিয়েছিল এবং তাতে ইনফেকশন হয়ে গিয়েছিল। আর আমি জানতে চাই, মাফ চাই... আমার মতো স্টকহমে কে কে রোদে জ্বলে গেছেন বলেন তো।

এত কিছুর পরও দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানো আমার সত্যিকারের ভালোবাসা। এমনকি যখন ষোল বছর বয়স ছিল, বেবি সিটিংয়ের টাকা জমিয়ে আমি প্রথমবারের মতো রাশিয়া গিয়েছিলাম। সকল কষ্ট আর ত্যাগের চেয়ে ভ্রমণটাই আমার কাছে বেশি মূল্যবান সবসময়। আমি ভ্রমণের প্রতি ভালোবাসায় এমন স্থির আর বিশ্বস্ত যা অন্যান্য ভালোবাসার নই। ভ্রমণের প্রতি আমার অনুভূতিটা এমন যেন আমি একটা অশান্ত, শূলবেদনায় আক্রান্ত, অস্থির বাচ্চার মা। এটা আমাকে কতটা ঝামেলায় ফেলবে তাতে আমার মাথা ব্যথা নেই। কেননা আমি একে ভালোবাসি, কেননা এটা আমার, কেননা এটা দেখতে একেবারে আমার মতো। ও চাইলে আমার পুরো শরীরে বমি করে দিতে পারে তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই।

যাই হোক, ফ্লেমিংগো পাখির মতো হওয়াতেও আমি পৃথিবীতে পুরোপুরি অসহায় নই। আমার টিকে থাকার আলাদা পদ্ধতি আছে। আমার ধৈর্য আছে। আমি জানি কিভাবে ব্যাগ হালকা রকম গোছাতে হয়। আমি কোনো কিছু খেতে ভয় পাই না। ভ্রমণের ক্ষেত্রে আমার বিশেষ গুণ হচ্ছে আমি যে কাউকে বন্ধু বানিয়ে ফেলতে পারি। আমি মৃতের সাথেও বন্ধুত্ব করতে পারি। সার্বিয়ায় আমার একটা যুদ্ধ অপরাধী বন্ধু ছিল এবং সে আমাকে পর্বতে তার পরিবারের সাথে ছুটি কাটাতে দাওয়াত করেছিল। গর্ব করছি না এই বলে যে সার্বিয়ার সাধারণ খুনি আমার কাছের ও প্রিয়। একটা গল্পের জন্য তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং এটাও একটা কারণ যে সে আমাকে খামচে দিতে তো আর আসত না। কিন্তু আমি বলছি যে আমি এটা পারি। আশেপাশে যদি কেউ কথা বলার মতো না থাকে আমি হয়ত চার ফুট লম্বা একটা স্তম্ভের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারব। এই কারণে আমি পৃথিবীর দূরবর্তী দেশগুলোতে যেতে ভয় পাই না। সেখানে যদি মানুষের দেখা পাওয়া মুশকিল হয় তবুও না। ইটালি যাওয়ার আগে লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার কি ইটালিতে বন্ধু আছে।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়েছিলাম না নেই। কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম আমি বন্ধুত্ব করে নেব। বেশিরভাগ সময় আমাদের বন্ধুদের সাথে হঠাৎ দেখা হয় ট্রেনে তাদের পেছনের সিটে বসে, কোনো রেস্টুরেন্টে কানে ফোন ধরে রাখা অবস্থায়। কিন্তু এগুলো আকস্মিকতার কথা আর আকস্মিকতার ওপর নির্ভর করা যায় না। এর চেয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায় হচ্ছে পরিচিতির চিঠি পদ্ধতি যেটা দিয়ে পরিচিতের পরিচিতের সাথে সাক্ষাত করা যায়। এটা মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার একটা

www.pathagar.org

বাজে পদ্ধতি। বেহায়ার মতো ঠাণ্ডা অনুভূতির ফোনের যোগাযোগে কাউকে রাতের খাবারে ডাকা। তবুও ইটালি যাওয়ার আগে আমি আমেরিকায় আমার পরিচিত সবাইকে বলেছিলাম, তাদের যদি রোমে বন্ধু থেকে থাকে তারা যেন আমাকে তাদের বিস্তারিত জানায়। একটা সত্যিকারের কার্যকরী যোগাযোগের তালিকা থাকবে আমার কাছে।

নতুন ইটালিয়ান বন্ধুদের তালিকা থেকে আমি একজনের সাথে দেখা করতে বেশি উৎসাহী ছিলাম। তার নাম শুনলে অবাক হবেন লুকা স্পেগেটি। লুকা স্পেগেটি আমার বন্ধু পেট্রিক মেক ডেভিডের বন্ধু। যাকে আমি কলেজে পড়ার সময় থেকে চিনি এবং এটাই তার আসল নাম। আমি কসম করছি এই নামটা ছদ্ম না। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নাম। মানে এরকম যে, পেট্রিক মেক ডেভিড নামটা ছাড়া একটা জীবন কল্পনার বাইরে।

যাহোক তখন আমার পরিকল্পনা ছিল যত দ্রুত সম্ভব লুকা স্পেগেটির সাথে দেখা করা।

১৪

প্রথমত আমাকে স্কুলে থিতু হতে হতো। লিউনার্দো দ্য ভিঞ্চি একাডেমিতে আমার ভাষা শিক্ষার ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল, যেখানে আমি সপ্তাহে পাঁচ দিন, এক ঘণ্টা করে শিখবো। আমি স্কুল নিয়ে খুব উৎসাহিত ছিলাম। আমি এমন একটা বেহায়া ছাত্র যে আগের রাতেই কাপড় জামা ঠিক করে রেখেছিলাম। প্রথমে বিভাগে যাওয়ার আগে আমার চামড়ার জুতা আর নতুন খাবারের বাক্স নিয়ে ঠিক যেমনটা করেছিলাম।

গিয়ে জানতে পেরেছিলাম লিউনার্দো দ্য ভিঞ্চি-তে প্রথম দিন আমাদের সবার একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে। ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক স্তর যাচাই করতে সেই পরীক্ষা। শুনেই আমি আশা করতে শুরু করেছিলাম, নিশ্চয়ই আমাকে প্রথম স্তরের জন্য বাছাই করা হবে না। সেটা খুবই অপমানজনক হবে। জানেনই তো আমি নিউইয়র্কের ডিভোর্সি মেয়েদের রাতের স্কুলে ইটালিয়ান ভাষার ওপর প্রায় এক সেমিস্টার শেষ করেছিলাম। আমি গ্রীষ্মকালটা ফ্লাস কার্ড মুখস্থ করেছি, এর ওপর তখন রোমে এক সপ্তাহ ধরে আছি, কত মানুষের সাথে ভাষাটা অনুশীলন করছি! এমনকি বুড়ো দাদির সাথে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে আলাপ করেছি একদিন। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ঠিক জানতাম না সেই স্কুলে কয়টা স্তর। তবে যখনই স্তর শব্দটা শুনেছিলাম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাকে অন্তত দ্বিতীয় স্তরে জায়গা করে নিতে হবে।

সেদিন প্রবল বৃষ্টি দেখে আমি আগেই ক্লাসে উপস্থিত হয়েছিলাম। বরাবর একজন আজব মানুষ হিসেবে যা আমি করি। এবং আমি পরীক্ষাও দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, 'আচ্ছা! আমি কি দশ ও পাব না! ইটালিয়ান ভাষা অনেকটাই তো আমি জানি।' কিন্তু

www.pathagar.org

আমি যা জানি তারা তা থেকে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। তারপর মৌখিক পরীক্ষাটা আরও খারাপ হয়েছিল। একটা রোগা ইটালিয়ান শিক্ষক আমার পরীক্ষা নিচ্ছিল এবং খুব দ্রুত কথা বলছিল। আমার মতে আমি এর চেয়ে আরও ভাল করতাম, কিন্তু ভয়ে অনেক জানা জিনিসও ভুল করেছিলাম। নাহলে আমি সন আনাটা আ স্কেউলা না বলে ভাডো আ স্কেওলা কেন বলেছিলাম?

সব শেষে, রোগা শিক্ষকটা আমার পরীক্ষার খাতা দেখে আমাকে বাছাই করেছিল– 'দ্বিতীয় স্তর!'

সেখানে ক্লাস শুরু হতো সন্ধ্যায়। তাই তখন আমি শাক-সবজি ভাজা খেতে যাই। তারপর শ্লথ গতিতে স্কুলে চলে আসি। চটপট প্রথম স্তরের ছাত্রদের পেরোতে পেরোতে ভাবি প্রথম স্তরের ছাত্ররা অবশ্যই তেমন হবে যাকে সেখানে বলে, 'মলটো স্টুপিডিও,' আমার প্রথম ক্লাসে আমি বীর পুরুষের মতো ঢুকি কিন্তু ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এতে আমার কোনো জারি জুরি নেই। কেননা দ্বিতীয় স্তর অসম্ভব রকম কঠিন। মনে হচ্ছিল আমি সাঁতার করছি আর দমে দমে পানির ভেতর থেকে কথা বলছি। শিক্ষকটা একজন রোগা মানুষ। বুঝিনি সেখানে সকল শিক্ষক রোগা কেন? আমি রোগা ইটালিয়ানদের বিশ্বাস করি না। সে তখন খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল, বইয়ের পুরো অধ্যায়গুলো বাদ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল, আপনারা আগেই এটা জানেন, আপনারা আগে থেকেই ওটা জানেন। তারপর দ্রুতগতির বক্তা সঙ্গীর সাথে আমার একটা বিদ্যুৎ গতির কথোপকথন চাপিয়ে দিচ্ছিল। ভয়ে আমার পেট ফুলে গিয়েছিল এবং আমি বাতাসের জন্য হাঁপাচ্ছিলাম এবং প্রার্থনা করছিলাম যেন সে আমাকে না ডাকে। যখনই বিরতি এসেছিল, কাঁপা কাঁপা পায়ে আমি ক্লাস থেকে দৌড়ে পালিয়েছিলাম, কান্না সামলে দ্রুত অফিসের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। যেখানে খুব পরিষ্কার ইংরেজিতে আমি মিনতি করেছিলাম তারা কি আমাকে প্রথম স্তরে নামিয়ে আনতে পারবে। তারা তখন তা করেছিল আর আমি তখন সেখানে চলে গিয়েছিলাম। প্রথম স্তরে।

আহ! সেই শিক্ষকটার শরীরে মাংস ছিল এবং বলছিলও আস্তে আস্তে। আগের চেয়ে অনেক ভাল বোধ করছিলাম।

১৫

আমার ইটালিয়ান ক্লাসের সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল কারো ইটালি শেখার তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমরা বারোজন সেখানে একসাথে শিখতাম। নানান বয়সী মানুষ, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে গিয়েছিলাম একটাই কারণে, শুধু ইটালি ভাষা শিখতে, শুধু তার প্রয়োজন বোধ করে। কারো বস কাউকে বলেনি যে, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য ইংরেজি শেখা দরকার। সবারই তখন একই অবস্থা। এমনকি উচ্চপদস্থ জার্মান প্রকৌশলী আমাদের যা বলেছিল ঠিক

www.pathagar.org

যেমনটা আমি ভাবতাম। আমরা সবাই ইটালি ভাষায় কথা বলতে চাইতাম কারণ এটা বলার সময় যে অনুভূতি হয় তা আমরা ভালোবাসি। একটা দুঃখী চেহারার রাশিয়ান মহিলা বলেছিল, সে ইটালি ভাষা শেখে কারণ কিছু সুন্দর জিনিস তারও তো পাওনা। জার্মান প্রকৌশলী বলেছিল, আমি ইটালিয়ান ভাষা শিখতে চাই কারণ আমি 'ডলছে ভিটা' ভালোবাসি-মানে মিষ্টি জীবন। তার জার্মানি উচ্চারণে শেষমেশ শব্দটা এমন শোনাতো যেন সে বলেছে 'দ্যা ডিউসিয়ে ভিটা।'

আমি তখন কয়েক মাসের মধ্যেই জানতে পারব, যে ভাল কারণগুলোর জন্য ইটালি ভাষাটাতে এত মাদকতা অনুভূত হয় আর যে কারণে আমি একাই সেই ভাষার ভক্ত না। কারণটা জানতে হলে আপনাকেও আগে এটা জানতে হবে যে, ইউরোপ একসময় লাতিন ভাষা থেকে উদ্ভূত অসংখ্য উপভাষার জগাখিচুড়ী ছিল। এক শতক ধরে তা কয়েকটা আলাদা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল- ফ্রেঞ্চ, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান। ফ্রান্সে একটা গঠনমূলক বিবর্তন হয়েছিল। সবচেয়ে উন্নত এবং বিশেষায়িত শহরের উপভাষাকে পুরো জাতি তাদের মূল ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাই আমরা যাকে ফ্রেঞ্চ ভাষা বলে জানি তা মূলত প্রাচীন পারস্যের একটা সংস্করণ। পর্তুগিজ আসলেই তার নিজ শহর লিজবনের। স্প্যানিশ ভাল রকম মাদ্রিদি। এগুলো হচ্ছে পুঁজিবাদী জয়, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শহরই একটা পুরো দেশের ভাষা নির্ধারণ করে এসেছে।

ইটালির ব্যাপারটা আলাদা। কারণ লম্বা সময় ধরে সকল দেশ থেকে একটা জটিল পার্থক্য ছিল। সেটা কোনো আলাদা দেশ ছিল না। ১৮৬১ সালের আগে এটা নিজেকে সমন্বিত করতে পারেনি। এর আগ পর্যন্ত যুদ্ধরত শহরের উপশহর হিসেবে বিভিন্ন স্থানীয় রাজপুত্রদের অথবা অন্যান্য ইউরোপিয়ান শক্তির অধিকারীদের অধীনে ছিল। ইটালির কিছু অংশ ছিল ফ্রান্সের অধীনে কিছু স্পেনের, কিছু চার্চের, কিছু অংশ ছিল যারা স্থানীয় দুর্গ দখল করতে পেরেছে তাদের দখলে। ইটালিয়ান লোকজন এই অপমান আর শাসনের বিরুদ্ধে চটে গিয়েছিল। বেশীর ভাগই ইউরোপ অধ্যুষিত হয়ে থাকা পছন্দ করত না কিন্তু সেখানে সব সময় একটা নির্ভীক জটলা ছিল যেখান থেকে ভেসে আসত 'ফ্রানযা অ স্পাগনা, পুরখে সে মাগনা।' যে উপভাষার মানে হলো, 'ফ্রান্স অথবা স্পেন, খাব যতক্ষণ পারি।'

এইসব আভ্যন্তরীণ বিভক্তির মানে ছিল ইটালি কখনোই সমন্বিত ছিল না কিংবা ইটালিয়ানরা তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। শতক ধরে ইটালিয়ানদের লিখিত ও কথ্য ভাষা ছিল স্থানীয় উপভাষা, যার কোনো সীমা ছিল না। ফ্লোরেন্সের একটা বিজ্ঞানী খুব কমই যোগাযোগ করতে পারত সিসিলির একজন কবির সাথে কিংবা ভেনিসের ব্যবসায়ীর সাথে। ল্যাটিন ভাষা ছাড়া, যেটা খুব কমই জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ষোল'শ শতকে কিছু ইটালিয়ান বুদ্ধিজীবী এক হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এভাবে চলতে পারে না। ইটালিয়ান উপদ্বীপের পৃথক ইটালিয়ান ভাষা দরকার, অন্তত একটা লিখিত রূপ। যার সাথে সবাই একমত হতে পারে। এই বুদ্ধিজীবীরা একযোগে একটা অভূতপূর্ব কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। তারা তখন সবচেয়ে সুন্দর উপভাষাকে বাছাই করে তাকে ইটালির জাতীয় ভাষায় ভূষিত করেছিলেন।

www.pathagar.org

ইটালিতে ব্যবহৃত সবচেয়ে সুন্দর ভাষা খুঁজতে তাঁদের দুইশত বছর আগের অর্থাৎ চৌদ্দ'শ সালের ফ্লোরেন্সে ফিরে দেখতে হয়েছিল। সেই মহাসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেটাই ছিল মহান ফ্লোরেনটাইন কবি দান্তে এলিগিরির ব্যক্তিগত ভাষা। কিন্তু যখন জাহান্নাম থেকে প্রায়শ্চিত্ত আর তারপর স্বর্গের কল্পদৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে সে তার 'দা ডিভাইন কমেডি'র দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্য জগত চমকে গিয়েছিল কারণ সেই সাহিত্য ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। তার মনে হয়েছিল ল্যাটিন দুর্নীতিগ্রস্থ আর এলিটের ভাষা। আর সেই ভাষায় মূল সাহিত্য রচনা করার অর্থ হচ্ছে সাহিত্যকে বেশ্যায় পরিণত করা। সামগ্রিকভাবে এরকম বর্ণনা শুধু টাকা দিয়ে কেনা যায় বা অধুনা শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এর বদলে দান্তে রাস্তায় নেমে গিয়েছিলেন, আসল ফ্লোরেন্সিয়ান ভাষাটা সেই শহরের বাসিন্দাদের কাছ তুলে এনেছিলেন। যেখানে সমকালীন কবি বোক্কাকিও এবং পেতরাকও অন্তর্ভুক্ত। তারপর সেই ভাষাটা সেই গল্পে ব্যবহার করেছিলেন।

তিনি তার মৌলিক কাজ যাকে তিনি বলতেন, 'ডলছে ডা নুওভো' মানে মাতৃভাষার 'মিষ্টি পদ্ধতি' এবং সেটা লেখার সময়ও সে তাঁর মাতৃভাষাকে আকৃতি দিয়েছিল। এই ভাষা ব্যক্তি পর্যায়ে এভাবে প্রভাব ফেলেছিল যেভাবে সেক্সপিয়ার এলিজাবেথিয়ান ইংরেজিতে প্রভাব ফেলেছিলেন। অনেক পরে জাতীয়তাবাদী কিছু বুদ্ধিজীবীর দল একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দান্তের ইটালিয়ান ভাষাই ইটালির আনুষ্ঠানিক ভাষা হওয়া উচিত। যেভাবে নবম শতকের শুরুতে অক্সফোর্ডের এক দল একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন– এখন থেকে ইংল্যান্ডের সবাই শুদ্ধ শেক্সপিয়ারের ভাষা বলবে এবং তাই হয়েছিল।

যে ইটালি ভাষায় আমরা এখন কথা বলি তা আসলে রোমানও নয় আবার ভেনিসিও ভাষাও নয়। যদিও ভেনিস শক্তিশালী সামরিক ও বাণিজ্যিক শহর। কিংবা আভ্যন্তরীণভাবে এটা আসলে ফ্লোরেনটাইনও নয়। এটা বেশি রকম দান্তেয়ান। মানে দান্ত ময়।

অন্য কোনো ইউরোপিয়ান ভাষার এমন শৈল্পিক কৌলীন্য নেই। এবং এই ফ্লোরেনটাইন ইটালিয়ান ভাষার মতো অন্য কোনো ভাষা মানুষের আবেগ প্রকাশের জন্য এমন সঠিক ভাবে সাজানো হয়নি। কেননা পশ্চিমা সভ্যতার একজন মহান কবি দ্বারা এটা অলংকৃত হয়েছে।

দান্তে তার 'দ্য ডিভাইন কমেডি' লিখেছিলেন তেরজা রিমা মানে তিন মাত্রার মিত্রাক্ষর ছন্দের ধারা। প্রতি পাঁচ লাইনে সে চরণ তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়। তিনি তার মাতৃভাষাকে যা দিয়েছিলেন পণ্ডিতরা তাকে বলেন, 'ঝরনার মতো ছন্দ।' এমন একটা ছন্দ যা এখনো হেসে খেলে চলে যাচ্ছে। এমন কাব্যিক সুরের মূর্ছনা যা এখনো ক্যাব চালক, মাংস বিক্রেতা এবং সরকারি আমলাদের মুখে মুখে ফিরে। ডিভাইন কমেডির শেষ লাইনে দান্তে খোদ ঈশ্বরের স্বরূপের মুখোমুখি হয়েছিলেন এমন রস আর ভাবময়তায় যা এখনকার ইটালিয়ানদের কাছেও সমান প্রচলিত। দান্তে লিখেছেন ঈশ্বর কোনো ঝলমলে আলোর কল্পনা নয়। কিন্তু তিনি পুরোপুরি সেটাই,

আই আমর চে মুভ ইল সলো এ আই আলতেয়ার সেতেল।

সেই ভালোবাসা যা সূর্য ও অন্য তারাদের গতি দেয়।

www.pathagar.org

তাই এখানে আসলেই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আমি কেন পাগলের মতো এই ভাষাটা শিখতে চাই এবং চাইতাম।

১৬

ইটালি যাওয়ার দশ দিন পর বিষণ্নতা এবং একাকীত্ব আবার আমাকে পেয়ে বসে। স্কুলে একটা হাসি খুশি দিন কাটানোর পর এক সন্ধ্যায় ভিলা ভরগিজের ভেতর দিয়ে হাঁটছি। সেন্ট পিটার বাসিলিকার ওপারে সোনালি রঙের সূর্য অস্ত যাচ্ছে। যেখানে পার্কের অন্য সবাই হয় প্রেমিক না হয় আদুরে শিশু নিয়ে ব্যস্ত সেখানে আমি একা হলেও এমন মধুর দৃশ্য আমার বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু সূর্যাস্ত দেখব বলে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে আধ শোয়া হতেই আমি একটু বেশি চিন্তা করতে শুরু করে দেই। আমার চিন্তা ডালপালা মেলতে শুরু করে এবং তারা আমার নাগাল পেয়ে যায়।

পিঙ্কারটুন গোয়েন্দাদের মতো নিশ্চুপ এবং নিঃশব্দে তারা পাশে এসে বসে- বিষণ্নতা আমার বাম পাশে, একাকীত্ব আমার ডান পাশে। তারা আমাকে তাদের পরিচয়পত্র দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেনি, আমি এদের এমনিতেই ভাল করে চিনি। আমাদের মাঝে ইঁদুর বিড়াল খেলা বেশ কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে। তবে ইটালির ডাস্ক শহরের এমন রুচিশীল বাগানে তাদের দেখে অবাক হয়েছিলাম। তাদের তো সেখানে থাকার কথাই না।

সেদিন আমি তাদের বলি,

তোমরা আমাকে এখানে কিভাবে খুঁজে পেলে? আমি যে রোমে এসেছি তা তোমাদের কে বলল?

বিষণ্নতা সবসময়ই বিজ্ঞ। সে বলে,

কি! তুমি আমাদের দেখে খুশি হওনি?

আমি বলি,

চলে যাও।

একাকীত্ব খুব সংবেদনশীল প্রহরী। সে বলে,

আমি দুঃখিত ম্যাম। কিন্তু আপনার ভ্রমণের পুরোটা সময় আপনার পেছনে আমার লেগে থাকার কথা। এটাই আমার কাজ।

আমি তোমাদের ছাড়াই থেকেছি কদিন তাই নয় কি?

সে ক্ষমা প্রার্থনাসূচক কাঁধ ঝাঁকালেও শুধু কাছেই আসতে থাকে। তারপর তারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার পকেটে পুরে যেটুকু সুখ নিয়ে গিয়েছিলাম তা তারা খালি করে নিয়ে নেয়। সেদিন আবার বিষণ্নতা আমার সত্তা গুম করে, হ্যাঁ, প্রায়ই করে। তারপর একাকীত্ব আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করে। এটা আমি ভয় পাই কারণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই জেরা চলতেই থাকে। সে ভদ্র কিন্তু নির্দয়। শেষমেশ সব সময় সে আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়। সে জিজ্ঞেস করে এমন কোনো কারণ

www.pathagar.org

আছে কিনা যাতে আমি নিজেকে সুখি ভাবতে পারি। সে জিজ্ঞেস করে, আমি সে রাতেও একা কেন? যদিও এই একই কথোপকথন ইতোমধ্যে আমাদের মাঝে হাজারবার হয়ে গেছে তবু সে জিজ্ঞেস করে, আমি কেন কোনো সম্পর্ক চালিয়ে নিতে পারি না? আমি আমার বৈবাহিক জীবনকে কেন নষ্ট করলাম? কেন আমি ডেভিডের সাথে গণ্ডগোল বাধালাম? কেন আমি যাদের সাথেই থাকি তাদের সাথেই ঝামেলা পাকাই? সে জিজ্ঞেস করে ত্রিশ বছরে উপনীত হওয়ার রাতে আমি কোথায় ছিলাম? তখন থেকে সব এমন তিতকুটে হয়ে গেছে কেন? সে জিজ্ঞেস করে, কেন আমি সবকিছু মানিয়ে নিতে পারলাম না? আমার বয়সী অন্যসব সম্মানিত নারীদের মতো কেন একটা সুন্দর বাড়িতে ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করতে পারলাম না? সে জিজ্ঞেস করে, যখন আমার জীবনটাকে এভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছি তখন কেন আমার মনে হলো রোম শহরে একটা ছুটি কাটাতে হবে? সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমার কেন মনে হয় যে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো দৌড়ে ইটালি আসতে পারলেই আমি সুখি হয়ে যাব? সে জিজ্ঞেস করে, আর কতদিন এভাবে জীবন-যাপন করলে আমার মনে হবে আমি পরিণত হয়েছি, আমি থামব?

তারপর আমি বাড়ি ফিরে আসি, ভাবি এইবার তাদের গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেব, কিন্তু তারা আমাকে ছাড়ে না। বিষণ্নতা তার সুঠাম হাতে আমার কাঁধ চেপে ধরে থাকে এবং একাকীত্ব আমাকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে থাকে। আমি চাচ্ছিলাম না রাতের খাবার খাওয়ার সময় তারা আমাকে দেখুক। আমি চাচ্ছিলাম না, তারা সিঁড়ি ভেঙে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসুক। কিন্তু বিষণ্নতাকে তো আমি চিনি, তার হাতে একটা পুলিশি কাঠের লাঠি ছিল। সে যদি চাইত তাহলে কেউ তাকে আঁটকাতে পারত না।

আমি বিষণ্নতাকে বলি,

তোমার এখানে আসা মানায় না। যথেষ্ট খসিয়েছ। এতদিন নিউ-ইয়র্কে অনেক গোলামী করেছি তোমার।

কিন্তু সে সেই রহস্যময় হাসিটা হেসে, আমার প্রিয় চেয়ারটায় বসে আমার টেবিলে পা ছড়িয়ে সিগারেট জ্বালায়, ধোঁয়ায় ঘরটা আবছা করে ফেলে। একাকীত্ব তা দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর একদম জামা-জুতাসহ আমার বিছানায় লাফিয়ে পড়ে এবং সেভাবেই নিজেকে চাদর দ্বারা আবৃত করে নেয়। হ্যাঁ। সে সেই রাতেও তার সাথে আমাকে ঘুমাতে বাধ্য করে।

১৭

তখন মাত্র কিছুদিন হয় আমি বিষণ্নতা প্রতিরোধক ওষুধ খাওয়া বন্ধ করেছিলাম। বলুনতো, ইটালিতে বিষণ্নতা প্রতিরোধক ঔষধ খাওয়ার কি কোনো মানে আছে! আমি সেখানে কিভাবে বিষণ্ন থাকতে পারতাম!

www.pathagar.org

প্রথম দিকে আমি কোনো ওষুধপত্রে খেতে চাইনি। এ ব্যাপারে নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ করেছি। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিধিনিষেধের একটা বড় তালিকা ছিল আমার। আমেরিকানরা অতিরিক্ত মাত্রায় ঔষধে আসক্ত। আমরা জানি না মস্তিষ্কের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে। তাছাড়া এটা একটা অপরাধ। এখন আমেরিকান বাচ্চারাও বিষণ্নতা প্রতিরোধকে আসক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা শুধু লক্ষণের চিকিৎসা করছি কিন্তু এই জাতীয় জরুরী মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণকে চিহ্নিত করে তার প্রতিকার করছি না। আমার জীবনের বিগত কয়েক বছরে যে আমি মারাত্মক সমস্যায় ছিলাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেই ভয়াবহ অবস্থার দ্রুত উন্নতিও হচ্ছিল না। বিবাহিত জীবনের ইতি আর ডেভিডের সাথে সেই নাটকের প্যাঁচ খাওয়ার পর বিষণ্নতার সকল লক্ষণ আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। অনিদ্রা, ক্ষুধামন্দা আর যৌন আকাঙ্ক্ষা লোপ, অনিয়ন্ত্রিত কান্না, লাগাতার পিঠ ব্যথা, পেট ব্যথা, পাগলামি, নিরাশা, কাজে অমনযোগিতা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকানরা কোনো ভোট চুরি করলেও আমার যেন কিছু যায় আসে না... এরকম চলছিল দিনের পর দিন।

গভীর জঙ্গলে হারিয়ে গেলে মাঝে মাঝে সত্যটা মেনে নিতে সময় লাগে। সে অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে আপনি নিজেকে প্রবোধ দেবেন যে আপনি সঠিক পথ থেকে মাত্র কয়েক পা ব্যবধানে আছেন। তাই ভেবে নেবেন যেকোনো মুহূর্তে যে পথে এখানে এসেছেন তা পেয়ে যাবেন। রাতের পর রাত চলে যাবে আপনি তখনো জানবেন না কোথায় আছেন। তারপর একদিন আপনি নিজের কাছে স্বীকার করবেন আপনি আসলে পথভ্রষ্ট। পথ তো দূরের কথা আপনি এও জানেন না কোন দিকে সূর্য উদয় হয়। ঠিক তেমন ছিল ব্যাপারটা।

বিষণ্নতার সমস্যাটাকে আমি আমার জীবনের যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছিলাম। যেজন্য আমি নিজেই নিজের বিষণ্নতার চিকিৎসার ছাত্র হয়ে গিয়েছিলাম। রোগটার কারণের জট ছাড়াতে চাচ্ছিলাম। এইসব হতাশার কারণ কি? এটা কি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ছিল? মা এবং বাবার ভুল। এটা কি ক্ষণস্থায়ী সমস্যা, আমার জীবনের খারাপ সময়? বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেলে এর সাথে কি বিষণ্নতা চলে যাবে। এটা কি জিনগত? দুঃখী নববধূর মতো, মাতালের মতো, নিঃসঙ্গতা নানান রূপে আমাদের পরিবারে বংশানুক্রমে চলে আসছে। এটা কি সাংস্কৃতিক বা এটা কি কেবল একজন আমেরিকান রোজগেরে নারীর নারীবাদ পরবর্তী একটা বাজে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। যে এই অচেনা, দুশ্চিন্তাময় শহুরে জীবনে ভারসাম্য খুঁজছে। এটা কি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়? আমার দুঃখী স্বত্তার কারণ কি আমি কর্কট রাশির রুগ্ন জাতিকা বলে, আর যাকে শাসন করে মিথুন রাশি। এটা কী শৈল্পিক? সৃষ্টিশীল মানুষরা তো বিষণ্নতাকে ভুগেই থাকে কেননা তারা অতি সংবেদনশীল এবং পৃথক বৈশিষ্টের। এটা কি বিবর্তনের জন্য? নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে নিজেকে বাঁচাতে, আমি কি লক্ষ লক্ষ প্রজাতিতে বিবর্তিত হতে হতে এই বাড়তি ভয়টা বহন করছি? এটা কি কর্মফল? এই সমস্ত অনুশোচনার কারণ কি। পূর্বজন্মের কর্মফল, মুক্তির আগের শেষ বাধা। এটা কী হরমোনীয়? ডায়েটীয়? দর্শন সম্বন্ধীয়? ঋতুকালীন? পরিবেশীয়? আমি কি আকুলভাবে ঈশ্বরের দরজায় কড়া নাড়ছি। আমার কি রাসায়নিক ভারসাম্যের অভাব? নাকি আমার সন্তান প্রসব করা প্রয়োজন?

www.pathagar.org

মাত্র একজন মানুষের সত্তার সাথে কত কিছু জড়িয়ে! কতগুলো স্তর আমাদের পরিচালনা করতে হয় এবং কত ধরনের প্রভাব আমরা আমাদের মন, শরীর, ইতিহাস, পরিবার, শহর, আমাদের আত্মা এবং আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ থেকে গ্রহণ করি। আমি অনুভব করতে পারছিলাম আমার বিষণ্নতা হয়ত সেই উপাদানগুলোর একটা সমন্বিত অস্থির ভাণ্ডার। হয়ত আরও কিছু উপাদান আছে যাদের নাম আমি নেইনি। আমি প্রতিটা স্তরে যুদ্ধ করেছিলাম। আমি সকল অস্বস্তিকর নামের আত্ম-সাহায্যের বইগুলো কিনেছিলাম। সবসময় বইগুলো হাসলারের চলতি সংখ্যার মোড়ক দিয়ে মলাট করতাম যাতে কেউ না বোঝে আমি কি পড়ছি। তারপর একজন দয়ালু এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন পেশাদার চিকিৎসকের কাছ থেকে সাহায্য নিতে শুরু করেছিলাম। আমি প্রার্থনা করতাম আনাড়ি সন্ন্যাসীর মতো। অল্প সময়ের জন্য আমি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। কেউ একজন বলেছিল, মাংস খাওয়া মানে মৃত্যুর সময়ের প্রাণীদের ভয়টাও খেয়ে নেওয়া। কিছু নতুন ধরনের চিকিৎসক আমাকে কমলা রঙের অন্তর্বাস পরতে বলেছিল। এতে নাকি আমার যৌন চক্রের ভারসাম্য ঠিক হবে এবং ভাইরা আমি তাও করেছিলাম। আমি প্রচুর পরিমাণে সেই সেন্ট জন ওয়রট চা খেয়েছিলাম যা রাশিয়ান রাজনৈতিক বন্দিদের আনন্দ দিতে খাওয়ানো হতো। কোনো লাভ হয়নি। আমি ব্যায়াম করতাম, আমি উচ্চ পর্যায়ের শিল্পের কাছাকাছি নিজেকে দাঁড় করাতাম এবং কোনো দুঃখের সিনেমা, বই এবং গান শোনা থেকে সাবধান থাকতাম। কেউ যদি লিউনার্দ আর কেবেন উচ্চারণ করত আমি সেই কক্ষ ত্যাগ করতাম।

আমি আমার সেই সীমাহীন ফোঁপানির সাথে যুদ্ধ করছিলাম। নিজের প্রতি এক রাতের প্রশ্ন আমার মনে আছে। যখন আমি আমার ঘরের কোণায় পুরোনো সোফায়, আমার সেই পুরোনো কান্নার শয্যায় কুঁকড়ে, সেই দুঃখের ভাবনার পুনরাবৃত্তি করছিলাম। তখন প্রশ্নটা এসেছিল, এই দৃশ্যের কি কোনো পরিবর্তন হবে না লিজ? এবং আমার যা করার ছিল তা হলো এক পায়ে দাঁড়ানো। যদিও ফোঁপানিটা তখনো ছিল তবুও আমি আমার ঘরের মাঝখানে এক পায়ের ওপর ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছিলাম। শুধু এটা প্রমাণ করতে যে, আমি আমার কান্না সামলাতে না পারলেও, আমার ভেতরের নিরস প্রশ্ন বদলাতে না পারলেও, আমি আমার নিয়ন্ত্রণ হারাইনি। অন্তত আমি এক পায়ে ভারসাম্য রেখে ঐতিহাসিক ভাবে কান্না করতে পারি। ওহে! সেটাই ছিল শুরু।

আমি রোদের মধ্যে রাস্তা পার হতাম। আমার অনুকূল পরিমণ্ডলে গা এলিয়ে দিতাম, পরিবার নিয়ে আনন্দ করতাম, এবং আমার উজ্জ্বল বন্ধুত্বের সম্পর্কে জল হাওয়া দিতাম। কিন্তু যখন সেই উপযাচক মেয়েদের ম্যাগাজিন আমাকে বলত যে আমার নিম্ন আত্মমর্যাদাবোধ আমার বিষণ্নতা তাড়াতে তেমন কার্যকর কিছু না তখন আমি একটা সুন্দর চুলের ছাট দিয়েছিলাম। কিছু চটকদার মেকআপ এবং একটা দারুণ জামা কিনেছিলাম। আমার এক বন্ধু এ নিয়ে মন্তব্য করেছিল, 'অপারেশন আত্ম মর্যাদাবোধ– প্রথম দিন।'

দুই বছর দুঃখের সাথে লড়াই করে শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি ওষুধ খেয়েছিলাম। আমার মত অনুযায়ী ঔষধ সব চেষ্টায় বার্থ হওয়ার পরে খাওয়া উচিত! এক রাতের পর আমার 'ভিটামিন পি' খাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিতে হয়। সে রাতে আমি কয়েক ঘণ্টা আমার শোবার ঘরের মেঝেতে বসে বসে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যাতে

www.pathagar.org

রান্না ঘরের ছুরি দিয়ে নিজের হাত না কাটি। সেই রাতে তর্কে ছুরির প্রস্তাবই জিতেছিল। কিন্তু আমার আরও কিছু ভাল বুদ্ধিও ছিল– যেমন বিল্ডিং থেকে লাফ দেওয়া কিংবা পিস্তল দিয়ে মাথার খুলি উড়িয়ে দিলে হয়ত এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু হাতে ছুরি নিয়ে এক রাত কাটানোতে কাজটা হয়েছিল।

এর পরের দিন সকালে সূর্য উঠতেই আমি সুসানকে ফোন করে আমাকে সাহায্য করতে বলেছিলাম। আমার ধারণা আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে কোনো মহিলাই এমন করেনি। জীবনের মাঝামাঝি যেন রাস্তার মাঝে বসে এরকম বলা, 'আর এক পাও আমি এগুতে পারব না। কাউকে সাহায্য করতে হবে।' এরকম মহিলাদের কেউই সাহায্য করতে পারবে না যারা হাঁটা বন্ধ করে দেয়। এক্ষেত্রে একটা জিনিসই হয়, তা হলো সে এবং তার পরিবার না খেয়ে থাকে। সেই মহিলাদের কথা আমার মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সুসানের সেদিনের চেহারাটা আমি ভুলব না। সে জরুরী ফোন কল পেয়ে আমার বাসায় ছুটে এসে দেখেছিল, আমি আমার খাটে জড়ো হয়ে বসে ছিলাম। সেই ভয়ার্ত বছরগুলোর মধ্যে সেটা ছিল একটা বিশেষ ভয়ার্ত স্মৃতি। সুসানের মুখে আমার দুঃখ প্রতিফলিত হয়ে ভয়ের রূপ নিয়েছিল। যখন সুসান ফোন করে আমার জন্য চিকিৎসক খুঁজে পেয়েছিল তখন আমি একটা বল মোচড়াচ্ছিলাম। চিকিৎসক হয়ত বলছিল বিষণ্নতা প্রতিরোধক দেওয়ার আলোচনা করতে তিনি সেই দিনই আমার সাথে দেখা করবেন। আমি সুসানের এক পক্ষের আলাপ শুনছিলাম। সে বলছিল, আমি ভয় পাচ্ছি আমার বান্ধবী হয়ত নিজেকে মারাত্মকভাবে জখম করবে।

হয়ত তাই। আমি নিজেও ভয় পাচ্ছিলাম।

সেই সন্ধ্যায় যখন আমি সেই মনস্তত্ত্ববিদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, যেহেতু আমি নিজেকে অনেকদিন যাবত সাহায্য করতে পারছিলাম না তাহলে আমার সাহায্য চাইতে এত দেরী লাগল কেন? আমি তাকে বিষণ্নতা প্রতিরোধকের বিরুদ্ধে আমার অনীহা আর আপত্তির কথা জানিয়েছিলাম। তার টেবিলে আমি আমার প্রকাশিত তিনটা বই বের করে রেখে বলেছিলাম, আমি একজন লেখক। আমার মস্তিষ্কের সাথে ক্ষতিকর কিছু করবেন না।

তিনি বলেছিলেন, আপনাদের যখন কিডনি রোগ হয় তবে ঔষধ খেতে অমত করেন না তবে এক্ষেত্রে আপত্তি কেন করেন?

বোঝেন এতেই প্রমাণ হয় তিনি আমার পরিবার সম্পর্কে কিছুই জানে না। গিলবার্টরা একটা কিডনি রোগের ঔষধ অবশ্যই গ্রহণ করতেন না। যতটুকু বুঝেছি, আমি এমন এক পরিবার থেকে এসেছি যারা কোনো অসুস্থতাকে ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং নৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখে।

যে পর্যন্ত না সঠিক সমন্বয়টা খুঁজে পাই তিনি আমাকে কিছু ভিন্ন ঔষধ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন– জানাক্স, যোলফট, ওয়েলবার্টিন, বাসপেরিন। শরীরের সাথে না খাপ খেলে যাতে আমার বমি বমি ভাব না আসে, আমার কাম শক্তি হ্রাস না পায় এবং দূরের স্মৃতি ভুলে না যাই। দ্রুত, এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি আমার মনের ভেতর বাড়তি কয়েক ইঞ্চি আলো দেখতে পেয়েছিলাম এবং শেষমেশ ঘুমাতেও পারছিলাম। একজন নির্ঘুম মানুষের কাছে এটাই আসল পুরস্কার। কেননা তা না হলে অন্ধকার গর্তটা থেকে বের হওয়া যায় না। ঔষধগুলো আমাকে সেই রাত ফিরিয়ে দিয়েছিল।

www.pathagar.org

এটা আমার হাত কাঁপাও থামিয়েছিল এবং বুক খামচে ধরে রাখা এবং বুকের ভেতর ভয়ের সাইরেন বেজে ওঠা থেকেও মুক্তি দিয়েছিল।

যদিও তখন সেগুলো তাৎক্ষণিক সাহায্য করেছিল তবুও ঔষধগুলো খেতে আমি সচ্ছন্দ বোধ করতাম না। যে কেউই বলুক না কেন যে ঔষধগুলো ভাল এবং পুরোপুরি নিরাপদ তবু আমার দ্বিধা দূর হতো না। এতে কোনো সন্দেহ নেই সেই ঔষধগুলো আমার খারাপ থাকার ঐপারের সাথে সেতুর মতো ছিল তবুও যত দ্রুত সম্ভব আমি এই ঔষধ থেকে মুক্তি চাচ্ছিলাম। জানুয়ারি ২০০৩-এ আমি ঔষধগুলো খাওয়া শুরু করি এবং মে মাসের মধ্যেই ঔষধের মাত্রা বেশ খানিকটা কমিয়ে আনি। সেই মাসগুলো খুবই কষ্টকর গেছে। বিবাহবিচ্ছেদের শেষ মাস এবং ডেভিডের সাথে শেষের তিতকুটে মাসগুলোই সেগুলো। আমি কি সেই ঔষধগুলো ছাড়া অত সমস্যা সহ্য করতে পারতাম! যদি তাতে আরও সময় নিত? আমি কি আমার মতো আমি হয়ে বেঁচে থাকতে পারতাম? আমি জানি না। মানব জীবনের এই একটা বিষয় নিয়ন্ত্রণের কোনো সংগঠন নেই। আমরা জানি না আমাদের জীবনের কোনো একটা পরিবর্তন হয়ে গেলে আমরা কেমন হয়ে যাই, কতটা বদলে যাই বা কতটা বদলে যাব।

আমি জানি এই ঔষধগুলো আমার কষ্টের ভয়াবহতা কমিয়েছিল। এ ব্যাপারে আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু আমি এখনো প্রবলভাবে মানুষের সহজাত মেজাজ নিয়ন্ত্রণকারী ঔষধ বিরোধী। আমি তাদের ক্ষমতাকে সম্মান দেখাই কিন্তু তাদের দৌরাত্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমি মনে করি এগুলো চিকিৎসক দ্বারা নির্দেশিত হতে হবে এবং এর ওপর নিষেধাজ্ঞাও থাকবে এবং মানসিক চিকিৎসার অন্য সমাধান বা অন্য পর্বগুলো ছাড়া শুধু এই ঔষধগুলোই দেওয়া উচিত না। মূল কারণকে এড়িয়ে কোনো রোগের লক্ষণের চিকিৎসা করা একটা পশ্চিমা শঠতা। এখানে কেবল ভেবে নেওয়া হচ্ছে কেউ এতে ভাল হয়ে যাবে। এই ঔষধগুলো হয়ত আমার জীবন বাঁচিয়েছে কিন্তু তারা আমার আরও বিশটা চেষ্টার অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে যা আমি এর পাশাপাশি নিজেকে উদ্ধার করতে একযোগে করেছিলাম। আমি আশা করি আর কখনো এমন ঔষধ আমি খাব না। যদিও একজন চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন আমি আমার জীবনে অনেকবার বিষণ্নতা প্রতিরোধক ঔষধ বন্ধ করে দেব কারণ 'নিঃসঙ্গতার প্রতি আমার আকর্ষণ।' আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম তার কথা যেন ভুল প্রমাণিত হয়। সেটা ভুল প্রমাণিত করতে কিংবা অন্তত সত্যই যদি সেই নিষঙ্গ প্রবৃত্তি থেকে থাকে তার সাথে আমি সকল অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে রাজী ছিলাম। তাতে আমাকে যে চরিত্রেই দাঁড়াতে হতো, আত্ম-রক্ষাকারী গোঁয়ার বা আত্ম-সংরক্ষণকারী গোঁয়ার, আমি সেখানেই দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলাম।

১৮

কিংবা আমি তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম রোমে এবং বিপদে। তখন বিষণ্নতা আর একাকীত্ব এই দুই গণ্ডমূর্খ আবার আমার জীবনে তরী ভিড়িয়েছে। আমি শেষ ওয়েলবারটন

www.pathagar.org

খেয়েছিলাম তিন দিন আগে। মাঝখানের ড্রয়ারটায় এরকম আরও অনেক ঔষধ ছিল কিন্তু আমি এদের চাইনি। সারা জীবনের জন্য এদের কাছ থেকে মুক্তিও চাচ্ছিলাম আমি আর তার সাথে বিষণ্নতা আর একাকীত্বকেও আমার আশেপাশে দেখতে চাচ্ছিলাম না। কি করব বুঝতে পারছিলাম না বলে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার করণীয় বুঝতে না পারলে এমন কুঁকড়ে যাই। তারপর আমার ব্যক্তিগত নোটবুকটা হাতে নিয়েছিলাম। জরুরী প্রয়োজনে হাতের কাছে পেতে যেটা আমি আমার খাটের পাশেই রাখি। আমি সেটা খুলে প্রথম শূন্য পৃষ্ঠাটায় লিখেছিলাম,

আমি আপনার সাহায্য চাই।

তারপর অপেক্ষা করছিলাম। আমার নিজের হাতের লেখার মাধ্যমে কিছুক্ষণ পর যার সাড়া পেয়েছিলাম, আমি এখানেই আছি। তোমার জন্য কি করতে পারি?

হ্যাঁ। আমি আমার সবচেয়ে অদ্ভুত এবং সবচেয়ে গোপন কথোপকথন শুরু করেছিলাম। সেটা আমার ব্যক্তিগত নোটবই। সেখানে আমি নিজের সাথে কথা বলি। আমি সেই কণ্ঠটার সাথে কথা বলি ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার সময় যে কণ্ঠটা প্রথম গোসলখানার মেঝেতে শুনতে পেয়েছিলাম। যখন কেউ একজন বা কিছু আমাকে বলেছিল 'বিছানায় যাও লিজ।' তখন থেকে কয়েক বছর অতিরিক্ত মাত্রায় উদ্বেগের সময় আমি এই স্বরটা শুনতে পাই এবং বুঝতে পারি লিখিত কথোপকথনের সময়ই আমি এই স্বরের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছাতে পারি। অবাক হই, আমি প্রায় প্রতিবার এই স্বরের কাছে পৌঁছাতে পারি। আমার কষ্ট যত বেশিই হোক, এমনকি ভোগান্তির শেষ পর্যায়ে সেই শান্ত, সমবেদনাপূর্ণ, স্নেহপূর্ণ এবং অসীম বুদ্ধিমান স্বরটা আমার পাশে থাকে। যেটা হয়ত আসলে, আমি অথবা আমি না। কাগজে কথোপকথনের জন্য দিন রাতের যে কোনো সময় তার নাগাল পাওয়া যায়।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই কথোপকথনের জন্য নিজেকে সিজোফ্রেনিক ভেবে দুশ্চিন্তা করব না। হয়ত স্বরটা দিয়ে আমি স্রষ্টার কাছে পৌঁছাই, কিংবা আমার গুরু আমার মাধ্যমে কথা বলেন, হয়ত এটা ছিল সেই ফেরেশতা যে আমার মামলাটা নিয়ে কাজ করছে কিংবা এটা আমার একটা উচ্চতর সত্তা অথবা এটা আমার অবচেতন মনের নিভৃত অবকাঠামো। আমার নিজের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে যার আবির্ভাব। সেন্ট তেরেসা এরকম ঐশ্বরিক আভ্যন্তরীণ স্বরকে বলে গেছেন, 'লকুশন।' অতি প্রাকৃত থেকে আসা শব্দ যা মনে সাবলীলভাবে প্রবেশ করে ব্যক্তির ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে ব্যক্তিকে স্বর্গীয় সান্ত্বনা দেয়। আমি জানি ফ্রয়েড এরকম সান্ত্বনার ব্যাপারে কি বলেছেন, অবশ্যই তা হলো অযৌক্তিক এবং 'যা বিশ্বাস করার কিছু নাই। অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে জীবনটা কোনো ছেলে খেলা নয়।' আমি একমত- পৃথিবীটা ছেলে খেলা নয় তবে এতই কঠিন যে আমাদের মাঝে মাঝে আওতার বাইরে সাহায্যের জন্য পৌঁছাতে হয়। শান্তির জন্য আরও উচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হয়।

আমার ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতার প্রথম দিকে এরকম আভ্যন্তরীণ কথাবার্তার প্রতি আমার কোনো বিশ্বাস ছিল না। আমার মনে আছে একবার তিক্ত রাগে, দুঃখে উন্মত্ত হয়ে ব্যক্তিগত নোটবুকটা নিয়ে আমার অন্তর্গত স্বরকে, আমার ঐশ্বরিক অন্তর্গত

www.pathagar.org

শান্তিকে একটা হিজিবিজি বার্তা দিয়েছিলাম এবং পুরো একপাতা জুড়ে বড় অক্ষরে লিখেছিলাম,

'আমি তোমাকে এক আনাও বিশ্বাস করি না! ! !'

মুহূর্ত পরে জোরে শ্বাস ফেলে পরিষ্কার অনুভব করেছিলাম আমার ভেতর আলো জ্বলে উঠতে দেখেছিলাম এরপর আমি এই মজার এবং সবচেয়ে শান্ত উত্তরটা লিখেছি,

তাহলে তুমি কার সাথে কথা বলছ?

এরপর থেকে আমি এর অস্তিত্ব নিয়ে আর সন্দেহ করিনি। তাই সেই রাতে আমি আবার এই স্বরের কাছে যাই। ইটালি যাওয়ার পর সেদিন প্রথমবার আমি সেই কাজটা করলাম। আমি সেদিন যা লিখেছিলাম তা হলো, 'আমি দুর্বল এবং ভীত। একাকীত্ব আর বিষণ্নতা আবার দেখা দিয়েছে এবং আমার ভয় হচ্ছে এরা আর বিদায় নেবে না। আমি বলি, আমি আর ঔষধ খেতে চাই না কিন্তু ভয় পাচ্ছি আমার তা খেতে হবে। আমি ভীষণ শঙ্কিত যে আমি হয়ত আর আমার জীবন চালিয়ে নিতে পারব না।'

প্রত্যুত্তরে আমার ভেতরের কোথাও যেন একটা পরিচিত উপস্থিতি জেগে উঠেছিল। আবিষ্কার করেছিলাম, আমি বিপদে পড়লে অন্য কারো কাছে যে নিশ্চয়তা চাই আমি ঠিক তাই লিখছিলাম,

> 'আমি আছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার ইচ্ছা হলে সারারাত ধরে আমার কাছে কাঁদ। আমি তোমার পাশেই আছি, তুমি যদি ঔষধপত্র আবার চালিয়ে যেতে চাও তবে তাই কর। তবুও আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যদি তা না চাও তবুও আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যাই কর তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা অটুট থাকবে। তোমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি তোমাকে আগলে রাখব। তোমার মৃত্যুর পরও আমি তোমাকে আগলে রাখব। আমি বিষণ্নতার চেয়ে শক্তিশালী এবং একাকীত্বের চেয়েও সাহসী।'

সেই রাতে যখন আশেপাশে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই তখন এই অদ্ভুত আভ্যন্তরীণ বন্ধু রূপে নিজের এক অংশ দিয়ে নিজের অন্য অংশকে ঋণ দিয়েছিলাম। এতে নিউইয়র্কে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। একদিন খুব তাড়াহুড়ায় একটা অফিস বিল্ডিঙে লিফটের জন্য ভিড়ের মধ্যে চাপাচাপি করছিলাম। যখন তাতে দৌড়ে উঠতে গেছি, আমি নিজের একটা আকস্মিক প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলাম। সেই মুহূর্তে আমার মস্তিষ্ক একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল। চোখের নিমেষে এই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, 'হেই! তুমি কি তাকে চেন।' তোমার কোনো বন্ধু? এবং আমি আসলেই প্রতিবিম্বের দিকে হেসে ছুটে গিয়েছিলাম। সেই মেয়েটাকে অভিবাদন জানাতে যার মুখ আমার মনে আছে কিন্তু নাম মনে নেই। এক ঝলকে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় হেসে ফেলেছিলাম। আমার কুকুরের মতো সেই দ্বিধায়ও ভুগছিলাম যে, আয়না জিনিসটার কাজ কি? কিন্তু কিছু কারণে সেদিন রোমের সেই দুঃখের রাতে সেই ঘটনাটাই মনে পড়ে গিয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিল পৃষ্ঠার মাঝখানে আমি সেই শান্তির স্মারকই লিখছি,

কখনো ভুলো না, একদিন কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে তুমি তোমার প্রতিবিম্বকে তোমার বন্ধু ভেবে ভুল করেছিলে।

www.pathagar.org

নোটবুকের সেই সাম্প্রতিক নিশ্চয়তার পৃষ্ঠাটা খুলে তা বুকে চেপে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ঘুম ভেঙে বিষণ্নতার ধূমপানের ক্ষীণ গন্ধ পাই, কিন্তু তার নিজের তো সেখানে থাকার কথা। কিন্তু নেই। রাতেই সে উঠে কোথাও চলে গিয়েছিল। আর একাকীত্ব? সেও ছিল না।

১৯

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে রোমে যাওয়ার পর আমি আর যোগ ব্যায়াম করতে পারিনি। কয়েক বছর ধরে তো বেশ ভাল রকম অনুশীলনই করেছি। সেখানেও ব্যায়াম করার প্রচণ্ড ইচ্ছা নিয়ে মাদুরটা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে সেটা হচ্ছিল না, ব্যাস। মানে আমি কখন যোগাসন করব বলুন তো? চকলেট প্রেস্টি আর ডাবল ক্যাপোচিনোসহ একটা দুর্দান্ত ইটালিয়ান সকালের নাস্তার ঠিক আগে না পরে। প্রথম প্রথম সেখানে গিয়ে যোগাসনের মাদুরটা খুলেছিলাম, কিন্তু দেখেছিলাম আমি এর দিকে তাকিয়ে হাসা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। কোনো ব্যায়ামই এগুত না। একদিন আমি উচ্চস্বরে ইয়োগা মাদুর টাকে বলেছিলাম,

ঠিক আছে ছোট্ট সোনা আই কয়াত্রো ফরমাগি। দেখা যাক তোমার ভাগ্যে আজ কি আছে।

লজ্জার কথা এটা বলে আমি মাদুরটা আমার স্যুটকেসের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নাহ! বুঝেছিলাম, ভারত যাওয়ার আগে এটা আর খোলা হবে না। তারপর বাইরে বেরিয়ে পিস্তাচিও জিলেটো খেয়েছিলাম। ইটালিয়ানদের মতে এটা খাওয়ার উপযুক্ত সময় হচ্ছে সকাল নয়টা ত্রিশ মিনিট। সত্যি বলতে আমি তাদের সাথে একমত নই।

যতদূর বুঝতে পারি, রোমের সংস্কৃতির সাথে যোগের সংস্কৃতির কোনো মিল নেই। আমি মনে করি রোম এবং ইয়োগা এক জিনিস নয়। একটা ব্যাপারেই মিল আছে আর তা হলো, দুইটাই 'তোগা' (এক ধরনের পোশাক) শব্দটা মনে করিয়ে দেয়।

২০

প্রথম প্রথম আমার কিছু বন্ধুর দরকার ছিল এবং সেই খোঁজে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এরপর কিন্তু আমার এক ঝাঁক বন্ধু হয়ে যায়। এরপর রোমে আমি আমার পাশাপাশি আরও দুজন এলিজাবেথের সাথে পরিচিত হই। দুজনই লেখিকা। একজন

www.pathagar.org

ঔপন্যাসিক এবং আর একজন খাদ্য বিষয়ক লেখিকা। খাদ্য বিষয়ক লেখিকার রোমে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, আম্বিয়ায় বাড়ি আছে, ইটালিয়ান স্বামী আছে আর আছে এমন একটা চাকরি যেখানে তাকে ইটালির নানান জায়গা ঘুরে ঘুরে খাবার খেতে হয়, খাদ্য-প্রেমীদের জন্য লিখতে হয়। এসব দেখে মনে হয় দ্বিতীয় এলিজাবেথের অবশ্যই পূর্বজন্মে কর্মের জোর আছে। সে নিশ্চয়ই সে জন্মে এতিম বাচ্চাদের ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিল। তা নাহলে এত কপাল! স্বাভাবিকভাবেই রোমের কোথায় কি খাবার পাওয়া যায় তা তার মুখস্থ, যেমন 'জেলাটেরিয়া' যেখানে বরফ শীতল রাইস পুডিং পাওয়া যায়; এরকম জিনিস যদি স্বর্গে না পরিবেশন করা হয় তবে আমি সেখানে যেতে চাই না। সে একদিন আমাকে দুপুরের খাবার খেতে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা সেখানে শুধু ভেড়ার মাংসই না যা যা খেয়েছিলাম তা হলো, ট্রাফল, হেজেলনাট মুজ যার চারপাশ কারপাসিও দিয়ে প্যাঁচানো। তার সাথে একেবারে আলাদা একটা ছোট পরিবেশনা ছিল আচারি ল্যামপাছিউন। সেটা হলো একটা গুল্ম জাতীয় কন্দ।

আমার ভাষা-সঙ্গী দুজন, সেই চমৎকার যমজ দুই ভাই, জিয়েবানী আর দারিওর সাথেও আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। জিয়েবানী এত মিষ্টি যে তাকে আমার কাছে ইটালির গুপ্তধন বলে মনে হয়। প্রথম যে রাতে ওর সাথে দেখা হয় তখনই আমি চিরকালের জন্য মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যখন আমি ইটালিয়ান ভাষায় আমার দরকারি শব্দগুলো খুঁজে পেতাম না। হতাশ হয়ে পড়তাম। সে আমার বাহু চেপে ধরে বলত, নতুন কিছু শেখার সময় তোমাকে অনেক বিনয়ী হতে হবে, লিজ? তার গুরুগম্ভীর ভ্রূ, দার্শনিক মতাদর্শ এবং তার রাশভারী রাজনৈতিক মতামতের জন্য মাঝে মাঝে তাকে আমার চেয়ে বড় মনে হতো। আমি তাকে হাসাতে চেষ্টা করতাম কিন্তু আমার কৌতুক জিয়েবানি ধরতে পারত না। অন্য আর একটা ভাষায় কৌতুক ধরতে পারা কষ্টকর আর যেখানে ব্যক্তি, জিয়েবানির মতো গম্ভীর। এক রাতে সে আমাকে বলেছিল, 'তুমি যখন মজা করে কথা বল আমি কিছুই বুঝতে পারি না, আমি যেন পিছিয়ে পড়ি। যেমন তুমি বজ্রপাতের পর দ্রুত আলোর ঝলকানি আর আমি তার শ্লথ শব্দ।'

আমিও মনে মনে বলছিলাম, 'হ্যাঁ সোনা! এবং তুমি চুম্বক আর আমি লোহা। তোমার সবটুকু নিয়ে আমার কাছে এসে আমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও না।'

কিন্তু তখনো সে আমাকে চুমু খায়নি।

সোফির সাথে চুটিয়ে সময় কাটায় বলে দারিওকে তো দেখাই যেত না। সোফি আমার ভাষা স্কুলের খুব ভাল বন্ধু। দারিওর জায়গায় থাকলে আপনিও সোফির সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। সে মেয়েটাই এমন। সোফি সুইডিশ, বিশের কোঠায়। ও এত বেশি লাবণ্যময়ী একটা মেয়ে যে ওকে হুকে টোপ হিসেবে টাঙিয়ে অনায়াসে যে কোনো বয়সের, যে কোনো জাতির পুরুষকে ফাঁদে ফেলা যাবে। সোফি তার পরিবারকে ভয়ের মুখে রেখে, সহকর্মীদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে একটা সুইডিশ ব্যাংক থেকে চার মাসের ছুটি নিয়ে ইটালি গিয়েছিল শুধু সুন্দর করে ইটালি ভাষা শিখতে। প্রতিদিন ক্লাস শেষ করে সোফি আর আমি তিবারের তীরে বসে পড়াশোনা করতাম। নাহ পড়াশোনা না শব্দটা এখানে হবে ইটালি ভাষার রস আস্বাদন করতাম।

www.pathagar.org

একেবারে পূজার আচার অনুষ্ঠানের মতো। আমরা প্রায়ই একে অপরকে নতুন প্রবাদ প্রবচন শেখাতাম। যেমন এক ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম আন আম ইকা স্টেট মানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু স্টেট মানে বোঝায় আঁটসাঁট, যেমন একটা আঁটসাঁট পোশাক। তাই ইটালিয়ান ভাষায় এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে বোঝায় যাকে আঁটসাঁট করে পরিধান করা যায়, যে চামড়ার সাথে আরামপ্রদভাবে সেঁটে থাকে এবং আমার সুইডিশ বান্ধবী সোফি আমার কাছে ঠিক তেমন কিছুই হয়ে উঠেছিল।

প্রথম প্রথম আমি ভাবতাম আমাকে আর সোফিকে বোনের মতো দেখায়। কদিন পর আমরা রোমে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলাম এবং গাড়ি চালক আমাকে প্রশ্ন করেছিল সোফি আমার মেয়ে কিনা। কি জাতি! মেয়েটা আমার চেয়ে মাত্র সাত বছরের ছোট। আমার মন তখন স্থির হয়ে ভাবছিল লোকটা আসলে কি বলছে। তাৎক্ষণিকভাবে আমি ভেবেছিলাম লোকটা হয়ত স্থানীয় রোমান ক্যাব চালক ভালোভাবে ইটালি বলতে পারে না তাই হয়ত বোঝাতে পারছে না সে হয়ত বোনই বোঝাতে চাচ্ছে। কিন্তু না 'সে মেয়ে বলেছিল এবং মেয়েই বুঝিয়েছিল। ওহ হো! আমি আর কি বলতে পারতাম? গত কয়েক বছর আমার ওপর দিয়ে যে ঝড় গেছে। আমাকে নিশ্চয়ই অনেক মারমুখী ও বয়স্ক দেখাচ্ছিল। আর জানেন তার সাথে তাল রেখে গাড়িতে টেক্সাস এর পশ্চিমা দেশাত্মবোধক গানটা বাজছিল- আমি মাতাল, আমি দোষী, আমি কলঙ্কিনী। তবু দেখ তোমার সামনেই আছি দাঁড়িয়ে।

মারিয়া এবং জিওলিও নামে এক দম্পতির সাথেও আমার চমৎকার বন্ধুত্ব হয়েছিল। এনি আমাকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এনি একজন আমেরিকান চিত্রশিল্পী। কয়েক বছর হয় রোমে এসেছে। মারিয়া আমেরিকান আর জিওলিও দক্ষিণ ইটালির। জিওলিও একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা, আর মারিয়া একটা আন্তর্জাতিক কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। জিওলিও ভাল ইংরেজি বলতে পারে না আর মারিয়া গড়গড় করে ইটালি ভাষা বলতে পারে। পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ এবং চাইনিজও। এই যে জিওলিও ভাল ইংরেজি বলতে পারে না তাই আমাকে অনুরোধ করেছিল আমি যাতে তার সাথে ভাষা বিনিময় চর্চা করি। আপনি হয়ত অবাক হচ্ছেন কেন সে তার স্ত্রী যে কিনা জন্মগতভাবে আমেরিকান তার কাছ থেকে ইংরেজি ভাষাটা শিখছে না। কারণটা হচ্ছে তারা বিবাহিত। একজন আর একজনকে কিছু শেখাতে গেলেই ঝগড়া বেঁধে যায়। তাই জিওলিও আর আমি দুসপ্তাহ ধরে দুপুরের খাবারের সময় দেখা করতে যেতাম। আমাদের ইংরেজি আর ইটালিয়ান অনুশীলন করতাম। তেমন দুজন মানুষের জন্য এটা একটা ভাল কাজ যাদের কেউ কাউকে বিরক্ত করার কোনো ইতিহাস নেই।

জিওলিও আর মারিয়ার খুব সুন্দর একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি সেই দেয়ালটা দেখে যেখানে মারিয়া গালাগাল করে নানান কিছু লিখে ভরে ফেলেছিল। ঘন কালো ঝিকিমিকি কালি দিয়ে হিজিবিজি করে। কারণ তাদের সে সময় একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হয়েছিল তা ছিল, 'সে আমার থেকে বেশি চেঁচায়।' এবং মারিয়া নিজেও এর পাশাপাশি নিজের বক্তব্য রাখতে চেয়েছিল তাই, দেয়াল লিখন।

আমার ধারণা মারিয়া মারাত্মক রকম যৌন আবেদনময়ী। তার আবেগের বিস্ফোরণ এই কথারই প্রমাণ দেয়। মজার ব্যাপার জিওলিও ব্যাপারটা দেখেছে

www.pathagar.org

মারিয়ার নিপীড়ন হিসেবে। কারণ সে এগুলো লিখেছিল ইটালিয়ান ভাষায় আর ইটালি হলো তার দ্বিতীয় ভাষা। যে ভাষায় তার কিছু লিখতে হলে কয়েক মুহূর্ত ভাবতে হয়। সে বলেছিল যদি মারিয়া তার রাগের মাথায় এসব লিখত। সে কখনোই রাগের কাছে পরাস্ত হয়নি কেননা সে একজন ভাল আংলো প্রটেস্টান্ট। তাহলে অবশ্যই তার মাতৃভাষায় লিখত। সে বলে সব আমেরিকানরাই এমন অবদমিত সত্তা লালন করে। যখন তারা ক্ষুব্ধ হয় তখন এই বিপজ্জনক এবং সম্ভবত সাংঘাতিক ক্ষতিকর সত্তা বের হয়ে আসে।

'একজন বর্বর মানুষ' জিওলিও পর্যালোচনা করে।

যা আমার দারুণ লেগেছে তা হলো, একটা আরামদায়ক রাতের খাবার শেষ করে সেই দেয়ালটার দিকে তাকিয়েই আমরা সবাই এই কথাগুলো আলোচনা করছিলাম।

এসব শুনেও মারিয়া জিজ্ঞেস করেছিল,

আরও একটু মদ দেব, জান?

কিন্তু ইটালিতে নতুনদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু অবশ্যই লুকা স্পেগেটি। এটা খুবই মজার ব্যাপার যে খোদ ইটালিতে কারো নামের শেষের অংশ স্পেগেটি। আমি লুকার কাছে কৃতজ্ঞ কেননা সে আমাকে শেষমেশ আমার সেই বন্ধুর সমতায় আনতে পেরেছে যার প্রতিবেশী একটা কিশোর যার নাম ডেনিশ হাহা। আমার সেই বন্ধুটা সব সময় গর্ব করত তার ডেনিশ মানে এমন খাবারের নামের একটা বন্ধু ছিল। যাক! শেষতক আমিও একটা প্রতিযোগিতা ছুঁড়ে দিতে পারব।

লুকা নিজেও খুব ভাল ইংরেজি বলে এবং ভাল খেতে পারে। ইটালিতে যাকে বলে, 'উনা বুওনা ফরচেটা' একটা ভাল কাঁটা চামচ। এ কারণে সে আমার মতো একজন খাদকের জন্য মারাত্মক উপযুক্ত সঙ্গী। সে প্রায়ই দিনের মধ্যভাগে আমাকে ফোন করে বলত, শোনো আমি তোমার বাসার কাছেই, চল এক কাপ কফি খেয়ে আসি, না হয় এক প্লেট ষাঁড়ের লেজ ভাজা? আমরা অনেকটা সময় রোমের ছিপছিপে গলির সেই নোংরা ঝুপড়িতে কাটাতাম। সেই টিমটিমে আলোর নামহীন দোকানগুলো পছন্দ করতাম। যেখানে লাল চেকের প্লাস্টিকের টেবেলক্লথ, হাতের তৈরি লিমনছেলো ওয়াইন, হাতের তৈরি রেড ওয়াইন, অবিশ্বাস্য পরিমাণের পাস্তা পরিবেশনা যাকে লুকা বলত- 'ছোট জুলিয়াস সিজার।'

লুকা একজন গর্বিত, শক্তিশালী, স্থানীয় মানুষ। যার হাতের পিঠে পশম, খুব যত্ন নিয়ে নকশা করে যে চুল আঁচড়ায়। একবার আমি লুকাকে বলেছিলাম, এখানকার মানুষগুলো নিজেদের প্রথমত রোমান ভাবে দ্বিতীয়ত ইটালিয়ান এবং তৃতীয়ত ইউরোপিয়ান হিসেবে ভাবে, তাই না। সে আমাকে শুধরে দিয়েছিল, 'না তারা প্রথমত রোমান, দ্বিতীয়ত রোমান এবং তৃতীয়ত রোমান এবং প্রত্যেকে ইউরোপিয়ান।

লুকা একজন আয়কর হিসাববিদ। তার মতে একজন ইটালিয়ান আয়কর হিসাববিদ 'একজন শিল্পী।' কেননা ইটালিয়ান আয়কর বইতে কমপক্ষে কয়েকশত আয়কর আইন তাই আয়কর দাখিলা নথিভুক্ত করতে বিচারপতির মতো প্রস্তুতি লাগে। আমার কাছে খুবই মজা লাগত যে, সে একজন আয়কর হিসাববিদ। কেননা তার মতো হাসিখুশি মানুষের জন্য এটা একটা কঠিন কাজ। আর এক দিকে লুকাও

www.pathagar.org

আমার একটা দিক নিয়ে মজা পেত। তা হলো আমার যোগব্যায়াম। যা সে কখনো দেখেনি। সে ভাবতেই পারত না আমি কেন ভারতবর্ষ যেতে চাই। সব ফেলে একটা আশ্রমে যেতে চাই। আমিতো চাইলে ইটালিতেই এক বছর থাকতে পারি, যেখানে আমাকে মানায়। যেখানে সে আমাকে পাতের শেষের ঝোলটুকুও বড় রুটির টুকরা দিয়ে মুছে খেতে দেখে। সে বলত, ভারতে গিয়ে তুমি কি খাবে? সাধারণত যখন আমি দ্বিতীয় মদের বোতলের ছিপি খুলতাম সে তখন খুবই দুষ্ট স্বরে আমাকে গান্ধীজী বলে ডাকত।

লুকা অনেক ভ্রমণ করেছে তবু তার দাবি ইটালি ছাড়া আর কোথাও সে থাকতে পারবে না। একজন ইটালিয়ান হয়ে তার মাকে ছেড়ে থাকতে সে কি ভাবে ভাবতে পারে! কিন্তু শুধু তার মাই তাকে ধরে রাখেনি। কিছুদিন হয় তার বয়স ত্রিশের কোঠায় পড়েছে। কিশোর কাল থেকে এখন পর্যন্ত তার একটাই প্রেমিকা। লাবণ্যময়ী জীওলীয়ানা, যার মিষ্টি সরলতায় মুগ্ধ হয়ে, স্নেহে এবং সঙ্গতভাবেই ডাকে 'একুয়া ই সাপনে'- 'সাবান এবং পানি।' বাল্যকাল থেকে তার একই বন্ধু বান্ধব এখনো আছে, আছে একই প্রতিবেশী। তারা প্রতি রবিবার একসাথে ফুটবল খেলা দেখে- হয় স্টেডিয়াম নয় মাঠে, যদি রোমান দল খেলে। তারপর তারা সবাই বাড়ি ফিরে আসে যেখানে তারা বড় হয়েছে। কেননা সেদিন তারা তাদের মা-নানি-দাদির হাতে রান্না করা খাবার খায়।

যদি আমি লুকা স্পেগেটি হতাম আমিও রোম থেকে নড়তে পারতাম না। লুকা কয়েকবার আমেরিকা গিয়েছিল। ভালোই লেগেছিল তার। তার মতে নিউইয়র্ক শহর মনোমুগ্ধকর কিন্তু সেখানে মানুষ বেশি কঠিন পরিশ্রম করে তবে দেখে মনে হয় কাজটা তারা উপভোগ করছে। যেখানে অতিরিক্ত কাজে রোমানরা বিরক্ত হয়। আমেরিকায় যেটা লুকা স্পেগেটি পছন্দ করেনি সেটা হলো খাবার। দুটি শব্দে যার বর্ণনা করা যাবে- আমত্রাক পিজ্জা।

প্রথমবার ভেড়ার ভুঁড়ি খাওয়ার সময় আমি লুকার সাথে ছিলাম। এটা রোমানদের বিশেষত্ব, এরা খাদ্য-জ্ঞানী। রোমানরা আসলে তাদের ঐতিহ্যবাহী অসভ্য খাদ্যাভ্যাসের জন্য খুব উগ্র একটা জাতি হিসেবে পরিচিত। যেখানে পৃথিবীর উত্তরের ধনী লোকেরা প্রাণীর শরীরের এই অংশটা ফেলে দেয়। সেখানে ইটালির অভিজাতদের এগুলো প্রিয় খাবার।

জিনিসটা কি জানার আগে আমার কাছে ভেড়ার ভুঁড়ি খেতে ভালোই লাগছিল। সেগুলো ঘন, মাখন দেওয়া এবং সুস্বাদু ঝোল দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছিল যা ছিল মারাত্মক মজা। কিন্তু ভুঁড়ি একরকম, মানে, ভুঁড়ির মতো যার গঠন। অনেকটা কলিজার মতো কিন্তু নরম। কিভাবে বর্ণনা করব তা যদি না ভাবতে থাকতাম তবে হয়ত আমি আরও ভালোভাবে খেতে পারতাম। আমার মনে হয়েছিল এটা দেখতে ভুঁড়ির মতো না অনেকটা ফিতা কৃমির মতো। তারপর আমি এটা একপাশে সরিয়ে রেখেছিলাম এবং সালাদ চেয়েছিলাম।

খাবারটা লুকার খুব পছন্দ। তাই জিজ্ঞেস করেছিল,

তোমার ভাল লাগেনি?

আমি বলেছিলাম,

www.pathagar.org

আমি বাজি ধরতে পারি গান্ধী তার সারা জীবনে ভুঁড়ি খাননি।

তিনি চাইলে খেতে পারতেন।

না তিনি খেতে পারতেন না। তিনি ছিলেন নিরামিষাশী।

লুকা জোর গলায় বলেছিল,

কিন্তু নিরামিষাশীরা এটা খেতে পারে। কারণ ভুঁড়ি কোনো মাংস না, লিভ। এগুলো মল-মূত্র।

২১

স্বীকার করছি মাঝে মাঝে অবাকই লাগত সেখানে আমি কি করছিলাম।

ইটালিতে আমি আনন্দ পেতে গিয়েছিলাম। প্রথম কয়েক সপ্তাহে আমি ভয় পাচ্ছিলাম কিভাবে তা আমি পাব! সত্যি বলতে খাঁটি আনন্দ পাওয়া আমাদের সংস্কৃতিতেই নেই। আমি একটা অতি সচেতন বংশধারা থেকে এসেছি। আমার মায়ের বংশ হচ্ছে সুইডিশ কৃষক। যাদের ছবি দেখলে ভাববেন ঈশ যদি কিছু আনন্দময় পরিবেশ তারা পেত, তাহলে হয়ত তাদের জুতোসহই দ্রুত তার দিকে ছুটে যেত। আমার চাচা আমার মায়ের বংশের সবাইকে বলে ষাঁড়ের পাল। আমার বাবার দিকের পরিবার হচ্ছে ইংরেজ পিউরিটান, যারা বোকাসোকা এবং হাসি ঠাট্টার জন্য এক পায়ে দাঁড়ানো। আমি যদি আমার বাবার বংশের সতেরো শতকের দিকে ফিরে তাকাই তবে আসলেই পিউরিটান কিছু আত্মীয় স্বজন খুঁজে পাব যাদের নাম ডিলিগেন্স বা মিকিনেস।

আমার নিজের বাবা মায়ের নিজস্ব খামার আছে এবং আমি ও আমার বোন যেখানে কাজ করে বড় হয়েছি। আমরা নির্ভরশীল, দায়িত্ববান, স্কুলে সেরা এবং সাংগঠনিক। শহরের সবচেয়ে ভাল বাচ্চা পালনকারী হতে শিখেছি। আমরা ছিলাম আমাদের সেবিকা, কৃষক, কর্মঠ মায়ের ছোট সংস্করণ। এক জোড়া সুইস আর্মি-ছুরি যারা নানান ধরনের কাজে পারদর্শী। আমরা আমাদের পরিবারে অনেক মজা করেছি, অনেক হেসেছি, কিন্তু দেয়ালে কর্মতালিকায় বোঝাই থাকত এবং আমার কখনোই অলসতার অভিজ্ঞতা হয়নি বা আমি তা দেখিনি। আমার পুরো জীবনে একবারের জন্যও না।

সাধারণভাবে বলা যায় আমেরিকানরা বিশুদ্ধ শান্তিতে আরাম করতে অসমর্থ। আমরা বিনোদন-প্রিয় জাতি, কিন্তু আনন্দ খোঁজার প্রয়োজন বোধ করিনি কখনো। আমেরিকানরা বিনোদনের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন খরচ করে। পর্ণ থেকে শুরু করে পার্ক, পার্ক থেকে শুরু করে যুদ্ধে। কিন্তু সেগুলো আসলে ঠিক আনন্দ না। পুরো পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে আমেরিকানরা কাজ করে অনেক বেশি। শ্রম দিয়ে, সময় দিয়ে এবং অনেক চাপের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু লুকার অভিমত অনুযায়ী আমাদের দেখেই মনে হয় আমরা তা পছন্দ করি। এই পর্যবেক্ষণের পরিসংখ্যান

www.pathagar.org

বিপজ্জনক, কারণ তাতেই বোঝা যায় অনেক আমেরিকানরাই বাড়িতে থাকার চেয়ে তাদের অফিসে কাজ করতে বেশি পছন্দ করে। অবশ্যই আমাদের সবার কঠোর পরিশ্রম করতেই হয়, তারপর আমরা কাজ করতে করতে শেষ হয়ে যাই তারপর সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনগুলো পাজামাতেই কাটাই। প্যাকেট থেকে সরাসরি ঢেলে কর্নফ্লেক্স খাই আর এভাবে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকি যেন আমরা কোমায় চলে যাওয়া রোগী। হ্যাঁ এগুলো কাজ করার বিপরীত কিন্তু আনন্দের মতো কোনো কাজ নয়। আমেরিকানরা আসলে জানে না কিছু না করা কি জিনিস। এর কারণ মহান আমেরিকান ছাঁচ। অতি পরিশ্রমী যোদ্ধা, যারা ছুটিতে যায় ঠিক কিন্তু তারা আরাম করতে পারে না।

আমি একবার লুকা স্পেগেটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইটালিয়ানরাও কি ছুটিতে গেলে একই সমস্যায় পড়ে নাকি। সে এত জোরে হেসেছিলে যে ফোয়ারার পাশে মোটরবাইক নিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। সে বলেছিল,

আরে না। আমরা 'বেল ফার নিয়েন্ত' এ ওস্তাদ।

খুব সুন্দর অভিব্যক্তি। বেল ফার নিয়েন্ত মানে 'কিছু না করার শিল্প।' এখন শোনেন, জাতিগত ভাবেই ইটালিয়ানরা অনেক পরিশ্রমী। বিশেষ করে বহুদিন ধরে ভোগা সেই শ্রমিক পেশার জন্য যাকে বলে ব্রাচ্ছিতান্তি। বহুলভাবে খ্যাত কারণ তাদের বাহুতে পশুর মতো শক্তি, যাকে বলে 'ব্রাচ্ছি,' যা তাদের এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। কিন্তু সেই কঠোর পরিশ্রমের বিপরীতে বেল ফার নিয়েন্ত সব সময় ইটালির লালিত আদর্শ। কিছু না করার শিল্পই সকল কাজের লক্ষ্যবস্তু। উচ্চতর অভিনন্দিত হওয়ার চূড়ান্ত সম্পাদনা। যত সূক্ষ্ম এবং আনন্দের সাথে আপনি কিছুই না করতে পারবেন, তত বেশি আপনি জীবনে অর্জন করবেন। এটা করতে আপনাকে ধনী হতে হবে না। আর একটা চমৎকার ইটালিয়ান অভিব্যক্তি আছে 'আই আরত ডি এরাঞ্জাইয়াছি।' তেমন কোনো কিছু নয় তবু তা থেকে চমৎকার কিছু করা। সহজ কিছু উপাদান দিয়ে কিংবা অল্প কিছু বন্ধু নিয়ে একটা উৎসব তৈরি করার শিল্প। শুধু ধনী নয়, সুখের কৌশল জানে এমন দক্ষ যে কেউ এটা করতে পারবে।

আমার ক্ষেত্রে শান্তি খুঁজে পাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পিউরিটান বদ্ধমূল পাপবোধ। আমি ভাবি, আমি কি আসলেই এই শান্তির যোগ্য? সমস্যাটা আমেরিকান হওয়ার কারণেও। সুখ খুঁজে পাব কিনা এ ব্যাপারে নিরাপত্তা-বোধের অভাব। আমেরিকার বিজ্ঞাপন বিশ্ব তাদের সবসময় প্রদক্ষিণ করছে। অনিশ্চিত কাস্টমদের পুরোপুরি বাগে আনছে। বোঝাচ্ছে যে হ্যাঁ আপনি খুব ভাল কিছু পেতে যাচ্ছেন। অনেক হয়েছে সোনা। এবার একটু থামুন। বিয়ারের এই বান্ডিলটা আপনার জন্যই! কারণ আপনার তা পাওনা! এবং অনিশ্চিত ভোক্তারা ভাবে 'হ্যাঁ তাইতো। ধন্যবাদ! আমি আজ ছয়টা বিয়ারের একটা বান্ডিল নিচ্ছি। হয়ত দুটি নিচ্ছি।' এবং এরপর একটা প্রতিক্রিয়ামূলক পান উৎসব চালু হয়। তারপর আসে অনুশোচনা। এধরনের বিজ্ঞাপনদাতারা ইটালিতে কার্যকর কিছু করতে পারবে না। কারণ যারা রীতিমত এটা জানেই আনন্দ করাই এই জীবনের লক্ষ্য। 'তোমার আজ ছুটি দরকার' এই কথার প্রত্যুত্তর ইটালিতে যা হবে তা হলো, 'হ্যাঁ কোনো সন্দেহ নাই, একারণেই আমি আজ সন্ধ্যায় ছুটি নিতে চাই, যাতে তোমার বউয়ের সাথে শুতে তোমার বাড়ি যেতে পারি।'

www.pathagar.org

তাই হয়ত ইটালিতে প্রথম গিয়ে আমি যখন ইটালিয়ান বন্ধুদের বলেছিলাম আমি তাদের দেশে গিয়েছি চার মাসের বিশুদ্ধ আনন্দ পেতে, তারা তা শুনে ঝোলাঝোলি করেনি।

বরং তারা এগিয়ে এসে বলেছিল,

কমপ্লিমেন্তি! ভাই আবন্তি! মানে, 'অভিনন্দন। যাও। নিজেকে প্রকাশ কর। আমাদের মেহমান হও।'

কেউ একবারও বলেনি, 'কী দায়িত্বহীনই না তুমি! বা কি স্বার্থপর বিলাসিতা।' কিন্তু যেখানে খোদ ইটালিয়ানরা আমাকে অনুমতি দিয়েছে উপভোগ করতে সেখানে আমি থামতে পারিনি। ইটালিতে যাওয়ার প্রথম কয়েক সপ্তাহে এ ব্যাপারে আমার সমস্ত প্রতিবাদী সহযোগীরা নিরাশার সাথে হা হা করে উঠেছিল, 'একি! কাজ খুঁজছ নাকি!' আমি আনন্দ এভাবে পেতে চাইতাম যেন স্কুলের বাড়ির কাজ করছি কিংবা বিশাল কোনো বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করছি। আমি এমন প্রশ্ন করতাম, 'কিভাবে সবচেয়ে ভাল ভাবে বেশি বেশি আনন্দ পাওয়া যায়?' ভাবতে ভয়ই হয় এর উত্তর খুঁজতে হয়ত আমাকে পুরো দিন ইটালির লাইব্রেরিতে কাটাতে হতো, আনন্দের ইতিহাসের ওপর গবেষণা করতে হতো কিংবা আমি হয়ত ইটালিয়ানদের সাক্ষাৎকার নিতাম যারা জীবনে অনেক আনন্দ করেছে। জিজ্ঞেস করতাম শান্তি জিনিসটা কেমন লাগে। তারপর তা নিয়ে একটা কলাম লিখতাম। এক ইঞ্চি মার্জিন আর দ্বিগুণ স্পেস দিয়ে, যেটা সোমবারের কাগজের প্রধান বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়ে যেত?

কিন্তু যখন আমি বুঝতে পারলাম প্রশ্নটা আসলে দাঁড়ায়, 'আমি কিভাবে আনন্দকে ব্যাখ্যা করব?' এবং আসলেই আমি এমন এক দেশে ছিলাম যেখানে এই প্রশ্নের গায়ে হাওয়া লাগানোর অনুমতি আছে। তখন সব বদলে গিয়েছিল, সব মজাদার হয়ে গিয়েছিল। আমি নিজেকে প্রতিদিন যা জিজ্ঞেস করতাম তা হলো, 'তোমার আজ কি করতে ভাল লাগবে লিজ? এখন কি তোমাকে আনন্দ দেবে?' এক্ষেত্রে কারো কোনো বিষয়ের তালিকা বিবেচনা করতে হয় না বা কারো নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। এই প্রশ্নগুলো শেষমেশ হয়ে গিয়েছিল বিশুদ্ধ এবং নিজের জন্যই নির্দিষ্ট।

এটা মজার বিষয় যে নিজের অভিজ্ঞতা উপভোগ করার ওপর শাসন করার যে ক্ষমতা এক সময় নিজেকে দিয়েছিলাম, ইটালিতে এসে তা কেড়ে নিয়েছিলাম। ইটালিতে আনন্দ লাভের অনেক কিছু আছে আমি সব কিছুর উদাহরণ দিতে পারছি না। হয় এখানে আপনি একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ বেছে নিতে পারেন নয়তো আপনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে পারেন কি করবেন ভেবে না পেয়ে। এই কারণে আমি ফ্যাশন শোতে কিংবা অপেরা কিংবা সিনেমা কিংবা সুন্দর গাড়ি, কিংবা আল্পস পর্বতে চড়তে যাইনি। এমনকি আমি শিল্পকর্ম দেখতেও বিশেষ যাইনি। স্বীকার করতে কিছুটা লজ্জা লাগছে ইটালি থাকাকালীন চার মাসে আমি একদিনও কোনো জাদুঘরে যাইনি। কি আর বলব এর চেয়ে খারাপ লাগছে স্বীকার করতে একটা জাদুঘরেই আমি গিয়েছিলাম আর সেটা হলো পাস্তার জাতীয় জাদুঘর। আমি আবিষ্কার করেছিলাম আমি আসলে যা চাই তা হলো মজাদার খাবার খাওয়া আর যতটা সুন্দর করে পারা যায় ইটালি ভাষা বলা। ঠিক তাই। আমি দুটি মূল বিষয় নিয়েছিলাম আর তা হলো খাওয়া আর ইটালি ভাষা। জীলাটো তে মনোযোগ দেওয়া।

www.pathagar.org

এই খাওয়া ও কথা বলায় আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা অমূল্য কিন্তু খুব সাধারণ। অক্টোবরের মাঝামাঝি কিছু ঘন্টা আমি এভাবে কাটিয়েছি যা বাইরে থেকে দেখলে স্বাভাবিকই মনে হবে কিন্তু যা আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুখি মুহূর্তের একটা হিসেবে গণনা করি। আমার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে আমি একটা বাজার পেয়েছিলাম যা আগে কখনো খেয়াল করিনি। মাত্র কয়েক গলি পরই ছিল সেটা। সেখানে আমি একটা ছোট সবজির দোকান দেখতে পেয়েছিলাম। একজন ইটালিয়ান মহিলা আর আর তার ছেলে তাদের উৎপাদিত কিছু জিনিস বিক্রি করতো সেখানে। তাজা হালকা সবুজ রঙের পালং শাক, টমাটো এত লাল যে দেখে মনে হয় গরুর শরীরের অংশ, এবং শ্যাম্পেন রঙ্গা আঙুর, চামড়া এমন আঁটসাঁট যেন বেলে নাচের মেয়েদের পোশাক পরে ছিল সেগুলো।

আমি চিকন, হালকা সবুজ কিছু এসপারাগাস বেছে নিয়ে সাবলীল ইটালিয়ান ভাষায় মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করতে পেরেছিলাম,

আমি কি এই এসপারাগাসের অর্ধেকটুকু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি? আমার এত লাগবে না। আমি একা।

সে দ্রুত আমার হাত থেকে এসপারাগাসগুলো নিয়ে অর্ধেক করে দিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রতিদিন সকাল সাতটায় আমি কি দোকানটা খোলা পাব? তারপর তার দেখতে সুন্দর ছেলেটা আমার দিকে একটা চতুর দৃষ্টি দিয়ে বলেছিল,

ঠিক আছে আমরা চেষ্টা করব সেই সময় খুলতে।

আমরা সবাই হেসে ফেলেছিলাম। এই পুরো কথোপকথন হয়েছিল ইটালিয়ান ভাষায় মাত্র কিছুদিন আগেও যা আমি ভালোভাবে পারতাম না।

আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে হেঁটে হেঁটে ফিরেছিলাম এবং এক জোড়া বাদামি ডিম সেদ্ধ করেছিলাম দুপুরের আহারের জন্য। ডিমগুলো খোসা ছাড়িয়ে একটা প্লেটে আমি সেই সাত টুকরো এসপারাগাসের পাশে রেখেছিলাম। যেগুলো এত চিকন এবং তুলতুলে ছিল যে রান্না করার দরকার হয়নি। আমি প্লেটে কিছু জলপাই রেখেছিলাম এবং চার টুকরা ছাগলের দুধের পনির যেটা তার আগের দিন আমি ফরমাগেরিয়ার রাস্তার পাশ থেকে কিনেছিলাম, আর দুই টুকরা গোলাপি তৈলাক্ত স্যালমন মাছ। আর মিষ্টি মুখের জন্য একটা লাবণ্যময়ী পিচফল। যেটা সেই বাজারের মহিলাটা আমাকে বিনামূল্যে দিয়েছিল। পিচটা রোমান সূর্যের আলোর জন্য তখনো গরম ছিল। বহুদিন ধরে আমি এমন একটা দুপুরের খাবার ছুঁইনি। সেটা ছিল আমার কাছে সেরা কিছু। একটা খাঁটি শিল্পের প্রকাশ, একদম সাধারণ কিছু থেকে অসাধারণ কিছু তৈরি করা। শেষমেশ আমার খাবারের পুরো সৌন্দর্য আমি চোখ দিয়ে ভোগ করা শেষ করে, রোদের মধ্যে, পরিষ্কার কাঠের মেঝেতে বসে, আমার আঙুল দিয়ে প্রতিটা অংশ কামড়ে খেয়েছিলাম। সাথে ইটালিয়ান দৈনিক পত্রিকা পড়ছিলাম। আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুখ দৌড়চ্ছিল।

তখনো সেখানে যাওয়ার প্রথম সপ্তাহগুলোতে, আমার অপরাধ বোধ বিপদসংকেত দিতে শুরু করত। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার বিগত স্বামী আমার কানের কাছে ঘৃণা নিয়ে বলছে,

www.pathagar.org

তাহলেই এগুলোই সব, যার জন্য তুমি এতকিছু ছেড়ে দিয়েছ? একারণেই তুমি আমাদের দুজনের একসাথে থাকা জীবনটাকে লোপাট করে দিয়েছ? কয়েক টুকরা এসপারাগাস আর একটা ইটালিয়ান দৈনিক পত্রিকার জন্য।

আমি উচ্চস্বরে উত্তর দিয়েছিলাম,

প্রথমত আমি দুঃখিত। কিন্তু এটা আর তোমার মাথা ঘামানোর বিষয় না। আর দ্বিতীয়ত তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে বলতে হয়, 'হ্যাঁ এগুলোর জন্যই।'

২২

ইটালিতে আমার আনন্দের উপকরণ খুঁজে নেওয়ার একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা খুবই দরকার আর তা হলো, যৌনতা?

সহজভাবে বলতে গেলে আমি এরকম কিছু চাইনি সেখানে থাকাকালীন সময়ে। আরও সৎভাবে ও ব্যাপকভাবে বলতে গেলে– হ্যাঁ অবশ্যই মাঝে মাঝে আমার খুব কামনা জাগত। তবে কিছুদিনের জন্য এই খেলা থেকে আমি বাইরে থাকতে চেয়েছিলাম। আমি কারও সাথে জড়াতে চাচ্ছিলাম না। অবশ্যই চুমু খাওয়ার অভাব বোধ করতাম। চুমু খেতে আমার খুব ভাল লাগে। আমি সোফির কাছে এ নিয়ে অভিযোগও করেছিলাম। শেষমেশ এর পরের দিন সে অঙ্গভঙ্গি করে বলেছিল, 'ওহহো লিজ তোমার অবস্থা আরও খারাপের দিকে গড়ালে আমাকে বল। আমিই না হয় তোমাকে চুমু খাব।' কিন্তু এ-ব্যাপারে তখন আমি কিছুই করতে রাজী ছিলাম না। তখন একা লাগলে আমি ভাবতাম, 'একা হয়ে যাও লিজ। নিজের একাকীত্ব থেকে শেখ। এর মানচিত্র তৈরি কর। জীবনে একবার এর সাথে বস। মানব জীবনের এই অভিজ্ঞতাকে স্বাগত জানাও। কিন্তু কখনো নিজের অপূর্ণতার আর্তচিৎকার থেকে কাউকে খামচানোর প্রবৃত্তি জাগলে, সেই প্রবৃত্তি পূরণের জন্য কারো আবেগ বা শরীর ব্যবহার করো না।'

অন্য কিছু নয়, আমার জীবন রক্ষার জন্য এই পদ্ধতিটা তখন জরুরী। খুব কম বয়স থেকেই প্রেম ও যৌনতা খুঁজে ফিরেছিলাম আমি। বয়ঃসন্ধির শুরুতেই আমার প্রথম প্রেমিক জুটে গিয়েছিল, এবং পনেরো বছর থেকে আমার সারা জীবন আমার প্রেমিক হিসেবে একটা ছেলে কিংবা একজন পুরুষ থেকেছেই। কখনো দুটোও থেকেছে এক সাথে। সেটা শুরু হয়েছিল প্রায় উনিশ বছর আগে। তো প্রায় দুই দশক ধরে আমি একেক ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করতে পাল্লা দিয়েছি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে। একটার পর একটা, একজন প্রেমিকের পর কখনোই এক দু সপ্তাহ খালি যায়নি। কেউ না কেউ চলে এসেছে আমার জীবনে। আমার কিছুই করার ছিল না তবে আমার মনে হয় আমার পরিণত হওয়ার পথে এগুলো দরকারিই ছিল।

এছাড়া আমার পুরুষের ভেতর বন্দি হয়ে যাওয়ার সমস্যা আছে। কিংবা এটা বলা হয়ত উচিত না তবু সত্য যে, প্রথম দিকে একজনের অবশ্যই সীমানা থাকতে হয়–তাই না? কিন্তু আমি যাকে ভালোবাসি তার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাই। আমি একটা

www.pathagar.org

ভেদ্য ঝিল্লি। আমি যদি আপনাকে ভালোবাসি, সব আপনার। আমার সময়, আমার ত্যাগ, আমার টাকা, আমার পরিবার, আমার কুকুর, আমার কুকুরের টাকা, আমার কুকুরের সময়, সব। আমি যদি আপনাকে ভালোবাসি আপনার সকল দুঃখ আমি বহন করব। আমি আপনার সকল প্রকার ঋণ গ্রহণ করব। আমি আপনাকে নিরাপত্তাহীনতা থেকে রক্ষা করব। সৎ গুণাবলী চর্চা করাব এবং আমি আপনার পুরো পরিবারের জন্য বড়দিনের উপহার কিনে দেব। আমি আপনাকে সূর্য ও বৃষ্টি দেব। আর যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে আমি আপনাকে তপ্ত গাল ও ভেজা গাল দেব। আমি এসব দেব এর চেয়েও বেশি দেব যে পর্যন্ত না আমি পুরোপুরি গ্রাস হয়ে যাই। এটাই আমার সেরে ওঠার একমাত্র উপায় যখন আমি কারো প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি।

আমি খুব গর্বের সাথে নিজের ব্যাপারগুলো দেখছি না কিন্তু, আসলে এরকমই হয়েছে প্রতিবার।

আমার স্বামীকে ছেড়ে আসার কিছুদিন পর। একটা অনুষ্ঠানে একজন স্বল্পপরিচিত লোক আমাকে বলেছিল,

জানো নতুন প্রেমিকের সাথে থাকাতে তোমাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। আগে তোমাকে তোমার বরের মতো লাগত কিন্তু এখন তোমাকে ডেভিডের মতো লাগছে। এমনকি তুমি তার মতো পোশাক পরেছ এবং তার মতই কথা বলছ। জানো তো মাঝে মাঝে মানুষকে তার কুকুরের মতো দেখায়? আমার ধারণা তোমাকে সব সময় তোমার প্রেমিকের মতো দেখায়।

তখন আমার আফসোস হতো। ঈশ্বরকে বলতাম, 'প্রিয় ঈশ্বর আমি কি এই চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারি! কিছু সময় নিজের মতো করে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারি আসলে আমি কেমন দেখতে এবং কেমন করে কথা বলি যখন কারো সাথে সেভাবে না মিশি।' আর সত্য বলতে এটা আমার মানবিক দায়িত্ব কিছু সময়ের জন্য নিজেকে পুরুষের ঘনিষ্ঠতা মুক্ত করা। আমার প্রেমের স্মৃতিচারণ করলে খুব একটা ভাল কিছু পাওয়া যাবে না। একটার পর একটা বিপত্তিই ছিল। কত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পুরুষকেই না আমি ভালোবাসতে চেয়েছি আমার জীবনে এবং ব্যর্থ হতে থেকেছি। এক দিকে ভাবতে গেলে আপনি যদি পরপর দশটা সড়ক দুর্ঘটনা করেন তাহলে কি কর্তৃপক্ষ আপনার লাইসেন্স কেড়ে নেবে না? আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করছেন এমনই তো মনে হবে। তাই না?

একটা শেষ কারণ যে জন্য আমি কোনো পুরুষের সাথে জড়াতে চাচ্ছিলাম না, তা হচ্ছে, আমি তখনো ডেভিডের প্রতি প্রেম বোধ করতাম। তাই অন্য কোনো পুরুষ আমার কাছে যাওয়া তখন আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছিল না। আমি আসলে তখনো নিশ্চিত ছিলাম না ডেভিড আর আমার সাথে সব কিছু ভেঙে গেছে কি না। ইটালি যাওয়ার আগেও আমি আর ডেভিড খুব ঘোরাঘুরি করেছি, যদিও আমরা বহুদিন একসাথে শুইনি। কিন্তু আমরা দুজনই মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করতাম যে, হয়ত কখনো আবার...

তখন এতশত জানতাম না, শুধু এইটুকুই জানতাম, বাজে রকম পছন্দ আর এলোমেলো ইচ্ছার ক্রমাগত বিপদে আমি মানিয়ে গিয়েছিলাম। ইটালিতে যাওয়ার সময় আমার শরীর ও মনের শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। বরগা চাষিদের জমির মতো

www.pathagar.org

মনে হতো নিজেকে। বাজেভাবে অতি কর্ষণ করা হয়েছে যেটার এবং যার একটা পতিত ঋতু দরকার।

বিশ্বাস করুন, আমি বুঝতাম। একটা নিজে নিজে বানানো কুমারিত্ব নিয়ে ইটালিতে আনন্দ খুঁজতে যাওয়াটা হাস্যকর। আমি তা ভালোভাবেই বুঝতাম। কিন্তু আমি মনে করি একটা বিরতি সবচেয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ছিল সেই সময়ে। সে ব্যাপারে আমি আরও নিশ্চিত হই যখন একদিন আমার ওপরতলার প্রতিবেশীর বাসা থেকে শব্দ শুনতে পাই। খুব সুন্দর একটা ইটালিয়ান মেয়ে যার দারুণ সব উঁচু জুতার সমাহার ছিল, যার ঘর থেকে দীর্ঘ সময় যাবত, উচ্চস্বরে, চুমুর মাংসল চটকদার, বিছানা দাপানো শব্দ, দুমড়ানো মোচড়ানোর প্রেমোৎসবের শব্দ আসছিল। এমন কখনো শুনিনি। একেবারে নতুন ভাগ্যবান অতিথির সাথে হয়ত এসব হচ্ছিল। মেঝেতে সেই ধ্রুপদী নৃত্য প্রায় ঘণ্টা ব্যাপী চলছিল এবং ফিসফিসে শব্দে এবং বন্য পশুর ডাকে যার সমাপ্তি হয়েছিল। আমি যার মাত্র এক তলা নিচে, একা এবং ক্লান্ত হয়ে আমার খাটে শুয়েছিলাম। এবং আমি যা ভেবেছিলাম তা হলো, কি ভয়াবহ পরিশ্রমটাই না গেছে মেয়েটার।

অবশ্যই আমার মাঝে মাঝে কামনা জাগত। আমি প্রতিদিন ডজন খানেক ইটালিয়ান পুরুষের পাশে হেঁটে বেড়াতাম যাদের খুব সহজেই আমি আমার বিছানায় ভাবতে পারতাম কিংবা তাদের বিছানায়, যেটাই হোক। আমার চোখে ইটালিয়ান পুরুষরা হাস্যকর রকম, জঘন্য-রকম, বোকার মতন সুন্দর। সত্য বলতে ইটালিয়ান নারীদের চেয়েও সুন্দর। ইটালিয়ান পুরুষরা তেমনই সুন্দর যেমন ফ্রেঞ্চ মেয়েরা সুন্দর। বলা হয় পরিপূর্ণ সুন্দরের কোনো ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তারা দেখতে আদুরে কুকুর ছানার মতো। মাঝে মাঝে এত সুন্দর দেখতে কিছু পুরুষ দেখেছিলাম যে আমি প্রশংসা না করে পারিনি। সেখানকার পুরুষদের সৌন্দর্য আমাকে বাধ্য করে প্রেমের মহাকাব্য থেকে তাদের তুলনা তুলে আনতে। তারা শয়তানী শক্তির আকর্ষক কিংবা নিষ্ঠুর সুদর্শন কিংবা অবিশ্বাস্য পৌরুষ্যের অধিকারী।

যেভাবেই হোক, স্বীকার করতেই হয় সেই রোমানরা আমার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে প্রথমবারও না। আমি এরকম সংকেত প্রথমবার আবিষ্কার করেছিলাম। উনিশ বছর বয়সে আমি আর একবার ইটালি গিয়েছিলাম। সেই ভ্রমণের বিষয়ে আমার যা মনে আছে তা হলো রাস্তা ঘাটে ক্রমাগত উত্যক্ত হওয়া। পিজার দোকানে, সিনেমা হলে, ভ্যাটিকানে এরকম উত্যক্ত হচ্ছিলাম লাগাতার। ইটালিতে ভ্রমণ করা একটা বড় বিপদ ছিল। এসব দেখে মাঝে মাঝে ক্ষুধা মরে যেত। কিন্তু তখন চৌত্রিশ বছর বয়সে আমি কি বাহ্যিক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলাম! ভাবতাম, কখনো কোনো পুরুষ আমাকে বলবে, 'তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে, সিনোরিতা।' কিন্তু তেমন হচ্ছিল না আর কেউ সেভাবে এগিয়ে আসেনি এবং সেটা অবশ্যই চমৎকার একটা ব্যাপার; বাসে কোনো আগন্তুকের খামচি না খাওয়া, একজন নারীর নারীসুলভ অহংকার বজায় থাকা। অবশ্যই অবাক হওয়ার মতো বিষয়। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম সেখানকার কী বদলে গেছে? আমি? না তারা?

তাই আমি আশেপাশে জিজ্ঞেস করি সবাই একমত হয়, হ্যাঁ ইটালিতে গত দশ পনেরো বছরে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। খুব সম্ভবত নারীবাদের জয় কিংবা

www.pathagar.org

সংস্কৃতির বিপ্লব, কিংবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে অনিবার্য আধুনিকায়নের জন্য। কিংবা বাপ দাদাদের ব্যভিচারের জন্য শুধু যুবকদের একটা সহজ লজ্জা বা বিব্রত বোধ। কারণ যাই হোক ইটালি এখন এমন একটা সমাজ হিসেবে গড়ে উঠেছে যেখানে নারীদের উটকো জ্বালাতন করা এখন গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি আমার ছোট সুন্দরী বান্ধবী সোফিকেও রাস্তা ঘাটে উত্ত্যক্ত হতে হয়নি এবং সুন্দরী গোয়ালিনী চেহারার এই সুইডিশ মেয়েটাও সেই ব্যাপারটা নিয়ে মনোকষ্টে ছিল।

উপসংহারে বলতে পারি, ইটালিয়ান ছেলেরা পুরস্কৃত হওয়ার মতো উন্নতি করেছে।

যাক বাঁচা গিয়েছিল। কারণ কিছুক্ষণের জন্য আমি ভয় পাচ্ছিলাম। মানে আমার ধারণা ছিল আমার বয়স তখন উনিশ না আমি আর দেখতে ভাল না আর এই কারণেই হয়ত লোকজনের মনোযোগ নেই। আমি ভয় পেয়েছিলাম কারণ হয়ত আমার এক বন্ধু গত গ্রীষ্মে ঠিক কথাই বলেছিল, 'আহ চিন্তা কর না লিজ। সেই ইটালিয়ান ছেলেরা তোমাকে আর জ্বালাতন করবে না। সেটা ফ্রান্স না যে তারা বুড়িদের ওপর ঝুঁকবে।'

২৩

এক বিকেলে লুকা স্পেগেটি ও তার বন্ধুদের সাথে লাজিও দলের ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। রোমে ফুটবল খেলার দুটি দল– লাজিও ও রোমা। এই দুই দল এবং ভক্তদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বিশাল। এক্ষেত্রে একটা সুখি পরিবার এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশীরাও সামরিক যুদ্ধে নেমে যেতে পারে। সেখানে একজন ব্যক্তির জীবনের শুরুতেই লাজিও ভক্ত না রোমা ভক্ত তা ঠিক করে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রোববারের সন্ধ্যাটা সে কাদের সাথে ঘোরাঘুরি করবে তা নিশ্চিত হওয়াটা জরুরী।

লুকার দশজন বন্ধুর একটা দল আছে যারা একে অপরকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসে। শুধু একদিকে বিপত্তি তাদের অর্ধেক লাজিও ভক্ত আর অর্ধেক রোমা ভক্ত। আসলে তাদের কিছু করার নেই। তারা যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানকার নীতি অনুযায়ী আগেই ঠিক করা হয়ে গেছে কে কোন দল। লুকার দাদা তাকে তার প্রথম আকাশি রঙের লাজিও জার্সি দিয়েছিলেন যখন সে শিশু। লুকার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লাজিও ভক্ত হয়েই থাকতে হবে।

লুকা বলেছিল, আমরা আমাদের স্ত্রী বদলাতে পারি। আমরা আমাদের চাকরি বদলাতে পারি, আমাদের জাতীয়তা এমনকি আমাদের ধর্ম বদলাতে পারি। কিন্তু আমরা কখনোই আমাদের দল বদলাতে পারি না।

আর একটা ব্যাপার, ভক্ত শব্দটাকে ইটালিতে বলে টাপসো। টাঈপাস থেকে শব্দটার উদ্ভব। এর মানে যে 'মহান' রকম প্রিয়।

www.pathagar.org

আহ! লুকার সাথে আমার সেই প্রথম ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়া। যেন সেটা ছিল ইটালিয়ান ভাষার মারাত্মক এক ভোজসভা। আমি সেখানে সেই ছোট ছোট শব্দগুলো শিখেছিলাম যা স্কুলে শেখায় না। আমার পেছনে এক বৃদ্ধ লোক বসেছিল যে হাতে দুটি ফুলের মালা পেঁচিয়ে মাঠের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে চিৎকার চেঁচামেচি করছিল। আমি ফুটবল সম্পর্কে বিশেষ জানি না। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত খেলা নিয়ে লুকাকে অযথা প্রশ্ন করলে আমি সময় নষ্টই করতাম। আমি যা জানতে চাচ্ছিলাম তা হলো, লুকা পেছনের লোকটা এই মাত্র কি বলল? কেফন মানে কি? লুকা মাঠ থেকে একবারের জন্য চোখ না সরিয়েই উত্তর দিয়েছিল, 'ফাজিল, এর মানে ফাজিল।'

আমি সেটা লিখে রাখতে পারতাম কিন্তু আমি চোখ বুজে বৃদ্ধ লোকটার আরও আজেবাজে প্রলাপ শুনতে পারছিলাম। যা ছিল অনেকটা এরকম,

> দাই দাই দাই আলবারিনি দাই...ভা বেনে ভা বেনে, রাগাজ্জো মীও, পারফেত্তো, ব্রাভো, ব্রাভো...দাই দাই ভিয়া ভিয়া নেলেস্ত পোরতা! ঈক্কোলা ইক্কোলা ঈক্কোলা, মিও ব্রাভো রাগাজ্জো, কারো মিও, ঈক্কোলা ইক্কোলা ঈক্কো...আআআহহহ! ভাফাণকূলোওওও! ফিজিলো দি মিগনত্তা! স্ত্রোণজো! কেফোন! ট্রাডিটর! মাদোন্না...। আহ দিও মিও, পেরচে পেরচে পেরচে, কোয়েস্তো ঈ স্টুপিডিও, ই উনা ভারগোগনা, লা ভারগোগনা, চে কেছিনা চে বরদেলো... নন হায় চৌড়ে, আলবারতিনি, ফাই ফিনতা, গুয়ারদা নন ই সাকসেসো নিয়েস্তে... দাই দাই আহ...মলতো মিগলিউরে, আলবারতিনি, মলতো মিগলিউরে, সি সি সি, ইক্কোলা, বেলেস্ত, ব্রাভো, আনিমা মিয়া, আহ, আত্তিমো, ইক্কোলা আদেচ্ছোনিলা পরতা, নেলেস্ত পরতা, নেল-ভাফানছুলো!

আমি যার অনুবাদও করতে পারি,

> 'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, আলবার্তানি, এগিয়ে যাও। ঠিক আছে ঠিক আছ। আমার বাচ্চা, সেইরকম, দারুণ, দারুণ। এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও। যাও যাও! গোলপোস্টে যাও! এইতো এইতোও, আমার দক্ষ বাচ্চা, আমার প্রিয়, এইতো এইতো, এই-আহ! গোল্লায় যাও! কুকুরের বাচ্চা! গুখোর! ফাজিল। দেশদ্রোহী। ঈশ্বর ওহহো আমার ঈশ্বর, কেন, কেন, কেন, এরকম বোকামি, লজ্জা, লজ্জা কি জগাখিচুড়ি [লেখকের টিকা: ইটালিয়ান দারুণ অভিব্যক্তি চে কেসিনো আর চে বোরদেলোড় কোনো উপযুক্ত ইংরেজি শব্দ নেই অনুবাদের জন্য। যাদের শাব্দিক অর্থ যথারীতি কি দারুণ কেসিনো আর কি চমৎকার বেশ্যা বাড়ি। কিন্তু তাদের ভাবগত অর্থ হচ্ছে কি বিচ্ছিরি জগাখিচুড়ী'] তোমার কোনো হৃদয় নেই আলবার্তানি! তুমি একটা ভণ্ড। দেখো কিছুই হয়নি। এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও ওরে ওরে, হেই হ্যাঁ অনেক ভাল আগের চেয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইতো, সুন্দর, দারুণ,

www.pathagar.org

ওহহো, সুন্দর, এখন করতে হবে গোল করতে হবে, গোল করতে হবে,
জাহান্নামে যাও!

ঈশ! সেই লোকটার সামনে বসতে পারাটা আমার জীবনের কি দারুণ সৌভাগ্য ছিল। তার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটা শব্দই ছিল সাধু। আমি চাচ্ছিলাম পেছনে তার কাছাকাছি এভাবে হেলান দিতে যাতে আমার কানে তার অলংকার পূর্ণ অভিশাপের শব্দগুলো বর্ষিত হয়। শুধু সে একা নয়। পুরো স্টেডিয়াম এরকম স্বগতোক্তিতে ভরপুর ছিল। এরকম প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে! যেখানেই তাদের দল সুবিচার পাচ্ছিল না, পুরো মাঠের লোকজন তাদের পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ছিল। প্রতিটা মানুষ অভিশাপ দিতে, রাগ দেখাতে হাত নাড়ছিল। যেন সেই বিশ হাজার মানুষ একে অপরের সাথে বিবাদে নেমেছিল। লাজিও খেলোয়াড়রা তাদের ভক্তদের চেয়ে কম নাটক-বাজী জানে না। মৃত্যু যন্ত্রণায় মাঠে এভাবে গড়িয়ে পড়ছিল যেন জুলিয়াস সিজার। একেবারে পিছন সারি থেকে খেলতে খেলতে পায়ের ওপর ডিগবাজি খেয়ে গোল পোস্টে পৌঁছে যাচ্ছিল।

লাজিও হেরে যায়! তাই খেলা শেষে আনন্দ করা দরকার। লুকা স্পেগেটি তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল,

আমাদের কি যাওয়া উচিত?

আমি ধারণা করেছিলাম এর মানে হলো, আমাদের কি এখন বারে যাওয়া উচিত? কেননা আমেরিকাতে খেলা ভক্তরা এটাই করত যখন তারা হেরে যেত। কোনো বারে গিয়ে মদ খেয়ে ভাল বোধ করত। এবং শুধু আমেরিকানরাই এমন করে না, ইংরেজরা, অস্ট্রেলিয়ানরা, জার্মানরা, সবাই, ঠিক না? কিন্তু লুকা এবং তার বন্ধুরা হৈ-চৈ করতে কোনো বারে যায়নি। তারা একটা বেকারিতে গিয়েছিল। একটা ছোট, নিরীহ বেকারি যা রোমের নামহীন রাস্তার একটা বেসমেন্টে অবস্থিত। সেই রোববারের রাতে জায়গাটা কোলাহলপূর্ণ ছিল। খেলা শেষে সেই দোকানটা সব সময় জমে ওঠে। লাজিও ভক্তরা খেলা শেষে বাড়ি ফেরার সময় সেখানে থামে। তাদের মোটর সাইকেলগুলো একপাশে হেলান দিয়ে রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেলা নিয়ে কথা বলে, যারা সব কিছুতে পৌরুষত্ব খোঁজে এবং তারা ক্রিম পাফ খায়।

আমি ইটালি ভালোবাসি।

২৪

এক এক দিনে আমি প্রায় বিশটা করে শব্দ শিখছিলাম। স্থানীয় পথচারীর ভিড়ে, শহরে হাঁটতে-হাঁটতে, সব সময়। আমার মস্তিষ্কে এত শব্দের জায়গা পেত কই? তাই আশা করছিলাম আমার মন হয়ত সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু খারাপ ভাবনা আর দুঃখের স্মৃতি মুছে দেবে এবং তার বদলে সেই ঝকমকে নতুন শব্দগুলো সংরক্ষণ করবে।

www.pathagar.org

ইটালি ভাষা শিখতে আমি কঠোর পরিশ্রম করছিলাম। আশা করছিলাম, একদিন আমি পুরোপুরি শুদ্ধভাবে তা বলতে পারব। এমন একদিন আসবে যখন আমি মুখ খুলব আর জাদুর মতো গড় গড় করে ইটালি ভাষা আমার মুখ থেকে বের হবে। তখন আমি ইটালিয় মেয়ে হয়ে যাব। আমি চাচ্ছিলাম সেই ইটালিয়ান সত্তাটা আমার মাঝে বসতি গড়ে নিক। কিন্তু সেই ভাষায় বেশ কিছু কমতি আছে। যেমন, ইটালিয়ান ভাষায় গাছ এবং হোটেল– আলবেরো এবং আলবেরগো, এত কাছাকাছি উচ্চারণের কেন? এই কারণে লোকজনকে আমি 'আমি বেড়ে উঠেছি ক্রিসমাস হোটেল ফার্মে' বলে ফেলি। আসলে শব্দটা হবে ক্রিসমাস ট্রি ফার্ম। এবং এমন কিছু শব্দ আছে যাদের দুই থেকে তিনটা অর্থ। যেমন টাসসো যার মানে একাধারে সুদের হার, বাজেট এবং ওক গাছ। আলোচনার বিষয়ের ওপর নির্ভর করে মানে বদলায়। সবচেয়ে কষ্টের হচ্ছে যখন আমি ইটালিয়ান ভাষায় আঁটকে যেতাম। আমি এটাকে আত্ম অপমান হিসেবেই নিতাম। এভাবে বলছি তাই দুঃখিত। তবে আমি এতটা পথ এইজন্য পাড়ি দিয়ে ইটালি এজন্য যাইনি যে কি করে ক্রিমো(ক্রিন) শব্দটা উচ্চারণ করতে হয় তা শিখতে বসব।

তবে সেটা অনেক শুদ্ধ আনন্দের ব্যাপার ছিল যে, আমি আর জিওবানি একে অপরকে প্রবাদ প্রবচন শেখাতে ভাল সময় কাটাচ্ছিলাম। কারো হতাশায় সান্ত্বনা দিতে যা বলা হয় আমরা এক সন্ধ্যায় সেই প্রবাদ নিয়ে আলাপ করছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম,

এরকম অবস্থায় ইংরেজিতে আমরা মাঝে মাঝে বলি, 'আই উইল বি দেয়ার।'

কথাটা তার কাছে প্রথমে পরিষ্কার ছিল না। সে জিজ্ঞেস করেছিল আই উইল বি হোয়ার?

আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলাম, গভীর দুঃখে একজন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে যায়, সময়ের একটা নির্দিষ্ট স্থানাঙ্কে। যখন তুমি দুঃখের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলবে তোমার মনে হবে কখনোই এই জায়গা থেকে ভাল কোনো জায়গায় যাওয়া যাবে না। কিন্তু কেউ যদি এই নিশ্চয়তা দেয় তুমি না হয় আটকে গেছ কিন্তু আমি নিজেও সেখানে তোমার সাথে থাকব। বা তারা একসাথে সেই স্থানে থাকবে বা সে ইতোমধ্যে সেই স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে এই কথাটা অনেক আশা জাগায়।

জিওবানি জিজ্ঞেস করেছিল,

তাহলে দুঃখ একটা স্থান?

হুম। মাঝে মাঝে সেখানে মানুষ বছরের পর বছর থাকে।

এর বদলে জিওবানিও আমাকে ইটালির সেই সমবেদনার প্রবাদটা বলেছিল, 'লুহ প্রভাতো সুল্লা মিয়া পেল্লে' যার মানে আমি তা আমার চামড়ায় অনুভব করেছি। মানে আমি একইভাবে জ্বলে পুড়ে গিয়েছি এবং আমি জানি তুমি কিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ।

ইটালি ভাষায় আমার সবচেয়ে প্রিয় সহজ শব্দটা হচ্ছে, আত্রাভারসিয়ামোহ।

এর মানে 'এসো রাস্তা পার হই।' বন্ধুরা ফুটপাত ধরে রাস্তা পার হওয়ার সময় অনবরত এটা বলতে থাকে যখন রাস্তার এক পার থেকে আর এক পারে যেতে হয়। বলা যায় এটা পথচারীদের একটা শব্দ। এর চেয়ে বেশি কিছু না। এখনো কিছু কারণে আমার সাথে খুব যায় শব্দটা। প্রথমবার জিওবানি এই শব্দটা বলেছিল।

www.pathagar.org

আমরা কলোশামের কাছ দিয়ে হাঁটছিলাম। আমি হঠাৎ তাকে এই সুন্দর শব্দটা বলতে শুনেছিলাম। আমি আচমকা থেমে গিয়ে জানতে চেয়েছিলাম,

এর মানে কি? এইমাত্র তুমি কি বললে?

এর মানে 'এসো রাস্তা পার হই।' সে বুঝতে পারেনি আমি কেন এটা এত পছন্দ করেছিলাম। কিন্তু আমার কানে এটা সঠিক ইটালিয়ান আওয়াজ হিসেবে এসেছিল। প্রথমে আহ শব্দটার শুভাশিস, শেষে আহ মোহ শব্দটার ভেতরের ধ্বনিগুলোর ঘূর্ণি আর সবগুলো ধ্বনির শীতল বিলম্বের সমন্বয়। আমি শব্দটা ভালোবাসি। আমি তখন সারাক্ষণ এই শব্দটা বলতাম। তা যে কোনো বাহানায়। এটা সোফিকে বেশ ভোগাত। এসো পার হই, এসো পার হই। আমি ক্রমাগত সোফিকে টেনে হিঁচড়ে খ্যাপাটেভাবে রাস্তার এপাশ ওপাশ করতাম। সেই শব্দটার জন্য আমি আমাদের দুজনকে একদিন প্রায় মেরেই ফেলছিলাম।

জিওবানির প্রিয় ইংরেজি শব্দ হচ্ছে 'হাফ এশড।'

আর লুকার প্রিয় শব্দ হচ্ছে 'সারেন্ডার।'

২৫

বর্তমানে ইউরোপে ক্ষমতার লড়াই চলছে। গুটিকয়েক শহর একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। একবিংশ শতাব্দীর মহানগরী হিসেবে কোনো দেশের বা কোনো শহরের উত্থান হবে। এটা কি লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, জুরিখ, ব্রাসেলস, ইয়াং ইউনিয়নের কেন্দ্র? তারা সবাই একে অপরকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে, স্থাপনার দিক দিয়ে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে, রাজস্বের দিক দিয়ে অতিক্রম করতে সংগ্রাম করছে। কিন্তু রোম? বলা যায় অবস্থান নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। রোম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে না। রোম শুধু এইসব হৈচৈ আর সংগ্রাম দেখে আর একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকে। ক্ষীণ স্বরে বলে, 'হেই! তুমি যাই চাও না কেন আমি কিন্তু রোমই থাকব।' আমি এই শহরের রাজকীয় স্ব-প্রতিশ্রুতি ধারায় প্রভাবিত হয়েছি। শহরটা মাটিতে মিশুক, কি চরকির মতো ঘুরুক, কি আনন্দ করুক, কি স্থাপনা বনে যাক যাই হোক না কেন সে তার ইতিহাসের হাতের মুঠোয় সব ধরে রাখবে। বৃদ্ধকালে আমি রোমের মতো হতে চাই।

তখন আমি প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা হাঁটতাম। যদি শরীরের জ্বালানীর জন্য ক্রমাগত এক্সপ্রেসো আর প্রেস্টির দোকান থাকে, তবে এটা সহজ। আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা থেকে শুরু করে কসমোপলিটান শপিং সেন্টার পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতাম। যা আমার আশেপাশেই ছিল। যদিও গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি একে আমার পাশের মহল্লা বলতে পারতাম না। সেটা যদি আশপাশ হয় তাহলে আমার প্রতিবেশী হয়ে যেত সেই সাধারণ জনসাধারণ। যাদের নাম ভেলেন্তিনোস, গুচ্চিস এবং আরমানিশ। আমি যেখানে থাকতাম সেটা সব সময় উচ্চবিত্তদের এলাকা।

www.pathagar.org

রুবেনস, টেনিসন, স্টেনডাল, বালজাক, লিজসট, ওয়াগনার, থাককে, বায়রন, কিটস- এরা সবাই সেখানে থাকতেন। জায়গাটাকে তারা ডাকত 'দা ইংলিশ গেট্ট' বলে। ইউরোপের মহাভ্রমণে যেখানে সকল অভিজাতরা জিরিয়ে নিতেন। লন্ডনের একটা ভ্রমণ সংঘের নাম ছিল 'অকর্মা সমাজ।' বিজ্ঞাপনটা কল্পনা করেন, আপনি একজন অকর্মা। ওহহো কি লজ্জাকর।

একদিন আমি পিজ্জা ডেল পপোলোর দিকে হেঁটে যাই। সুইডেনের রাজকন্যা ক্রিস্টিনার ঐতিহাসিক আগমনের জন্য সেখানে বিরাট তোরণ বানানো হয়েছিল। বারনিনি দিয়ে নকশা আঁকা হয়েছিল। রাজকন্যা আসলেই একটা ঐতিহাসিক নিউট্রন বোমা। আমার সুইডিশ বান্ধবী সোফি এটা এভাবে বর্ণনা করে- তিনি ঘোড়া চালাতে জানেন, তিনি শিকার করতে জানেন, তিনি একজন পণ্ডিত, তিনি ক্যাথলিক হয়ে গেছেন এবং এটা নিয়ে অনেক দুর্নাম। কেউ কেউ বলে তিনি একজন পুরুষ ছিলেন, কিন্তু অন্তত পক্ষে তিনি একজন সমকামী। তিনি প্যান্ট পরে এসেছেন, তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক খোদাই কাজে গিয়েছেন, তিনি শিল্প সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি উত্তরাধিকার রেখে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

পরের খিলান ছিল একটা চার্চ যেখানে যে কেউ বিনামূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন এবং কারাভাজ্জিওর করা দুটি প্রতিকৃতি। একটা সেন্ট পিটারের শহিদ হওয়ার দৃশ্য আর একটা সেইন্ট পাওলোর মাটিতে পড়ে যাওয়া যা তার ঘোড়া বিশ্বাস করতে পারছে না। কারাভাজ্জির এই প্রতিকৃতি দুটো দেখলে আমার কান্না পেত আমি আবিষ্ট হয়ে পড়তাম। নিজেকে ফের আনন্দ দিতে আমি চার্চের অন্য পাশে সরে গিয়ে একটা দেয়াল চিত্র উপভোগ করছিলাম। রোমের সবচেয়ে সুখি, বোকা আর খিলখিল করে হাস্যরত শিশু যিশুর দেয়ালচিত্র।

আমি আবার দক্ষিণে হাঁটা দিয়ে পালাজ্জো বর্গি পার করেছিলাম, সেটা এমন একটা বিল্ডিং যা বিভিন্ন নামকরা ভাড়াটিয়াদের জন্য বিখ্যাত। নেপোলিয়নের কলঙ্কিনী বোন পাওলিনও এই তালিকায় আছেন। তার অসংখ্য প্রেমিক ছিল। সে তার কাজের লোকদের ওপর চড়ে চলাফেরা করত। ক্যাম্পেইন গাইড রোম বইটা পড়ে প্রথমে সবাই ভাবে তারা হয়ত বাক্যটা ভুল পড়েছে। কিন্তু এটা সত্যি যে পাওলিন কে গোসলখানায়ও বহন করে নিতে হতো। আমাদের একটা বিশাল দেহের নিগ্রো কথাটা বলেছিল। তারপর আমি গ্রাম্য চেহারার ভরা নদী 'তিবারের' তীর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। তিবার আইল্যান্ডের পুরোটা পথ ধরে যা রোমে আমার সবচেয়ে প্রিয় নিরিবিলি একটা জায়গা ছিল। সেই দ্বীপটা সবসময় আরোগ্যের সাথে জড়িত। ২৯১ খ্রিস্টাব্দের একটা প্লেগ মহামারীর পর এখানে আইসসুলাপিয়াসের একটা মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মধ্যযুগে ফেতেব্রেনিফেতেলি নামে তপসী সংঘ এখানে একটা হাসপাতাল নির্মাণ করেছিল। যাকে একাধারে অনুবাদ করে বলা যায় 'সুকর্মী ভাইগণ' এবং সেখানে এখনো একটা হাসপাতাল আছে।

তারপর নদী পার হয়ে ট্রাস্টটিবিয়ার গিয়েছিলাম। সেটা তিবারের উত্তর দিকের একটা জায়গা। দাবি করা হয় এখানে সত্যিকারের রোমানরা থাকত। সেই মানুষ, সেই কুশলী যারা তিবারের অপর পাশের স্থাপত্যগুলো তৈরি করেছে। তারপর একটা

www.pathagar.org

ছোট-খাট দোকানে দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম। আমি খাবার আর মদের পেয়ালা নিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম কেননা ট্রাস্টতিবিয়ারে আমার খাবার নিয়ে বসে থাকা নিয়ে অভিযোগ করার কেউ ছিল না। আমি চাইলে তা করতেই পারতাম। আমি ক্রুসচেত্তের একটা পদের ফরমায়েশ করেছিলাম। কিছু স্পেগেটি সসিও ই পেপ, একটা সাধারণ রোমান পাস্তা গোল মরিচ ও পনির দেওয়া, এবং তারপর একটা ছোট ভাজা মুরগি। যেটা আমি একটা দলচ্যুত কুকুরের সাথে মিলেমিশে শেষ করেছিলাম। কুকুরটা আমাকে অনেকক্ষণ দুপুরের খাবার খেতে দেখছিল। একমাত্র নিঃসঙ্গ কুকুরই এভাবে তাকিয়ে থাকতে পারে।

তারপর আমি ব্রিজ দিয়ে আবার ফিরে এসেছিলাম। পুরোনো জিউস গেট্টর ভেতর দিয়ে। নাৎসিদের দখল করার আগের শতক ধরে খুব আবেগপূর্ণ একটা জায়গা ছিল সেটা। তারপর আমি উত্তরের দিকে ফিরে গিয়ে পিজ্জা নাভোনা পার হয়েছিলাম। সেখানে চারটা বিশেষ নদীর মিলনস্থলের বিশাল ঝরনাটা আছে। তাকে সম্মান জানিয়েছিলাম, এই তালিকায় শ্লথ গতির তিবারও আছে। তারপর আমি প্যান্থিওন দেখতে গিয়েছিলাম। যখনই সুযোগ পাই আমি প্যান্থিওনে নজর বুলাতাম। যেহেতু আমি তখন রোমে। একটা পুরোনো প্রবাদ আছে, কেউ যদি রোমে এসে প্যান্থিওন না দেখে যায়– 'যায় গাধা হয়ে, ফিরে গাধা হয়ে।'

ফেরার পথে আমি একটা ছোট বাঁক নিয়ে থেমেছিলাম। সেটা আমার কাছে রোমের অতিশয় বিস্ময়কর কিছু– দ্য অগাস্টিয়াম। একটা বড়, গোল ধ্বসে যাওয়া স্তম্ভ। মউসলিয়ামের ইটের সভ্যতা শুরুর নিদর্শন। অক্টাবিয়ান অগাস্টাস ও তার পরিবারের লোকজন ও তার বংশধরদের জন্য বানিয়েছিলেন। সেই সময় সম্রাটের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল যে কখনো রোমে মহান অগাস্টিয়ানের শাসন ছাড়া চলবে। কিভাবে একটা রাজত্বের পতন আগেই অনুমান করা যায়? কিংবা জানা যায় সবকিছু বর্বররা ধ্বংস করে দেবে এবং বিশাল রাস্তা গুঁড়িয়ে যাবে, শহরে কোনো নাগরিক থাকবে না, কে জানতো সে সময়ের উন্নতির চূড়ায় যে জনগণ ছিল সেটা আবার ফিরে পেতে কমপক্ষে বিশ দশক লাগবে।

অন্ধকার যুগে অগাস্টাসের কবর ধ্বংস হয়েছিল এবং তার দেহের ছাই চুরি হয়ে গিয়েছিল। কে তা চুরি করেছিল জানা যায়নি। কিন্তু বিভিন্ন যুদ্ধবাজ রাজপুত্রদের হামলা থেকে বাঁচাতে শক্তিশালী কল্লনা পরিবার বারো'শ শতকে স্তম্ভটা পুনঃসংস্করণ করে। তারপর যেকোনোভাবে অগাস্টিয়াম একটা আঙুর বাগানে পরিণত হয়েছিল, তারপর একটা রেনেসিও বাগান, তারপর ষাঁড়ের যুদ্ধস্থল, তারপর একটা গোলা-বারুদের সংরক্ষণশালা, তারপর একটা কনসার্ট হল, ১৯৩০ সালে মুসোলিনি জায়গাটা বাজেয়াপ্ত করে আর তাদের একটা উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, যাতে ভবিষ্যতে জায়গাটা তার পরের প্রজন্মের জন্য একটা ভাল বিশ্রামাগার হয়ে ওঠে, আবার এটাকে মুসোলিনি শাসিত সাম্রাজ্য ছাড়া অন্য কিছু ভাবা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশ্যই মুসোলিনির ফ্যাসিবাদী স্বপ্ন শেষে পূরণ হয়নি এবং সেই মহান কবরখানা পাওয়ার ইচ্ছাও পূরণ হয়নি।

আজ রোমের সবচেয়ে শান্ত এবং নিরিবিলি স্থান এই অগাস্টিয়াম, মাটির তলায় গেঁথে গিয়েছে। এর চারপাশের শহরটা কয়েক শতক ধরে গড়ে উঠেছে। সময়ের

www.pathagar.org

আবর্তের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ধ্বংসাবশেষ এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটির নিচে গেঁথে যায়। মনুমেন্টের দিকে মানুষের চলাফেরাও এখন অনেক কমে গেছে। আমি যতটা জানি গণ শৌচাগার হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া সেখানে এখন তেমন কেউ যায় না। কিন্তু দালানটা এখনো আছে, মর্যাদার সাথে রোমান ভূমি আঁকড়ে ধরে, নিজের পরবর্তী অবতারের জন্য অপেক্ষা করেছে।

অগাস্টিয়ামের সহনশীলতা মনে প্রত্যয় জাগায়। এত অস্থির গতিতে তার গঠন বদলেছে তবুও সময়ের হিংস্রতার সাথে এটা খাপ খাইয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে অগাস্টিয়াম একজন ব্যক্তি যে খুবই এলোমেলো জীবন-যাপন করেছে। যে হয়ত একজন গৃহিণী হিসেবে জীবন শুরু করেছে, তারপর আকস্মিকভাবে হয়ে গেছে বিধবা, তারপর কিছুদিন লোকজনকে নাচ দেখিয়ে টাকা উপার্জন করেছে, শেষমেশ বহির্বিভাগে মহিলা দাঁতের ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছে, তারপর জাতীয় রাজনীতিতে গা ভাসিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং যে এত বিপর্যয়ে এখনো ভেঙে পড়েনি।

আমি অগাস্টিয়ামের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম আসলে আমার জীবন এখনো এতটা বিগড়ে যায়নি। শুধু এই পৃথিবীটাই গোলমেলে। আমাদের মধ্যে এমন পরিবর্তন এনে দেয় যা আমরা কখনো ভাবিনি। অগাস্টিয়াম আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, আমি কে? আমি কিসের প্রতিরূপ? আমি কার? এবং একসময় আমি কি কাজ করেছি তা নিয়ে যাতে কোনো সেকেলে ধারণা পোষণ না করি। গতকাল হয়ত আমি কারো কাছে মহিমান্বিত স্তম্ভ ছিলাম কিন্তু তার কাছেই পরের দিন গোলা বারুদের সংরক্ষণাগার হয়ে যেতে পারি। শুনতে পেয়েছিলাম সেই শাশ্বত শহরেও নিঃশব্দ অগাস্টিয়াম বলছে, প্রত্যেককে রূপান্তরের অস্থির আর অসীম ঢেউয়ের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

২৬

নিউইয়র্ক থেকে ইটালি যাওয়ার আগে আমি আমার কিছু বই জাহাজে করে পাঠিয়েছিলাম। বইগুলো আমার রোমান অ্যাপার্টমেন্টে চার থেকে ছয় দিনের মধ্যে যাওয়ার কথা ছিল। আমি ভেবেছিলাম ইটালিয়ান পোস্ট অফিস হয়ত এটা ভুলে ১৪ দিন হিসেবে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু দুই মাস চলে যাওয়ার পরও আমার বাক্সটা পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার ইটালিয়ান বন্ধুরা বাক্সের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে বলেছিল। তারা বলেছিল, 'বাক্সটা হয়ত এসেছে, হয়ত আসেনি, কিন্তু এসব জিনিস আমাদের আয়ত্তের বাইরে।'

আমি লুকা স্পেগেটটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

কেউ কি এটা চুরি করেছে? পোস্ট অফিস কি সেটা হারিয়ে ফেলেছে।

সে তার চোখ ঢেকে বলেছিল,

www.pathagar.org

এইসব প্রশ্ন মনে এনো না। শুধু শুধু দুঃখই পাচ্ছ।

বাক্সের রহস্যটা নিয়ে এক রাতে আমার ও আমার আমেরিকান বন্ধু মারিয়া এবং তার স্বামী জিওলিওর মধ্যে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়। মারিয়ার মতে একটা সভ্য সমাজে একজন মানুষের পোস্ট অফিসের ওপর, দ্রুত মেইল সরবরাহের ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু জিওলিও অন্য কিছু বলেছিল। তার মতে পোস্ট অফিস কোনো মানুষের ওপর না বরং ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে এবং এরকম মেইলের সরবরাহের ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। মারিয়া তা মেনে নেয়নি। বলেছিল, এটাই ক্যাথলিক আর প্রটেস্টান্টদের পার্থক্য। এই প্রার্থক্যটা এখানে সবচেয়ে ভাল প্রমাণ হয়েছে। সে বলেছিল, তার স্বামীসহ সকল ইটালিয়ানরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা করতে পারে না। এক সপ্তাহের অগ্রিম পরিকল্পনাও না। আপনি যদি একজন মধ্য-পশ্চিমের প্রটেস্টান্ট আমেরিকানকে আগামী সপ্তাহ রাতের খাবারের জন্য বলে থাকেন, যে প্রটেস্টান্টরা বিশ্বাস করে যে সে তার নিজের ভাগ্যের চালক। তারা বলবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। বৃহস্পতিবার রাতে হলে আমার জন্য ভাল হবে। কিন্তু আপনি যদি সালাব্রিয়ার একজন ক্যাথলিককে একই দাওয়াতের জন্য বলে থাকেন, সে শুধু কাঁধ ঝাঁকাবে। তার চোখ ঈশ্বরের দিকে তুলে বলবে, কিভাবে বলব আগামী বৃহস্পতিবার রাতে আমরা নৈশভোজের জন্য সময় পাব কিনা, যেহেতু সব কিছু ঈশ্বরের হাতে এবং আমরা আমাদের ভাগ্যের কথা আগে থেকে জানি কি?

তখনো আমি মাঝে মাঝে পোস্ট অফিসে যেতাম আমার হারিয়ে যাওয়া বাক্সটা খুঁজতে। রোমান পোস্টাল চাকুরেদের তাদের প্রেমিকের সাথে কথা বলায় ব্যাঘাত ঘটত। আমার উপস্থিতিতে তারা খুশি হতো না। আর আমার ইটালিয়ান ভাষা! বিশ্বাস করুন যা তখন বেশ ভালোর দিকেই তাও তেমন একটা পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হতো! আমি যদি যুক্তি দিয়ে হারানো বাক্সটার ব্যাপারে কথা বলতে যেতাম তাহলে মহিলাটা আমার দিকে এমন ভাবে তাকাত যেন আমি থুথু ছিটাচ্ছি।

আমি যখন ইটালিয়ান ভাষায় জিজ্ঞেস করতাম,

আপনার কি মনে হয় পরের সপ্তাহে পাব?

সে কাঁধ ঝাঁকাত,

মাগারি।

ইটালিয়ান আঞ্চলিক ভাষার আর একটা ব্যাখ্যাতীত অভিব্যক্তি 'মাগারি।' যার মানে 'আশা করি' এবং 'স্বপ্নে পেলে পেতে পারো' এই দুই বাক্যের মাঝামাঝি কিছু।

শেষে এই ভাবা শুরু করেছিলাম, আহ! যা হয়েছে ভাল হয়েছে। প্রথমত আমার মনেই ছিল না আমি কি কি বই প্যাকেট করেছিলাম। ভেবেছিলাম সত্যিকার অর্থে ইটালিকে জানতে হলে সেই জিনিসগুলো হয়ত আমাকে পড়াশোনা করতে হবে। ইটালিকে নিয়ে গবেষণামূলক সেই বইগুলো আমার কাছে এরপর আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। আমার বরং মনে হয়েছিল এর বদলে গেব্বনের লেখা, 'হিস্ট্রি অব ডেকলাইন' এবং 'ফল অব দ্য রোমান এমপেরর' এই বিশাল বইগুলো বাক্সে অন্তর্ভুক্ত করার

www.pathagar.org

দরকার ছিল। কিন্তু সেই ভাবনাও এক সময় ঝেড়ে ফেলেছিলাম। এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, 'যাই হোক জীবনটা খুব ছোট, বাকি একশো নয়দিন আমি এডওয়ার্ড গেব্বন পড়ে কাটাতে চাই না।'

২৭

একদিন আমার সাথে একটা অস্ট্রেলিয়ান যুবতী মেয়ের দেখা হয়েছিল। যে কিনা ইউরোপ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কাঁধে ব্যাগ চাপিয়েছিল। আমি তাকে ট্রেন স্টেশনের ঠিকানাটা দিয়েছিলাম। সে সলভেনিয়ার দিকে শুধু একটু ঘুরে দেখতে যাচ্ছিল। আমি যখন তার পরিকল্পনা শুনেছিলাম হিংসার বোবা খিঁচুনি চেপে বসেছিল আমার ভেতরে। ভাবছিলাম,

আমিও তো সলভেনিয়া যেতে চেয়েছিলাম? আহ! আমি কখনো কোথাও যেতে পারি না কেন?

নিরীহ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে আমি রীতিমতো ভ্রমণের মধ্যেই তো ছিলাম এবং মেনে নিচ্ছি এক জায়গায় ভ্রমণ করার সময় আর এক জায়গায় ভ্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করা একধরনের লোভাতুর পাগলামি। এটা এক ধরনের কল্পনা বিলাস। যেন আপনার প্রিয় অভিনেতার সাথে মিলিত হওয়ার সময় আর একজন প্রিয় অভিনেতার সাথে মিলনের কল্পনা করা। কিন্তু ব্যাপারটা হলো, মেয়েটা আমার কাছে দিকনির্দেশনা চেয়েছিল। সে হয়ত এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে আমি সেখানকার বাসিন্দা, তখন নিজেকে সেখানকার ভ্রমণকারী নয় বরং বাসিন্দার মতো লাগছিল। কিছুটা হয়ত ঠিক, এক দিক দিয়ে কিন্তু আমি রোমে শুধু ভ্রমণই করছিলাম না আমি তখন সেখানকার বাসিন্দাও। আমি যখন মেয়েটার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম তখন আমি ইলেকট্রিক বিল পরিশোধ করতে যাচ্ছিলাম। যা নিয়ে সাধারণত একজন ভ্রমণকারী ব্যস্ত হন না। কোথাও ভ্রমণের শক্তি আর থাকার শক্তি প্রাথমিকভাবে দুটি দুই রকম শক্তি। ভ্রমণকারীর শক্তি এমনিতেই বেশি। আর পথে সলভেনিয়ার দিকে ভ্রমণ করতে যাওয়া মেয়েটার সাথে দেখা হওয়ায় তা এত বেড়ে গিয়েছিল যে আমি চাইলে তখন রাস্তা গুঁড়িয়ে দিতে পারতাম।

তাই এক সপ্তাহ পরে আমি সোফিকে ডেকে বলেছিলাম, 'চল আজকের জন্য নেপল্‌সে যাই আর কিছু পিজ্জা খাই।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ট্রেনে উঠে জাদুর মতো পৌছে যাই নেপলস। এক ঝলকেই আমি নেপলসকে ভালোবেসে ফেলি। বুনো, কর্কশ, কোলাহল, নোংরা নেপলস, খরগোসের বসতিতে পিঁপড়ার বাসা, মধ্য পশ্চিমা বিদেশী বাজার আর তার সাথে নিউ অরলিয়ানের মোহময়তা। হতবাক হওয়ার মতো বিপজ্জনক এবং আনন্দময় কোলাহলপূর্ণ গিঞ্জি অবস্থা। আমার বন্ধু ওয়েড ১৯৭০ সালে নেপলস এসেছিল তখন একটা জাদুঘরে তার সবকিছু ছিনতাই হয়েছিল। পুরো শহরের

www.pathagar.org

জানালা ধোয়া কাপড় দিয়ে সাজানো এবং রাস্তা বরাবর ঝোলানো। প্রত্যেকের সদ্য ধোয়া গেঞ্জি এবং অন্তর্বাস বাতাসে এমন পত পত করে উড়ছিল যেন সেগুলো পরনের কাপড় নয় তিব্বতীয় প্রার্থনার পতাকা। নেপল্‌সের এমন কোনো রাস্তা নেই যেখানে দুরন্ত বাচ্চারা ছোট প্যান্ট বা দু পায়ে দু ধরনের মোজা পরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছাদের অন্য বাচ্চার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে না। শহরে এমন কোনো দালান ছিল না যেখানে জানালায় একজন কুঁজো হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা কুটিল দৃষ্টি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নেই।

নেপলসের মানুষজন একটু পাগলা ধরনের আর কেনই বা তা হবে না। এটা এমন একটা শহর যা পৃথিবীকে পিজ্জা আর আইস-ক্রিম দিয়েছে। নেপলসের মহিলাগুলো মোটা আর উচ্চ গলায় কথা বলে, তারা উদার, উচ্চ নাক বিশিষ্ট, সবাই মাতব্বর প্রকৃতির আর বিরক্ত। কি আর বলব, তাদের ভাব ভঙ্গি এমন যে তখনই আপনার মুখের সামনে এসে বকাঝকা করবে। ভয় পেয়ে ভাববেন, আরে তারা সবাই এমন করছে কেন? নেপলসের উচ্চারণ মিষ্টি চড়ের মতো। যেন অল্প সময়ের ফরমায়েশি খাবারের দোকানের বাবুর্চির শহর সেটা। একই সময়ে একই সাথে সবাই চিৎকার করছে। এখনো তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা আছে এবং আছে পরিবর্তনশীল তরল স্থানীয় ভাষা। আমার মনে হয়েছে ইটালির মধ্যে নেপলসবাসীর কথা বোঝা আমার জন্য সহজ। কারণ তারা চায় আপনি বোঝেন। ইচ্ছে করেই তারা উচ্চস্বরে আর বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কথা বলে এবং আপনি যদি তাদের ভাষা বুঝতেই না পারেন তবে তাদের অঙ্গভঙ্গি দেখেই অনুমান করতে পারবেন তারা কি বলতে চাচ্ছে। এই যেমন মোটরবাইকে বড় ভাইয়ের পিছে বসা স্কুলগামী দুষ্ট মেয়েটা যেতে যেতে আমার দিকে হাত তুলে আঙুল বাজিয়ে একটা মিষ্টি হাসি দিয়েছিল। আমাকে বুঝিয়েছিল– 'কষ্ট পেও না আমার বয়স সাত কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি বুঝে গেছি তুমি একটা আস্ত বোকা, কিন্তু সমস্যা নেই, আমার মনে হয় তুমি অপরিপূর্ণ তারপরও তোমার গাধার মতো চেহারাটা আমার দেখতে ভাল লাগছে। আমরা দুজনই জানি তুমি আমার মতো হতে চাও। কিন্তু দুঃখিত কোনোভাবেই তা তুমি পারবে না। এই দেখো আমার মধ্য আঙুল, নেপল্‌সে মজা কর। চাও।'

ইটালির সর্বত্র ছেলে, কিশোর, বুড়ো ফুটবল খেলে কিন্তু নেপল্‌সে কিছু অতিরিক্ত দেখেছিলাম। যেমন আমি সাত আট জন শিশুর দলকে দেখেছিলাম ছোট মুরগির বাক্স থেকে আর একটা বাক্সে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে এত দ্রুত পোকার খেলছিল যে মনে হচ্ছিল তারা ব্যথা পাবে।

জিওবানিও দারিও মূলত নেপলসের স্থানীয় বাসিন্দা। ভাবতেই পারি না। লাজুক, সমব্যথি জিওবানিকে এই এলাকার যুবক হিসেবে কল্পনা করা যায়! কিন্তু সে একজন নেপল্‌সবাসী তাতে কোনো সন্দেহ নাই। রোম থেকে রওনা দেওয়ার আগে সে আমাকে একটা পিজার দোকানের নাম দিয়েছিল। যে দোকানের পিজ্জা নাকি আমার অবশ্যই চেখে দেখা উচিত। জিওবানি জানিয়েছিল এরা ইটালির সবচেয়ে মজার পিজ্জা পরিবেশন করে। আমার কাছে ব্যাপারটা মজাদার আর উত্তেজনাপূর্ণ মনে হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল পিজ্জা ইটালির আর সেই ইটালির সবচেয়ে ভাল পিজ্জা নেপলসের। কোনো আকাশ কুসুম কল্পনা হবে না যদি আমি এটাকে পুরো

www.pathagar.org

পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল পিজ্জা বলে থাকি। যতটা গুরুত্ব আর গম্ভীরতার সাথে আমাকে দোকানের নামটা চালান করেছিল জিয়েবানি, যেন আমি কোনো গোপন সমাজে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। সে আমার হাতের তালুতে দোকানের নামটা চেপে ধরে বলেছিল, 'দয়া করে এই দোকানে যাবে আর দ্বিগুণ মজোরেলা দিয়ে একটা মার্গারিটা পিজার অর্ডার করবে। যদি নেপলস গিয়ে এই পিজা না খাও তাহলে দয়া করে আমাকে মিথ্যা হলেও জানিও যে তুমি খেয়েছ।'

তাই আমি আর সোফি পিজা 'দা মিকেল' দোকানটাতে এসে এই পিজার টুকরোগুলো অর্ডার করেছিলাম। দুজনের জন্য দুটি আলাদা পিজা। পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি আমার পিজাটা খুব পছন্দ করেছিলাম। বাতিকগ্রস্তের মতো আমি বিশ্বাস করছিলাম, আমার পিজ্জা হয়ত আমাকে আসলে ভালোবাসে যেজন্য তার সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে প্রেমের সম্পর্ক। ইতোমধ্যে সোফি প্রায় কেঁদে ফেলছিল, সে নাকি এটার জন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি বোধ করছে। সে আমার কাছে মিনতি করে জানতে চাচ্ছিল, স্টকহোমে আমরা কেন পিজা বানাতেও চাই না, স্টকহোমে আমরা কেন কোনো খাবারই খেতে চাই না, ইত্যাদি।

'পিজারিয়া দ্য মিকেল' মাত্র দুই কক্ষ বিশিষ্ট এবং সেখানে একটা সারাক্ষণ চলতি ওভেন আছে। ট্রেন থেকে নেমে মাত্র পনেরো মিনিটের রাস্তা, বৃষ্টির মধ্যেও ভাববেন না। শুধু চলে যাবেন। সেখানে সকাল সকাল গেলেই ভালো। মাঝে মাঝে তাদের ডো শেষ হয়ে যায়, যা আপনার মনটা ভেঙে দিতে পারে। দুপুর একটা বাজে এই দোকানের ঢোকার জন্য দোকানের সামনের রাস্তায় বাইরে নেপলসবাসীদের ভিড় জমে যায়। জায়গা পাওয়ার জন্য তাদের চেষ্টা দেখে মনে হবে তারা লাইফবোটে উঠতে চাচ্ছে। সেই দোকানের কোনো খাদ্য তালিকা নেই। দুটো পদ– একটা সাধারণ আর একটা অতিরিক্ত পনির দেওয়া। সেখনকার পিজ্জাতে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মতো শুকনো জলপাই আর টোমাটোর সংযোজনা নেই। প্রায় অর্ধেকটা খাওয়ার পর ডো মানে ময়ানের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলাম যা অনেকটা ভারতীয় নান রুটির মতো খেতে। সেটা নরম আবার চিবানো যায় এমন, কিন্তু মারাত্মক রকম পাতলা। পিজার আবরণের ব্যাপারে আমি ভাবতাম। কেবল দুটি উপায়ে পিজার ডো বানানো হয়, পাতলা এবং মচমচে আর মোটা এবং মাংসল। আমি কি করে জানতাম পৃথিবীতে এমন একটা ডো আছে যেটা একই সাথে পাতলা এবং মাংসল। অদ্ভুত অদ্ভুত! পাতলা, মাংসল, শক্ত, আঠালো, মজাদার, চিবানোর মতো, লবণাক্ত পিজার তলভাগ। উপরে মিষ্টি টোমাটোর সস যেটা তাজা ষাঁড়ের মজোরেলায় গলে গিয়ে বুদবুদে, ফেনাদার। এবং যার মাঝখানে বাসিলের অংশ। তা যেন পুরো পিজ্জাটাকে একটা ভেষজ চমক দিয়েছিল। যেমন করে কোনো অনুষ্ঠানের মাঝখানে ঝলমলে সিনেমার অভিনেতা তার আশেপাশে সবাইকে তার চাকচিক্যে আলোকিত করে। এধরনের কিছু ভেবে চিন্তে খাওয়া কঠিন। আপনি আপনার পিজার টুকরোটায় কামড় দেবেন এবং আঠালো আবরণটা বাসিলের পাতা মুড়িয়ে দেবে তারপর জমির উপরের মাটির মতো মজোরেলা পনির ছুটে আসবে আপনার মাথা খারাপ করে দেবে, কিন্তু একবার চেখেই দেখুন।

www.pathagar.org

এই জাদুকরী কাজটা যে করছিল সে বেলচা দিয়ে কাঠের জ্বলন্ত চুল্লিতে পিজ্জা ভিতরে ঢুকাচ্ছিল আর বের করছিল। জাহাজের পেটে বসে যেভাবে নাবিক দুনিয়া খুঁজে বেড়ায় সেভাবে বেলচা দিয়ে কয়লা, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দিচ্ছিল সে। তার হাতের আস্তিন ঘর্মাক্ত বাহুতে গুটানো ছিল, মুখ উষ্ণতায় লাল, এক চোখে তেরছা করে জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকানো এবং ঠোঁটে ঝুলন্ত সিগারেট। সোফি আর আমি দুজনে আরও পিজ্জা দিতে বলেছিলাম। আর একটা করে পরিপূর্ণ পিজ্জা। সোফি যেন নিজেকে সামলাতে চাইছিল কিন্তু আসলেই পিজাটা এত মজার যে আমরা সামলাতে পারিনি।

আমার শরীর নিয়ে কিছু কথা। প্রতিদিন আমার ওজন বাড়ছিল। ইটালিতে গিয়ে আমি আমার শরীরের ওপর অত্যাচার করছিলাম, এমন ভয়ানক পরিমানে পনির, পাস্তা, রুটি, মদ, চকলেট এবং পিজা। নেপলসের ব্যাপারে আমাকে বলা হয়েছিল, তুমি সেখানে আসলেই চকলেট পিজা পাবে। সেটা অবশ্যই মজার কিছু হবে। কিন্তু সত্যিকার অর্থ চকলেট পিজা? আমি ব্যায়াম করছিলাম না, তেমন আঁশ জাতীয় কিছু খাচ্ছিলাম না, আমি কোনো ভিটামিন নিচ্ছিলাম না। স্বাভাবিক জীবনে সকালের নাস্তায় খাঁটি ছাগলের দুধের দৈ এর সাথে গমের বীজ খাওয়ার সুনাম আছে আমার। সেই জীবন কই চলে গিয়েছিল! আমেরিকাতে আমার বান্ধবী সুসান সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিল, আমি 'শরীরে কোনো বাঁক রাখব না,' ট্যুরে আছি। কিন্তু সব মিলিয়ে আমার শরীর যে কি ভাল ফূর্তিতে ছিল তা কি আর বলব! আমার এই অকাজের প্রতি শরীর একটা অন্ধ দৃষ্টি তৈরি করেছিল এবং বলছিল, 'ঠিক আছে বাবু। বাদ দাও, আমি বুঝতে পারছিলাম এটা ক্ষণস্থায়ী। যখন তোমার খাঁটি আনন্দের ওপর ছোটখাটো পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমাকে বলবে। ভেবে দেখবো কিভাবে ক্ষতি পূরণ করা যায়।

নেপলসের সেই সবচেয়ে ভাল পিজ্জার দোকানে নিজেকে দেখেছিলাম। সে এক অন্য আমি। একটা উজ্জ্বল চোখের, পরিষ্কার ত্বকের, সুখি এবং স্বাস্থ্যবান মুখের একজন। নিজের এমন একটা মুখ আমি বহুদিন দেখিনি। ফিসফিস করে 'ধন্যবাদ' বলেছিলাম। তারপর আমি আর সোফী বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে গিয়েছিলাম পেস্ট্রি খেতে।

২৮

নেপলসের সেই সুখই একদিন আমায় ভাবায় ডেভিডের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করার। আনুষ্ঠানিকভাবে ডেভিডের সাথে সব শেষ হয়ে গেলেও আশার জানালাটা তখনো একটু খোলা ছিল। হয়ত আমার যাওয়ার পর কিংবা প্রায় এক বছর পর, হয়ত আমরা আর একটা চেষ্টা করতে পারতাম কাছাকাছি হওয়ার। আমরাতো একে অপরকে ভালোইবাসতাম। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যাটা ছিল আমরা উগ্রভাবে,

www.pathagar.org

মানসিকভাবে একে অপরের ওপর অত্যাচার করতাম। আমরা বুঝতেও পারছিলাম না কিভাবে তা বন্ধ করতে পারি।

তার আগের বসন্তে, ডেভিড আমাদের সমস্যার একটা সমাধান দিয়েছিল। যার সারাংশ হলো– স্বীকার করতেই হবে আমাদের সম্পর্কটা একদম বাজে এবং যেভাবেই হোক আমরা আর পারছি না। আমরা যদি স্বীকার করি আমরা একে অপরকে ভোগাচ্ছি, অনবরত ঝগড়া করছি, শারীরিকভাবেও খুব কম মিলিত হচ্ছি কিন্তু আবার একে অপরকে ছাড়া থাকতেও পারছি না। তাহলে এটা কিভাবে আমরা ঠিক করব? আমরা একসাথে জীবন-যাপন করতে পারি। কিন্তু সেটাও কষ্টেই, পুরোপুরি সুখ কিন্তু পাব না।

শেষের দশ মাস আমি এই প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করেছি। এতেই প্রমাণ হয় তাকে আমি কতটা ভালোবাসি।

আমাদের মনের অগোচরে আর একটা উপায় লুকিয়ে ছিল আর তা হলো আমাদের যেকোনো একজনের আবশ্যিক পরিবর্তন। তার আরও উদার মনের আর স্নেহবান হওয়ার দরকার ছিল। যে তাকে ভালোবাসে তার কাছ থেকে নিজেকে এভাবে গুটিয়ে নেওয়া উচিত ছিল না। আমি তার আত্মা বিনষ্ট করব এটা ভাবা বন্ধ করতে হতো কিংবা আমাকে শিখতে হতো তার আত্ম খাওয়া কিভাবে বন্ধ করা যায়।

ডেভিডের সাথে থাকাকালীন সময়ে আমি আমার মায়ের বিবাহিত জীবনের ব্যবহারের অনুকরণ করতে চাইতাম। আমার মায়ের মতো স্বাধীন, কর্মঠ, আত্মনির্ভরশীল হতে চাইতাম। নিজের ভরণ-পোষণ নিজেই করতে পারে এমন। আমার কৃষক বাবার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ভালোবাসার উচ্ছ্বাস ছাড়াও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে যে সমর্থ ছিল তেমন। আমার বাবা মাঝে মাঝে নিজের চারপাশে নীরবতার প্রাচীর তুলে রাখতেন। যার কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। এসবের মধ্যেও মা হাসিখুশিভাবে ডেইজি চারাগাছের চাষ করতে পারতেন। এমনিতে বলতে গেলে আমার বাবা পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। কিন্তু তিনি ভীষণ ভিন্ন চরিত্রের। আমার এক পুরোনো প্রেমিক একবার তাকে এভাবে বর্ণনা করেছিল,

তোমার বাবার এক পায়ের পাতা কেবল এই পৃথিবীতে আছে। আর পাগুলো অনেক অনেক লম্বা।

এটা দেখে আমি বড় হয়েছি যে ঘরকন্না করা আমার মা তার স্বামীর খেয়ালখুশি মতো ভালোবাসা পেত। যখন তার স্বামীর ইচ্ছা হতো তখন। কিন্তু এরপর আমার বাবা পিছিয়ে পড়ে ডুবে যেতেন তার নিম্নমানের নিজস্ব অবহেলার জগতে। আমার কাছে এমনই মনে হতো। ভাবতাম কেউ বিশেষ করে সন্তানরা, বিবাহিত জীবনের গোপন রহস্য বুঝতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি আমি বড় হয়েছি এমন একজন মাকে দেখে যে নিজের জন্য অন্যের কাছে কিছুই চায়নি। আহারে আমার মা! তিনি এমন একজন মহিলা, স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে বই ধার করে এনে শিখেছিলেন কিভাবে একা সাঁতার কাটতে হয়, তাও শীতল মাইনসটা লেকে, একা। আমার চোখে এই মহিলা জীবনে তার নিজের জন্য কিছুই করেনি।

www.pathagar.org

তারপর রোমে আসার আগে আমার মায়ের সাথে খেতে খেতে একটা আলাপ হয়। তিনি নিউইয়র্ক এসেছিলেন শেষবারের মতো আমার সাথে দুপুরের খাবার খেতে। তিনি আমাকে খোলাখুলিই বলেছিলেন,

আমাদের পরিবারের ইতিহাস অনুযায়ী সম্পর্কের সকল নিয়ম ভেঙে দিয়েছে আমার আর ডেভিডের বিষয়টা। গিলবার্ট পরিবারের সাধারণ নিয়মে আরও একটা অসম্মান যোগ হলো।

আমি আসলেই তাকে সব বলে ফেলেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি ডেভিডকে কতটা ভালোবাসি কিন্তু যখন প্রায়ই শোবার রুম থেকে, খাট থেকে, পৃথিবী থেকে সে শারীরিকভাবে থেকেও অদৃশ্য হয়ে যেত তা আমাকে কতটা একা করে আর নিঃস্ব করে দিত।

মা বলেছিলেন,

তার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে তোমার বাবার মতো।

হ্যাঁ। আমার মা ঠিক বলেছিলেন। খুব সাহসী এবং উদার স্বীকারোক্তি। আমি বলেছিলাম,

'সমস্যা হচ্ছে আমি আমার মায়ের মতো নই। আমি তোমার মতো এত শক্ত নই, মা। আমি যাকে ভালোবাসি তার কাছ থেকে একটা স্থির সান্নিধ্য চাই। আমি যদি তোমার মতো হতাম তবে হয়ত ডেভিডের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্কটা টিকে যেত। কিন্তু যে স্নেহ আর ভালোবাসাটা আমি চাই তা না পাওয়াটা আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।'

তারপর আমার মা আমাকে চমকে দিয়ে বলেছিলেন,

লিজ? তুমি তোমার সম্পর্ক থেকে যা কিছু পেতে চাও তা একসময় আমিও চাইতাম।

সেই মুহূর্তে আমার শক্ত মনের মা যেন টেবিলের ওপাশ থেকে তার মুঠো ভর্তি বন্দুকের গুলি দেখিয়েছিলেন। কয়েক দশক ধরে আমার মা দাঁতে দাঁত চেপে ছিলেন যাতে আমার বাবার চোখে একটা সুখি বিবাহিত মহিলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন (সবদিক বিবেচনা করে তিনি সুখিই ছিলেন)। তার এই দিকটা আমি কখনো দেখিনি, কখনোই না। আমি কখনোই ভাবিনি সে আসলে কি চাইত, কি পেত না। দীর্ঘদিন ধরে কোনো জিনিসগুলোর জন্য সে লড়াই করতে চায়নি। সেদিন আমার মায়ের কথাটা শুনে আমার দৃষ্টিভঙ্গির একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়েছিল।

আমি যা চাই তাই তিনি চাইতেন। তাহলে? আমার সাথে সেই অব্যক্ত সান্নিধ্য রেখে আমার মা বলেছিলেন, সোনা, তোমার বুঝতে হবে জীবন থেকে কত কম চাইতে শিখে আমি বেড়ে উঠেছিলাম। মনে রাখবে আমি তোমার চেয়ে একটা ভিন্ন সময় ও ভিন্ন স্থান থেকে এসেছি।

আমি চোখ বন্ধ করে দেখছিলাম, আমার মায়ের বয়স দশ বছর। মাইনসটায় তাদের পারিবারিক খামারে ঠিকা কর্মীর মতো কাজ করছে। তার ছোট ভাইকে লালন পালন করছে, বড় বোনের জামা কাপড় পরছে, সেখান থেকে বের হতে দু আনা জমাচ্ছে।

www.pathagar.org

তিনি ইতি টেনেছিলেন এই বলে যে, এবং তোমার বুঝতে হবে আমি তোমার বাবাকে কতটা ভালোবাসতাম।

আমার মা তার জীবন বেছে নিয়েছিলেন। যেমন আমাদের বেছে নেওয়া উচিত এবং তিনি শান্তিতেই আছেন। আমি তার শান্তি বুঝতে পারি। তিনি নিজের সাথে লুকোচুরি খেলেননি। তার এই বেছে নেওয়ার ফল বিশাল, একটা স্থায়ী আর দীর্ঘকালীন বিবাহিত জীবন। এমন একজনের সাথে সেই জীবন-যাপন যাকে তিনি এখনো তার সবচেয়ে ভাল বন্ধু হিসেবে বলে থাকেন। একটা পরিবার যা এখন নাতি পুতির মুখ দেখছে, তাদের ভালোবাসছে, এটা যেন আমার মায়ের ইচ্ছা শক্তির একটা নিশ্চিত বিবর্তন। কিছু ছাড় তো দিতেই হয় এবং আমার বাবাও এই ছাড় দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে কে ত্যাগ ছাড়া বেঁচে থাকে!

তখন আমার ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো যে, আমার পছন্দ কোনটা হওয়া উচিত? কোনটা আমার জীবনে প্রাপ্য বলে আমি মনে করি। আমি কোথায় ছাড় দিতে রাজী, কোথায় রাজী না। তখনো ডেভিড ছাড়া একটা জীবন আমি কল্পনা করতে পারতাম না। আমার সেই প্রিয় ভ্রমণ সঙ্গী যাকে ছাড়া রাস্তা ভ্রমণ আমি কল্পনা করতে পারতাম না, সেই জানালার গ্লাস নামিয়ে স্প্রিং স্টেনের গান রেডিওতে শোনা, প্রচুর কথা, জলখাবার এবং হাইওয়ের ধার ধরে সমুদ্রের রেখা নেমে যাওয়া দেখা এইসব যেমন ভুলতে পারছিলাম না আবার সেই অন্ধকার অংশ ভেবেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। যে হাড্ডি মাংস গুঁড়া করা ফেলা একাকীত্ব, নিরাপত্তাহীনতায় ডেভিড আমাকে ছেড়ে দিত। যেভাবে সে দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, নিতে শুরু করে দিত। এসব সহ্য করার ক্ষমতা তখন আর ছিল না। নেপলসে আমার সাম্প্রতিক আনন্দ আমাকে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত করেছিল যে ডেভিডকে ছাড়া আমার শুধু সুখ খুঁজে নিতে হবে তা নয়, আমার তাকে ছাড়া অবশ্যই সুখি হতে হবে। যত ভালোই আমি তাকে বাসি না কেন? হ্যাঁ, আমি তখনও তাকে ভালোবাসি, বোকার মতো অতিরিক্ত ভালোবাসি। আমাকে তখন এই লোকটাকে বিদায় জানাতে হবে বুঝতে পেরে এ-ব্যাপারে শক্ত হতে হয়েছিল।

সাতপাঁচ ভেবে আমি তখন তাকে একটা ইমেইল লিখেছিলাম।

নভেম্বর এবং জুলাই থেকে আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমি তাকে বলেছিলাম আমার ভ্রমণের সময় আমার সাথে যোগাযোগ না করতে। কারণ তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা এত বেশি, যদি যোগাযোগ করতাম তাহলে আমি ঘোরাঘুরিতে মনোযোগ দিতে পারতাম না। কিন্তু তখন সেই ইমেইল দিয়ে তার জীবনে আবারও প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম।

যেখানে প্রথমে আমি তাকে বলি, আমি আশা করি সে ভাল আছে এবং জানাই আমি ভাল আছি। আমি কিছু হাসি ঠাট্টা করি। তার সাথে হাস্যরসের ব্যাপারে আমি খুবই পারদর্শী ছিলাম। তারপর আমি ব্যাখ্যা করি আমাদের ভালোর জন্যই এখন আমাদের এই সম্পর্কটার ইতি টানা উচিত। হয়ত এটা স্বীকার করার সময় এসেছে আমাদের মাঝে কিছু হওয়ার নয়, হওয়া উচিতও নয়। চিঠিটাতে খুব বেশি নাটক করিনি। ঈশ্বরই জানেন আমাদের মাঝে কতটা নাটক হয়ে গেছে! তাই আমি চিঠিটাকে ছোট আর সরল রাখি। কিন্তু আরও একটা

www.pathagar.org

জিনিস আমাকে বলতেই হতো। নিশ্বাস চেপে আমি তা টাইপ করি, 'তুমি যদি তোমার জীবনে অন্য সঙ্গী পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার আশীর্বাদই পাবে।' আমার হাত কাঁপছিল। শেষটায় আমি যথা সম্ভব আন্তরিকতা আর আনন্দের সুর রাখতে চেষ্টা করি।

আমার মনে হয় সেদিন আমি নিজের বুকে নিজেই লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছিলাম।

আমার লেখা পড়ে তার প্রতিক্রিয়া কল্পনা করে সে রাতে আমি বেশি ঘুমাতে পারিনি। উত্তর জানতে তার পরদিন সকাল হতেই আমি কাছের একটা ইন্টারনেট ক্যাফেতে দৌড়ে যাই। আমি আমার সেই অংশকে পাত্তা দিতে চাচ্ছিলাম না যে ভাবছে প্রত্যুত্তরটা এসেছে এমন, 'ফিরে এসো! যেও না। আমি বদলে যাব।' আমি আমার নিজের ভেতরের সেই মেয়েটাকে অবজ্ঞা করতে চাচ্ছিলাম যে পুরো পৃথিবী ঘোরার বিশাল পরিকল্পনাটা ছেড়ে দিতে পারে ডেভিডের অ্যাপার্টমেন্টের চাবি হাতে পেলে। কিন্তু রাত দশটার কাছাকাছি সময়ে অবশেষে আমি আমার উত্তর পাই। খুব সুন্দর করে লেখা একটা ইমেইল। সেও একমত। সে লিখেছিল, হ্যাঁ সময় হয়েছে, আমাদের এখন অবশ্যই বিদায় জানানো উচিত। সেও একই কথা চিন্তা করেছে। সে তার সহজাত স্বভাবের চেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারবে না। সে এক সময়ের ভালোবাসা হারানো এবং তার অনুশোচনার নিজস্ব অনুভূতির কিছু কথা বলে। সে আশা করে আমি যাতে বুঝি সে আমাকে কতটা ভালোবাসে। যে ভালোবাসা ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না কিন্তু আমরা দুজনই দুজনের মনের মতো না। এখনো সে নিশ্চিত একদিন আমি আমার ভালোবাসা খুঁজে পাব। সে নিশ্চিত। কেননা 'সৌন্দর্য সৌন্দর্যকে আকর্ষণ করে।'

যেখানে আপনার ভালোবাসা আপনাকে বলতে পারত 'ফিরে এসো! যেও না! আমি বদলে যাব!' সেখানে সে কত চমৎকার ভাবেই না তা এড়িয়ে গেছে। আন্তরিকতার ছোঁয়া রেখেছে তাই না?

কম্পিউটার স্ক্রিনে তাকিয়ে আমি অনেকক্ষণ বসেছিলাম। আমি তখন জানি যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে। আমি ভোগান্তির বদলে সুখ বেছে নিয়েছিলাম। আমি নিজেকে তখন জানি। জীবনের আগত বিস্ময়ের জন্য আমি জায়গা খালি করে রাখছিলাম। আমি এসব জানি। কিন্তু ডেভিড...

ডেভিড। সে আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে তখন।

আমি আমার মুখ হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ঢেকে রেখেছিলাম। শেষমেশ যখন চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম সেই আলবেনিয়া মহিলাকে দেখতে পেয়েছিলাম। সে ইন্টারনেট ক্যাফের মেঝে মোছার কাজের রাতের শিফট থেকে বিরতি নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে আমাকে দেখছিল। এক মুহূর্ত আমরা আমাদের ক্লান্ত দৃষ্টি দিয়ে দুজন দুজনাকে দেখেছিলাম। তারপর আমি আমার মাথা ভয়ানকভাবে ঝাঁকিয়ে তাকে উচ্চস্বরে বলেছিলাম, 'সব শেষ হয়ে গেছে' সেও সমবেদনায় মাথা ঝাঁকিয়েছিল। সে আমার ভাষা বোঝেনি আবার হয়ত নিজের মতো করে সবই বুঝেছিল।

তারপর আমার ফোন বাজে।

www.pathagar.org

জিওবানি। তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল। সে বলছিল, সে আমার জন্য পিজা ফিউমে অপেক্ষা করছে যেখানে আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার ভাষা শিক্ষা চর্চা করতে দেখা করতাম। সে অবাক হয় কেননা সাধারণত সে নিজেই দেরী করে আসত আর আমাদের দেখা করার বিষয়টা ভুলে যেত। কিন্তু সেই রাতে সে ঠিক সময়ে আসে,

আমাদের কি আজ দেখা করার কথা ছিল না?

আমি ভুলে গিয়েছি।

আমি তাকে জানিয়েছিলাম আমি কোথায় আছি। সে বলেছিল, সে এসে আমাকে তার গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। কারো সাথে দেখা করার মতো মন মানসিকতা আমার তখন ছিল না কিন্তু আমার সীমাবদ্ধ ভাষাজ্ঞান দিয়ে টেলিফোনে এসব বোঝানো সম্ভব হয়নি। ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে গিয়ে আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কয়েক মিনিট পর সে তার লাল গাড়িটা নিয়ে আসে। আমি সেটাতে উঠে গিয়েছিলাম। সে ইটালির স্ল্যাং ভাষায় আমাকে বলেছিল, কি খবর। আমি উত্তর দিতে মুখ খুললেও কান্নায় আমার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেন হাহাকারে, যেন দুর্ভোগে নিশ্বাস গ্রহণ করতে প্রতিটা ফোঁপানিতে দুটো আলাদা অক্সিজেনে খাবি খেতে হচ্ছিল। নিজের মধ্যে এমন অনুতাপের কাঁপুনি আসতে আমি কখনো দেখিনি, যেন কিছুই চোখে দেখছিলাম না।

আহারে জিওবানি। সে তার আনাড়ি ইংরেজিতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে কি এমন কিছু করেছে যে আমি তার ওপর রাগ করেছি? সে কি আমার অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছে? আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি শুধু মাথা দুলিয়ে হাহাকার প্রকাশ করেছিলাম। নিজের ওপর ভীষণ রাগ আর জিওবানির জন্য অনুতাপ হচ্ছিল। সে এভাবে গাড়ির ভেতর আমার মতো ভেঙে পড়া এক বুড়ির অসংলগ্ন কান্না আর ফোঁপানির মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিল।

অবশেষে, আমি কোনো মতে তাকে নিশ্চয়তা দিতে পেরেছিলাম যে আমার দুঃখের কারণ সে নয়। এমন একটা বাজে ঘটনার জন্য আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম। এই অবস্থায় জিওবানি তার বয়সের চেয়ে পরিণত আচরণ করেছিল। সে বলেছিল,

কান্নার জন্য ক্ষমা চাইবে না। এই আবেগটা ছাড়া আমরা এক এক জন রোবট।

সে গাড়ির পেছন থেকে আমাকে কিছু টিস্যু পেপার দিয়ে বলেছিল,

চল এবার গাড়ি চালাই।

সে ঠিক বলেছিল ইন্টারনেট ক্যাফেটার বাইরে জনবহুল এবং সেখানে এভাবে ভেঙে পড়া পাগলামি। সে গাড়ি পিজ্জা ডেলা রিপাবলিকান মাঝে থামিয়েছিল। রোমের একটা বিশেষ খোলা জায়গা সেটা। সে সেই দারুণ ফোয়ারাটার সামনে থামিয়েছিল যেখানে উঁচু গলার বিশাল বিশাল হাসের ভিড়ে যৌন আবেদন পুষ্ট নগ্ন দুটো জলপরী আছে। রোমান মান অনুযায়ী খুব বেশি আগের তৈরি নয়। আমার গাইড বই অনুসারে, এক জোড়া বোন এই জলপরীর ভাস্কর্যের মডেল হয়েছিল। সেসময়ের দুজন বিখ্যাত নর্তকী ছিল তারা। তাদের বেশ কুখ্যাতি হয় যখন ভাস্কর্যটা বানানো শেষ হয়। চার্চ কয়েক মাস চেষ্টা করে যাতে ভাস্কর্যটা অনাবৃত থাকে। কেননা সেটা খুব

www.pathagar.org

যৌন আবেদনময়। সেই বোনগুলো ভালোভাবেই জীবনযাপন করে। ১৯২০ সালে মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা প্রতিদিন সকালে এই পিজ্জার দোকানের সামনে হেঁটে যেত তাদের ফোয়ারাটা দেখতে। যতদিন তারা বেঁচেছিল ততদিন প্রতি বছর একবার সেই ফ্রেঞ্চ স্থপতি যে তাদের যৌবনে মার্বেল পাথরের আদল দিয়েছিল, এই দুজনকে দুপুরের ভোজে নিয়ে যেত। সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে যখন তারা সবাই যুবক, সুন্দর আর বন্য ছিল।

জিওবানি সেখানে গাড়ি থামিয়ে আমার সামলে ওঠার অপেক্ষা করছিল। আমি যা পারতাম তা হলো নিজের হাতের তালু দিয়ে নিজের চোখে বাড়ি মারতে, কান্না ভেতরে সেঁধিয়ে দিতে। আমার আর জিওবানির মধ্যে কখনো কোনো ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা হয়নি। এতগুলো মাস এতগুলো রাতের খাবারেও না। আমরা যেসব ব্যাপারে শুধু কথা বলেছিলাম তা হলো দর্শন এবং শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং খাবার। আমরা একে অপরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানি না। এমনকি সে জানে না আমি ডিভোর্সি এবং আমেরিকাতে আমার ভালোবাসা পেছনে ফেলে এসেছি। তখন আমি তার সম্পর্কে কয়েকটা জিনিসই কেবল জানি তা হলো, সে একজন লেখক হতে চায় এবং সে নেপলসে জন্মগ্রহণ করেছে। আমার কান্নায় দুজন মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কথোপকথন শুরু হয়েছিল। এমন যদি না হতো! সেই বাজে পরিস্থিতিতে।

সে বলেছিল,

আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি আজ কিছু হারিয়েছ?

কিন্তু আমি যেন ভুলে গিয়েছিলাম কিভাবে কথা বলতে হয়। জিওবানি হেসে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলেছিল,

পারলা কাম মাগ্নি।

সে জানত রোমান উপভাষার এটা আমার একটা প্রিয় উক্তি। যার মানে, 'এভাবে বলে ফেল যেন খাচ্ছ।' কিংবা আমার ব্যক্তিগত অনুবাদ অনুযায়ী, 'কথাটা এভাবে বল যেন খাচ্ছ।' এটা মনে রাখার মতো একটা উক্তি। যদি কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা কষ্টকর হয়। যখন আপনি সঠিক শব্দটা খুঁজে পাবেন না তখন রোমান খাবারের মতোই সহজ ভাষায় বলার চেষ্টা করবেন। ব্যাপারটা বাড়ানোর কিছু নেই। টেবিলে পরিবেশনের মতো সহজ রাখা।

আমি একটা গভীর শ্বাস নিয়ে আমার অবস্থানুযায়ী ইটালিয়ান ভাষায় সংক্ষেপে বলেছিলাম,

এটা একটা প্রেম কাহিনির ব্যাপার জিওবানি। যাকে আমার আজকে বিদায় জানাতে হয়েছে।

তারপর আমি আবার আমার চোখ চেপে ধরেছিলাম কিন্তু আঙুল তুচ্ছ করে কান্নাগুলো গড়িয়েই পড়ছিল। জিওবানির মঙ্গল হোক। সে আমাকে সান্ত্বনা দিতে জড়িয়ে ধরেনি। না সে আমাকে দুঃখ প্রকাশে একটু বাধা দিয়েছিল। বরং যে পর্যন্ত না আমি শান্ত হই সে পর্যন্ত আমাকে কাঁদতে দিয়ে আমার পাশে চুপচাপ বসে ছিল। তারপর সঠিক সমবেদনায়, যত্নের সাথে প্রতিটা শব্দ– ধীরে, পরিষ্কার করে এবং মায়ার সাথে উচ্চারণ করেছিল,

www.pathagar.org

আমি বুঝি। আমিও সেখানে থাকব, লিজ।

২৯

কিছুদিন পর রোমে আমার বোন আসে। ডেভিডের ব্যাপারটা নিয়ে আমি যাতে ভেঙে না পড়ি আর আমি যেন আবার উদ্যম ফিরে পাই, তাই। আমার বোনের সব কিছুই দ্রুত। একটা শক্তি তার চারপাশে সবসময় ছোটখাটো সাইক্লোনের মতো পেঁচিয়ে থাকে। সে আমার চেয়ে তিন বছরের বড় আর তিন ইঞ্চি লম্বা। সে একজন খেলোয়াড়, একজন পণ্ডিত, একজন মা এবং একজন লেখিকা। রোমে থাকাকালীন পুরোটা সময় সে ম্যারাথনের অনুশীলন করেছে। মানে আমার খবরের কাগজে একটা কলাম পড়তে পড়তে আর দুটি ক্যাপাচিনো খেতে খেতে সে প্রায় আঠারো মাইল দৌড়ে চলে আসত। দৌড়ানোর সময় তাকে একদম হরিণের মতো দেখায়। প্রথম বাচ্চাটা পেটে নিয়ে সে একবার অন্ধকারে পুরো একটা লেক সাঁতার কেটেছিল। অন্তঃসত্ত্বা না হয়েও পানিতে নামতে আমি ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বোন আসলেই ভয় পায়নি। তার দ্বিতীয় বাচ্চার সময় এক গাইনী বিশেষজ্ঞ বলেছিল, ক্যাথরিনের ভেতরে ভেতরে যদি কোনো অব্যক্ত ভয় থাকে তাহলে বাচ্চাটার ওপর খারাপ প্রভাব পড়বে– যেমন জেনেটিক সমস্যা বা প্রসবের জটিলতা। আমার বোন বলেছিল, আমার কেবল একটাই ভয় আর তা হলো বাচ্চাটা হয়ত বড় হয়ে রিপাবলিকান হয়ে উঠবে।

এমনই আমার বোন, যার নাম ক্যাথরিন। সে আমার একমাত্র সহোদরা। আমরা যখন কানেকটিকাটের গ্রামে বড় হয়েছিলাম, তখন একটা খামার বাড়িতে শুধু আমরা দুজনই ছিলাম। আশে পাশে কোনো বাচ্চা ছিল না। সে শক্তিশালী এবং শাসক গোছের এবং আমার সারা জীবনের কমান্ডার ছিল। আমি তার আতঙ্কে থাকতাম। সে ছাড়া কারো মতামতই প্রাধান্য পেত না। আমি কার্ড খেলায় ইচ্ছে করেই হেরে যেতাম যাতে সে আমার ওপর রেগে না যায়, তার সাথে আমার সবসময় বন্ধু সুলভ সম্পর্ক ছিল না। সে আমার ওপর বিরক্ত হতো আর আমি তাকে ভয় পেতাম। আমার বিশ্বাস আটাশ বছর না হওয়া পর্যন্ত আমি সহ্য করেছি। সে বছর আমি চূড়ান্তভাবে প্রতিবাদ করেছিলাম এবং তার প্রতিক্রিয়া অনেকটা এরকম ছিল,

তোমার প্রতিবাদ করতে এতদিন লাগল কেন?

আমার বিবাহিত জীবন ভেঙে যাওয়ার সময় আমাদের সম্পর্ক এইসব দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায়। ক্যাথরিনের জন্য খুবই সহজ ছিল আমার পরাজয়ে তার জয় উদযাপন করা। ক্যাথরিনের চেয়ে আমি সব সময় আদরে, ভাগ্যে সেরা ছিলাম।

www.pathagar.org

পরিবার এবং সফলতায় সব দিক দিয়ে জয়ী ছিলাম। সে জীবনের সাথে খুব তীক্ষ্ণভাবে যুদ্ধ করেছে এবং মাঝে মাঝে নিজেও ব্যথা পেয়েছে। আমার ডিভোর্স এবং বিষণ্ণতা নিয়ে ক্যাথরিনের এমন মন্তব্য করা সহজ ছিল, 'আহ! এবার নতুন সূর্যোদয় দেখ।' তার বদলে সে আমাকে তুলে ধরেছিল যেন আমি একজন বিজয়িনী। যখনই নিরাশ বোধ করেছি গভীর রাত হলেও সে আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে। সান্ত্বনা আর শান্তির কথা বলেছে। আমি কেন এত দুঃখী এই প্রশ্নের উত্তর আমার সাথে সেও খুঁজেছে। আমার চিকিৎসার ব্যাপারে সে আমার পাশে আমার প্রতিনিধির মতো ছিল। চিকিৎসকের সাথে আমার প্রতিটা বৈঠকের পর আমি তাকে ফোন করে সে সময়ের সকল অনুভূতি বর্ণনা করতাম এবং সে সব কাজ ফেলে রাখত। আর বলত, আহ্, অনেক কিছু স্পষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ একই সাথে আমাদের দুবোনের সম্পর্কের অনেক কিছু স্পষ্ট হচ্ছিল।

এখন আমরা দুজন দুজনের সাথে প্রায় সারাদিন কথা বলি– অন্তত রোমে যাওয়ার আগে তাই করেছি আমরা। আমাদের দুজনের কেউ একজন যদি প্লেনে উঠতে যাই আর একজন সবসময় ফোন করে বলি, আমি জানি অদ্ভুত শোনাচ্ছে কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি। আগেই বলছি কারণ জানোই তো ঈশ্বর না করুন যদি কিছু হয়ে যায় এবং একথা শুনে অপরজন সবসময় বলি, 'আমি জানি।'

সে রোমে সবসময়ের মতো তৈরি হয়েই গিয়েছিল। সে পাঁচটি গাইড বই নিয়ে গিয়েছিল। পুরো শহরের ম্যাপ তখন ইতোমধ্যে তার মাথায় আঁকা। সে ফিলাডেলফিয়া যাওয়ার আগেও এমন প্রস্তুতি নিয়ে যায়। আমাদের দুজনের প্রার্থক্যের এটা একটা মৌলিক উদাহরণ। রোমে প্রথম সপ্তাহ আমি ৯০ ভাগ হারিয়ে গিয়ে আর তাতে ১০০ ভাগ খুশি হয়েছিলাম। আমার চারপাশের সবকিছু ব্যাখ্যাতিত হলেই আমার ভাল লাগে। রহস্যজনক সৌন্দর্য দেখে দেখে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। পৃথিবীকে আমার এমনই মনে হয় কিন্তু আমার বোনের মতে এমন কিছু নেই যা বোঝা যাবে না। সে সেই বিষয়ে পড়াশোনা করে। সে এমন একজন মহিলা যে তার রান্নাঘরের পাশে রান্নার বইয়ের সাথে দ্য কলম্বিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া রাখে এবং আনন্দ নিয়ে পড়ে।

আমার বন্ধুদের সাথে আমি একটা খেলা খেলি যার নাম 'দেখো এটা।' যখনই কোনো কিছু নিয়ে অস্পষ্ট ধারণা চলে আসবে, যেমন, সেন্ট লুইস কে? তখন আমি বলব 'দেখো এটা।' তারপর আমি আশেপাশের ফোন নিয়ে আমার বোনকে ফোন করব। মাঝে মাঝে দেখা যাবে সে সময় সে হয়ত গাড়িতে, বাচ্চাদের নিয়ে ভলভোতে ফিরছে। তখন সে বলবে, সেন্ট লুইস, সে একজন বর্বরদের মতো জামা পড়া ফ্রেঞ্চ রাজা। আসলে তার চরিত্রটা খুব মজার কারণ...

রোমে আমার শহরে আসার পর একটা জিনিস তার চোখে পড়েছে। এটা রোম। একেবারে ক্যাথরিনের মনের মতো। নানান বিষয়, তারিখ এবং স্থাপত্যে ভরপুর। এসব আমার নজরে পড়েনি কেননা আমি ওসব নিয়ে ভাবি না। আমি কোনো জায়গার বা কোনো মানুষের ব্যাপারে একটা জিনিসই জানতে চাই আর তা হলো, গল্প। আমি শুধু নান্দনিক বিষয় প্রসঙ্গে জানতে চাই। আমি আসার এক মাস পর সোফি আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসে বলেছিল, বাহ! কি দারুণ গোলাপি

www.pathagar.org

বাথরুম! এবং ঠিক তখনই আমি খেয়াল করেছিলাম সেটা গোলাপি রঙয়ের। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত হালকা গোলাপি টালি সবখানে। আমি আসলেই সেটা আগে দেখিনি। কিন্তু, আমার বোনের অভিজ্ঞ চোখে ঠিকই রোমান বা বেজ্রেটাইন আমলের একটা দালান ধরা পড়েছিল। চার্চের মতো মেঝেতে নকশা করা কিংবা অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ দেয়ালচিত্র বেদীর পেছনে লুকানো। সে তার লম্বা লম্বা পা দিয়ে পুরো রোম চষে বেড়াত। আমরা তাকে বলতাম তিন ফুট লম্বা পায়ের ক্যাথরিন। ছোট থেকেই আমি তার পিছে দ্রুত ছুটতাম। আমরা কেউই তার সাথে পেরে উঠতাম না।

সে বলেছিল,

দেখ লিজ। দেখো তারা কিভাবে আঠারো শতাব্দীর ইটের কারুকার্যের ওপর দিয়ে উনিশ শতকের ছাপ মেরে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত ওখানে গেলে আমরা দেখতে পাব...হ্যাঁ এইতো।

এই বলে সে চিহ্ন পেয়েও গিয়েছিল। সে সময়ের মানুষরা দালানের ভীম হিসেবে সরাসরি প্রস্তরের স্তম্ভ ব্যবহার করত। হয়ত তাদের তেমন লোকবল ছিল না। সেটাই দেখা গিয়েছিল সেখানে। বিশাল বিক্রয়মানের সেই রাজপ্রাসাদটা আমার খুব ভাল লাগে।

ক্যাথরিন হাতে ম্যাপ নিয়েছিল আর নিয়েছিল মিকেলিনের সবুজ গাইড বই। আর আমি নিয়েছিলাম আমাদের পিকনিকের দুপুরের খাবার। নরম বল আকৃতির দুটো প্যাঁচানো রুটি, মশলাদার সসেজ, আঁচারি সারডিন মাছ চারপাশে মাংসল জলপাই দিয়ে প্যাঁচানো, একটা মাশরুমের প্যাকেট, আগুনে ছেঁকা মজোরেলার বল, ঝাল আর পোড়া-পোড়া আলুগুলো, চেরি টোমাটো, পেকোরিনো পনির, মিনারেল যুক্ত পানি আর সাদা মদের একটা বোতল। খেতে শুরু করার সময় আমি তো অবাক, কেননা সে অবাক হয়ে বলছিল, লোকজন কেন ট্রেন্ট শহরের রাজনীতি নিয়ে কিছু বলে না?

সে আমাকে নিয়ে রোমের প্রায় ডজন খানের চার্চে গিয়েছে, আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম সেন্ট হেন, সেন্ট তেন, সেন্ট কে জেনো অনুতাপে খালি পায়ে ঘোরার যন্ত্রণা ভোগ করেছিল ইত্যাদি...। এসমস্ত জিনিসের নাম জানি না বলে এই নয় যে আমার বোনের সাথে এসব জায়গায় যেতে আমার ভাল লাগেনি। ওর কোবাল্টের মতো চোখে কিছুই বাদ পড়ে না। আমার সেই গির্জার নামও মনে নাই যার দেয়ালচিত্র অনেকটাই আমেরিকান ডাবলু পি এ নিউ ডিয়ালের বীরত্বপূর্ণ দেয়াল চিত্রের মতো। কিন্তু আমার মনে আছে ক্যাথরিন সেগুলো দেখিয়ে আমাকে বলেছিল, ঐ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট পোপদের তোমার ভাল লাগবে। আমার এটাও মনে আছে যেদিন আমরা খুব ভোরে উঠে সেন্ট সুজানাতে ছুটে গিয়েছিলাম এবং একে অপরের হাত ধরে ধার্মিকদের সাথে গ্রেগরীয় ভজন সংগীতে সুর মিলিয়েছিলাম। আমার বোন কোনো ধার্মিক মানুষ নয়। আমাদের বংশে তেমন কেউই নাই। তাই আমাকে আমার পরিবারের সাদা ভেড়া বলা হতো। আমার

www.pathagar.org

আত্মিক খোঁজে মনোযোগ আমার বোন বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূহল নিয়েই দেখে। চার্চে সে আমার কানে কানে বলেছিল 'আমার মনে হয় এরকম ধর্ম বিশ্বাস খুব সুন্দর কিছু। কিন্তু আমি পারি না, একদম পারি না।'

আমাদের দুজনের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমার বোনের পাশের বাড়ির এক পরিবার একসাথে দুটো বিপদে জড়িয়ে পড়েছিল। কম বয়সী মা ও তার চার বছরের ছেলে দুজনই হঠাৎ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি যখন শুনেছি, হতবাক হয়ে গিয়ে বলেছিলাম, ঈশ্বর! তাদের করুণা কর। আর অন্যদিকে সে বলিষ্ঠভাবে বলেছিল, ঐ পরিবারের জন্য একটা বড় ডিস দরকার। এরপর ঠিকই সে পুরো পরিবারকে তার বাড়িতে পারিবারিকভাবে রাতের খাবারের আওতায় আনে। প্রত্যেক রাতে, এক বছর ধরে এটা সে করে। আমি জানি না আমার বোন বুঝেছে কিনা, এটাই কিন্তু করুণাধারা।

আমরা সেন্ট সুজানা থেকে বের হয়ে আসার পর সে বলেছিল, পোপের কেন মধ্যযুগে শহরের পরিকল্পনা করতে হয়েছিল জানো?। কেননা সমস্ত পশ্চিমা বিশ্ব থেকে বছরে প্রায় দুই মিলিয়ন ক্যাথলিক পুণ্য পথযাত্রী আসত। ভ্যাটিকান থেকে সেন্ট জনে সেই পুণ্য যাত্রার জন্য। এমনকি মাঝে মাঝে হাঁটু গেড়েও যেত মানুষ। তাদের জন্য সুবিধা করতেই হয়েছিল।

আমার বোন শিক্ষায় বিশ্বাস করে। তার কাছে পবিত্র শব্দসমূহ হচ্ছে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি। সে পড়ার সময় যেভাবে মাথা নত করে, যেভাবে তার হাতের আঙুল পৃষ্ঠাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় যেন সে তার ঈশ্বরের সাথে আছে। সেইদিন একটু পর আমি আমার বোনকে আর একবার প্রার্থনা করতে দেখেছিলাম। হাঁটু গেড়ে রোমান আদালতের মাঝখানে বসে, মাটির ওপর থেকে লিটার ধুলো-বালি সরিয়ে, যেন একটা ব্লাকবোর্ডের লেখা মুছছে, একটুকরো পাথর নিয়ে ময়লার মধ্যে আমার জন্য রোমান গির্জাগুলোর একটা হুবহু নকশা এঁকে সে সেই জায়গাগুলো নির্দেশ করেছিল যেগুলো অনুপস্থিত রয়ে গেছে। এবং বাহ্যিকভাবে আমার না বোঝার কারণ নেই এমন পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। সেই দালানটার কেন আঠারো শতকের আগের ছিল মনে হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর মিলাতে সে শূন্যে তার আঙুল দিয়ে অনেক আগেই হারিয়ে যাওয়া তোরণ, জানালাগুলো এঁকেছিল। হারল্ডের মতো তার বেগুনি রঙের মোম রং দিয়ে মহাশূন্যের অনুপস্থিত অংশ নিজের কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছিল, এবং ধ্বংস প্রাপ্ত অংশের হিসাব মিলিয়েছিল।

ইটালিতে মাঝে মাঝে একটা সময়সূচক প্রবাদ ব্যবহার করা হয় যাকে বলে 'পাস্যাতো রিমোট' মানে দূরবর্তী অতীত। যা অতীত নিয়ে আলোচনা করার সময় ব্যবহার হয়। এমন আগের জিনিস যার বর্তমানের ওপর কোনো প্রভাব নেই। যেমন প্রাচীন ইতিহাস। কিন্তু আমার বোন যদি ইটালি ভাষা বলত তবে অবশ্যই প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় এই কাল বাচক শব্দটা ব্যবহার করত না। তার কাছে রোমান ইতিহাস খুব দূরের নয়, এটা অতীতও নয়। আমি তার যতটা কাছে এটা তার কাছে ততই কাছে।

পরের দিন সে চলে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম,

www.pathagar.org

শোন, তোমার প্লেন নিরাপদে ল্যান্ড করলে আমাকে জানিও। ঠিক আছে? অদ্ভুত শোনাবে, তবু বলি,

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমি জানি সোনা। আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

৩০

মাঝে মাঝে আমার খুব অবাক লাগে যে, আমি নই, আমার বোন একজন মা এবং একজন বউ। সবসময় তো এর উল্টোটাই ভেবে এসেছি। আমি যখন ভাবতাম আমার জীবন এমন একটা বাড়ি ঘিরে হবে যেটা হবে রাজ্যের ময়লা জুতা আর বাচ্চাদের কোলাহল মুখরিত। অন্যদিকে তখন ক্যাথরিন তার নিজের বিছানায় কোনো বই নিয়ে নিজের জগতে ডুবে থাকত। আমাদের দুজনের ব্যাপারে যা যা ধারণা করা হতো পরিণত বয়সে আমরা কেউই তেমন হইনি। এক দিকে ভালই হয়েছে। সকল অনুমানের বাইরে থেকে আমরা যে যার জীবনধারা তৈরি করতে পেরেছি। তার নিঃসঙ্গচারী স্বভাবের মানে হলো একাকীত্বের বলয় থেকে দূরে রাখতে তার একটা পরিবার দরকার, আমার হই-হুল্লোড় স্বভাবের মানে হলো একাকীত্ব আমার কাছে ব্যাপার না। আমি একা থাকতে পারব। আমার বোন তার পরিবারের কাছে ফিরে যাচ্ছে এতে আমি খুশি এবং এ নিয়েও খুশি যে আমার সামনে ভ্রমণের জন্য আরও নয় মাস আছে। যেখানে আমার করার মধ্যে ছিল কেবল খাওয়া, পড়া, প্রার্থনা করা এবং লেখা।

আমি এখনো বলতে পারি না কখনো আমি সন্তান চাইব কিনা। ত্রিশ বছর বয়সেও যখন আমি বাচ্চাকাচ্চা চাইনি তখন আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। সে স্মৃতি মনে পড়লে আমি সাবধান হয়ে যাই কেননা চল্লিশ বছর বয়সেও যে আমি সন্তান চাইব সে ব্যাপারে জোর গলায় আমি বলতে পারি না। আমি শুধু বলতে পারি এই মুহূর্তে আমি কেমন আছি, আমি এখন নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট। এটাও জানি ভবিষ্যতে আমার সন্তানের জন্য অনুশোচনা জাগতে পারে শুধু এই জন্য সামনে আমি আমার মত পাল্টাবো না। আমার মনে হয় না পৃথিবীতে আরও বাচ্চা আনার জন্য এটা উপযুক্ত অজুহাত। আমার মনে হয়, মানুষ মাঝে মাঝে সন্তান উৎপাদন করে ভবিষ্যৎ অনুশোচনার হাত থেকে বাঁচতে। আমার মনে হয় যেসকল কারণে মানুষ সন্তান চায় সেগুলো হলো– মাঝে মাঝে আসলেই খাঁটি প্রাকৃতিক ইচ্ছা থেকে কিংবা জীবনের সাক্ষী রেখে যেতে, মাঝে মাঝে কোনো অন্য উপায় না থাকলে, মাঝে মাঝে সঙ্গীর মন রাখতে, মাঝে মাঝে উত্তরাধিকার রেখে যেতে, মাঝে মাঝে অতশত না ভেবে। বাচ্চা নেওয়ার সকল কারণ এক নয় এবং সব কারণই স্বার্থ ছাড়া নয়। বাচ্চা না চাওয়ার কারণও সব সময় এক নয় এবং তার কারণগুলোও যে সব সময় স্বার্থপরের মতো হবে তা কেন মনে হয় মানুষের?

www.pathagar.org

আমি এসব বলি কারণ, আমি এখনো সেই অভিযোগ কিংবা আমার তথাকথিত 'স্বার্থপরতা' নিয়ে ভাবি যা আমার স্বামী আমাদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সময় আমার ওপর আরোপ করেছিল। প্রতিবার যখনই সে আমাকে এরকম বলত, অপরাধ-বোধ থেকে আমি এটা পুরোপুরি মেনে নিতাম। ভাবতাম, হায় ঈশ্বর আমি এখনো সন্তান নেইনি, এবং আমি তাদের এখনই অবহেলা করছি, নিজেকে প্রাধান্য দিয়েছি, আমি অবশ্যই একজন খারাপ মা। এই বাচ্চাগুলো এই অলীক বাচ্চাগুলো আমাদের তর্কে বহুবার এসেছিল এভাবে, কে এই বাচ্চাদের লালন পালন করবে? কে বাচ্চাদের সাথে বাড়িতে থাকবে? কে তাদের ভরণ পোষণ করবে? মাঝরাতে কে এদের খাওয়াতে উঠবে? আমার মনে আছে, যখন আমার বিবাহিত জীবন ওষ্ঠাগত প্রায় তখন একবার আমি আমার বন্ধু সুসানকে এরকম বলছিলাম। আমি চাই না আমার সন্তানরা এমন একটা সংসারে বেড়ে উঠুক। তখন সুসান বলেছিল, 'তুমি কেন এই কাল্পনিক বাচ্চাগুলোকে আলোচনার বাইরে রাখতে পারো না লিজ? এদের এখনো কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি বরং স্বীকার কর এমন অসুখি জীবন যাপন তুমি আর চাচ্ছো না। তোমাদের দুজনের একজনও না এবং ডেলিভারি রুমে বসে বসে প্রসবের শেষ মুহূর্তে এসব না ভেবে এখনই ভাবা উচিত।'

সেই সময়ে নিউইয়র্কে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। এক জোড়া সফল চিত্রকর দম্পতি ও তাদের সদ্য প্রসূত বাচ্চার কথা মনে আছে আমার। মা টা তার নিজের গ্যালারি উদ্বোধন করতে উৎসবের আয়োজন করেছিল। আমার মনে আছে আমি মহিলাটাকে, সেই নব্য মাকে, আমার বন্ধুকে, চিত্রশিল্পীকে দেখছিলাম। দেখছিলাম অনুষ্ঠানে অতিথিদের সেবা করতে করতে সে কি পরিমাণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। একই সময়ে সে বাচ্চাটার দেখাশোনা করছিল এবং তার কাজের আলোচনা করছিল। আমি আমার জীবনে এমন ঘুম বঞ্চিত কাউকে দেখিনি, তার চেহারায় নির্ঘুম অনেক রাতের ছাপ ছিল। মধ্যরাতের পর তার রান্নাঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য আমি ভুলতে পারব না, ভুলতে পারব না কুনই পর্যন্ত হাত ডুবিয়ে বেসিনের নোংরা থালা বাসন ধোবার চেষ্টা। আর তার স্বামী, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এটা সকল স্বামীদের স্বভাব প্রকাশ করার চেষ্টা নয়, অন্য ঘরে যথারীতি কফি টেবিলে পা মেলে টেলিভিশন দেখছিল। শেষমেশ সে তার স্বামীকে বলেছিল সে কি তাকে কাজে সাহায্য করবে? এবং লোকটা উত্তর দিয়েছিল, রেখে দাও সোনা কাল সকালে আমরা দুজন মিলে পরিষ্কার করব। বাচ্চাটা আবার কান্না শুরু করে দিয়েছিল। আমার বন্ধুর ককটেল পার্টির পোশাক ভেদ করে বুকের দুধ চুইয়ে পড়ছিল।

যারা সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিল তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে আমি সব কিছু দেখছিলাম। অনেকের মনেই হিংসার আগুন জ্বালিয়েছিল সেই সুন্দরী মহিলা, তার স্বাস্থ্যবান বাচ্চা, তার সফল পেশা, তার দারুণ অ্যাপার্টমেন্ট, তার চমৎকার স্বামী, তার ককটেল পার্টি পোশাক। সেই অনুষ্ঠানের কেউ কেউ হয়ত সুযোগ পেলে তাদের জীবন মহিলাটার সাথে পাল্টাপাল্টি করে নিত। সেই মহিলাটা গর্বে হয়ত অতীতে ফিরে তাকিয়েছিল, সে কি স্বপ্নেও এমন ভেবেছিল, তার জীবনের, মাতৃত্বের, বিবাহিত জীবনের, পেশা জীবনের সফলতার এমন একটা রাত পাবে! চেষ্টা করলেও কি পায় কেউ! কিন্তু নিজের কথা যা বলতে পারি তা হলো, অনুষ্ঠানে সারাক্ষণ আমি

www.pathagar.org

এই ভেবে ভয়ে কাঁপছিলাম আর নিজেকে বলছিলাম, তুমি কি বুঝতে পারছো না এটা তোমার ভবিষ্যৎ? বুঝতে না পারলে ভাববে তোমার মাথা গেছে। এরকম হতে দিও না।

আমার কি একটা পরিবার বানানোর দায়িত্ববোধ আছে? ওহ ঈশ্বর! দায়িত্ববোধ। এই শব্দটার অর্থ আমি বুঝতে যতক্ষণ পর্যন্ত না পারি, যে পর্যন্ত না আমি এই শব্দটাকে দুভাগ করে এর সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারি, 'দায়িত্বে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা,' আমার সমগ্র সত্তা আমাকে বলছিল, আমার বিবাহিত জীবনের ইতি টানতে আমি কেবল তারই সাড়া দিতে পারতাম। আমার ভেতরের কোথাও একটা আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার হচ্ছিল যে আমাকে এই ঝড়ের মধ্যেও ভয়াবহভাবে এই পথে চলতে হবে। যদি আমি কোনোভাবে বাচ্চাদের পৃথিবীতে আনতাম তাতেও আমার দায়িত্বহীনতা মোটা কালিতে স্পষ্ট হয়ে উঠত। নিজের সত্তার এই অবাস্তব জিনিসগুলো প্রকাশ হওয়ার লজ্জা আর ঝামেলায় আমি পড়তে চাচ্ছিলাম না।

শেষে আমার বন্ধু শার্লীর সেই কথা দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত হয়েছিলাম যা সে সেই রাতে, সেই অনুষ্ঠানের পর আমাকে বলেছিল। যখন সে আমাকে বাথরুমে লুকানো, কম্পিত, নিজের মুখে পানির ঝাপটা দিতে থাকা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিল। শার্লি কিংবা কেউই তখন জানতো না আমার বিবাহিত জীবনে কি ঘটছিল, আমি সে রাতে তাকে বলতে পারিনি। আমি যা বলতে পেরেছিলাম তা হলো, 'আমি জানি না আমি কি করব।' আমার মনে আছে আমাকে সে বাহুতে জড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত হেসে সহজভাবে বলেছিল, সত্য বলো, সত্য বলো, সত্য বলো।

আর আমি তাই করতে চেষ্টা করেছিলাম।

বিবাহবিচ্ছেদ একটা বাজে আর কঠিন সমস্যা। শুধু আইনি আর অর্থনৈতিক জটিলতা নয় কিংবা জীবনযাত্রার চরম বিপর্যয় নয় এটা। এ-বিষয়ে একবার আমার বন্ধু ডেবোরাহ আমাকে একটা বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলেছিল, 'আসবাবপত্রের মায়া ছেড়ে দিলে কেউ মরে যায় না কিছু এটা একটা বিশেষ আবেগ থেকে সরে আসাও যা একজনকে শেষ করে দেয়।' প্রচলিত জীবনধারা থেকে ছিটকে পড়ার ধাক্কা এবং সেসকল আরামদায়ক সামগ্রী থেকে সরে আসা যা বহু মানুষকে একটা নির্দিষ্ট ছকে সবসময় আঁটকে রাখে। একজন স্ত্রীর সাথে আর একটা পরিবার ধরে রাখা আমেরিকান সমাজের ধারাবাহিকতা আর মূল্যায়ন ধরে রাখার সবচেয়ে প্রাথমিক পদ্ধতি। মাইনোসোটায় আমার মায়ের পরিবারের বিরাট পুনর্মিলনীতে আমি প্রতিবার এই সত্যটা নতুন করে আবিষ্কার করি। এবং দেখতে পাই কিভাবে বছরের পর বছর সবাই নিশ্চিতভাবে তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে। প্রথমে আপনি একজন শিশু তারপর কিশোর, তারপর একজন বিবাহিত যুবক-যুবতী, তারপর আপনি একজন পিতা-মাতা তারপর একজন অবসরপ্রাপ্ত, তারপর আপনি একজন দাদা-দাদি। প্রতিটা অবস্থানে আপনি জানেন আপনি কে? আপনার কর্তব্য কি? এবং জানেন পুনর্মিলনীতে কোথায় বসতে হবে? আপনি বাচ্চা, কিশোর, যুবক, বাবা-মা বা অবসরপ্রাপ্তদের সাথে বসবেন ততদিন পর্যন্ত যতদিন না আপনার নব্বই বছর হয়। আর তেমন বয়স হয়ে গেলে আপনি ছায়ায় বসে আপনার বংশধরদের সন্তুষ্টির সাথে দেখতে পাবেন। আপনি কে? এই প্রশ্নে আপনার কোনো সমস্যা নেই। আপনি সেই

www.pathagar.org

লোক যে এতবড় পরিবার সৃষ্টি করেছেন। এই সন্তুষ্টি তাৎক্ষণিক, এবং এছাড়াও এই সন্তুষ্টি সর্বজন স্বীকৃত। কত লোককে আমি দাবি করতে শুনেছি যে তাদের সন্তান জন্ম দিয়ে তাদের জীবনের সেরা কাজটা করেছে বা সন্তানরা তাদের সেরা সুখ এনে দিয়েছে? সন্তান এমন একটা জিনিস যাতে একজন তার মানসিক চাহিদার সময় কিংবা তাদের সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহের মুহূর্তে নির্ভর করতে পারে। ব্যাপারটা এমন যে আমি যদি জীবনে কিছু না করতে পারি অন্ততপক্ষে আমি আমার বাচ্চা-কাচ্চা ভাল ভাবে বড় করতে পারব।

কিন্তু যদি নিজের পছন্দে কিংবা অনিচ্ছায় আপনি এই সহজাত পারিবারিক চক্র আর ধারাবাহিকতাতে অংশগ্রহণ না করেন তাহলে কি হবে? কি হবে যদি আপনি পা পিছান? পুনর্মিলনীতে আপনার বসার স্থান কোথায় হবে? নির্ভয়ে কিভাবে সময়ের বয়ে চলাকে আপনি চিহ্নিত করবেন? আপনি তো পৃথিবীর সময়কে অপ্রাসঙ্গিকরকম ভেঙে টুকরো টুকরো করেছেন। আপনার অন্য কারণ খুঁজতে হবে, অন্য পরিমাপক খুঁজতে হবে যাতে নিজেকে বিচার করতে পারেন আপনি একজন সফল মানুষ কিনা। আমি বাচ্চাদের ভালোবাসি। কিন্তু আমার বাচ্চা না থাকলে কি হবে? সেটা আমাকে কিরকম মানুষ হিসেবে দাঁড় করাবে?

ভার্জিনিয়া উলফ লিখেছেন– বিস্তীর্ণ মহাদেশের ওপারে মহিলাদের জীবন তরবারির ছায়ার ওপর পড়ে। তিনি বলেছিলেন, সেই তরবারির এক পাশে আছে নিয়ম, সংস্কৃতি আর আদেশ যেখানে সবই সঠিক। কিন্তু তরবারির অপর পাশে, যদি আপনি নিয়ম ভাঙার মতো সাহসী এবং এমন একটা জীবন বেছে নেন যেটা প্রচলিত রীতি মানা হয় না, সব কিছুই দ্বিধা। কোনো কিছুই সাধারণ নিয়মের বাইরে না। তার যুক্তি অনুযায়ী সেই ছায়াকে অতিক্রম করলে মহিলাদের অস্তিত্ব আরও অন্যরকম হতে পারে, এবং কেউ বাজী রাখতে পারে তা আরও ঝকঝকে হবে।

আমি ভাগ্যবান অন্তত পক্ষে আমার লেখক সত্তাটা আছে। এটা এমন একটা কিছু যা মানুষ বোঝে। বলে, আহ সে তার বিয়ে ভেঙে দিয়েছে তার শিল্প বাঁচাতে। সেটা আংশিক সত্য, পুরোপুরি নয়। অনেক লেখকদের পরিবার আছে। যেমন টনি মরিসন। সন্তান বড় করা তার নোবেল প্রাইজ পাওয়া থামাতে পারেনি। কিন্তু টনি মরিসন তার নিজের পথ তৈরি করে নিয়েছেন এবং অবশ্যই আমার নিজেরও পথ তৈরি করে নিতে হবে। ভগবৎ গীতা, প্রাচীন ভারতের তপস্বীদের গ্রন্থে বলা আছে– অন্যের জীবনধারা সঠিকভাবে অনুকরণ করে বেঁচে থাকার চেয়ে নিজের জীবন ভুল-রকম যাপন করা ভালো। তাই আমি এখন আমার জীবন যাপন করা শুরু করেছি। তা যত বিশৃঙ্খল আর কদাকার দেখাক না কেন, এটা পুরোপুরি আমার নিজের স্বরূপ।

যাইহোক, আমি এসব কথা উত্থাপন করলাম কেননা আমার বোনের বাড়ি, ভাল বিয়ে, তার বাচ্চার সাথে নিজেকে তুলনা করে মাঝে কিছুদিন খুব অস্থির ছিলাম। তখন আমার একটা ঠিকানা পর্যন্ত নেই এবং এ ধরনের অপরাধ চৌত্রিশ বছরের মতো এমন পরিণত বয়সে করা কি মানায়? ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সব আসবাব ক্যাথরিনের বাড়িতে জমা ছিল। সে আমাকে তার বাড়ির চিলেকোঠায় একটা সাময়িক ঘর দিয়েছিল। যাকে আমরা কুমারী খালাদের বাড়ি বলে থাকি। যেখানে একটা জানালাও আছে, যেখানে বসে বাইরে তাকিয়ে আমি মাঠে নিজের বিয়ের জামা পরা

www.pathagar.org

মূর্তি কল্পনা করতে পারতাম, নিজের হারানো যৌবন নিয়ে অনুতাপ করতে পারতাম। ক্যাথরিনকে দেখে মনে হতো সেই ব্যবস্থাপত্র করতে পেরে, সে খুব খুশি আর তাতে আমিও স্বস্তি পেতাম। কিন্তু আমি যে ভয় পেতাম তা হলো, যদি আমি এই পৃথিবীর প্রবাহে বাজে ভাবে বয়ে চলি, আমি হয়ত কোনোদিন পরিবারের বাইরে ছিটকে যাব। কিংবা ছিটকেই গেছি। এর আগের গ্রীষ্মে আমার একটা পাঁচ বছর বয়সী ভাগ্নি আমার বোনের বাসায় তার বন্ধুর সাথে খেলছিল। আমি বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার জন্মদিন কবে? সে বলেছিল জানুয়ারির ২৫ তারিখ।

আমি বলেছিলাম,

উফ! তুমি একজন কুম্ভ রাশির জাতিকা। আমি অনেক কুম্ভ-রাশির জাতকের সাথে প্রেম করেছি। তারা যে কি পরিমাণ অদ্ভুত এটা বোঝার জন্য।

পাঁচ বছর বয়সী দুই বাচ্চাই আমার দিকে ভয় আর অনিশ্চয়তা নিয়ে তাক লেগে তাকিয়েছিল হঠাৎ আমি তাদের কাছে একজন ভয়াবহ মহিলার রূপ নিয়েছিলাম। আমাকে হয়ত তাদের কাছে তখন নির্ভরশীল দেখাচ্ছিল না। একজন পাগলা খালা হিসেবে ধরা দিয়েছিলাম। যেন আমি বিবসনা জামার, বিবাহবিচ্ছেদী নারী। যার ঘাড় পর্যন্ত কমলা রঙ্গের চুল। যে দুধের কিছু খায় না কিন্তু মেনথলের ধোঁয়া পান করে। যে প্রায়ই সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসে আর এরোমা থেরাপিস্ট প্রেমিকের সাথে যার ছাড়াছাড়ি হতেই থাকে। যে স্কুলগামী বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ বলা কার্ডগুলো পড়ে আর বলে, 'লিজ খালার জন্য একটা ঠাণ্ডা মদের বোতল নিয়ে আসো সোনা তাহলে আমি তোমাদের আমার মেজাজ ঠাণ্ডা করার আংটিটা দিয়ে দেব।'

নাহ! এরকম না। আমি তখন বুঝতে পারছিলাম, আমাকে আবার একজন খাঁটি নাগরিক হতে হবে।

৩১

শেষের দিকে ছয় সপ্তাহ ধরে আমি বলনি, ফ্লোরেন্স, ভেনিস, সিসিলি, আর একবার নেপলসে ঘুরে বেড়াই। তারপর সেখান থেকে ক্যালাব্রিয়া যাই। একটা জায়গা সম্পর্কে বুঝতে, অনুভব করতে, ঘুরে দেখতে, রাস্তার মানুষদের জিজ্ঞেস করতে কোথায় ভাল ভাল খাবার পাওয়া যায় আর সেগুলো খেতে ঠিক যতটা সময় লাগে আমি তখন ঠিক ততটুক সময় প্রতিটা জায়গায় থেকেছি। এক সপ্তাহ এখানে তো এক সপ্তাহ সেখানে। তারপর আমি আমার ইটালি ভাষা শিক্ষার স্কুল ছেড়ে দেই। আমার মনে হয়েছিল আমার সহজাত ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষার সামর্থ্যকে এটা আড়ষ্ট করে দিচ্ছে। স্কুলে শিখতে গিয়ে ক্লাসরুমে বন্দি হয়ে থাকার চেয়ে ইটালি ঘুরে বেড়িয়ে ব্যক্তি বিশেষের সাথে সহজাত অনুশীলনই তো আমি করতে পারি।

নিজের মতো করে সহজাত ভ্রমণের সেই সপ্তাহগুলো কী চমৎকার ছিল! কী স্বাধীন দিনই না ছিল আমার জীবনের! টিকিটের জন্য ট্রেন স্টেশনে যাওয়া, এখানে

www.pathagar.org

সেখানে দৌড়ানো। আমি আমার স্বাধীনতার স্বাদ নিচ্ছিলাম, কেননা শেষে এমন একটা সময় এসেছিল যে আমি যেখানে খুশি যেতে পারছিলাম। অল্প কিছুক্ষণের জন্যও কোনো বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা করিনি সে কয়দিন। জিওবানি ফোন করে বলেছিল, 'ছেই উনা ট্রটোলা' অর্থাৎ তুমি লাটিমের মতো ঘুরছো নাকি শুধু? এক রাতে মেডিটেরানিয়ান শহরে সমুদ্র লাগোয়া একটা হোটেল রুমে আমি নিজের হাসির শব্দে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম। অবাক হয়েছিলাম। আমার বিছানায় কে এভাবে হাসছিল? আসলে সেখানে শুধু আমিই ছিলাম এটা বুঝতে পেরে আমি আবার হেসেছিলাম। এখন মনে নেই আমি কি নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম। মনে হয় নৌযান নিয়ে কিছু একটা হবে।

৩২

টেরি চাচা আর ডেভ চাচি কানেকটিকাট থেকে জীবনে প্রথমবারের মতো ইটালি ঘুরতে এসেছিলেন। সাথে আমাকে দেখতেও চেয়েছিলেন। তাই সপ্তাহ শেষের এক শুক্রবারে দ্রুতগামী ট্রেনে চেপে একদিনের জন্য ফ্লোরেন্সে গিয়েছিলাম। তাদের পৌছাতে পৌছাতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের দিউমো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার চাচার প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে দেখার মতো জিনিসই সেটা আসলে। তিনি বলেছিলেন,

অয় ভেয়!

তারপর একটু থেমে বলেছিলেন,

ক্যাথলিক চার্চের প্রশংসা বাক্য হিসেবে আমার কথাটা অবশ্য যায় না।

আমরা বাগানের মাঝখানে সেবিন মহিলাদের ধর্ষিত হওয়ার ভাস্কর্যটা দেখেছিলাম। মাইকেল এঞ্জেলোকে সায়েন্স মিউজিয়ামের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, শহরের চারপাশ ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশের দৃশ্য দেখে আমি আমার চাচা-চাচিকে অবশিষ্ট ছুটির দিনগুলো তাঁদের নিজেদের মতো ঘুরে বেড়াতে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমি প্রাচুর্যপূর্ণ শহর এমপেল লুকায় গিয়েছিলাম। এটা সেই ছোট তুসকান শহর যার মাংসের দোকান খুব প্রসিদ্ধ। পুরো ইটালিতে এত সুন্দর আকৃতিতে কাটা মাংস আমি দেখিনি। শহর জুড়ে সেগুলো এভাবে সাজানো ছিল যেন সেগুলো বলছে, 'তুমি আসলে আমাকেই চাও।' কাল্পনিক সকল আকৃতির, সকল রঙের সসেজগুলো এমনভাবে সাজানো ছিল যেন মেয়েদের পা কোনো কাম উত্তেজক মোজার ভেতর ঢুকানো হয়েছে। সেগুলো মাংসের দোকানের সিলিং থেকে ঝোলানো ছিল। হ্যামের বলিষ্ঠ নিতম্ব জানালায় এভাবে টাঙানো ছিল যেন তারা আমস্টার্ডামসের অসভ্য মেয়ে, মানুষজনকে ইশারা করছে। মুরগিগুলো দেখতে এত মোটাসোটা আর হৃষ্টপুষ্ট ছিল যেন কে বেশি মোটা আর রসালো এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পর তারা

www.pathagar.org

স্বেচ্ছায় বলি হয়ে গিয়েছে। লুকায় কেবল মাংসই চমৎকার নয়; আরও আছে বাদাম, পিচ, ঝুলে থাকা ডুমুর। প্রিয় ঈশ্বর কি ডুমুরগুলোই না...

জায়গাটা পুচ্চিনির জন্মস্থান হিসেবেও বিখ্যাত। আমি জানি আমার এ ব্যাপারে কৌতূহল থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কৌতূহল হয়েছিল যখন একজন দোকানি আমাকে একটা গোপন তথ্য দিয়েছিল, আর তা হলো পুচ্চিনির জন্মস্থানের উল্টো পাশের একটা রেস্টুরেন্টে শহরের সেরা মাশরুম পরিবেশন করা হয়। তাই আমি ইটালিয়ান ভাষায় রাস্তা জিজ্ঞেস করে করে লুকা শহর চষে বেড়িয়েছিলাম। 'বলতে পারেন পুচ্চিনির বাড়িটা কোথায়?' আর তারপর শহরের এক উদার বাসিন্দা আমাকে পথ দেখিয়েছিল, সম্ভবত সে খুব আশ্চর্য হয়েছিল যখন আমি তাকে 'গ্রাযি' বলে আমার পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়ে জাদুঘরে ঢোকার একেবারে উল্টো পাশে হন হন করে হেঁটে গিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি বৃষ্টির মধ্যে বসে রিসোটো আই ফাঙ্গি পরিবেশনের অপেক্ষায় বসে ছিলাম।

আমার মনে নেই লুকা শহরের আগে না পরে আমি বলোনি গিয়েছিলাম। এমন সুন্দর একটা শহর, কি বলব! যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, 'মাই বলোনি হেজ এ ফার্স্ট নেম' এই গানটা গুনগুন করছিলাম। এত্তো সুন্দর! প্রাচীন বলোনি তার ইটের সুন্দর কারুকার্য আর প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত। এই শহরকে বলা হয়– দ্য রেড, দ্য ফ্যাট এন্ড দ্য বিউটিফুল– লালচে, স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর। আমি কিন্তু এই বইয়ে উল্লেখ করার জন্য নামটাকে একটু ভদ্র আবরণ দিয়েছি। রোমের চেয়ে ওখানকার খাবার নিশ্চয়ই আরও ভাল কিংবা ওখানে রোমের চেয়ে বেশি মাখন ব্যবহার করা হয়। এমনকি বলোনির জেলাটোও রোমের চেয়ে বেশি ভালো। আমার কেন জানি কথাটা বলতে অনৈতিক লাগছে কিন্তু এটা সত্য। ওখানকার মাশরুমগুলো বড় মোটা যৌন আবেদনময়ী জিহ্বার মতো এবং যেভাবে একটা চমৎকার মেয়েলি টুপিতে পাতলা লেসের অবগুণ্ঠনের মতো প্রসিয়াতো, পনিরের পাতলা আবরণ, দিয়ে পিজা ঢেকে রাখা হয়েছে সেটা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না। আর সেই বলোনিজ সস যা যেকোনো সস বানানোর পদ্ধতিকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে।

দুঃখের বিষয় 'বুওন এপেতিতো' এই ইটালি শব্দটার কোনো সঠিক ইংরেজি শব্দ নেই। তাহলে বোঝানো যেত আমার সাথে কি ঘটেছিল। যখন ইটালির ট্রেন-স্টপগুলোর নামকরণ পৃথিবী বিখ্যাত খাবার আর মদের নামে হয় আর তা ঘোষণা করা হয় এভাবে, এরপর থামবে পারমা, তারপর থামবে বলোনি, তারপর মন্তেপুলছিয়ানো, তখন শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগে বলুন। কী মুখরোচক নামগুলো! ট্রেনের ভেতরেও অবশ্য খাবার ছিল। ছোট সাইজের স্যান্ডউইচ এবং ভাল গরম চকোলেট। বাইরে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে জলখাবার খেতে খেতে ছুটে চলতে সত্যি ভাল লাগে।

একটা লম্বা ভ্রমণের জন্য আমি একটা সুদর্শন ইটালিয়ান যুবকের সাথে ভাগাভাগি করে একটা কম্পার্টমেন্ট নিয়েছিলাম। বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে সে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছিল। ততক্ষণে আমি অক্টোপাসের সালাদটা খাওয়া শেষ করেছিলাম। লোকটা ভেনিস পৌঁছানোর কিছু আগে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। চোখ ঘঁষে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে দেখে নিশ্বাস চেপে বলেছিল,

www.pathagar.org

কারিনা।

যার অর্থ মিষ্টি। আমি তাকে অতিমাত্রায় ভদ্রতার সাথে বলেছিলাম,

'গ্রাযি মিললে' যার অর্থ অসংখ্য ধন্যবাদ। সে অবাক হয়েছিল। ভাবতেই পারেনি আমি ইটালি ভাষা জানি। আসলে আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। প্রায় বিশ মিনিট কথা বলার পর প্রথমবারের মতো আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমি পারছি। কিছু লাইন অবশ্য তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল এবং আমি আসলেই তখন ইটালি বলতে পারি সেটাই ছিল বড় বিষয়। অবশ্যই প্রতিটা বাক্যে কিছু ভুল ছিল কারণ আমি তখন কেবল তিনটা কাল জানি। কিন্তু কিভাবে যেন সেই লোকটার সাথে আমি খুব কষ্ট ছাড়াই ভাব বিনিময় করতে পেরেছিলাম। লোকটা জিজ্ঞেস করেছিল,

তুমি কিভাবে ইটালিয়ান বলছ?

আমি বলেছিলাম,

মি লা কাভো। যার মূল অর্থ হচ্ছে, কিছুটা পেরেছি।

শব্দটা বোতলের ছিপি খুলতে যে ক্রিয়া বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় তা থেকে এসেছে। যার মানে পরিস্থিতিতে পড়লে নিজের ভেতর থেকে নিংড়ে বের করতে পারি এই যা।

সে আমার দিকে ইশারা করছিল। সেই বাচ্চা ছেলেটা! হাস্যকর। তবে সে পুরোপুরি আকর্ষণ বিহীনও ছিল না পুরুষত্বহীন তো নয়ই। কথায় কথায় সে আমাকে ইটালিয়ান ভাষায় প্রশংসাই করেছিল। যেমন,

আমেরিকান মহিলাদের মতো তুমি তত মোটা নও।

আমি তাকে ইংরেজিতে বলেছিলাম,

ইটালিয়ান পুরুষের মতো তুমিও মেদবহুল নও।

কমে? তার মানে।

আমি একটু পরিবর্তিত ইটালিয়ান ভাষায় আবার বলেছিলাম,

আর তুমি সকল ইটালিয়ান পুরুষদের মতোই উদার।

উফ আমি এই ভাষাটা বলতে পারছিলাম। কিন্তু বাচ্চা ছেলেটা মনে করছিল আমি তাকে পছন্দ করছি। কিন্তু কেবল শব্দগুলোর সাথে আমি প্রেমিক সুলভ মজা করছিলাম। আমি তালগোল পাকিয়ে ফেলছিলাম কিন্তু আমার জিহ্বার ছিপি যেন খুলে গিয়েছিল। এবং ইটালিয়ান ভাষা উদাত্তভাবে বর্ষিত হচ্ছিল। সে চেয়েছিল ভেনিসে আমি তার সাথে দেখা করি কিন্তু আমার তার প্রতি কোনো আগ্রহ জন্মায়নি। আমি শুধু এই ভাষাটার প্রেম-রোগী। তাই আমি তাকে এড়িয়ে যাই। যাহোক আমার ভেনিসে লিন্ডার সাথে সাক্ষাত করার কথা। আমি সেখানে তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম।

যদিও সে তেমন নয়, তবু আমি তাকে পাগলা লিন্ডা নামে ডাকি। সে সিয়াটল থেকে ভেনিস এসেছিল। ভেনিস আর একটা আর্দ্র ও ধূসর শহর। লিণ্ডা চেয়েছিল সে ইটালিতে আমার সাথে দেখা করতে যাবে, কিন্তু আমি তাতে পা পিছিয়ে তাকে ভেনিসে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আমার পক্ষে সম্ভব না। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রেমময় শহরে একা যেতে চাইনি আমি, না, তখন না, সে বছর না। এমন একটা শহরে আমি শুধু নিজেকে কল্পনা করতে পারি একটা গন্ডোলার শেষ ধারে দাঁড়িয়ে আছি আর একটা মাঝি কেঁদে কেঁদে কুয়াশা কেটে এগিয়ে চলছে। পাহাড়ের চূড়ায় কপোতির

www.pathagar.org

জন্য বানানো বাই সাইকেল দেখে একা একা মনমরা হয়ে থাকার চেয়েও এটা একটা দুঃখের চিত্র। এর চেয়ে লিণ্ডা আমার সঙ্গ হওয়াতে ভাল হয়েছিল, সে খুব ভাল সঙ্গী।

দুই বছর আগে বালি শহরে, এক মাথা জট আর পায়ারসিংস পরা, লিন্ডার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। যখন আমি যোগ বিষয়ে লেখার কাজে সেখানে গিয়েছিলাম। তার পর কোস্টারিকাতেও আমরা দুজন একত্রে গিয়েছিলাম। সে আমার একজন প্রিয় ভ্রমণ সঙ্গী। সে ঝঞ্ঝাটহীন, বিনোদন-মুখর আর এর সাথে সে যেন ছোট সাইজের একটা পরী, যে আশ্চর্যরকম আঁটসাঁট লাল ভেলভেটের জামায় এঁটে আছে। বললে বেশি হবে না যে লিন্ডা পৃথিবীর অটুট শরীরের অধিকারীদের একজন। সে নির্মল এবং উচ্চ আত্মমর্যাদার অধিকারীও বটে। নিজেকে আয়নায় দেখার সময় সে একবার বলেছিল আমাকে, আমি জানি আমিই একমাত্র ব্যক্তি নই যাকে যে কোনো পোশাকে ভাল দেখায়। কিন্তু আমি নিজেকে না ভালোবেসে পারি না। আমি যখন অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক ভাবনার ফেনা তুলতে চাই তখন সেই একমাত্র আমাকে থামিয়ে দিতে পারে। যেমন যখন আমি বলি, মহাবিশ্বের চরিত্রটা কি? লিন্ডার উত্তর, আমি জিজ্ঞেস করি, এত প্রশ্ন কর কেন? লিন্ডার ইচ্ছা কোনোদিন তার জট এত বড় হবে যে সেটা সে বিদ্যুতের তারের থামের আকৃতিতে বুনতে পারবে, ঠিক যেভাবে ঝোপঝাড়কে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে নানান আকৃতি দেওয়া হয় এবং বলা যায় হয়ত সেখানে কোনো পাখি নীড় বাঁধবে। বালিবাসীরা লিন্ডাকে পছন্দ করে, কোস্টারিকানরাও করে। তার পোষা টিকটিকি আর উদবিড়াল দেখাশোনা করার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে সেসময় সে একটা সফটওয়ার উন্নয়ন কোম্পানিতে কাজ করে আর আমাদের চেয়ে বেশি আয় করে।

যাহোক আমরা একে অপরকে ভেনিসে খুঁজে পেয়েছিলাম। লিণ্ডা শহরের ম্যাপ দেখে, ভ্রূ-কুচকে, উল্টে-পাল্টে আমাদের হোটেল খুঁজে নিজের স্বভাবসুলভ হাস্যোচ্ছল বলেছিল, শালা! আমরা এখন থেকে এই শহরের মেয়র।

তার আনন্দ, তার আশাবাদের সাথে আঁশটে গন্ধের, ধীর গতির, ডুবন্ত, রহস্যজনক, নীরব এবং অদ্ভুতুড়ে সেই শহর একদম যায়নি। ভেনিস খুব সুন্দর একটা শহর কিন্তু তাদের জন্য, যারা ধীরে ধীরে মদ খেয়ে মরে যেতে চায়, কিংবা যেখানে প্রেমিককে হারিয়ে ফেলা যায় কিংবা হারিয়ে ফেলা যায় প্রিয় কারো খুন হয়ে যাওয়ার অস্ত্রটা। ভেনিসকে দেখে মনে হয়েছিল ভাগ্য ভাল আমি থাকার জন্য ইটালিকে বেছে নিয়েছিলাম। আমার মনে হয় না সেখানে থাকলে আমি এত দ্রুত বিষণ্নতা প্রতিরোধক ঔষধগুলো ছাড়তে পারতাম। ভেনিস সুন্দর কিন্তু তার সৌন্দর্য বোরমেনের ছবির মতো যার কেবল প্রশংসা করা যায় কিন্তু থাকতে ইচ্ছা করে না।

পুরো শহরটার পলেস্তরা খসে পড়ছে, মলিন হয়ে যাচ্ছে। সেই ঘরগুলোর মতো যেগুলো এক কালের ধনী পরিবারের মানুষরা দেখাশোনা না করতে পেরে তালাবন্ধ করে রাখে। এরকম দরজায় আঁচড় কাটা যায় কিন্তু ভেতরের কোনো ব্যাপারে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। এমনই আসলে ভেনিস। অ্যাড্রিয়াটিক নদীর তৈলাক্ত পানি দিয়ে বহুদিন ধরে ভোগা দালানগুলোর ভীত ধুয়ে যেতে থাকে। যেন আঠারো শতকের বিজ্ঞান মেলার কর্ম ক্ষমতা যাচাই করতে গবেষকরা ভেবেছিল, দেখা যাক এমন একটা শহর বানালে কেমন হয় যেটা প্রতিদিন একবার পানিতে বসে পড়বে।

www.pathagar.org

নভেম্বরের ঘোলা আকাশে ভেনিস তখন ভুতুড়ে। মাছ ধরার জেটির মতো শহরটা সব সময় তীক্ষ্ণ শব্দ করে আর দোল খায়। এরপরও লিওার আত্মবিশ্বাস ছিল আমরা শহরটা শাসন করতে পারব। আমরা প্রতিদিন হারিয়ে যেতাম এবং বিশেষ করে রাতে। ভুল দিকে মোড় নিয়ে একেবারে বিপজ্জনক গলির শেষ মাথায় চলে যেতাম যেগুলো খালের পানির দিকে গেছে। এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে আমরা একটা দালানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আসলেই দালানটা কঁকাচ্ছিল। লিওা ফিসফিস করে বলেছিল আর কিছু না শয়তানের পেটের ক্ষুধা। আমি তাকে আমার প্রিয় ইটালিয়ান বাক্য দিয়ে বলেছিলাম। 'আত্রাভারসিয়ামোহ।' চলো ওপারে যাই এবং আমরা ভয়ার্ত ভাবে দ্রুত উল্টো পালিয়েছিলাম।

আমরা যেখানে থাকছিলাম তার উল্টোপাশের হোটেলের মালিক সুন্দরী ভেনিসিয়ান মহিলা তার ভাগ্যটা খুবই খারাপ। সে ভেনিসকে ঘৃণা করে। সে কসম কেটে বলেছিল ভেনিসে যারা থাকে সবাই একে কবর খানাই মনে করে। একসময় সে একজন সারডিয়ান চিত্রশিল্পীর প্রেমে পড়েছিল যে তাকে অন্য পৃথিবীর চাঁদ তারা এনে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল কিন্তু শেষে তার তিন বাচ্চাসহ তাকে ফেলে চলে যায়। ভেনিসে ফিরে এসে পারিবারিক রেস্টুরেন্ট চালানো ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না। সে আমার বয়সী হলেও আমার চেয়ে আরও বুড়োটে দেখায়। আমি ভাবতেও পারিনি সেই লোকটা কিভাবে এমন আকর্ষণীয় মহিলাটাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। মহিলাটি বলেছিল, লোকটার আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল আর সে নাকি তার ছায়ার প্রেমেও পাগল ছিল। ভেনিস খুব রক্ষণশীল। মহিলাটার খুব সম্ভবত সেখানে কিছু বিবাহিত পুরুষের সাথে সম্পর্ক থাকে প্রায়ই কিন্তু যেগুলো শেষে কোনো সুখ বয়ে আনে না। প্রতিবেশীরা তাকে নিয়ে কথা বলে বেড়ায়। সে যখন ঘরের ভেতর দিয়ে হেঁটে যায় লোকজন তার সাথে কথা বলে না, তার মা তাকে অনুরোধ করে মিথ্যা করে হলেও একটা বিয়ের আংটি পরতে। বলে, সোনা, এটা রোম নয় যেখানে তুমি মুখে চুন-কালি লেপে বেঁচে থাকতে পারবে। প্রতিদিন সকালে যখন আমি আর লিওা তার রেস্টুরেন্টে এসে সেই যুবতী বৃদ্ধাকে দিনের আবহাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম আর সে তার আঙুলটা বন্দুকের মতো বাঁকিয়ে তার খুলিতে তাক করে বলত, 'আরও বৃষ্টি।'

অবশ্য আমি সেখানে বিষণ্ণতায় ভুগিনি। আমি মানিয়ে নিয়েছিলাম এবং বলতে গেলে কিছু দিনের জন্য একরকম উপভোগ করছিলাম সেই শহরের ডুবন্ত নিঃসঙ্গতাকে। আমার ভেতরে আমি কেমন করে যেন আলাদাভাবে চিনতে পেরেছিলাম সেটা আমার নিঃসঙ্গতা নয়, সেই শহরের নিজস্ব নিঃসঙ্গতা। আমার এবং সেই শহরের মধ্যে পার্থক্য বোঝার মতো মানসিকভাবে আমি তখন স্বাস্থ্যবান। এটা একটা ভাল লক্ষণ। কিছু বছর ধরেই সীমাহীন হতাশায় হারিয়ে গিয়েছিলাম, যখন সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ আমি নিজের মধ্যে অনুভব করতাম। সকল ধরনের দুঃখ আমার ভেতরে চুইয়ে পড়ত এবং দুঃখের আর্দ্র ভেজা ভাবের ছাপ মিলত।

কটকটি লিওার পাশে বিষণ্ণতা নিয়ে বসে থাকা কী সম্ভব? আমার জন্য বিশাল আকৃতির পশমের টুপি কিনে দিতে চাচ্ছিল। এই হচ্ছে লিওা, যে একটা পরী। মধ্যযুগে ভেনিসে মানুষের এক ধরনের একটা পেশা ছিল যার নাম কদেগা– একজন

www.pathagar.org

এমন মানুষ যাকে ব্যক্তির আগে আগে বাতি নিয়ে হাঁটার জন্য ভাড়া করা হতো, যারা পথ দেখাত, চোর এবং ভূত-প্রেতদের ভয় দেখিয়ে অন্ধকার রাস্তায় পথিককে আত্মবিশ্বাস আর নিরাপত্তা দিত। লিগুাই হচ্ছে আমার সাময়িক, বিশেষভাবে ফরমায়েশ করা, ভ্রমণ সহায়ক, ভেনিসিয়ান কদেগা।

৩৩

ট্রেনে চেপে ভেনিস থেকে আবার উষ্ণ, রৌদ্রোজ্জ্বল, নিত্য গোলযোগের শহর রোমে নেমেছিলাম। যেখানে রাস্তায় নামতেই কাছাকাছি কোনো 'ম্যানিফিজতাজিয়ানি' থেকে ফুটবল খেলার মাঠের মতো শোরগোল শুনতে পেয়েছিলাম। আরও একটা শ্রমিক অসন্তোষ, সেবারে তারা হরতাল ডেকেছে। আমার গাড়ির চালকও সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেনি। তাকে দেখেই মনে হয়েছিল এসব কিছুতে তার কিছু যায় আসে না। সে হরতালকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিল 'স্তি কঁজি,' যার ভাষান্তর দাঁড়ায় 'আমার কি!' ফিরতে পেরে খুব ভাল লাগছিল। আসলেই ভেনিসের গুমোট গম্ভীরতার পর এমন একটা শহরে ফিরে ভাল লাগছিল আমার। শহরটা কি ভীষণ জাগ্রত, জীবন্ত, পুতুলের মতো সাজানো, রোদের আলোতে আবেদনময়ী!

আমার বন্ধু মারিয়ার স্বামী জিওলিও একবার আমাকে যা বলেছিল তা মনে পড়ে যায়। আমরা একটা ক্যাফের বাইরের দিকে বসে ভাষা চর্চা করছিলাম। তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, রোমের ব্যাপারে আমার কি মনোভাব। আমি বলেছিলাম,

আমি আসলেই জায়গাটা খুব পছন্দ করি, কিন্তু কেন জানি মনে হয় এটা সেই জায়গা নয় যেখানে আমি আমার বাকি জীবনটা কাটাতে চাই। রোমের কিছু একটা আছে যা আমার জন্য নয়। তবে আমি এখনো বুঝতে পারছি না সেটা কি।

যখন আমরা এসব কথা বলছিলাম তখনই একটা সহায়ক দৃশ্যমান উদাহরণ আমাদের সামনে চলে এসেছিল। একটা বিশুদ্ধ রোমান মহিলা, দারুণ গোছানো, অলংকারে আগাগোড়া মোড়া, চল্লিশের কোঠায় বয়স, চার ইঞ্চি উঁচু জুতা আর একটা আঁটসাঁট স্কার্ট পরা যেটা এক হাত লম্বালম্বিভাবে চেরা, আর রেসের গাড়ীর মতো রোদ চশমা পরা, যেটা বেশ দামি, যে তার রঙিন পাথর উৎকীর্ণ শিকল পরিহিত দেখতে সুন্দর কুকুরটার সাথে কথা বলছিল। তার আঁটসাঁট জ্যাকেটের পশমের কলারটা দেখলে মনে হয়েছিল তার কুকুরের শরীরের পশম দিয়েই যেন বানানো। সে অবিশ্বাস্য রকম মনোমুগ্ধকর আমেজ বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে যেন বলছিল, 'তুমি আমাকে দেখবে কিন্তু আমি তোমার দিকে তাকাবো না।' মনে হয় না সে তার জীবনের দশ মিনিটও মাশকারা ছাড়া থেকেছে। সব দিক দিয়ে সেই মহিলা আমার সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। আমার পোশাকের কথা আর কি বলব, পোশাকের ব্যাপারে

www.pathagar.org

আমি এত বেখায়ালী যে আমার বোন আমাকে ক্ষেপায়, 'স্টিভ নিকস ইয়োগা ক্লাসে পাজামা পরেই চলে যায়।'

আমি জিওলিওকেও সেই মহিলাকে দেখিয়ে বলেছিলাম,

দেখো জিওলিও। ঐ যে একজন রোমান মহিলা। রোম একই সাথে আমার ও এই মহিলার শহর হতে পারে না। আমাদের মধ্যে যে কোনো একজন এর অধিকারী হতে পারে। এবং আমার মনে হয় আমরা, তুমি আমি দুজনই জানি সে কে।

জিওলিও বলেছিল,

হয়ত তোমার আর রোমের শব্দটা আলাদা।

তুমি কি বলতে চাচ্ছ?

সে বলেছিল,

তুমি কি জানো না একটা শহরকে এবং এর মানুষদের জানার গোপন উপায় হচ্ছে সেখানকার রাস্তার শব্দটা কি তা জানা?

ইংরেজি, ইটালিয়ান ভাষা এবং হাতের অঙ্গভঙ্গিতে ব্যাপারটা এরকম ব্যাখ্যা করেছিল জিওলিও, প্রতিটা শহরের একটা শব্দ থাকে যা দ্বারা সেই শহরের মানুষদের বোঝা যায়। কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে আশেপাশের চলতি মানুষের ভাবনা পড়লে দেখা যাবে বেশির ভাগ মানুষের ভাবনা একইরকম। বেশির ভাগ মানুষ যেটা ভাবে সেটাই সেই শহরের শব্দ। এবং যদি একজনের ব্যক্তিগত শব্দের সাথে সেটা না মেলে তাহলে সে আসলেই সেখানকার নয়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

রোমের শব্দ কি?

সে ঘোষণা করেছিল,

'যৌনতা।'

কিন্তু এভাবে কি রোমকে ঢালাও ভাবে একটা ছকে ফেলে দেওয়া হলো না?

না।

কিন্তু আমি নিশ্চিত, কিছু লোক তো অবশ্যই আছে যারা যৌনতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবে?

জিওলিও তা মানতে নারাজ। সে জোর দিয়ে বলেছিল,

না তারা সবাই সারা দিন একটা জিনিস নিয়েই ভাবে আর তা হলো যৌনতা।

ভ্যাটিকানেও তাই?

সেটা আলাদা। ভ্যাটিকান রোমের অংশ না। তাদের সেখানে অন্য একটা শব্দ আছে। তাদের শব্দ হচ্ছে ক্ষমতা।

আমার মনে হয় এটা হতে পারে বিশ্বাস।

সে আবার জোর দিয়ে বলেছিল,

না এটা ক্ষমতাই। কিন্তু বিশ্বাস কর রোমের শব্দটা হচ্ছে যৌনতা।

জিওলিওর কথা বিশ্বাস করলে 'যৌনতা' এই ছোট শব্দটা রোমের রাস্তায় আমার পায়ের নিচে পাথরের মতো সাজানো আছে, ঝরনা থেকে উৎসরণ হচ্ছে, সড়কের কোলাহলের মতো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। এই নিয়েই যত ভাবনা, জামা কাপড় পরা, কোনো কিছু মেনে নেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করা, এ থেকে খেলাধুলা বানানো এ

www.pathagar.org

সবই এই শব্দটা ঘিরে তৈরি হচ্ছে। এতেই বোঝা যায় কেন এত জাঁকজমক সত্ত্বেও রোম আমার নিজের শহরের মতো নয়। আমার জীবনের এই মুহূর্তের জন্য তো নয়ই। কেননা যৌনতা সেই মুহূর্তে আমার শব্দ নয়। এটা অন্য একটা সময়ে ছিল হয়ত কিন্তু এখন না। তাই রোমের এই শব্দটা এখানকার রাস্তায় চর্কির মতো ঘুরে হঠাৎ আমার সাথে ধাক্কা খেত, আমার গায়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ত। তবু আমার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। তাই আমি একেবারে সেখানে থাকতে চাইনি। তত্ত্বটা অবশ্য অপ্রমাণিত, যা প্রমাণ করা অসম্ভব। আমার কাছে কিন্তু ভাল লেগেছে।

জিওলিও জিজ্ঞেস করেছিল,

নিউইয়র্ক শহরের শব্দটা কি?

আমি কিছুক্ষণ এ নিয়ে ভেবে বলেছিলাম,

এটা একটা ক্রিয়াবাচক শব্দ অবশ্যই। আমার ধারণা এটা হবে অর্জন।

সূক্ষ্মভাবে এটা লসএঞ্জেলসের শব্দটা থেকে আলাদা। আমার কাছে মনে হয় লস এঞ্জেলসের শব্দটা হচ্ছে সফল হওয়া। পরে আমি এই পুরো তত্ত্বটা আমার সুইডিশ বন্ধু সোফির সাথে আলোচনা করেছিলাম। এবং সে বলেছিল স্টকহোমে রাস্তার শব্দটা হচ্ছে মেনে নেওয়া যা আমাদের দুজনের মন খারাপ করিয়ে দিয়েছিল।

আমি জিওলিওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম নেপলসের শব্দটা কি? সে দক্ষিণ ইটালি সম্পর্কে বেশ ভাল জানে।

সে বলেছিল, লড়াই। তুমি যখন বেড়ে উঠছিলে তখন তোমার পরিবারের শব্দটা কি ছিল?

এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে আমি অল্প আর অভ্যস্ত এই দুই শব্দের একটা সহজ সমন্বয়ের কথা ভাবছিলাম কিন্তু এর মধ্যেই সে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটা করে ফেলেছিল,

তোমার শব্দটা কী?

তখন আমি আসলেই উত্তর দিতে পারছিলাম না। এমনকি কয়েক সপ্তাহ ভাবার পর আমি এই প্রশ্নের ভাল একটা উত্তর খুঁজে পাইনি। আমি জানি কিছু শব্দ, যেগুলো অবশ্যই আমার শব্দ হতে পারে না। এটা যে 'বিয়ে' না তা প্রমাণিত। এটা 'পরিবার' নয়, যদিও আমার স্বামীর সাথে কয়েক বছর যে শহরে থেকেছি তার শব্দ পরিবার কিন্তু এখনো আমি শব্দটার সাথে খাপ খাওয়াতে পারিনি আর তাই তো কত দুর্ভোগেই না পড়লাম। তখন আর সেটা 'বিষণ্নতা' নয়। স্টকহোমের শব্দটা 'প্রতিরূপ' নিয়েও আমি ভাবছিলাম না। আমি তখন ভেতরে ভেতরে নিউইয়র্কের 'অর্জন' করা শব্দটাও আর লালন করি না। এটা আমার বিশের কোঠার বয়সের শব্দ হতে পারে। আমার শব্দটা হয়ত 'খোজা'! সত্য বলতে আবার বলতে হয় এর সাথে লুকানো শব্দটাও তাহলে জুড়ে যায়। ইটালিতে গত মাস পর্যন্ত আমার শব্দটা ছিল 'আনন্দ।' কিন্তু শব্দটা আমার প্রতিটা অংশের অর্থ বহন করে না আর তা হলে আমি ভারতে যাওয়ার জন্য উতলা হতাম না। আমার শব্দটা হতে পারে 'ত্যাগ' কিন্তু যে আমি গুণে দেখি না কত বোতল মদ খেলাম, সে ক্ষেত্রে শব্দটা অতি ভাল একটা আমেজ তৈরি করে যা আমি আসলে নই।

www.pathagar.org

আমি উত্তরটা জানিই না এবং আমার মনে হয় সেই বছরের ভ্রমণটা আসলে আমার শব্দটা খোঁজার জন্যই ছিল। কিন্তু একটা কথা আমি সুনিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে– আমার শব্দটা 'যৌনতা' নয়। আচ্ছা আমি যে দাবি করছিলাম 'যৌনতা' আমার শব্দ নয় তাহলে একদিন সকালে আমার পা দুটো যন্ত্রের মতো কেন ভিয়া কনদত্তির একটা নিজস্ব ধরনের ফ্যাশন সামগ্রীর দোকানে ছুটে গিয়েছিল? কেন সেখানে একটা অভিজ্ঞ মোহনীয় ইটালিয়ান দোকানি মেয়ের তত্ত্বাবধানে স্বপ্নিল কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে একটা আন্তঃমহাদেশীয় বিমান ভ্রমণের সমান টাকা খুইয়েছিলাম? এতগুলো মেয়েলি অন্তর্বাস কিনেছিলাম যা একটা সুলতানের সকল শয্যাসঙ্গিনীর এক হাজার এক রাতের জন্য যথেষ্ট। আমি সকল আকৃতির সকল ধরনের বক্ষ বন্ধনী কিনেছিলাম। সিনেমার মতো, পাতলা আবরণের এবং চিকন পাড় দেওয়া সকল রঙের প্যান্টি। যেন পিছলে পড়েছিলাম, মাখনের মতো কোমল সাটিন কাপড়ে এবং পিছলে পড়ছিলাম শিশুর ত্বকের মতো মোলায়েম সিল্ক কাপড়ে। হাতের তৈরি সুতোর কাজের জিনিসগুলো বিশেষত ভেলভেটের, পাতলা পার দেওয়া দারুণ আদুরে জিনিসগুলোর একটার পর একটা কিনেই চলেছিলাম।

আমি জীবনে কখনো এরকম কিছু কিনিনি। কিন্তু সেদিন কেন? আমি যেভাবে হাতের নিচে গোপন নিষিদ্ধ কিছুর মতো টিস্যু দিয়ে মুড়িয়ে দোকান থেকে বের হয়েছিলাম তাতে হঠাৎ আমার একটা হতাশাব্যঞ্জক প্রশ্নের কথা মনে হয়েছিল। যা আমি রোমান ফুটবল ভক্তদের লাজিও খেলার দিন চিৎকার করে বলতে শুনেছিলাম। জনপ্রিয় লাজিও খেলোয়াড় আলবার্তিনি একটা জটিল মুহূর্তে বলটা ডানদিকে জনশূন্য স্থানে ঠেলে দিয়েছিল। যা খেলাটাকে বাজে দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

পের কে?

ভক্তরা পাগলের মতো চিৎকার করছিল,

কার জন্য তুমি বলটা সেখানে ঠেলে দিলে আলবার্তিনি? সেখানে কেউ নেই?

রাস্তায় আমার মেয়েলি অন্তর্বাস কেনার পর, আমার এই লাইনগুলো মনে পড়েছিল, আবিষ্কার করেছিলাম নিজের কানে কানে নিজেই ফিসফিস করে বলেছি,

'পের কে?'

'কার জন্য? লিজ?'

কার জন্য এইসব স্থূল যৌন সরঞ্জাম। কেউ নেই। ইটালিতে আমার মাত্র কয়েক সপ্তাহ ছিল এবং তখন আসলেই আমার কারো দ্বারে কড়া নাড়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিংবা আসলে ছিল কি? আমি কি আসলে শেষমেশ রোমের রাস্তার শব্দ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম। সেটা কি ইটালিয়ান হওয়ার শেষ চেষ্টা ছিল? কিংবা সেটা কি নিজেকে দেওয়া একটা উপহার ছিল কিংবা কাল্পনিক ভবিতব্য প্রেমিকের জন্য ছিল? সেটা কি আমার বিগত সম্পর্কের ধ্বংসযজ্ঞের ফলে সৃষ্ট যৌন বিতৃষ্ণা থেকে সেরে ওঠার প্রথম লক্ষণ ছিল।

আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

www.pathagar.org

তুমি কি তবে এসব নিয়ে ভারতে যাবে?

৩৪

লুকা স্পেগেটির জন্মদিন সেবছর থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের দিন পড়ে। তাই সে একটা টার্কি তন্দুর করতে চায়। আমেরিকান থ্যাংক্স গিভিং উৎসবে যেমনটা বড় মোটা টার্কি তন্দুর করা হয় তেমনটা সে নাকি কখনো খায়নি। কেবল ছবিতেই দেখেছে। তার মতে একটা উৎসব সেখানেও তো করা যাবে। বিশেষ করে যেখানে আমার মতো একজন আমেরিকান আছে। এক্ষেত্রে আমরা তার বন্ধু মারিও আর সিমোনার রান্নাঘর ব্যবহার করতে পারব। তাদের পাহাড়ের ধারে অনেক বড় একটা বাড়ি আছে আর তারাই নাকি সবসময় লুকার জন্মদিনের উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

উৎসব নিয়ে লুকার পরিকল্পনা ছিল, সে আমাকে রাত সাতটার দিকে নিতে আসত তারপর বাকি কাজ শেষ করে রোমের উত্তর দিকে এক ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে তার বন্ধুর বাড়ি যেতাম যেখানে আমরা অন্য মেহমানদের সাথে দেখা করতে পারতাম এবং আমরা কিছুক্ষণ মদ্য পান করতাম, সবাই সবার সাথে পরিচিত হতাম এবং তারপর রাত নয়টায় আমরা একটা বিশ পাউন্ড ওজনের টার্কি তন্দুর করা শুরু করতে পারতাম।

আমার লুকাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছিল একটা বিশ পাউন্ড ওজনের টার্কি তন্দুর করতে যে সময় লাগবে তাতে জন্মদিনের খাবার খেতে খেতে পরের দিন ভোর হয়ে যাবে।

বলেছিলাম এর চেয়ে ভাল হয় চলো আমরা পিজার ব্যবস্থা করি, আমেরিকান অনানুষ্ঠানিক পরিবারগুলো থ্যাংকস গিভিংয়ের দিন এটাই করে থাকে।

কিন্তু এটা নিয়ে তার তখনো মন খারাপ। যদিও ইটালিতে ঠিক সেই মুহূর্তে সামগ্রিক দুঃখ চলছিল। ভীষণ শীত নেমেছিল। পরিষ্কার কর্মী, ট্রেনের চাকুরে এবং জাতীয় আকাশযানের সকল কর্মীরা একই দিনে হরতাল ডেকেছিল। একটা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল, ময়দায় গ্লুটেন নামে এক প্রকার প্রোটিন থাকে, যা থেকে এলার্জি হয়। ইটালিয়ান সংস্কৃতিতে পাস্তা, পিজা আর রুটি খাওয়ার চল বেশি থাকায় প্রায় ৩৬ ভাগ ইটালিয়ান বাচ্চাদের গ্লুটেন এলার্জি আছে। আর আরও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে খুব সম্প্রতি একটা কলাম দেখেছিলাম। যার শিরোনামটাও চমকে দেওয়ার মতো 'ইন্সোডিস্ফেট সিক্স ডন্নে সু টেন' যার মানে হচ্ছে দশ জনের মধ্যে ছয় জন ইটালিয়ান মহিলা যৌনমিলনে অসন্তুষ্ট। পঁয়ত্রিশ ভাগ পুরুষ জানিয়েছে তাদের বীর্যপাত তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গবেষকদের সাথেও আমি হতোবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। 'আচ্ছা! রোমের শব্দ হিসেবে এখনো কি যৌনতা শব্দটা আর প্রযোজ্য!'

www.pathagar.org

'আরও কিছু জরুরী দুঃসংবাদ' ছিল ঊনিশ জন ইটালিয়ান সৈনিক সম্প্রতি ইরাকে আমেরিকান যুদ্ধে গেছে। বিশাল সংখ্যার ইটালিয়ান সৈনিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে এখন পর্যন্ত মারা গেছে। রোমানরা এই খবরে এতই মর্মাহত হয়েছিল যে ছেলেগুলোর অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময় পুরো শহরে ছুটি ঘোষণা করেছিল। আসলে একটা বড় সংখ্যার ইটালিয়ান সৈনিক বুশের যুদ্ধে কোনো ভূমিকা রাখতে চায়নি। এক্ষেত্রে যুদ্ধে জড়ানোর সিদ্ধান্তটা ছিল ইটালির প্রধানমন্ত্রী সিলভিও ভারলুস্কনির, সেখানকার ইতিহাসে সেই অধ্যায়টা এলো ইডিয়টও নামে পরিচিত। এই বোধহীন ব্যক্তি, যে কিনা ফুটবল ক্লাবের মালিকানা নেওয়া ব্যবসায়ী, দুর্নীতির নোংরা তৈলাক্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা, যে কিনা প্রতিনিয়ত ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে তার নাগরিকদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়, যে বক্তব্য প্রদানের শিল্পে ওস্তাদ এখানে সেটাকে বলে 'আরিয়া ফ্রিতা' মানে, ফাঁকা বুলি। যে দক্ষভাবে মিডিয়াকে ধোকা দেয়, কারো অধীনে থাকলে এটা কোনো ব্যাপারই না এবং যে সাধারণত একজন বিশ্ব নেতার মতো আচরণ করে না, মনে হয় যেন ওয়াটার-বেরি মেয়র। অন্য পাঠকরা ক্ষমা করবেন মেয়রের তুলনাটা কানেকটিকাটের অধিবাসীদের জন্য একটা আভ্যন্তরীণ কৌতুক। সে এখন ইটালিয়ান লোকদের এমন যুদ্ধে জড়িত করেছে যেটা ইটালিয়ানরা তাদের বিষয় বলে মনে করে না।

মৃত সৈনিকদের শোকসভায় বারলাসকনি বলেছিলেন, 'তারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন।' কিন্তু বেশির ভাগ ইটালিয়ান এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, 'তারা জর্জ বুশের ব্যক্তিগত জাতি বিভেদে মারা গেছে।' এরকম রাজনৈতিক পরিবেশে আমেরিকানদের জন্য ইটালি ভ্রমণ করা কঠিন বলে মনে হতে পারে। আমিও ভেবেছিলাম আমাকে ইটালিয়ানদের বিরক্তি ভাব সইতে হবে প্রচুর। কিন্তু এর বদলে আন্তরিকতাই পেয়েছি ইটালিয়ানদের কাছ থেকে। জর্জ বুশের কথা উঠলে, মানুষজন বারলাসকনির ব্যাপারেও বিব্রত হতো। তারা বলত, 'আমরা জানি কেমন সে, আমাদেরও তো একজন আছে।'

শুনতে বাজে শোনায় সেই পরিস্থিতিতে লুকা আমেরিকান থ্যংক্স গিভিং দিবসে তার জন্মদিন করতে চায়। কিন্তু আমার পছন্দ হয়েছিল বুদ্ধিটা। থ্যাঙ্কস গিভিং একটা চমৎকার ছুটির দিন যেটা নিয়ে আমেরিকানরা গর্ব করতে পারে। এটা আমাদের এমন একটা জাতীয় উৎসব যা এখনো তুলনামূলকভাবে বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত হয়েছে কম। এটা একটা দয়ার দিন, ধন্যবাদ দেওয়ার দিন এবং সকল জাতি নির্বিশেষে পালন করার মতো একটা দিন, হ্যাঁ, আনন্দেরও দিন। এবং ঠিক এরকম কিছুই আমাদের এই মুহূর্তে দরকার।

তখন সপ্তাহ শেষে আমার সাথে ছুটি কাটাতে আমার বন্ধু ডেবোরাহ ফিলাডেলফিয়া থেকে ইটালিতে আসে। ডেবোরাহ আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, একজন লেখিকা, একজন নারীবাদী চিন্তাবিদ। কিন্তু বহুদিন আগে যখন ফিলিতে খাবার পরিবেশনকারী হিসেবে কাজ করতাম তখন থেকে আজও কিন্তু সে আমার একজন প্রিয় গ্রাহকই আছে। সে দুপুরের খাবার খেতে আসত। সাথে নিত বরফ ছাড়া ডায়েট কোক আর কাউন্টারের অপর পাশ থেকে আমার সাথে বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলত। সে আসলেই সেই যোগাযোগটাকে বন্ধুত্বে নিয়ে গিয়েছিল। প্রায়

www.pathagar.org

পনেরো বছর ধরে আমরা বন্ধু। সোফিও লুকার অনুষ্ঠানে এসেছিল, যার সাথে বন্ধুত্ব পনেরো সপ্তাহ ধরে। থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের সবসময় সবাইকে স্বাগতম জানাতে হয়। বিশেষ করে এটা যখন ঘটেছে লুকা স্পেগেটির জন্মদিনের দিন।

সেদিন সন্ধ্যার পর আমরা ধীরে সুস্থে পর্বতের উপরে গাড়ি চালিয়ে যাই। লুকা আমেরিকান সংগীত পছন্দ করে, তাই আমরা ঈগল ব্যাণ্ডের গান বাজিয়ে উচ্চস্বরে গাইতে থাকি, টেক ইটটু দ্য লিমিট ওয়ান মোর টাইম!!! আমাদের কোরাস আর গাড়িতে বাজানো গান জলপাই বন আর পুরোনো জলনালির ভেতর দিয়ে খুব ভাল সংগীতের সুর তৈরি করে। আমরা লুকার পুরোনো বন্ধু মারিও এবং সিমোনার বাসায় পৌঁছাই। তারা বারো বছর বয়সী যমজ মেয়ে জিওলিয়া আর সারার বাবা মা। ফুটবল খেলার আগে পাওলো নামে লুকার এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছিল সেও তার প্রেমিকার সাথে এসেছিল। এবং অবশ্যই লুকার নিজের প্রেমিকা জিওলিয়ানাও সন্ধ্যার আগেই গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছিল। জলপাই বাগানের ভেতর লুকানো, ক্লেমেন্টাইন আর লেবুগাছের ছায়ায় কি অদ্ভুত সুন্দর একটা বাড়ি! ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলে তাদের হাতের তৈরি অলিভ অয়েল দিয়ে।

বিশ পাউন্ড ওজনের টার্কি তন্দুর করার সময় ছিল না আসলে। কিন্তু লুকা সুন্দর করে কিছু টার্কির বুকের মাংস ভাজে এবং আমি বাতাসের গতিতে এর ভেতর ঠাসাঠাসি করে যথাসম্ভব থ্যাঙ্কস গিভিং রীতির পুর দিয়ে দেই। যতদূর রেসিপি মনে ছিল আমি তার সর্বাত্মক চেষ্টা করি। ইটালিয়ান লম্বা রুটি গুঁড়া করে ব্রেড ক্রাম বানাই, সাথে কিছু প্রচলিত খাবারের যোগ করি। এপ্রিকটের বদলে খেজুর, সেলেরির বদলে মৌরি। যেকোনোভাবেই হোক সেদিন খাবারের ব্যবস্থাটা খুব ভাল হয়। লুকা চিন্তিত ছিল সেই রাতে আমাদের কথোপকথন কিভাবে এগুবে তা নিয়ে। কেননা আমাদের অর্ধেক মানুষ ইংরেজিতে কথা বলে আর অর্ধেক ইটালিয়ান ভাষায় আর একমাত্র সোফী শুধু সুইডিশ ভাষা জানে। কিন্তু মনে হচ্ছিল সেটা একটা আশ্চর্যজনক সন্ধ্যা যেখানে আমরা সবাই সবার কথা বুঝতে পারি, অন্তত কোনো শব্দে আটকে গেলে পাশের জন এগিয়ে আসে।

গুণিনি কত বোতল সারডিনিয়ান মদ আমরা পান করেছিলাম। এরপর ডেবোরাহ টেবিলে একটা প্রস্তাব পেশ করে। আমেরিকান একটা চলতি প্রথা অনুযায়ী আমরা যাতে হাতে হাত রেখে এক জনের পর এক জন বলি আমরা কি কারণে কৃতজ্ঞ। আমাদের মতে তিন ভাষায় এই সমন্বিত উদাত্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একটা ঐশ্বরিক বিবৃতি হয়ে থাকবে।

প্রথমে ডেবোরাহ শুরু করে সে কৃতজ্ঞ কারণ আমেরিকা দ্রুত তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সুযোগ পাবে। সোফি বলে, প্রথমে সুইডিশ ভাষায় তারপর ইটালি ভাষায় পরে ইংরেজি ভাষায়, ইটালির বদান্যতায় সে কৃতজ্ঞ। এই চার মাস এই দেশে সে যে পরিমাণ আনন্দে কাটিয়েছে তা বলার মতো নয়। কান্না শুরু হয় যখন আমাদের নিমন্ত্রণকারী মারিও ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার কাজের জন্য, তার এত সুন্দর বাড়ির জন্য। যেখানে তার পরিবার আর বন্ধুরা আনন্দ উৎসব করতে পারছে। তখন পাওলো হেসে দিয়ে বলে, সেও কৃতজ্ঞ এই জন্য যে আমেরিকা নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে পারবে। আমরা

www.pathagar.org

ছোট সারার সম্মানে কিছুক্ষণ চুপ থাকি। বারো বছর বয়সী যমজের একজন সে। সে কৃতজ্ঞতা জানায় এখানে এত ভাল মানুষদের সাথে আজ সে আছে। বহুদিন ধরে সে স্কুলে খারাপ সময় কাটাচ্ছিল কেননা কিছু ছাত্র-ছাত্রী তাকে সবসময় নিচু দেখাতে চেষ্টা করত। সে বলে, তাই আমার সাথে ভাল আচরণের জন্য এবং আমাকে তুচ্ছ না করায় আপনাদের ধন্যবাদ। লুকার প্রেমিকা বলে সে কৃতজ্ঞ বছরের পর বছর লুকা তার প্রতি যে সততা প্রদর্শন করেছে এবং বিপদের সময় তার পরিবারকে যে সাহায্য করেছে তার জন্য। সিমোনা আমাদের নিমন্ত্রণকারীনি, সে তার স্বামীর চেয়েও গলা ছেড়ে কান্না করে বলে, সে কৃতজ্ঞ উৎসবের এবং ধন্যবাদ দেওয়ার একটা নতুন রীতি তার বাড়িতে এই আগন্তুকরা আজ এনেছে। যারা আসলে আগন্তুক নয় লুকার বন্ধু এবং শান্তির বন্ধু।

আমার বলার সময় এলে আমি বলতে শুরু করি, 'সনো গ্রাতা' তারপর বুঝতে পারি আমি আমার সত্যিকারের ভাবনাটা বলতে পারছি না। যেমন সে আমি ছিলাম রাতে বিষণ্ণতা থেকে মুক্ত যা আমাকে বছরের পর বছর ইঁদুরের মতো জ্বালাতন করছিল। একটা বিষণ্ণতা যা আমার আত্মা ফুটো করে চিবিয়ে খাচ্ছিল। যে কারণে একটা সময়ে আমি এমন একটা সুন্দর রাত উপভোগ করতে পারতাম না। আমি এসবের কিছুই উল্লেখ করিনি সেদিন কেননা সেখানে বাচ্চারাও ছিল। তখন এর বদলে আমি সরল কিছু সত্য বলি যে,

আমি পুরোনো এবং নতুন বন্ধুদের নিয়ে কৃতজ্ঞ। যার জন্য আমি বিশেষ করে আজ রাতে কৃতজ্ঞ, সে হচ্ছে লুকা স্পেগেটি। তাই আমি কামনা করি তার তেত্রিশতম জন্মদিন শুভ হোক। অন্য মানুষের কাছে যে একজন পুরুষকে কেমন উদার এবং সৎ হতে হয়, কেমন প্রেমিক হতে হয় তার উদাহরণ হয়ে আশা করি সে অনেক বছর বাঁচবে। এবং তাই আমি আশা করি কেউ কিছু মনে করবেন না এসব বলে আমি কেঁদে ফেলছি।

অবশ্য আমার মনে হয়নি কেউ কিছু মনে করবে কারণ সবাই আসলে কাঁদছিল।

লুকা আবেগে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে সে শুধু এটাই বলতে পেরেছিল,

তোমাদের কান্নাই আমার জন্য প্রার্থনা।

সারডিনান মদ চলছিল। যখন পাওলো থালা বাসন ধুচ্ছিল এবং মারিও তার মেয়েকে বিছানায় শুইয়েছিল এবং লুকা গিটার বাজিয়েছিল এবং সবাই মাতাল হয়ে নানান উচ্চারণে নেইল ইয়াং এর গান গাচ্ছিল তখন ডেবোরাহ আমাকে শান্তভাবে বলেছিল,

এই ইটালিয়ান পুরুষগুলোকে দেখো, কত ভাল এরা। দেখ তারা কত খোলা মনের, কত মায়ায় তারা পরিবারের কাজে অংশগ্রহণ করে। দেখ তারা তাদের জীবনে মেয়েদের আর শিশুদের কেমন আন্তরিকতা আর সম্মান দেখায়। কাগজে যা পড় তা বিশ্বাস করো না লিজ। দেশটা খুব এগিয়ে যাচ্ছে।

সেই রাতে ভোর পর্যন্ত আমাদের উৎসব চলতে থাকে। আর আমরা বিশ কেজি ওজনের টার্কি তন্দুর করেছিলাম সকালের নাস্তায় খেতে তো হবে। লুকা স্পেগেটি আমাকে ডেবোরাহ আর সোফিকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল। আমরা তাকে 'ক্রিসমাস কারলোস, সাইলেন্ট নাইট, সেইন্টেড নাইট, হলি নাইট' এই গান গেয়ে

www.pathagar.org

জেগে থাকতে সাহায্য করেছিলাম। রোমে পৌছানো পর্যন্ত, যত ভাষা জানি সব ভাষায় এই গানটাই বারবার গেয়েছিলাম।

৩৫

কিছুই গায়ে চাপাতে পারছিলাম না। ইটালিতে চার মাস থাকার পর একটা প্যান্টও আর ঠিকঠাক হচ্ছিল না। এমনকি এক মাসে কেনা পোশাকগুলোও তখন আর কাজে দিচ্ছিল না। যেগুলো দ্বিতীয় মাসে মোটা হওয়ার পর কিনেছিলাম, প্রতি সপ্তাহে এক আলমারি ভর্তি জামা-কাপড় কেনা আমার জন্য সম্ভব ছিল নাকি! অবশ্য আমি জানতাম শীঘ্রই আমি ভারতে যাব এবং সেখানে এই অতিরিক্ত চর্বিগুলো গলে যাবে। কিন্তু তাতে কি তখন এই প্যান্টগুলো পরে তো আমি আর হাঁটতেই পারছিলাম না। আর সহ্য হচ্ছিল না।

কয়েকদিন হয় একটা সৌখিন ইটালিয়ান হোটেলে আমি আমার ওজন মেপে জেনেছিলাম যে সেই চার মাসে আমার ওজন বেড়েছে তেইশ পাউন্ড। বেশ বড় মাপের একটা ওজন। স্বাভাবিক ওজন পেতে প্রায় পনেরো পাউন্ড আমার এমনি বাড়ার কথা ছিল কেননা বিগত কয়েক বছর বিবাহবিচ্ছেদ আর প্রেমের জটিলতা নিয়ে আমি কী কংকালসারটাই না হয়ে গিয়েছিলাম! আমি ধরে নিয়েছিলাম, শেষের পাঁচ কেজি তো আমি দুষ্টামি করে করে বাড়িয়েছি। আর বাকি বাদ তিন পাউন্ড, এটা প্রমাণ করতে যে আমি আসলে ওজন বাড়াতে পারি।

কিন্তু এটা ঠিক যে আমি এমন একটা জিনিস কিনেছিলাম যা আমার সারা জীবন আনন্দের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিতে পারি আর তা হলো একটা ইটালিয়ান জিন্স। দোকানের যুবতী মেয়েটা ক্রমাগত বড় থেকে বড় সাইজের পন্য নিয়ে আসছিল আর পর্দার আড়াল থেকে আমার হাতে দিয়ে যাচ্ছিল। শুধু জিজ্ঞেস করছিল। এটা কি লেগেছে। বারবার আমাকেও মাথা পর্দা থেকে বের করে বলতে হয়েছিল, ক্ষমা করবেন আপনার কাছে কি আর একটু বড় সাইজের কিছু আছে? শেষ পর্যন্ত সেই মিষ্টি যুবতী মেয়েটা এমন এক সাইজের জিন্স দিয়েছিল যা দেখেই আমার চোখ ব্যথা করছিল। আমি ড্রেসিং রুম থেকে বের হয়ে নিজেকে বিক্রেতা মেয়েটার সামনে উপস্থিত করেছিলাম।

সে পলক ফেলেনি বরং সে যেন শিল্পবোদ্ধার মতো একটা ফুলদানির মূল্য পরিমাপ করার চেষ্টা করছিল। একটা বিরাট বড় ফুলদানির।

শেষমেশ সে বলেছিল,

কারিনা। যার মানে সুন্দর।

আমি তাকে বলেছিলাম এই জিন্স পরে আমাকে কি গরুর মতো লাগছে।

সে বলেছিল,

না সিনোরিনা আপনাকে গরুর মতো লাগছে না।

www.pathagar.org

আমাকে কি শূকরের মতো লাগছে?

সে আরও বিব্রতভাবে বলেছিল,

না। না।

যাক আমি শূকরের মতো না অন্তত! মহিষের মতো কি?

শব্দকোষের দারুণ চর্চা হচ্ছিল। আমি আসলে বিক্রেতা মেয়েটার মুখ থেকে হাসিও বের করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু সে যেন পেশাদার থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

আমি আর একবার চেষ্টা করেছিলাম।

হয়ত আমাকে একটা মহিষের দুধের মজোরেলা পনিরের মতো দেখাচ্ছে?

সে মৃদু হেসে স্বীকার করেছিল,

হ্যাঁ। ঠিক আছে। হয়ত তোমাকে কিছুটা মহিষের দুধের মজোরেলা পনিরের মতোই দেখাচ্ছে।

৩৬

তখন আর মাত্র এক সপ্তাহ অবস্থানের সময় ছিল। ভারতে যাওয়ার আগে আগত বড়দিনটায় আমি একটু আমেরিকা ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম। শুধু এজন্য নয় যে পরিবার ছাড়া বড়দিন পালন করতে আমার কষ্ট হবে। আসলে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া যাব বলে আমার সামনে আরও আট মাসের ভ্রমণ পড়ে ছিল আর যে জন্য নতুন করে বাক্স পেটরা গোছগাছ করতেও তো হবে। ইটালিতে থাকতে যা যা জিনিস লেগেছে তার খুব অল্প কিছুই ভারতে থাকার সময় কাজে লাগবে।

হয়ত শেষের সেই সপ্তাহটা সিসিলির ভেতর দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটা আসলে আমার ভারত ভ্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি ছিল। ইটালির অন্যতম তৃতীয় বিশ্ব সিসিলি এবং অন্য একটা অতিমাত্রার দরিদ্র দেশের মুখোমুখি হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতির জন্য খুব খারাপ একটা উদাহরণ নয় সেই দেশ। কিংবা হয়ত আমি সিসিলি এই জন্য যেতে চাচ্ছিলাম কেননা গৌদি বলেছিলেন, ইটালিকে বুঝতে হলে সিসিলি যেতে হবে।

কিন্তু সিসিলি যাওয়া কিংবা এর আশেপাশে ঘোরাও এত সহজ ছিল না। এর জন্য আমাকে পুরো মাথা খাটিয়ে একটা ট্রেন খুঁজতে হয়েছিল যা রবিবার উপকূলে পৌঁছে দেয়। তারপর মেসিনা যাওয়ার সঠিক ফেরি নৌকা খুঁজতে হয়েছিল। একটা ভয়ার্ত এবং সন্দেহজনক বন্দর শহর। দেখে মনে হয় ব্যারিকেডের ভেতর থেকে শহরটা চিৎকার করে বলছে, আমি দুঃখিত, 'আমি কুৎসিত। কিন্তু আমার ওপর ভূমিকম্প হয়েছে, কার্পেট বোমা ছোঁড়া হয়েছে এবং মাফিয়াদের দ্বারাও আমি ধর্ষিত হয়েছি।' সেখানে মেসিনা পৌঁছে আমাকে একটা বাস স্টেশন খুঁজতে হয়েছিল। তাওরমিনা না যাওয়া পর্যন্ত আমি সিসিলির পূর্ব উপকূলের বিস্ময়কর ও মজবুত সমুদ্র সৈকত এবং পাহাড়ে কিছুক্ষণ নিরর্থক সময় কাটাই। তারপর আমাকে একটা ট্যাক্সি ও হোটেল খুঁজতে হয়। তারপর খুঁজতে হয়েছিল একটা সঠিক লোককে যাকে কিনা আমার সেই

www.pathagar.org

প্রিয় প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা যায়, 'আচ্ছা বলেন তো এই শহরের সবচেয়ে ভাল খাবার কোথায় পাওয়া যায়'? দেখা গিয়েছিল তাওরমিনার সেই লোকটা একজন ঘুম ঘুম চোখের পুলিশ। সে আমার হাতে এমন একটা জিনিস দিয়েছিল যা আমার সারাজীবনেও কেউ দেয়নি। একটা ছোট কাগজের টুকরোতে একটা রেস্টুরেন্টের নাম, কিভাবে জায়গাটায় যেতে হবে তার হাতে আঁকা একটা ম্যাপ।

দেখা গেল সেটা একটা জল-খাবারের দোকান। যেখানে ছোটখাটো মিশুক একজন মহিলা তার সন্ধ্যার কাস্টমারদের জন্য তৈরি হচ্ছিল। সে মোজা পরা পায়ে রেস্টুরেন্টের জানালা এভাবে মোছার চেষ্টা করছিল যাতে বড়দিনের ক্রিচের কোনো ক্ষতি না হয়। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি খাবারের তালিকা দেখব না কিন্তু সে কি আমাকে এখানকার সবচেয়ে ভাল খাবারটা এনে দিতে পারে কেননা সিসিলিতে এটা আমার প্রথম রাত। সে আনন্দে হাত কচলে সিসিলির আঞ্চলিক ভাষায় রান্নাঘরে তার বৃদ্ধা মাকে কি যেন বলেছিল এবং এর প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যে আমি কনুই ডুবিয়ে সেই সেরা মজার খাবারটা খেয়েছিলাম, যা আমি রোমেও খাইনি। সেটা পাস্তা। না ঠিক পাস্তা না আসলে পাস্তার একটা আকৃতি। আমি এমন বড়, তাজা পাস্তার শিট আগে কখনো দেখিনি। যেটাকে রাবোলির নামে একটা খাবারের মতো মুড়িয়ে পোপের টুপির আকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ভেতরে পুর হিসেবে দেওয়া হয়েছিল গরম গরম সুগন্ধি সামুদ্রিক আর্থপ্রোডো গোত্রের মাছের নির্জাস, অক্টোপাস আর স্কুইড। এটা পরিবেশন করা হয়েছিল গরম সালাদ, তাজা ঝিনুক আর জুলিয়ান কাটেড় সবজির সাথে। পুরো জিনিসটা যেন সাঁতার কাটছিল জলপাই তেলের ঝোলের ওপর। আর এর পর-পর দিয়েছিল টাইম নামের একটা সুগন্ধি গুল্মের ঝোল দিয়ে খরগোসের মাংস।

পরের দিন সায়রাকিউজে এর চেয়েও ভাল কেটেছিল। দিনের শেষে বাস আমাকে ঠাণ্ডা বৃষ্টির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে রেখে যায়। সায়রাকিউজ! আমার পায়ের নিচে তখন তিনশ হাজার বছরের ইতিহাস! এটা এমন একটা পুরোনো সভ্যতা যার কারণে রোমকে ডালাসের মতো দেখায়। মিথলজি অনুযায়ী ক্রিট থেকে দায়দালুস সেখানে উড়ে এসেছিল এবং হারকিউলিস একসময় সেখানে ঘুমিয়ে ছিল। সাইরাকিউজ গ্রিকদের এমন একটা বসতি ছিল যাকে থুসাইডিডেস বলেছিল, 'এথেন্স এর চেয়ে কোনো অংশেই নিকৃষ্ট নয়।' প্রাচীন গ্রিক আর প্রাচীন রোমের যোগসূত্র ছিল সেই সাইরাকিউজ। অনাদিকাল থেকে অনেক নাট্যকার আর বিজ্ঞানীদের বসবাস ছিল সেখানে। প্লুটোর মতে এটা একটা কাল্পনিক গবেষণার উপযুক্ত স্থান হয়ে উঠত। দৈব বলে যেখানে দার্শনিকরা হয়ে যেত শাসক এবং শাসকরা হয়ে যেত দার্শনিক। ইতিহাসবিদরা বলেন বাক্যের অলঙ্করণ আবিষ্কার হয় সায়রাকিউজে এবং নাট্যপালাও।

আমি ছেঁড়া-ফাড়া শহরের বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম। যখনই একটা কালো উলের টুপি পরা বৃদ্ধ লোককে দেখতে পাই আমি জানি না কেন কোনো কারণ ছাড়া আমার মন ভালোবাসায় ভরে উঠেছিল। লোকটা তার কাস্টমারদের জন্য মাছ কাটছিল। মুখের ভেতর সিগারেটটা এমন ভাবে রাখা ছিল, যেভাবে নিরাপত্তার জন্য একজন সেলাই-কর্মী সেলাই করার সময় সূই দাঁত দিয়ে ধরে রাখে। তার ছুরি

www.pathagar.org

মনোযোগ দিয়ে সঠিকভাবে মাছের টুকরো করার কাজে নিয়োজিত ছিল। আমি লজ্জিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আজ রাতে আমি কোথায় খেতে পারি? এবং আবার এখানেও একটা কাগজের টুকরো ছোঁ মেরে নিয়ে আমি আমাদের কথোপকথন শেষ করেছিলাম। যেটাতে একটা নামহীন হোটেলের ঠিকানা দেওয়া ছিল। সেই রাতে যত দ্রুত সম্ভব আমি সেই রেস্টুরেন্টে বসে পড়েছিলাম। আহ! মেঘের মতো হালকা রিকোট্টা পনির আর তার সাথে কাঠ বাদাম, সুরভী তেলে ভাসা বড় রুটির টুকরো, ছোট প্লেটে কাটা মাংস আর জলপাই। পেয়াজ আর পার্সলে পাতা দিয়ে মাখানো একটা ঠাণ্ডা কমলার সালাদ। এর আগেও আমি অবশ্য এই কালামারি হাউজের কথা বিশেষভাবে শুনেছিলাম।

প্লুটো বলেছেন, 'কোনো শহরই শান্তিতে থাকতে পারে না তার আইন যেমনই হোক।' যখন এর বাসিন্দারা উৎসব আর পানাহার ছাড়া কিছুই করে না এবং তারা এতে এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে ভালোবাসার শক্তি তাদের থাকে না।

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য এভাবে বেঁচে থাকা কি খুব বেশি খারাপ কিছু? সময় নিয়ে ভ্রমণ করা আর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া একের পর এক মজার খাবার খুঁজে নেওয়া, এভাবে একজনের জীবনের মাত্র কয়েক মাস কাটানো কি খুব ভয়ানক কিছু? কিংবা শুধু নিজের কানে শুনতে ভাল লাগে বলে একটা এমন ভাষা শেখা যাতে বিশেষ কোনো লাভ নেই? কিংবা একটা বাগানে, সূর্যের আলোয়, দিনের মধ্যখানে, আপনার প্রিয় ফোয়ারার পাশে ঘুমিয়ে পড়া? এবং এরপরের দিনও তাই করা?

অবশ্যই এভাবে কেউ চিরকাল জীবন যাপন করতে পারবে না। বাস্তব জীবন, যুদ্ধ, শোক এবং নৈতিকতা এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে। সিসিলির সেই ভয়াবহ দারিদ্র্যে, বাস্তব জীবন কারো চিন্তা থেকেই দূরে নয়। একশো বছর ধরে মাফিয়া ব্যবসা সেখানে সফল, নিজেদের বাঁচাতেই তাদের এই ব্যবসা চালাতে হয় এবং এখনো এটা সবার বুক খামচে ধরে আছে। গয়েথে দাবি করেছিলেন পালেরামো নামে শহরের একসময় অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ছিল। এটা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের একমাত্র শহর যেখানে গেলে এখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নুড়ি-পাথর পাওয়া যাবে। শুধু এখানকার উন্নয়নের একটা উদাহরণ স্বরূপ কথাটা বললাম। ১৯৮০ সালে মাফিয়ারা তাদের কালো টাকা সাদা করতে জঘন্য এবং অপরিকল্পিতভাবে দালান আর অ্যাপার্টমেন্ট বানিয়ে শহরটাকে ঠাণ্ডা মাথায় কুৎসিত করে তুলেছে। আমি এক সিসিলিবাসীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই দালানগুলো কি সস্তা কংক্রিট এর তৈরি? সে বলেছিল, আরে না এগুলো অনেক দামি কংক্রিট। প্রত্যেকবার কংক্রিট মিশ্রণের সময় মাফিয়াদের কিছু মানুষ খুন করতে হয়েছিল। যাতে অনেক খরচ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানুষের হাড় আর দাঁতের মিশ্রণে কংক্রিট অনেক শক্তিশালী হয়েছিল।

এমন একটা পরিবেশে শুধু নিজের পরবর্তী মজার খাবার নিয়ে ভাবা কিছুটা হালকা ব্যাপার হয়ে যায়। কিংবা হয়ত এটাই সবচেয়ে ভাল কিছু যা একজন এই কঠিন পরিস্থিতিতেও করতে পারে। লুইগি বার্জিনি ১৯৬৪ সালে তার মৌলিক কাজ 'দা ইটালিয়ানস,' যখন বিদেশীদের ইটালি সম্পর্কে লেখা পড়তে পড়তে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা সে পছন্দ করে বা ঘৃণা করে লিখেছিল বইটা, বইতে সে নিজের সংস্কৃতির ইতিহাস রাখার চেষ্টা করেছিল। সে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল যুগ

www.pathagar.org

যুগ ধরে মহান শিল্পী, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী তৈরি করেও কেন এখনো ইটালি সবচেয়ে বড় বিশ্বশক্তি হয়ে উঠতে পারেনি? এই গ্রহের সেরা শাব্দিক কূটনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও কেন ঘরোয়া সরকার ব্যবস্থায় তারা অদক্ষ? তারা পৃথক পৃথকভাবে সাহসী হয়েও কেন সমন্বিতভাবে একটা দক্ষ সেনাবাহিনী তৈরি করতে পারেনি? তারা ব্যক্তিগতভাবে সেরা ব্যবসায়ী হয়েও জাতিগতভাবে কেন মূলধন বাড়াতে পারেনি?

নিজেকে এই ছোট গণ্ডির মধ্যে চেপে রাখার চেয়েও তার প্রশ্নের উত্তরগুলো কঠিন। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের দ্বারা ইটালিতে দুর্নীতি এবং বিদেশী শোষকদের দ্বারা শোষণের দুঃখ ভরা ইতিহাস, এসব কিছু মিলিয়ে এখানকার মানুষের মন এমন একটা উপসংহারই খুঁজে নেয় যে কাউকে এবং কোনো কিছুকে বিশ্বাস করে না। কারণ পৃথিবী খুবই দূর্নীতিগ্রস্থ, মিথ্যাবাদী, অস্থির, অতিরঞ্জিত এবং অসুন্দর। এ অবস্থায় একজন তার নিজের চোখ কানকেই আর অনুভূতিকেই কেবল বিশ্বাস করতে পারে। ইউরোপের অন্য কোনো দেশের চেয়ে ইটালিতে এই বোধটা বেশি জাগ্রত। এই কারণে বারজিনি বলে, ইটালিয়ানরা জঘন্য রকম অযোগ্য সেনানায়ক, রাষ্ট্রনায়ক, অত্যাচারী শাসক, অধ্যক্ষ, আমলাতন্ত্র-বাদী, সাংবাদিক এবং শিল্প-কারখানার পরিচালক সহ্য করতে পারে কিন্তু অযোগ্য অপেরা গায়িকা, নায়ক, নর্তকী, বেশ্যা, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, রাঁধুনি, দর্জি এসব সহ্য করে না। অসুখ ধ্বংস আর প্রতারনার পৃথিবীতে শুধু সৌন্দর্য কে বিশ্বাস করা যায়। শুধু শৈল্পিক সৌন্দর্যই দুর্নীতিহীন। আনন্দের কোনো দরদাম হয় না। মাঝে মাঝে খাবার এমন একটা আনন্দের প্রচলন যা আসলেই খাঁটি।

শুধু বাস্তবতা থেকে পালাতে সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের আনন্দে নিজেকে উৎসর্গ করা একজনের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে না বরং, যখন একটা সমাজে সব কিছু মিথ্যা অভিনয় এবং প্রতারণা সব কিছু গিলে খেতে থাকে তখন মাঝে মাঝে এটা বাস্তব জীবন আঁকড়ে ধরে রাখার একটা উপায়ও হয়ে দাঁড়ায়। খুব বেশি দিনের কথা নয় সম্পর্কে ভাই হয় এমন দুজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করেছিল। কারণ তাদের মাফিয়াদের সাথে সরাসরি আঁতাত আছে। তাই আপনি কাকে বিশ্বাস করবেন? কার ওপর নির্ভর করবেন? যখন পৃথিবী নির্দয়, নিষ্ঠুর। সিসিলিতে এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে কি আপনি একটা কুৎসিত নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য কংক্রিটের গুঁড়ার সাথে মিশতে চান? আপনার স্বতন্ত্র মানব সত্তার সম্ভ্রম ধরে রাখতে এরকম পরিবেশে আপনি কি করতে পারেন? হয়ত কিছুই না। হয়ত কিছুই না, কেবল সান্ত্বনা নিতে পারেন এই গর্ব করে যে আপনি খুব সুন্দর করে মাছের চিড় কাটতে পারেন কিংবা পুরো শহরের সবচেয়ে হালকা ফুলকো রিকোট্টা পনির ভাজতে জানেন।

আমি আমার সাথে বহুদিন ধরে ভোগা সিসিলিবাসীর তুলনা করে কাউকে অপমান করতে চাই না। আমার জীবনের সমস্যা একদম ব্যক্তিগত এবং মূলত নিজের চারিত্রিক গঠনের কারণে সৃষ্ট। আমার জীবন কোনো শোষণের মহাকাব্য নয়। আমি কেবল একটা বিবাহবিচ্ছেদ এবং বিষণ্নতার ভেতর দিয়ে গিয়েছি, কয়েক শতকের খুন জখম আর অত্যাচারের ভেতর দিয়ে নয়। তবু আমি এখানে কিছু প্রেরণার উৎস পেয়েছি। এখনো আমি বলব যে জিনিস সিসিলিয়ান প্রজন্মকে তাদের সম্ভ্রম ধরে

www.pathagar.org

রাখতে সাহায্য করেছে ঠিক সে জিনিসই আমার মানসিক দুর্দশায় সেরে ওঠা শুরু করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। আমি বিশ্বাস করি এটাই সেই কারণ যেজন্য গৌদি ইটালিকে বুঝতে সিসিলিতে যেতে বলেছে এবং আমার মনে হয় ঠিক একারণেই আমি সহজাতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাকে ইটালি যেতে হবে, নিজেকে বুঝতে।

সেদিন নিউইয়র্কের বাথটাব স্নানের সেই দৃশ্যতে ফিরে তাকিয়েছিলাম, যখন ইটালিয়ান শব্দ জোরে জোরে উচ্চারণ করে আমি প্রথম নিজের আত্মার মেরামত শুরু করেছিলাম। তখন আমার জীবন এতটা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল যে নিজেকে চিনতে পারতাম না, মনে হতো আমি যেন পুলিশের জেরার জন্য অপেক্ষমান সারিতে দাঁড়িয়ে আছি আর তা থেকে কখনোই বের হতে পারব না। কিন্তু ইটালিয়ান শিখতে শুরু করে আমি নিজের মধ্যে আনন্দের ঝলক দেখেছিলাম। এবং দীর্ঘ বিষাদের পর আপনি যদি এমন সুখ দেখতে পান আপনিও হাঁটু গেড়ে সেই আনন্দের কাছে যাবেন এবং তাকে ততক্ষণ ধরে রাখবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই আনন্দ ময়লা থেকে আপনার মুখ উপরে তুলতে পারেন। এটা কোনো স্বার্থপরতা নয়, এটা কর্তব্য। আপনাকে জীবন দেওয়া হয়েছে এবং এটা আপনার দায়িত্ব জীবনের জন্য সুন্দর কিছু খুঁজে নেওয়া, সেটা যত ছোটই হোক।

আমি চিমসানো পাতলা অবস্থায় ইটালিতে গিয়েছিলাম। এও জানতাম না আমার পোশাক-আশাক কিরকম হবে। জানতাম না আমার কি পাওয়ার যোগ্যতা আছে। জানতাম নির্দোষ কিছু সরল আনন্দ দিয়ে আমি নিজেকে মুমূর্ষ অবস্থা থেকে বেশ সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় নিয়ে ফিরছিলাম। সবচেয়ে সহজ এবং আদিম মানুষের মতো একটা কথা বলি, আমার ওজন বেড়েছিল। চার মাসের আগের চেয়ে আমার অস্তিত্ব তখন বেশি ছিল। সেখানে যাওয়ার সময় থেকে আকারে আমি তখন লক্ষণীয় বৃহৎ এবং এই ধারণা নিয়ে সেখান থেকে ফিরছিলাম, জীবনের বিস্তৃতিকরণ এবং জীবনের বৃহত্তরীকরণ এই পৃথিবীতে খুবই মূল্যবান।

www.pathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত

কিংবা
আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে
ধন্য বোধ করছি
কিংবা
ভক্তি সাধনার ছত্রিশটা গল্প

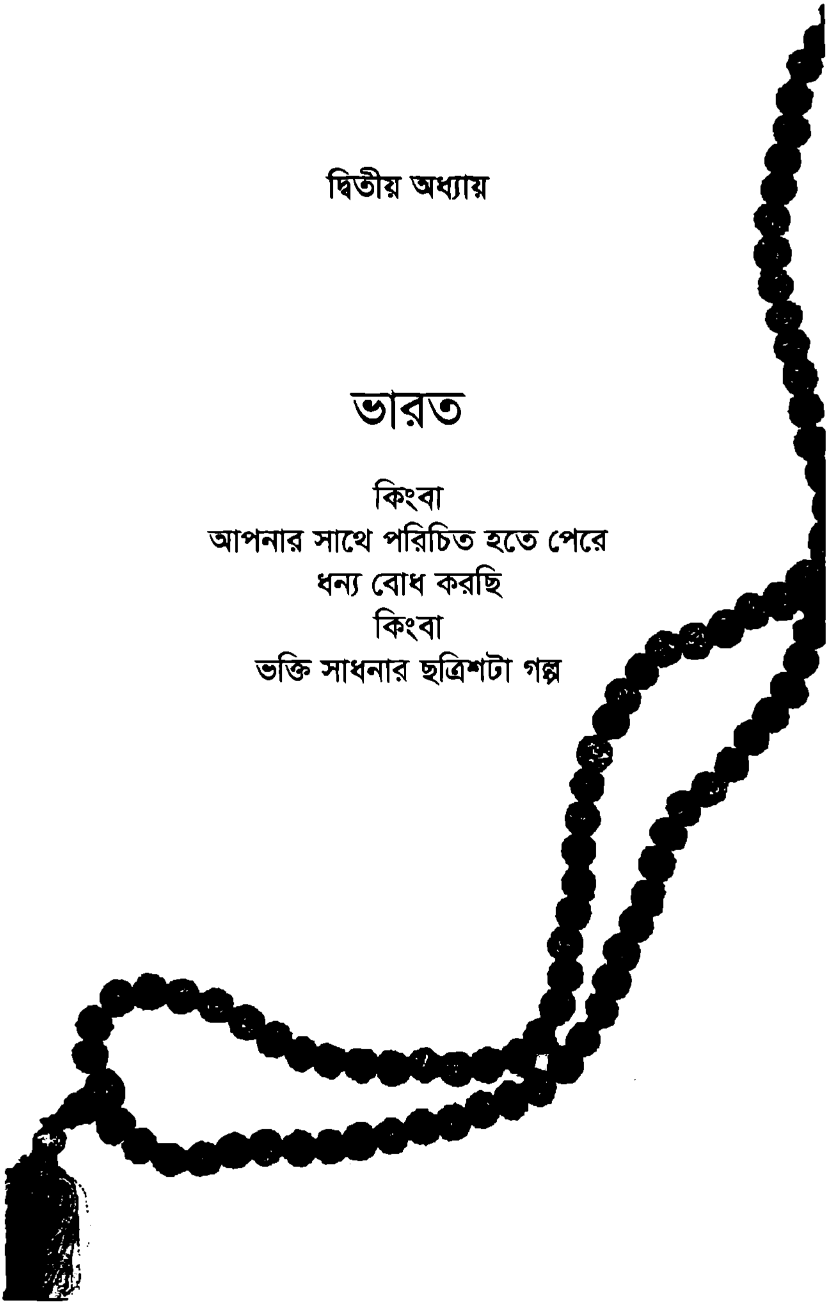

www.pathagar.org

www.pathagar.org

৩৭

আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমাদের বাড়িতে মুরগির খোঁয়াড় ছিল। কমপক্ষে ডজন-খানেক মুরগিতো সেখানে সব সময় থাকতই। যখনই কোনো একটা মুরগিকে বাজপাখী বা শেয়াল নিয়ে যেত কিংবা কোনো সংক্রামক রোগে একটা দুটি মারা যেত, আমার বাবা নতুন মুরগি এনে সেই হারানো মুরগির সংখ্যা পূরণ করতেন। তিনি কাছের একটা মুরগির খামারে ছুটে গিয়ে নতুন একটা মুরগি নিয়ে তবেই ফিরতেন।

নতুন মুরগিকে খোঁয়াড়ে স্থান দেওয়ার কিছু নিয়ম আছে। এক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা পালন করতে হয়। তা না হলে পুরোনো মুরগির সাথে ঝামেলা বেধে যায় কেন না পুরোনো মুরগিরা নতুন মুরগিকে হামলাকারী হিসেবে দেখে। এভাবে হুট করে একটা নতুন মুরগিকে খোঁয়াড়ে না ঢুকিয়ে যা করতে হয় তা হলো রাতে অন্য মুরগিদের ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় খোঁয়াড়ের এক কোণায় নতুন মুরগিটাকে নিঃশব্দে রেখে আসা। পরের দিন ভোরে যখন সব মুরগিরা জেগে ওঠে, তারা নতুন মুরগিটাকে আলাদাভাবে খেয়াল করে না। ভাবে নতুন মুরগিটা হয়ত আগে থেকেই সেখানে ছিল। মজার ব্যাপার হলো, নতুন মুরগিটাও ভোরে জেগে উঠে বুঝতে পারে না যে সে সেখানে নতুন। সে মনে করে সে হয়ত আগে থেকেই সেখানে ছিল।

ভারতে আমার আবির্ভাব ঠিক এমনভাবেই হয়েছিল। ডিসেম্বরের ৩০ তারিখ। মুম্বাই শহর। আমার প্লেন সেখানে রাত দেড়টায় অবতরণ করে। মালামাল খুঁজে পাওয়ার পর একটা ট্যাক্সি নেই। তারপর ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে ছুটে যেতে থাকি দূরের একটা গ্রামের দিকে। যেখানে সেই আশ্রমটা অধিষ্ঠিত।

রাতের ভারত! ঝিমাতে ঝিমাতে মাঝে মাঝে আমি বাইরে তাকাচ্ছিলাম। ভয়াবহ রকম শুকনো মহিলারা শাড়ি পরে রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কিন্তু অত রাতে মাথায় লাকড়ি কেন বুঝতে পারিনি। কখনো হেডলাইট ছাড়া বাসগুলো আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছিল তো কখনো আমরা গরুর-গাড়ি অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। কখনো কখনো বিশাল-বিশাল বট গাছ দেখতে পাচ্ছিলাম, যেগুলোর শিকড় খানা-খন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা মন্দির লাগোয়া আশ্রমের দরজায় পৌছালাম রাত সাড়ে তিনটায়। টেক্সি থেকে নামতেই পশ্চিমা ধাচের পোশাক পরা একজন লোক তার টুপি খুলে

www.pathagar.org

নিজের পরিচয় দিয়েছিল। সে আরতুরো, চব্বিশ বছরের মেক্সিকান সাংবাদিক এবং আমার গুরুর শিষ্য। সে সেখানে আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছিল। আমরা যখন ফিসফিস করে একে অপরের সাথে পরিচিত হচ্ছিলাম তখন ভেতর থেকে আমার প্রিয় সংস্কৃতি ভজনের সুর ভেসে আসছিল। যাকে বলা হয় ভোরের আরতি বা দিনের প্রথম প্রার্থনা। আশ্রমে ভোর সাড়ে তিনটায় এটা গাইতে হয়। আমি মন্দিরের দিকে হাত উঁচিয়ে আরতুরোর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আমি কি ওখানে যেতে পারি? তার দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যেন বলছে, অবশ্যই। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে, মালামাল একটা গাছের পেছনে ঝুলিয়ে জুতো খুলে, তারপর সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে আমার কপাল মন্দিরের সিঁড়িতে স্পর্শ করে ভেতরে গিয়েছিলাম, যারা এই সুন্দর ভজনটা গাইছিল সেই সব ভারতীয় মহিলাদের ভিঁড়ে মিশে যেতে।

সেই ভক্তিমূলক আরতিপূর্ণ ভজনটাকে আমি বলি, সংস্কৃত ভাষার অসাধারণ মহিমা। সেটা এমন একটা ভক্তিমূলক গান যা আমি শুধু ভালোবেসেই শিখে ফেলি। আমার তেমন কোনো কষ্ট হয়নি। সেই সংস্কৃত ভাষার আরতিটা আমি প্রথমে গাইতে শিখি শুদ্ধ যোগ শিক্ষার সময়। কথাগুলো এমন– মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি তাকে, সূর্য, চন্দ্র এবং আগুন যার চোখ। তুমিই সব, হে প্রভুদের প্রভু। আর শেষের কিছু লাইনের অমূল্য সমন্বয় হচ্ছে– তথাস্তু, তথাস্তু। তুমি যদি সব নিয়ে নাও তারপরও যা থাকে তাও তথাস্তু।

মহিলাটা গান শেষ করার পর প্রণাম পর্ব নিঃশব্দে শেষ হয়েছিল। তারপর পাশের একটা দরজা খুলে সবাই ছোট উঠানে গিয়েছিল, যেখানে সুগন্ধী ধূপ জ্বালানো। আমি তাদের অনুসরণ করেছিলাম। ঘরটা পশ্চিমা এবং ভারতীয় শিষ্যে বোঝাই ছিল। সেই শীতের ভোরে সবার শরীরে শাল পেঁচানো ছিল। সবাই ধ্যান না হয় বিশ্রাম করছিল। বলতে পারেন আমি একরকম মোমের মতো গলে, নিঃশব্দে তাদের পাশে জায়গা করে নিয়েছিলাম। যেন খোঁয়াড়ের সেই নতুন পাখি, যাকে কেউ আলাদাভাবে খেয়াল করেনি। তারপর আড়াআড়ি পা ভাঁজ করে, হাত পায়ের ওপর রেখে, চোখ বুজেছিলাম।

তখন চার মাস হয় আমি ধ্যান করিনি। এমনকি চার মাস ধরে ধ্যান করার চিন্তা পর্যন্ত করিনি কিন্তু কিভাবে যেন সেখানে বসে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস শান্ত করে নিজে নিজেই একবার খুব আস্তে করে প্রতিটা অক্ষর আলাদাভাবে উচ্চারণ করেছিলাম।

ওঁম না মাহ শি বা য়া

ওঁম নামাহ শিবায়া

তারপর এটা বার বার বলছিলাম। বললে বেশি হবে না আমি মন্ত্রটা এভাবে বলেছিলাম যেন তাকে মোড়ক থেকে বের করছি। যেভাবে নানি-দাদির হাতের চিনামাটির তৈরি কিছু অনেকদিন বাক্সবন্দি থাকার পর খুব সাবধানে খোলা হয়। যা এখনো অব্যবহৃত। বুঝতে পারছিলাম না আমি কি ঘুমিয়ে গেছি না সম্মোহিত হয়ে পড়েছি। কতটা সময় চলে গেছে তাও তখন জানি না। কিন্তু যখন ভারতের আকাশে সূর্য উঠেছিল এবং আমি চোখে মেলে আশেপাশে তাকিয়েছিলাম। ইটালি আমার কাছ

www.pathagar.org

থেকে তখন দশ হাজার মাইল দূরের মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমি আজীবন সেখানেই ছিলাম। যেন আমি সেই খোঁয়াড়েরই পাখি।

৩৮

আমরা কেন যোগাসন শিখি?

নিউইয়র্কে, কিছুটা জটিল একটা যোগের ক্লাসে এক শিক্ষক আমাকে এই প্রশ্নটা করেছিল। আমরা তখন সবাই পাশাপাশি মুখ করে ত্রিকোণাসন করে বসেছিলাম। আমরা যতক্ষণ পারছিলাম শিক্ষকটা আমাদের সেই অবস্থানে ততক্ষণই ধরে রাখছিলেন।

সে আবার জিজ্ঞেস করেছিল,

আমরা কেন যোগ অনুশীলন করি? যাতে আমরা আমাদের পাশের জন থেকে ভাল বক্র আসন করতে পারি? নাকি এছাড়াও এর অন্য কোনো বিশেষ কারণ আছে?

যোগ শব্দের সাংস্কৃতিক রূপ হচ্ছে সম্মিলন। এটা মূলত 'ইউজ' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার মানে হচ্ছে 'কুসুমের দিকে' বা নিজেকে ষাঁড়ের পালের মতো নিয়মানুবর্তিতায় সংযুক্ত করা। যোগের মাধ্যমে এমন কাজ করা যাতে মনের সাথে শরীরের, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার, আমাদের ভাবনার সাথে ভাবনার উৎসের, শিক্ষকের সাথে ছাত্রের এমনকি মাঝে মাঝে আমাদের এবং আমাদের ত্রিকোণাসনে কম পারদর্শী পাশের অনুশীলনকারীর সাথে সম্মিলন ঘটাতে পারি। পশ্চিমা বিশ্বে আমরা জেনে এসেছি যে, যোগ বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কার্যকর শারীরিক অনুশীলন। কিন্তু সেটা হচ্ছে কেবল হাথা যোগ, যোগ দর্শনের কেবল একটা শাখা মাত্র। প্রাচীন পণ্ডিতরা কেবল ব্যক্তিগত সুস্থতার জন্য এই শারীরিক কসরতের উন্নয়ন করেননি। বরং ধ্যানের প্রস্তুতি হিসেবে শরীর ও মন শিথিল করার জন্য এটা ব্যবহৃত হতো। এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা স্থির হয়ে বসে থাকা কঠিন। কেন না তাতে আপনার কোমর ব্যথার কারণে ধ্যান থেকে মনোযোগ চলে যেতে পারে। আপনি তখন ধ্যান নয় বরং এই নিয়ে গর্ব করতে শুরু করতে পারেন যে, বাহ! আমি এতক্ষণ বসে থেকেছি যে আমার কোমর ব্যথা করছে!

কিন্তু যোগ বলতে ধ্যান, পাণ্ডিত্য, নীরবতা, ভক্তিমূলক কাজ বা মন্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে খোঁজা ও বোঝা। যদিও কিছু কিছু অনুশীলন দেখলে বাহ্যিকভাবে মনে হবে হিন্দুধর্ম যোগের মূলমন্ত্র। কিন্তু না, যোগের উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মে মানুষকে উদ্ভূত করা নয়। যোগ হিন্দুধর্মে কোনো সমার্থক শব্দ নয় কিংবা সকল হিন্দু যোগীও নয়। একজন সত্যিকারের যোগী অন্য ধর্মের সাথে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় না। একজন মানুষ যোগের মাধ্যমে শুদ্ধ নিয়মানুবর্তিতায় শুদ্ধ সম্মিলন ঘটাতে পারেন কৃষ্ণার, যিশুর, মোহাম্মদের, বুদ্ধের

www.pathagar.org

কিংবা ইয়াহিয়ার কাছাকাছি হতে। আশ্রমে থাকাকালীন সময়ে আমি অনেক শিষ্যের সাথে পরিচিত হয়েছি যারা নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন খ্রিস্টান, জিউস, বুদ্ধিস্ট, হিন্দু এমনকি মুসলিম যোগী হিসেবেও। আমি এমন শিষ্যদের সাথেও পরিচিত হয়েছি যারা তাদের ধর্ম সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে কিছু বলতে চায়নি। ধর্মযুদ্ধের এই পৃথিবীতে আপনি তাদের তেমন একটা দোষ দিতে পারবেন না।

একজন যোগীর পথ হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃতিগত সমস্যা দূর করার পথ। আমি সেই সমস্যাটা এখানে আরও সহজভাবে বলব, সেটা হচ্ছে 'সন্তুষ্টি অর্জনে অপারগতা।' শতকের পর শতক ধরে নানান ধরনের দার্শনিক মতবাদ নানাভাবে মানুষের এই জন্মগত অসুখি সত্ত্বার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে। তাওরাত অনুসারীরা একে বলে ভারসাম্যহীনতা, বৌদ্ধধর্মে বলে অজ্ঞতা, ইসলাম বলে স্রষ্টার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সৃষ্টি হয় আমাদের জীবনের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, জুডিও খ্রিস্টানদের মতে পাপ এর জন্য দায়ী, ফ্রয়েডিয় তত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষা আর সভ্যতার চাহিদার মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে সব সমস্যার উদ্ভব হয়। আমার বন্ধু মনোবিজ্ঞানী ডেবোরাহর মতে 'আকাঙ্ক্ষা' হচ্ছে একটা জন্মগত ত্রুটি। যোগীরা বলে মানুষের অসন্তোষের মূল কারণ হচ্ছে নিজের সত্তা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা। আমরা দুঃখ কষ্টে ভুগি কারণ আমরা ভাবি আমরা সবাই আমাদের ভয়, দোষ, বিরক্তি এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে আলাদা। ভুলবশত আমরা ভাবি যে আমাদের সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র আমিত্ব আমাদের পুরো চরিত্র গঠন করে। আমরা আমাদের অন্তর্গত ঐশ্বরিক সত্তাকে চিনতে ভুল করি। আমরা বুঝতে পারি না আমাদের ভেতরের কোথাও একটা মহান সত্তা তার নিজস্ব অবয়বে অধিষ্ঠিত আছেন। সেই মহান সত্তাটাই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। যোগীরা বলে যে পর্যন্ত না এই সত্যটা আমরা বুঝতে পারি আমরা আমাদের জীবনের নানান হতাশায় ডুবে থাকি। গ্রিক নির্বিকার মতবাদের দার্শনিক এপিক্টেটাসের একটা লাইন উদ্ধৃত করে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়, 'হতভাগা! তুমি জানোই না তুমি তোমার ভেতর ঈশ্বরকে ধারণ করে আছ।'

যোগ হচ্ছে ঐশ্বরিক অনুভূতির স্বাদ নেওয়ার সক্ষমতা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখা। যোগের কাজ হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণ যাতে আমরা অতীত নিয়ে অনুতাপ আর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে সময় নষ্ট না করি। এর বদলে আমরা যেন একটা অন্তর্গত সত্তার উপস্থিতি খুঁজে নিতে পারি যাতে আমরা নিজেদের এবং আশেপাশের সবকিছুর সাথে ভারসাম্য বজার রাখতে পারি। তখন আমাদের কাছে প্রমাণিত হবে সব কিছু সম্পর্কে সমান ধারণা রাখা পৃথিবীর সত্যিকারের চরিত্র। সত্যিকারে যোগী তার ভারসাম্যের স্থান থেকে পুরো পৃথিবীকে স্রষ্টার সৃষ্টিশীল শক্তির সমান প্রকাশ হিসেবে দেখে। পুরুষ, নারী, শিশু, শালগম, ছারপোকা, সামুদ্রিক প্রবাল এই সবকিছুতেই ঈশ্বর লুকিয়ে আছেন। কিন্তু যোগীরা বিশ্বাস করে মানুষের জীবন একটা অনেক বড় সুযোগ। শুধু মানব জীবন এবং মানুষের মনই স্রষ্টাকে অনুভব করতে সক্ষম। শালগম, ছারপোকা, সামুদ্রিক প্রবাল তারা এটা খুঁজে বের করার সুযোগ পাবে না যে তারা আসলে কে? কিন্তু আমাদের সেই সুযোগ আছে।

www.pathagar.org

সেন্ট অগাস্টিন বলেছেন, 'আমাদের সকল কর্ম এই জীবনেই।' কিন্তু যোগের ভাষায় বলা হয়, শরীরে অন্তরদৃষ্টিকে পুনঃস্থাপন করা যাতে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই।

অন্যান্য দার্শনিক ধারণার মতো এটাও বোঝা সহজ কিন্তু বস্তুত জীবনে ধারণ করা কঠিন। আচ্ছা ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি আমরা সবাই এক এবং ঐশ্বরিক কিছু আমাদের সবাইকে ঘিরে আছে। কোনো সমস্যা নেই। আপনি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এখন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ধারণ করে দেখুন তো? যেটা বুঝতে পেরেছেন চব্বিশ ঘণ্টা সেটা অনুশীলনের আওতায় আনুন তো? এতো সোজা না। এজন্য ভারতে মনে করা হয় যোগ অনুশীলনের জন্য একজন শিক্ষক প্রয়োজন। অন্যথায় হয়ত আপনি জ্বলজ্বলে সাধক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও বস্তুগত জীবনে সেঁটে থাকবেন। আলোর পথে পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন আছে। আপনি যদি ভাগ্যবান হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন জীবন্ত গুরুর সন্ধান পাবেন। এই খোঁজেই পুণ্যার্থিরা ভারতে যুগের পর যুগ এসেছেন। চতুর্দশ শতকে অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট একজন রাষ্ট্রদূতকে একটা অনুরোধসহ পাঠিয়েছিলেন যাতে সেরকম একজন বিখ্যাত যোগী খুঁজে দেওয়া হয় এবং ব্যাপারটা নিয়ে সেই রাষ্ট্রদূতের দরবারেও যেতে হয়েছিল। রাষ্ট্রদূত জানিয়েছিলেন একজন যোগী পাওয়া গেছে কিন্তু সে ভ্রমণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। প্রথম খ্রিস্টাব্দে, তায়রানার এপোলোনিয়াস, আর একজন গ্রিক রাষ্ট্রদূত তার ভারত ভ্রমণ নিয়ে লিখেছিলেন, "আমি ভারতীয় ব্রাহ্মণ দেখেছিলাম! কি আর বলব! এরা যেন পৃথিবীতে বাস করেও পৃথিবীতে নেই, শক্তি-অর্জন না করেই শক্তিশালী, কোনো সম্পদ নেই কিন্তু সকল পুরুষের চেয়ে ধনী। গান্ধী নিজে সবসময় একজন গুরুর সাথে শিখতে চাইতেন। কিন্তু অনুতাপ করার তেমন সময়-সুযোগ তিনি পাননি। তিনি লিখেছেন, আমার ধারণা এটা একটা বড় সত্য যে একজন গুরু ছাড়া সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন অসম্ভব।

একজন সত্যিকারের যোগী হচ্ছে এমন একজন, যে মঙ্গলময় আলো চিরস্থায়ীভাবে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে সক্ষম এবং একজন গুরু হচ্ছেন একজন মহান যোগী তিনি এই আলো অন্যের মধ্যে প্রজ্জ্বোলিত করতে পারেন। গুরু শব্দটা দুটো সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। একটা হচ্ছে আঁধার আর একটা হচ্ছে আলো। আঁধার থেকে আলো। গুরু থেকে শিষ্যের প্রতি বিচ্ছুরিত আলো। যাকে বলে, 'মাত্রাবিরইয়া।' আলোকিত চেতনার সম্ভাবনা। আপনি যেখানে গুরুর কাছে কেবল শিখতে আসবেন না বরং গুরুর মহিমা নিতেও আসবেন।

একজন মহান মানুষের কাছে থেকে এরকম মহিমার সঞ্চালন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হতে পারে। নিউইয়র্কে আমি একবার ভিয়েতনামিজ একজন সাধক, কবি এবং শান্তিকর্মী থিক নাথ হানের বক্তব্য শুনতে গিয়েছিলাম। সেটা এমনিতেই সপ্তাহ শেষের একটা অস্থির রাত ছিল, অডিটোরিয়ামে ভিড় আর ঠেলা ধাক্কা চলছিল। পরিস্থিতিটা মানুষের আলাদা দুশ্চিন্তাগুলোর পালে বাতাস দিয়ে যাচ্ছিল।

www.pathagar.org

এমন সময় সাধু এলেন। তিনি বক্তব্য রাখার পূর্বে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসলেন। কিছু একটা হচ্ছিল, সেই সাধুর নীরবতায় সবচেয়ে কোলাহল করা নিউইয়র্কবাসী দর্শকের সারি চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। দশ মিনিটের মধ্যে ছোটখাটো সেই ভিয়েতনামিজ মানুষটা আমাদের সবাইকে তার নীরবতা দিয়ে শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিংবা আরও ভালোভাবে বলা যায় তিনি আমাদের নিজস্ব নীরবতায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন কিংবা সেই শান্তিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যা আমাদের ভেতরে সহজাতভাবেই বিরাজ করে কিন্তু যা আমরা বুঝতে পারি না। কোনো সরব উপস্থিতি না রেখেও নিজের এই শান্ত অবস্থান আমাদের প্রতি সঞ্চালন করার সক্ষমতাই হচ্ছে ঐশ্বরিক ক্ষমতা। এবং ঠিক এই কারণেই আপনি আপনার গুরুর কাছে আসবেন যাতে আপনার গুরুর মেধা আপনার ভেতরের মহত্ত্ব বের করে আনতে পারে।

ভারতীয় গুরুরা লিখেছেন একটা আত্মা ধন্য কিনা বা বিশেষরকম ভাগ্যবান কিনা তা তিনটা জিনিসের ওপর নির্ভর করে,

১। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে সচেতন অনুসন্ধানে পারদর্শী হওয়া।
২। জন্মগতভাবে বা আত্ম-উন্নয়নের মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে আকুল আকাঙ্ক্ষা বোধ করা।
৩। একজন জীবন্ত আত্মিক গুরুর সন্ধান পাওয়া।

একটা মতবাদ আছে যদি আপনি মন থেকে খুব করে একজন গুরুর সন্ধান করেন আপনি একজনকে খুঁজে পাবেনই। মহাবিশ্ব উলোট-পালোট হয়ে ভাগ্যের অণু-পরমাণু পাক খেয়ে এমন ব্যবস্থা করবে যাতে আপনার পথ দ্রুত আপনার গুরুর পথের সাথে মিলিত হয়। গোসলখানার মেঝেতে আমার উন্মত্ত প্রার্থনা আর এক রাতে স্রষ্টার কাছে উত্তর চেয়ে কান্নাকাটি করার এক মাস পরই আমি আমার গুরু খুঁজে পেয়েছিলাম। ডেভিডের অ্যাপার্টমেন্টে হাঁটতে হাঁটতে সেই অসাধারণ মহিলার ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। গুরু ব্যাপারটা নিয়ে আমার ভেতর কিছুটা দ্বন্দ্ব ছিল। সাধারণ নিয়মেই আমরা পশ্চিমারা এই শব্দে পরিচিত নই। আমাদের এই নিয়ে বাজে একটা ইতিহাস আছে। ১৯৭০ সালে কিছু উন্নত, আগ্রহী, সংবেদনশীল পশ্চিমা অন্বেষক ভারতে যাওয়ার পর তাদের সাথে দেখতে গুরুর আদলে একদল ভারতীয়ের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। বেশির ভাগ ফ্যাসাদ এখন মিটে গেছে কিন্তু অবিশ্বাসের সেই ধ্বনি এখনো প্রতিধ্বনিত হয়। এমনকি এখনো আমি গুরু শব্দটার সাথে মানিয়ে নিতে পারি না। কিন্তু আমার ভারতীয় বন্ধুদের এই ব্যাপারে কোনো সমস্যা হয় না। তারা বেড়েই উঠেছে গুরু ধারণার ওপর ভিত্তি করে। তারা এই শব্দে অভ্যস্ত। যাহোক আমি জেনে বুঝে থলে নিয়ে গুরু খুঁজতে বের হইনি। তিনি তো একরকম আবির্ভূত হয়েছেন। আমি যখন তার ছবি দেখেছি আমার মনে হয়েছিল তাঁর ছবির ভেতর থেকে কালো বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর বলছেন, তুমি আমাকে ডেকেছিলে আর এইতো আমি এখানে। বল তুমি কি এখন আমাকে চাও?

www.pathagar.org

আমার সবসময় মনে থাকবে সেই রাতে সমস্ত কৌতুক, ভয়, ভিন্ন দেশীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি সব কিছু এক পাশে সরিয়ে রেখে আমি সোজা-সাপটা দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিয়েছিলাম, হ্যাঁ।

৩৯

আমার প্রথম রুমমেট দুজন ছিলেন একজন মধ্যবয়স্ক আফ্রিকীও আমেরিকান ধর্মপ্রাণ যাজক আর একজন সাউথ ক্যারোলিনার ধ্যান উপদেষ্টা। পরবর্তী সময়ে আমার আরও রুমমেটদের মধ্যে ছিলেন, একজন আর্জেন্টিনাবাসী নৃত্যশিল্পী, একজন সুইস হোমিওপ্যাথিবিদ, একজন মেক্সিকান সহকর্মী, একজন অস্ট্রেলিয়ান পাঁচ বাচ্চার মা, একজন বাংলাদেশি যুবক যে পেশায় কম্পিউটার প্রোগ্রামার, মেরিনের একজন শিশু বিশেষজ্ঞ এবং একজন ফিলিপিনো হিসাববিদ। শিষ্যদের অবস্থানগত চক্রের ভিত্তিতে আরও অনেকে আসত আবার চলেও যেত।

আশ্রমটা এমন একটা জায়গা না যে, কেউ ইচ্ছা করলেই এখানে ঘুরে যেতে পারে। প্রথমত, এটার প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। এর ওপর এটা মুম্বাই থেকে অনেক দূরে। ধুলোময় পথ, গ্রাম্য নদীর কিনারে একটা ছোটগ্রাম, একটা রাস্তা, একটা মন্দির, হাতে গোনা কয়েকটা দোকান এবং এক পাল গরু যারা স্বাধীনভাবে এখানে সেখানে ঘোরা ফেরা করে। গরুগুলো মাঝে মাঝে দর্জির দোকানে ঢুকে সেখানে শুয়ে পড়ে। এক রাতে আমি গ্রামের মাঝখানের একটা গাছে ষাট ওয়াটের একটা বাল্ব ঝুলতে দেখলাম। সেটাই সেই গ্রামের একমাত্র রাস্তার জন্য দেওয়া বাতি। আশ্রমটাই যেন সেখানকার স্থানীয় অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি। সেই গ্রামের অহংকার। আশ্রমের দেয়ালের বাইরে সর্বত্র ধুলা-বালি এবং দারিদ্রতা। কিন্তু ভেতরে, পরিকল্পিত বাগান, ফুলের সমাহার, লুকিয়ে থাকা অর্কিড, পাখির কলতান। আম, কাঁঠাল, বাদাম, তাল, ম্যাগনোলিয়া আর কলাগাছ। খুব জাঁকজমক না হলেও আশ্রমটা দেখতে ছিমছাম সুন্দর। ক্যাফেটেরিয়ার মতো সাধারণ খাবারঘর। পৃথিবীর ধর্মীয় সংস্কৃতির লেখা নানান ধরনের বইয়ের একটা বিশাল পাঠাগার। বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহের কয়েকটা মন্দির। ধ্যানের জন্য দুটি আলাদা মাটির নিচের গুহা, একটা নিস্তব্ধ আর একটা অন্ধকার। গুহায় আরামদায়ক বসার আসনও আছে এবং জায়গটা সমস্ত দিন রাত খোলা থাকে। এটা কেবল ধ্যান অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সকালে যোগ অনুশীলনের জন্য বাইরে তাঁবু টানানো একটা জায়গা আছে যার চারপাশে আছে ডিম্বাকৃতির একটা পার্কের মতো জায়গা। যেখানে ছাত্ররা চাইলে ব্যায়ামের জন্য দৌড়াতে পারে।

আমার আশ্রমে থাকাকালীন সময়ে কখনোই একশোর বেশি সংখ্যক মানুষকে আমি সেখানে থাকতে দেখিনি। যদি গুরু নিজে থাকেন তবে সেখানকার জনসংখ্যা বিবেচনা অনুযায়ী বেড়ে যায়। কিন্তু আমি থাকাকালীন সময়ে কখনোই গুরুকে

www.pathagar.org

দেখিনি। আশা করেছিলাম আমেরিকায় তিনি হয়ত কোনো কারণে বেশি সময় কাটাচ্ছেন। তিনি হয়ত খুব শীঘ্রই সেখানে যাবেন কিন্তু তিনি হঠাৎ কখন কোথায় আবির্ভূত হবেন এই বিষয়ে আগে থেকে ধারণা করা যায় না। আশ্রমে গুরুর শিক্ষার সাথে দৈহিকভাবে গুরুর উপস্থিতি প্রয়োজনীয় মনে করা হয় না। এ যেন শারীরিকভাবে উপস্থিত না থেকেও সারাক্ষণ একজন জীবন্ত গুরু ঘিরে থাকা। আমিতো এমনটাই অনুভব করেছিলাম। কিন্তু অনেক শিষ্যের মতে দীর্ঘদিন এমন চলতে থাকলে আকর্ষণ কমে যায়। অল্প স্বল্প গুরুকে যতটাই পাওয়া যায় তার উপস্থিতি বিখ্যাত সব আমেজে ঢেকে থাকে তাতে গুরু শিষ্য উভয়ের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এভাবে তার যেকোনো আশ্রমে গিয়ে শিষ্য হয়ে নিয়মের মধ্যে অনুশীলন করার সময় মাঝে মাঝে মনে হবে ব্যক্তিগত অনুশীলন বুঝি এর চেয়ে ভাল ছিল। সেভাবে গুরুর সাথে আরও সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব ছিল। আশ্রমের ভিড়ের মধ্যে নিজেকে ঠেলে দিয়ে হা করে তীর্থের কাকের মতো গুরুর একটা শব্দের জন্য অপেক্ষা করা মাঝে মাঝে বিরক্তিকর।

আশ্রমে কিছু বেতন-ভুক্ত চাকরিজীবী থাকলেও বেশিরভাগ কাজ করে থাকে ছাত্ররা। কিছু স্থানীয় গ্রাম্য মানুষও সেখানে বেতনের বিনিময়ে কাজ করে। আরও কিছু স্থানীয় মানুষ সেখানে থাকে যারা গুরুর শিষ্য এবং সেখানকার ছাত্রদের সাথে কাজ করে। আশ্রমে একটা ভারতীয় তরুণ আছে যে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তার ভেতর অরোরা রশ্মি বলে কিছু একটা ছিল যা আমাকে তার প্রতি খেয়াল করতে বাধ্য করেছিল। সে ছিল অতিমাত্রায় শুকনা, যদিও তার আশপাশের সব কিছু আমার দেখতে ভাল লাগত কিন্তু যদি পৃথিবীতে এর চেয়েও শুকনো কিছু থেকে থাকে তাহলে আমি তা দেখতে ভয় পাব। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটারে আগ্রহী একটা সহপাঠী ছিল, সে তার ব্যান্ড দলে গান গাওয়ার সময় যেরকম জামা কাপড় পরতো আশ্রমে ছেলেটার পোশাক-আশাকও তেমন। বিশাল বড় সাইজের ইস্ত্রি করা, সাদা বোতাম লাগানো জামা আর কালচে পাজামা। বিশাল ফুলদানিতে একটা মাত্র ডেইজি ফুলের মতো তার চিকন ঘাড়টা জামা থেকে বের হয়ে থাকা, পানি দিয়ে সুন্দর করে আঁচড়ানো চুল আর ষোল ইঞ্চি কোমরে দুই প্যাঁচ দিয়ে মাপে বড় কারো বেল্ট পরা। আশ্রমে সে প্রতিদিন একই পোশাক পরে আসত। আমি বুঝতে পারতাম, সেটা তার একমাত্র পোশাক। অবশ্যই প্রতি রাতে সে হাতে কাপড়গুলো কেঁচে, শুকিয়ে নিয়ে সকালে ইস্ত্রি করে নেয়। এই ভারতীয় ছেলেটা তার ফিটফাট পোশাকে আমাকে আমার কোঁচকানো অগোছালো জামার জন্য দ্রুত লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল এবং আমাকে আরও ভদ্রস্থর জামা-কাপড় গায়ে চাপাতে বাধ্য করেছিল। আচ্ছা সেই বাচ্চা ছেলেটার কি ছিল? তার মুখ দেখে আমি কেন প্রতিবার ভেতরে ভেতরে নড়ে উঠতাম। তার আলোর বন্যায় প্লাবিত মুখটা দেখলে মনে হতো সে অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে ছুটি কাটিয়ে এখনই মিল্কিওয়েতে এসেছে। কৌতূহলবশত আমি অন্য এক তরুণীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছেলেটা কে? মেয়েটা বলেছিল, সেখানকার একজন স্থানীয় দোকানদারের ছেলে সে। তার পরিবার খুবই দরিদ্র। গুরু তাকে সেখানে থাকার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। সে যখন ঢোল বাজায় মনে হয় তা ঢোলের শব্দ নয়, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।

www.pathagar.org

আশ্রমে একটা মন্দির আছে যা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। যেখানে সারাদিন অনেক ভারতীয় আসে সিদ্ধা যোগীর (শুদ্ধকারী শিক্ষক) মূর্তিকে প্রণাম করতে। যে ১৯২০ সালে এই শিক্ষা-পদ্ধতির ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। যাকে এখনো সারা ভারতে একজন বিশেষ সাধক হিসেবে মানা হয়। কিন্তু আশ্রমের অবশিষ্টাংশ কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের। সেটা কোনো হোটেল বা পর্যটন কেন্দ্র নয় বরং এটা অনেকটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। একজনকে অবশ্যই সেখানে থাকার অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হবে। একজন মানুষকে অবশ্যই প্রমাণ দেখাতে হবে সে বহুদিন ধরে ভালোমতো যোগ অনুশীলন করেছে। অন্তত এক মাস থাকতে হবে সেখানে। আমি সেখানে ছয় সপ্তাহ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এবং ইচ্ছা ছিল তারপর আমি নিজের মতো করে ভারতের নানান মন্দির, আশ্রম এবং ধর্মীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখব।

সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতীয় এবং পশ্চিমা হিসেবে সমান ভাগে বিভক্ত। আবার পশ্চিমারা আমেরিকান আর ইয়োরোপিয়ান হিসেবে সমান ভাগে বিভক্ত। কোর্সগুলো হিন্দি এবং ইংরেজিতে শেখানো হয়। আবেদনপত্রে একজনের ব্যাখ্যা করা একটা রচনা অবশ্যই লিখতে হয়, কিছু আত্মীয়-স্বজন, পরিজনের নাম ঠিকানা উল্লেখ করতে হয়, তার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থান যাচাইয়ের নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। মাদক বা অ্যালকোহল নিগ্রহের ইতিহাস থাকলে তাও উল্লেখ করতে হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাও উল্লেখ করতে হয়। গুরু চান না ব্যক্তিগত জীবনের পাগলামি বা উশৃঙ্খলতা থেকে পালাতে কেউ এটা ব্যবহার করুক। এটা কারোর জন্যই উপকারী নয়। তার আরও একটা সাধারণ নীতিমালা আছে তা হলো, কারো পরিবার বা আপনজন যদি ভাবে যে একজন গুরুকে অনুসরণ করার কোনো দরকার নেই বা আশ্রমে থাকার কোনো কারণ নেই তবে তার এটা করা উচিত না। তার বাসায় থেকেই একজন ভাল মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এটা নিয়ে বড় ধরনের নাটক করার কোনো অর্থ নেই।

এই মহিলার এই বাস্তব সংবেদনশীলতা সবসময় স্বস্তি দেয় আমাকে।

সেখানে গেলে আপনাকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে আপনিও একজন সংবেদনশীল, বাস্তববাদী মানুষ। আপনাকে কাজ করার সামর্থ্যও দেখাতে হবে কেন না সেখানে দিনে প্রায় সব মিলিয়ে আশ্রমের কর্মকাণ্ডে পাঁচ ঘণ্টা আপনাকে শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। যাকে সেখানে সেবা বা 'স্বার্থহীন কাজ' বলা হয়ে থাকে। আশ্রম ব্যবস্থাপকরা আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করবে আপনি সম্প্রতি ছয় মাসের মধ্যে কোনো বড় ধরনের শোকের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন কি না? তাহলে আপনাকে অবশ্যই আশ্রমে অন্য কোনো সময় আসার পরামর্শ দেবে তারা। কারণ এক্ষেত্রে আপনার আশ্রমের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে না পারার ঝুঁকি আছে। আর এ রকম কোনো কিছুতে যদি আপনি ভেতরে ভেতরে পুড়তে থাকেন তাহলে আপনি কেবল আপনার সহপাঠীর মনোযোগ নষ্ট করবেন। তখন আমার নিজের বিবাহবিচ্ছেদের পরবর্তী সময়ের মানসিক কষ্টের কথা মনে পড়ছিল। সেই মুহূর্তে আমি যদি সেখানে যেতাম কোনো সন্দেহ নেই তখন আমি আসলেই সবাইকে বিষাদে ভাসিয়ে দিতাম। ভালোই হয়েছে, ইটালিতে কিছু দিন বিশ্রাম নিয়ে আমি

www.pathagar.org

আমার মানসিক ও শারীরিক শক্তি ফিরে পেয়ে তবে গিয়েছিলাম। কারণ আমার তখন শক্তিটাই দরকার ছিল।

তারা চায় আপনি সেখানে শক্তি নিয়েই যান। কেননা আশ্রম জীবন অনেক কঠোর। ভোর তিনটা থেকে শুরু করে রাত নয়টা পর্যন্ত শুধু শারীরিক পরিশ্রমই নয় বরং মানসিক শক্তিও আপনাকে ব্যয় করতে হবে। আপনাকে ঘন্টার পর ঘণ্টা নিরিবিলি ধ্যানের মাধ্যমে কিছুটা সরে যাওয়া বা যাকে বলে নিজের মনের যন্ত্রপাতি থেকে কিছুক্ষণের জন্য নিষ্কৃতি নিতে হবে। যেখানে আপনাকে অল্প জায়গার মধ্যে অপরিচিত এবং গ্রাম্য ভারতীয়দের সাথে থাকতে হবে। জোঁক, সাপ আর বিচ্ছু আছে যেখানে। আবহাওয়া মাঝে মাঝে চরমে পৌঁছে যায়। মাঝে মাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বৃষ্টি চলতেই থাকে, মাঝে মাঝে ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বাইরে তাবু ফেলতে হয়। সেখানে সবকিছু দ্রুত খুব চরম পর্যায়ে চলে যায়।

আমার গুরু সবসময় বলেন, যখন আপনি আশ্রমে আসবেন তখন একটা ব্যাপারই ঘটবে আর তা হলো আপনি আবিষ্কার করবেন আপনি কে? তাই, যদি আপনি পাগলামিতে ইতোমধ্যে ডুবে আছেন বলে মনে করেন তাহলে আপনার অবশ্যই এখানে আসা উচিত নয়। আপনাকে সেখান থেকে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বের করে দেওয়া হোক, এটা কেউ চায় না।

৪০

দারুণ কাকতালীয় ব্যাপার। আমার সেখানে যাওয়া আর নতুন বছর একই সময়ে ঘটে। তখন মাত্র একদিন হয় আমি আশ্রমের কাজ কর্মে নিজেকে জড়িয়েছি আর নতুন বছরের আগমন! রাতের খাবারের পর ছোট উঠানটা সেদিন মানুষে মানুষে ভরে যাচ্ছিল। আমরা সবাই মাটিতে বসে, কেউ ঘাসে তো কেউ ঠাণ্ডা মার্বেল পাথরের মেঝেতে। ভারতীয় নারীরা সব এমন পোশাক পরে এসেছিল যেন সেদিন তাদের বিয়ে। তেল চপচপে কালো চুল পিঠে বিনুনি করে বাঁধা, গায়ে দারুণ সিল্ক শাড়ি এবং হাতে সোনার বালা। তাদের সবার কপালের মাঝখানে পাথরের জ্বলজ্বলে বিন্দি যেন আমাদের সবার মাঝে ক্ষীণ তারার আলো ছড়াচ্ছিল।

সেদিন সেই আশ্রমে, যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন বছর না গড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভজন গাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

ভজন এমন একটা শব্দ যা আমি কেবল এমনিতেই শিখি না। আমার এটা আসলেই অত্যন্ত প্রিয়। এমনিতে ভজন শব্দটা শুনলে মনে হয় ভয়াবহ একঘেঁয়ে প্যান-প্যানে কোনো গান। কিংবা যেন আগুনে আহুতি দেওয়ার জন্য পুরুষ দ্রুদস (গ্রিক ভবিষ্যৎবক্তা) আগুনের চারপাশে ঘুরছে। কিন্তু যখন সেই আশ্রমে তা গাওয়া হতো তখন মনে হতো স্বর্গীয় কিছুই সেটা। সাধারণত ডাকা এবং সাড়া দেওয়ার পদ্ধতিতে সেখানে সেটা গাওয়া হতো। এক দল যুবক-যুবতী অদ্ভুত

www.pathagar.org

সুন্দর কণ্ঠস্বরে কিছু সুরেলা বাক্য দিয়ে শুরু করত এবং আমরা বাকিরা সেটা পুনরায় গাইতাম। সেটা আসলে এক ধরনের আত্ম সম্মোহনের অনুশীলন ছিল। গানের অগ্রগতি আর মানের দিকে মনোযোগ ধরে রাখা আর পাশের জনের সাথে স্বর এমনভাবে মিলানো যেন সেই সমবেত সঙ্গীতটা আমরা সবাই একজন হয়ে গাইছি। আমার জেট-লগ চলছিল তাই ভয় পাচ্ছিলাম যে মধ্যরাত পর্যন্ত হয়ত জেগে থাকা এবং ততক্ষণ গান চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু যখন হালকা অন্ধকারে একটা মাত্র ভায়োলিন দিয়ে একটা লম্বা সুর বাজানো হয়েছিল আর তারপর এসেছিল হারমোনিয়াম তারপর হালকা তালে তবলা, তারপর কণ্ঠ... কী যে বলব, অদ্ভুত!

আমি সকল মায়েদের সাথে উঠোনের শেষদিকে বসে ছিলাম। ভারতীয় নারীগুলো খুব সহজাতভাবেই আড়াআড়ি আসন করে বসেছিল। তাদের বাচ্চাগুলো কম্বলের মতো তাদের চারপাশ জড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল। সেদিনের ভজন ছিল রাগের মাধ্যমে একটা ঘুমপাড়ানি গান, একটা বিলাপ, একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গান। রাগ এমন একটা সুর যাতে মায়া, দরদ এবং ভক্তি থাকে। সবসময়ের মতো আমরা সংস্কৃত শব্দে গাচ্ছিলাম। সংস্কৃত একটা প্রাচীন ভাষা যা ভারতে মোটামুটি বিলুপ্তির পথে। কেবল ধর্মীয় কাজ আর প্রার্থনায় সেটা এখন ব্যবহৃত হয়।

আমি চাচ্ছিলাম মূল গায়কের সুরের প্রতিধ্বনি করতে এবং তাঁদের কণ্ঠের উঠানামা নীল আলোর সুতোর মতো ধরতে। তারা সেই পবিত্র শব্দগুলো আমার দিকে পাঠাচ্ছিল আর আমি কিছুক্ষণের জন্য তা ধরে শব্দগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম। এভাবে আমরা সময়ের মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত না হয়ে গাইছিলাম। সবাই যেন সেই রাতের সমুদ্রে শ্যাওলার মতো দোল খাচ্ছিলাম। কি চমৎকার ব্যাপার ছিল! আমার চারপাশের বাচ্চাগুলো আমাকে পশমি কাপড়ের উপহারের মতো জড়িয়ে ছিল।

ক্লান্ত হলেও গানের নীল সুঁতাটা কিন্তু ছাড়িনি আমি। আমার মনোযোগ এমন ছিল যেন আমি ঘুমের মধ্যে ঈশ্বরের নাম জপছি কিংবা আমি কেবল মহাবিশ্বের থেকে বিচ্যুত হয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছি। সাড়ে এগারোটার দিকে বাদ্য বাদকের দল ভজনের সুরটা বিশুদ্ধ আনন্দের মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল। সুন্দর পোশাক পরিহিতা নারীরা চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ তুলে হাত তালি দিচ্ছিল, নাচছিল, আর সারা শরীর ঝাঁকিয়ে আনন্দ জানাচ্ছিল। ঢোলের শব্দ সুরেলা, জোরালো এবং উত্তেজনাপূর্ণ। কয়েক মুহূর্ত পার হওয়ার পর আমার মনে হচ্ছিল আমরা সবাই মিলে ২০০৪ সালকে কাছে টেনে নামাচ্ছি। যেন আমরা একে আমাদের সুরের দড়ি দিয়ে বেঁধেছি তারপর একে আমরা এভাবে ধরেছি যেন এটা রাতের আকাশে ছড়ানো সেটা একটা বিশাল মাছ ধরার জাল। আমাদের অজানা ভাগ্যসহ দোল খাচ্ছে। কী ভারী জালই না সেটা যা আগামী বছরে আমাদের ভাগ্যের সকল জন্ম, মৃত্যু, বিপদ, যুদ্ধ, ভালোবাসার কাহিনি, সৃষ্টি, রূপান্তর এবং আবহাওয়া যা বহন করছে।

আমরা গান গাইছিলাম এবং টলছিলাম– হাতে হাত রেখে, মুহূর্তের ওপর মুহূর্ত নিয়ে, স্বরের ওপর স্বর দিয়ে, কাছাকাছি হয়ে। রাত দ্বিপ্রহরে আমরা

www.pathagar.org

আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে আরও উচ্চস্বরে গাচ্ছিলাম, সেই শেষ সাহসী উদ্যোগে আমরা জালটা আমাদের ওপর টেনে নামাতে সক্ষম হয়েছিলাম। আকাশ এবং আমরা সবাই ঢেকে গিয়েছিলাম সেই জালের নিচে। ঈশ্বরই জানেন সেই বছর আমাদের ভাগ্যে কি ছিল কিন্তু তখন সেখানে আমরা সবাই এর নিচে অবস্থান করছিলাম।

আমার জীবনের সেটা একটা অদ্ভুত নববর্ষ। যাদের সাথে দিনটা পালন করেছিলাম তাদের কাউকে আমি চিনি না। সেই যে গান গাওয়া এবং নাচতে থাকা মানুষগুলোর কেউ সেখানে আমার জন্মদিন বলে আমাকে বিব্রত করতে আসেনি। কিন্তু আমাকে এটা মানতেই হবে সে রাতে আমি একা বোধ করিনি।

না আমি তা অবশ্যই বলব না।

৪১

আমাদের সবাইকে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। আমার কাজ পড়েছিল মন্দিরের মেঝে পরিষ্কার করা। তাই সেখানে দিনে কয়েক ঘণ্টা কাটাতেই হতো। ঠাণ্ডা মার্বেল পাথরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে একটা ব্রাস আর বালতি নিয়ে কাজ করতে হতো। যেন আমি ছিলাম রূপকথার গল্পের সৎ বোন। এই রূপকথা আমি বুঝি– এখানে মন্দিরের মেঝেটা হচ্ছে আমার হৃদয়, কাজটা হচ্ছে আসলে আমার আত্মা পরিষ্কার করা। প্রতিদিন জাগতিক কিছু সামর্থ্য আত্মিক অনুশীলন ব্যয় করা যাতে আত্মা শুদ্ধ হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমার মেঝে পরিষ্কার করার সহকর্মীরা ছিল এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী। কর্তৃপক্ষ সবসময় তরুণ-তরুণীদের এই কাজ দেয়। যেখানে বিশাল দায়িত্ব নয় শারীরিক সক্ষমতাটাই দরকার কিংবা কাজে গোলমাল বাধালে খুব বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মেয়েগুলো চঞ্চল প্রজাপতির মতো। এদের আমেরিকান আঠারো বয়সী মেয়েদের চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। আর ছেলেগুলো দেখতে কিছুটা স্বৈরাচারী গোছের, তাই তাদের আঠারো বছর বয়সী আমেরিকান তরুণদের চেয়ে বড় দেখায়। মন্দিরে কারো কথা বলার কথা না, কিন্তু আমাদের কাজ করার সময় অনর্গল আড্ডা চলতেই থাকত। সেগুলো সবই অবশ্য অকাজের কথা বার্তা নয়। আমার পাশে মেঝে পরিষ্কারকারী একটা ছেলে সারাক্ষণ আমাকে জ্ঞান দিত। যেমন, 'কাজটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে নাও, ভালোভাবে কর, আস্তে-ধীরে, রয়ে-সয়ে। মনে রাখবে যাই করছ তা ঈশ্বরের জন্য আর ঈশ্বর যা করবেন সব তোমার জন্যই।'

খুব ক্লান্তিকর শারীরিক চর্চা কিন্তু সেটা আমার কাছে ধ্যান করার চেয়ে তুলনামূলক সহজ মনে হতো। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হতো না আমি

www.pathagar.org

ধ্যানে পারদর্শী। আমি জানি তখন আমি বেশ কিছুদিন ধ্যানে সময় দেইনি কিন্তু একথাটাও সত্য যে আমি এই কাজে বরাবরই তেমন মনযোগী ছিলাম না। আমার মনে হতো আমি আমার মনকে স্থির রাখতে পারি না। কথাটা একজন ভারতীয় সাধককে বলেছিলাম। সে বলেছিল, 'আহ এটা একটা দুঃখের বিষয়। তবে ইতিহাসে তুমিই একমাত্র ব্যাক্তি নও যার এই সমস্যাটা আছে।' তারপর সন্ন্যাসীটা ভগবৎ গীতা থেকে উদ্ধৃত করেছিল যা যোগের প্রাচীন শুদ্ধ লিপি, 'ও কৃষ্ণ, মন বড়ই অস্থির, চঞ্চল, অদম্য, একরোখা। বাতাসকে বাগে আনার মতোই কঠিন এটা।'

ধ্যান একদিকে যোগের মূল বিষয় আর এক দিকে শাখা। ধ্যান একটা উপায়। যদিও দুটোই ঐশ্বরিক অনুশীলন তবুও ধ্যান আর প্রার্থনা এক জিনিস নয়। আমি শুনেছি, বলা হয়ে থাকে যে প্রার্থনা করা ঈশ্বরের সাথে কথা বলার মতো কাজ আর ধ্যান হচ্ছে শোনা। একবার খেয়াল করে দেখেন তো আমার জন্য কোনটা সহজ ছিল। আমি সারাটা দিন ইশ্বরের সাথে ঠিকই নিজের অনুভূতি আর সমস্যা নিয়ে বকবক করতে পারতাম কিন্তু যখন শান্ত হয়ে শোনার প্রশ্ন উঠত, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে যেত। আমি যখন আমার মনকে শান্ত হতে বলতাম তখন অবাক হয়ে যেতাম, কত দ্রুত এটা হয়ে যেত, ১ বিরক্ত, ২ রাগান্বিত, ৩ বিষণ্ণ, ৪ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ এবং ৫ উল্লেখিত সব কটা।

সকল মানবের মতো আমিও বহন করতাম বুদ্ধের ভাষায় যাকে বলে, 'বানর মন।' যে ভাবনা এক ডাল থেকে আর এক ডালে দোল খায় এবং কেবল একে অপরকে খামচি, চিমটি দেয়। আর ঝগড়া করার সুযোগ খোঁজে। বিগত অতীত থেকে অজানা ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আমার মন সারাক্ষণ বন্য দোল খায়। এটা এমনিতে কোনো সমস্যা নয়। সমস্যাটা হচ্ছে ভাবনার সাথে আবেগের সংশ্লিষ্টতা। সুখি ভাবনা আমাকে সুখি করে কিন্তু উফ! কত দ্রুত আমি আবার ঝুলে যাই দুশ্চিন্তায়, মেজাজ খিঁচড়ে যায়, এবং কোনো পুষে রাখা ক্ষোভ স্মরণ করিয়ে দেয় তারপর আমার মাথা গরম হয়ে যেতে থাকে এবং আবার আমার মন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর আমার মন সিদ্ধান্ত নেয় যে দুঃখ প্রকাশ শুরু করার জন্য এটা আসলেই উপযুক্ত সময় এবং দ্রুত একাকীত্ব আমাকে অনুসরণ করে। আপনি যা ভাববেন আপনি তাই। আপনার আবেগ আপনার ভাবনার দাস এবং আপনি আপনার আবেগের দাস।

ভাবনার এক ডাল থেকে আর এক ডালে দোল খাওয়ার সমস্যাটা হচ্ছে আপনি কখনোই আপনার বর্তমানে থাকছেন না। হয় অতীতে গিয়ে মাটি খুঁড়ছেন না হয় ভবিষ্যৎকে খোঁচা দিচ্ছেন কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আপনি জিরোচ্ছেন না। ব্যাপারটা আমার বন্ধু সুজানের একটা অভ্যাসের মতো। সে যখনই কোনো সুন্দর জায়গায় বেড়াতে যায়, দেখেই উত্তেজনায় আর ভয়ে ঘোষণা করতে থাকে, 'বাহ জায়গাটা এতো সুন্দর! আমি আবার এখানে আসব।' আমার সকল ক্ষমতা দিয়েও তাকে তখন বোঝাতে পারি না যে সে ইতোমধ্যে সেই জায়গাটাতেই তো আছে। তার আর একবার আসার উৎকণ্ঠা প্রকাশের চেয়ে এই বার উপভোগ করাটা বেশি জরুরী। আপনি যদি ঐশ্বরিক সমন্বয় খোঁজেন এই রকম ভাবে সময়ের আগে পিছে ঘুরপাক

www.pathagar.org

খাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে তারা ঈশ্বরকে একটা উপস্থিতি হিসেবে বলে থাকে। কেন না ঈশ্বর এইখানে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন। বর্তমানই এমন একটা জায়গা যেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে এবং এই মুহূর্তটাই এক মাত্র শ্রেষ্ঠ সময়।

কিন্তু বর্তমান সময়ে স্থির থাকতে একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে মনোনিবেশ করা শিখতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ধ্যান বিভিন্ন ধরনের কেন্দ্রীভূত মনোযোগের শিক্ষা নিতে হয়, যেমন আলোর একটা রশ্মির দিকে চোখ স্থির রাখা কিংবা নিজের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ প্রক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করা। আমার গুরু একটা মন্ত্রের মাধ্যমে মন কেন্দ্রীভূত করতে শিখিয়েছেন, শুদ্ধভাবে ধ্বনি উচ্চারণ করে তার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে। মন্ত্র দুই ধরনের কাজ করে। এক, এটা মনকে কিছু করতে দেয় এই যেমন আপনি বানরকে দশ হাজার বোতামের স্তূপ দিয়ে বললেন একটা একটা করে সরিয়ে রাখ আর একটা নতুন স্তূপ বানাও। এক কোণায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বলার চেয়ে এটা বানরের জন্য সহজ কাজ। মন্ত্রের আর একটা কাজ হচ্ছে, আপনার মনের ছোট ছোট ভাবনার ঢেউয়ে নৌকা বেয়ে অন্য একটা অবস্থানে পৌঁছে দেওয়া। যখনই আপনার মনোযোগ বর্তমানের নানান ঘটনায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তখনই নৌকায় ফিরে যাবেন এবং এগুতে থাকবেন। বলা হয়ে থাকে মহান সংস্কৃত শব্দ অভাবনীয় ক্ষমতার অধিকারী। আপনি যদি একটা মন্ত্রের সাথে থাকতে পারেন তাহলে সেটা আপনাকে ঐশ্বরিক সমুদ্রতীরে দ্বার বেয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

যে মন্ত্রটা আমাকে দেওয়া হয়েছিল, 'ওঁম নামাহ শিবায়া' তা আমার মাথায় স্থির থাকে না। যদিও শব্দটা আমি পছন্দ করতাম। আমি এর অর্থটা ভালোবাসি কিন্তু এটা আমাকে ধ্যানে আটকে রাখতে পারে না। আমার যোগ শেখার দুই বছরেও তা হয়নি। আমি যখন মনে মনে ওঁম নামাহ শিবাহ বার বার বলতাম, বাক্যটা আমার মুখে আটকে যেত, আমার বুক শক্ত করে ধরে রাখত এবং আমি ভয় পেতে শুরু করতাম। আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে আমি আগে কখনোই এই ধ্বনিগুলোকে খাপ খাওয়াতে পারিনি।

শেষ পর্যন্ত আমি আমার রুমমেট কেরলাকেও কথাটা জিজ্ঞেস না করে পারিনি। খুব লজ্জিতভাবে স্বীকার করেছিলাম মন্ত্রে মনোযোগ দিতে আমার কি পরিমান কষ্ট হচ্ছে। ভেবেছিলাম যেহেতু সে একজন ধ্যানের উপদেষ্টা সে নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করতে পারবে। সে বলেছিল, ধ্যানের সময় তার মনও নাকি নানান ভাবনায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু এখন সে দারুণ ভাবেই কাজটা করতে পারে। এখন এটা তার কাছে সহজ এবং আনন্দের।

সে বলেছিল,

দেখো! এই যেমন আমি এখানে বসে আমার চোখ বুজলাম। এবং শুধু মন্ত্রের ব্যাপারেই ভাবলাম তারপর আমি স্বর্গে উধাও হয়ে গেলাম।

এটা শুনে হিংসায় মনটা জ্বলে গিয়েছিল। তারপর সে বলেছিল, আমার বয়স যত, ততদিন ধরে সে যোগ অনুশীলন করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঠিক কিভাবে সে 'ওঁম নামাহ শিবাহ' শব্দটা উচ্চারণ করে। সে কি প্রতিটা ধ্বনিতে একটা

www.pathagar.org

করে শ্বাস নেয়। আমি যখন এটা করি আমি হতবুদ্ধি বোধ করি এবং বিরক্ত হই, নাকি প্রতিটা শ্বাসে সবগুলো ধ্বনি একসাথে নেয়? কিন্তু শব্দগুলোর উচ্চতা সমান নয় আমি কিভাবে তা সমান ভাগে ভাগ করে শ্বাস ফেলব! নাকি সে শ্বাস নিতে নিতে পুরো মন্ত্রটা একবারে বলে এবং শ্বাস ফেলতে ফেলতে আর একবার বলে। কারণ আমি যখনই এরকম করতে গিয়েছি আমার লয় দ্রুত হয়ে যায় আর আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই।

কেরলা বলেছিল,

আমি জানি না। আমি শুধু বলে যাই।

আমি তবু উদ্ভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করতে থাকি।

কিন্তু তুমি কি এটা গাও? তুমি কি এতে কোনো তাল যোগ কর?

আমি কেবল এটা বলিই।

আচ্ছা! তুমি মনে মনে এটা যেভাবে বল সেভাবে তুমি কি আমাকে একবার শোনাতে পারবে?

তখনই আমার রুমমেট তার চোখ বুজে মন্ত্রটা বলতে শুরু করে। যেভাবে তার মাথায় এটা আসে এবং দেখা গিয়েছিল অবশ্যই সে কেবল এটা উচ্চারণ করছিল। শান্তভাবে, সাধারণভাবে, হেসে হেসে এবং আস্তে। যে পর্যন্ত না আমি অস্থির হয়ে থামাই সে এটা বলছিল।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

কিন্তু তুমি বিরক্ত হও না?

কেরলা তার চোখ খুলে হেসে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিল,

দশ সেকেন্ড চলে গেছে লিজ। বিরক্ত হয়ে গেছি নাকি আমরা?

৪২

এর পরদিন ভোর।

আমি সেখানে ভোর পাঁচটায় গিয়েছিলাম। প্রতিদিন সেই সময়েই ক্লাস শুরু হতো। শুরুতে আমাদের সেখানে এক ঘন্টা নিঃশব্দে বসে থাকতে হতো। কিন্তু সেসময় মিনিটকে আমার কাছে মাইলের মতো মনে হতো। কী নিষ্ঠুর ষাট মিনিট! আমি সহ্য করতে পারতাম না। কয়েক মিনিট পর আমার বুক ধুকপুক শুরু হতো, আমার হাঁটু ভেঙে আসত এবং উত্তেজনা আমাকে বশ করে ফেলত। সেসময়ে আমার আর আমার মনের কথা বার্তা শুনলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। কথোপকথনগুলো অনেকটা এমন হতো,

> আমি : ঠিক আছে। আমরা এখন ধ্যান করব। এসো আমরা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আর মন্ত্রে মনোযোগ দেই। ওঁম নামাহ শিবায়া। ওঁম নামাহ শিবায়া।

www.pathagar.org

মন : আমি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। জানো?

আমি : ঠিক আছে। আমার তোমার সাহায্য দরকার। চলো এগোই। ওঁম নামাহ শিবায়া, ওঁম নামাহ শিবায়া–

মন : আমি তোমাকে ধ্যানের জন্য ভাল ছবি কল্পনা করে দিতে পারি। যেমন– এই দেখ কি সুন্দর একটা ছবি ভেবেছি। ভেবে নাও তুমি একটা মন্দির। মানে একটা দ্বীপে তুমি একটা মন্দির এবং দ্বীপটা একটা সমুদ্রের ওপর অবস্থিত।

আমি : ওহ। খুবই সুন্দর একটা দৃশ্য।

মন : ধন্যবাদ আমি নিজেই এটা ভেবে বের করেছি।

আমি : কিন্তু আমরা এখানে কোনো সমুদ্রের ছবি তৈরি করেছি।

মন : হে ধ্যানী! ভেবে নাও এটা একটা গ্রিক দ্বীপ। সেই দ্বীপে একটা গ্রিক প্রাচীন মন্দির। ভেবো না আবার বেশি নাটুকে হয়ে গেল। শোনো, সমুদ্রের কথা বাদ দাও। সমুদ্র খুব ভয়াবহ। একটা ভাল বুদ্ধি আছে বরং ভেবে নাও দ্বীপটা একটা হ্রদের ওপর অবস্থিত।

আমি : দয়া করে আমরা কি এখন ধ্যান শুরু করতে পারি? ওঁম নামাহ শিবায়া।

মন : অবশ্যই। কিন্তু হ্রদটা কি দিয়ে বোঝাই তা নিয়ে ভাবতে চাইছি না বরং কিন্তু সেগুলাকে যেন কি যেন বলে?

আমি : জেট স্কিস?

মন : হ্যাঁ জেট স্কিস। তাতে অনেক ফুয়েল খরচ হয়। পরিবেশের জন্য খুবই খারাপ। তুমি জানো সবচেয়ে বেশি ফুয়েল খায় কি? পাতা ঝাঁট দেওয়ার গাড়ি। তুমি হয়ত তা জানো না। কিন্তু–

আমি : ঠিক আছে কিন্তু এখন আমাকে ধ্যান করতে দাও। দয়া করে চুপ থাক।

মন : ঠিক। আমি অবশ্যই তোমাকে ধ্যানে মনোযোগী করতে চাই। তাই আমরা এখন লেক বা সমুদ্রের ওপর দ্বীপের ছবিটা বদলে দেব। কেননা এটা কোনো কাজের না। তাই কল্পনা কর, তুমি একটা দ্বীপে আছ যা নদীর ওপর।

আমি : আহা! তুমি কি বলছ সেটা হাডসন নদীর ওপর বানেরম্যান দ্বীপের মতো?

মন : ঠিক। একদম ঠিক। এটাই চূড়ান্ত যে, তুমি একটা নদীর ওপর একটা দ্বীপ। ধ্যান করার সময় তোমার সকল ভাবনা নদীটার বহমান তরঙ্গে

www.pathagar.org

ভাসছে। এবং এই ভাসমান অবস্থায় তুমি খারাপ বোধ করছ না, কেন না তুমি একটা দ্বীপ।

আমি : থামো। তুমি বলেছিলে আমি একটা মন্দির।

মন : ঠিক আছে। দুঃখিত। তুমি একটা দ্বীপে একটা মন্দির। আসলে তুমি মন্দির এবং দ্বীপ দুটোই।

আমি : নদীটাও আমি?

মন : না। নদীটা শুধু একটা ভাবনা।

আমি : থামো। দয়া করে থামো। তুমি আমাকে পাগল করে দিচ্ছ।

মন : (আহত) দুঃখিত! আমি কেবল সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।

আমি : ওঁম নামাহ শিবায়া, ওঁম নামাহ শিবায়া।

কয়েক সেকেন্ড দুর্দান্ত মনোযোগী হয়ে ধ্যান করতাম কিন্তু তারপর,

মন : তুমি কি আমার ওপর ক্ষেপে আছ?

–এবং তারপর আমি এমনভাবে শ্বাস টেনে নিতাম যেন গভীর পানি থেকে বাতাসের জন্য এই মাত্র উপরে উঠেছি, আমার মন জিতে যেত, আমার চোখগুলো যেন খুলে যেত এবং কাঁদতে কাঁদতে আমি ধ্যান শেষ করতাম। আশ্রমে গেলে ধ্যানে মনোযোগী হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে কী ভয়াবহ অবস্থা! এই চাপ আমার জন্য বেশি ছিল। আমি আর পারছিলাম না। কিন্তু কি করব? প্রতিদিন এভাবে চৌদ্দ মিনিট পর মন্দির থেকে কেঁদে-কেটে বের হয়ে যেতাম?

একদিন সকালে এভাবে যুদ্ধ করার সময় আমি নিজেকে থামিয়ে দিয়ে, ধ্যান থেকে উঠে গিয়েছিলাম। আমার পেছনের দেয়ালে ঠাস করে এলিয়ে পড়ে পিঠে ব্যথা পেয়েছিলাম। আমার মন এভাবে কেঁপেছিল যেন আমার কোনো শক্তি নেই। আমার আসন এভাবে আঁটকে গিয়েছিল যেন কোনো সেতু ভেঙে পড়েছে। আমি আমার মাথা থেকে মন্ত্রটা, যেটা আমাকে মুগুর দিয়ে আঘাত করার মতো চাপ দিচ্ছিল, নামিয়ে মেঝেতে আমার পাশে রেখে দিয়েছিলাম। তারপর ঈশ্বরকে বলেছিলাম, আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি আপনার কাছে এই পর্যন্তই যেতে পেরেছি।

লেকোঁটা সেক্সাস বলে, যে বাচ্চা স্থির হয়ে বসতে পারে না সে এখনো পরিণত হয়নি। এবং একটা প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে বলা আছে, 'কিছু লক্ষণে বোঝা যায় ধ্যান ঠিক মতো হচ্ছে কিনা। তাদের একটা হলো আপনার মাথায় একটা পাখি বসে ভাববে আপনি একটা জড় পদার্থ।' আমার সাথে তখনো এমন কিছু ঘটেনি। কিন্তু এর পরের চল্লিশ মিনিট আমি সেই ধ্যানের কক্ষে নিজের লজ্জা আর অপারগতার জালের ফাঁদে পড়ে যথাসম্ভব চুপচাপ থেকেছি। অথচ আমার আশে-পাশের শিষ্যদের মুখের শান্ত ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল অবশ্যই তারা ততক্ষণে কোনো স্বর্গে পৌঁছে গেছে। আমার খুব, খুব কষ্ট হয়েছিল। সে অবস্থায়

www.pathagar.org

কান্নায় ভেঙে পড়লে হয়ত আমি শান্তি পেতাম কিন্তু আমার গুরু যা বলেছিলেন তা ভেবে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলাম শান্ত থাকতে। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি কখনো নিজেকে ভেঙে পড়তে দেবে না। যদি দাও তবে এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তা বারবার ঘটতে থাকবে। এর চেয়ে তুমি অভ্যাস করবে শক্ত থাকার।'

কিন্তু আমার মনে হতো না আমি শক্তিশালী। আমি ক্রমাগত ক্ষয়ে যাচ্ছিলাম, আমার শরীর ব্যথা করছিল। বুঝতে পারছিলাম না যখন মনের সাথে কথা বলতাম তখন সে আমিটা কে আর মনটা কে? আমার নিষ্ঠুর চিন্তার জন্মদাতা এবং আত্মগ্রাস করার যন্ত্র হচ্ছে আসলে আমার এই মগজ। ভেবে বিস্মিত হয়েছিলাম এই পৃথিবীতে কিভাবে আমি একে নিয়ন্ত্রণ করব। তারপর জওসের সেই লাইনগুলো মনে পড়ে অবশ্য হাসি আঁটকে রাখতে পারিনি,

'আমাদের আরো বড় নৌকা দরকার।'

৪৩

একদিন রাতের আহারের সময়, আমি একা বসে ছিলাম। খাদ্যটা কিভাবে আস্তে ধীরে খাওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছিলাম। খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের গুরু সবসময় নিয়মানুবর্তিতা মানতে বলেন। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা দেন যাতে আমরা মার্জিতভাবে খাদ্যটা খাই এবং যেভাবে খুশি সেভাবে খাবারের গ্রাস মুখে না তুলি। আমাদের পরিপাকতন্ত্রে অতিমাত্রায় খাদ্য ঠুসে আমাদের শরীরের শুদ্ধতার আগুন না নিভিয়ে দেই। আমি একেবারে নিশ্চিত আমার গুরু কখনো নেপলসে যাননি। যখন ছাত্ররা তার কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে যে তারা ঠিকমতো ধ্যানে মনোযোগ দিতে পারছে না তখন গুরু সবসময় জিজ্ঞেস করেন যে, ইদানীং তাদের খাবার ঠিকমতো হজম হয় কি না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনি আত্মিক অনুশীলনে মনোযোগ দিতে পারছেন না কারণ আপনার নাড়িভুঁড়ি একটা সসেজ কলজনে, এক পাউন্ড মোষের মাংস এবং কিছু নারকেলের নাড়ু পিষতে যুদ্ধ করছে। এই জন্য সেখানে এই ধরনের খাবার পরিবেশন করা হতো না। আশ্রমের খাবার নিরামিষ জাতীয়, হালকা, স্বাস্থ্যকর কিন্তু এতটাই মজা যে ক্ষুধার্ত এতিমের মতো হামলে না পড়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়াত। তার ওপর খাদ্য পরিবেশন করা হতো বাফেট পদ্ধতিতে। যদি এমন সুঘ্রাণ যুক্ত, লোভনীয়, বিনামুল্যের খাবার-দাবার এভাবে উন্মুক্ত পড়ে থাকে তখন দ্বিতীয় বার বা তৃতীয় বার তা আবার পাতে না নিয়ে পারা যায় নাকি! বলুন তো?

তাই আমি খাবার টেবিলে একা বসে আমার চামচ সংযত রাখার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ একটা লোককে তার খাবারের থালা নিয়ে বসার জন্য চেয়ার খুঁজতে দেখলাম। আমি তাকে ইশারা করে আমার পাশে বসার সম্মতি দিলাম।

www.pathagar.org

লোকটাকে এর আগে তো সেখানে দেখিনি। ভেবেছিলাম, অবশ্যই সে সেখানে নতুন এসেছে। হাঁটা চলা কেমন শান্ত, যেন কোনো তাড়াহুড়া নেই। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে কোনো বর্ডার শহরের পুলিশ কর্তৃপক্ষ কিংবা বহুদিন ধরে একজন উচ্চ-পদস্থ পোকার খেলোয়াড়। বয়স পঞ্চাশের কোঠার মনে হলেও হাঁটার ধরন তেমন ছিল না। যেন আসলে এর চেয়ে কয়েক শতক বেশি তার বয়স। মাথায় ছিল সাদা চুল, সাদা দাড়ি এবং পরনে ফ্লানেলের কুর্তা। তার চওড়া কাঁধ এবং বিশাল হাত দুটো দেখে মনে হচ্ছিল সেগুলো বিরাট ধরনের ক্ষয় ক্ষতি করতে প্রস্তুত। চেহারাটা কিন্তু আবার একেবারে শান্ত ছিল।

সে আমার বরাবর বসেই হা পিত্যেশ শুরু করে দিয়েছিল,

ওরে বাবা! এত বড় বড় মশা। একটা মুরগিকে অনায়েসে ধর্ষণ করে ফেলতে পারবে।

ভদ্র মহোদয় এবং ভদ্র মহিলাগণ, আমার গল্পে টেক্সাসের রিচার্ড চলে এসেছে।

৪৪

টেক্সাসের রিচার্ড তার সারা জীবনে কি কি কাজ করেছে তার কিছু বাদ দিয়েই বলছি শুনুন- তেল-খনি কর্মী, আঠারো চাকার ট্রাক চালক, ডাকোটার ব্রিকেনস্টকের প্রথম নিবন্ধিত ডিলার, মধ্য পশ্চিমের জমির সাক-সাকার, হাইওয়ে সংস্থাপন কর্মী, পুরোনো গাড়ি বিক্রেতা, ভিয়েতনামের সৈনিক, পণ্যদ্রব্যের দালাল, সেই পণ্যগুলো বেশিরভাগ মেক্সিকান নারকটিস পাগলা এবং মাতাল, যদি আপনি এটাকে পেশা হিসেবে নিয়ে থাকেন, তারপর পুনর্গঠিত পাগল এবং মাতাল, একটা বেশ ভাল সম্মানজনক জীবিকা, একটা সংগঠনের যাযাবর কৃষক, রেডিওর ঘোষক এবং শেষমেশ একটা সফল চিকিৎসা বিষয়ক যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ী। বিবাহবিচ্ছেদের আগ পর্যন্ত তার সাবেক জনের পেছনে মন-প্রাণ দিয়ে দেওয়া তার কাজ ছিল আর এখন কাজ হচ্ছে আমার কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেওয়া। সে শেষমেশ অস্টিনে একটা বাড়ি কিনেছে।

তারপরও রিচার্ড বলত, জীবনে কিছু করতে পারিনি কেবল ঘোড়ার ঘাস কেটেছি।

টেক্সাসের রিচার্ড এমন একজন মানুষ যে জীবনে অনেক কিছু চায় না। আমি তাকে পাগল বলব না। না জনাব। আমিই কিছুটা বাতিকগ্রস্ত তাই আমি তাকে এতটা পছন্দ করি।

সেই আশ্রমে রিচার্ডের উপস্থিতি আমার কাছে অনেক মজার হয়ে উঠেছিল। তার প্রবল আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব আমার জন্মগত ভীত সত্তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল, বুঝিয়েছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি ঠিক নাও হয় তবে হাস্যকর কিছু হবে। রোস্টার ফগহর্ন, লেগহর্ন কার্টুনটা মনে আছে? রিচার্ড ঠিক সে রকম।

www.pathagar.org

এবং আমিও তার কটকট করা ঘনিষ্ঠ ছোট বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। রিচার্ডের নিজস্ব ভাষায় যাকে বলে, 'কক কক করা মুরগি।' আমি এবং মুদি দোকান দুজনই সারাক্ষণ হাসতাম।

মুদি দোকান কি এবং কে? বলছি।

প্রথম দেখাতেই সে খেয়াল করেছিল আমি অনেক খেতে পারি। হ্যাঁ! তারপর মুদি দোকান ডাকনামটা রিচার্ডই আমাকে দিয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলি, আমি কিন্তু যোগের নিয়মনীতি অনুযায়ী ভেবে চিন্তে খাচ্ছিলাম, তবু নামটা স্থায়ী হয়ে গিয়েছে!

হয়ত রিচার্ড আদর্শ যোগী নয়। যদিও আমার ভারতে থাকাকালীন সময়টা আদর্শ যোগীর মানদণ্ড বিচার করার বিপক্ষে। রিচার্ড তার এক সাবেক প্রেমিকার মাধ্যমে যোগের সাথে পরিচিত হয়েছিল। যে তাকে টেক্সাস থেকে নিউইয়র্ক গুরুর ভাষণ শুনতে নিয়ে গিয়েছিল। রিচার্ড বলেছিল, আমি ভেবেছিলাম আশ্রম হবে আমার দেখা খুব বাজে একটা জায়গা। ভয় পাচ্ছিলাম হঠাৎ কোনো একটা ঘরে গিয়ে আমার সব টাকা, গাড়ি, বাড়ির দলিল দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু না তেমনটা কখনোই ঘটেনি।

সেই অভিজ্ঞতার পর রিচার্ড আবিষ্কার করেছিল, সে সারাক্ষণ প্রার্থনা করছে। তার প্রার্থনাটা সব সময় একইরকম হতো। সে সারাক্ষণ ঈশ্বরকে বলত, দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর আমার হৃদয় খুলে দাও। সে এটাই শুধু চাইত– একটা উন্মুক্ত হৃদয়। এবং সে সব সময় প্রার্থনা শেষ করত খোলা হৃদয়ের আকুতি জানিয়ে, আর বলত, ঈশ্বর, কখন এটা ঘটবে তার একটা নিদর্শন দেখিও দয়া করে। তাই সে সময়ের স্মৃতিচারণ করে সে আমাকে বলে, ঈশ্বরের কাছে কি চাইবে তা চিন্তা করে চাইবে মুদি দোকান, কেননা তুমি এটা পেয়েও যেতে পারো। কয়েক মাস অনবরত প্রস্বস্ত মনের জন্য প্রার্থনা করতে করতে বলুন তো রিচার্ড কি পেয়েছিল? একদম ঠিক ধরেছেন– একটা খোলা হৃদয়। তার বুক চেরা হয়েছিল কারণ তার ভেতরের রগগুলো একে অপরের সাথে পেঁচিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল যাতে হৃদপিণ্ডে কিছু সূর্যের আলো পৌঁছে। ঈশ্বর যেন বলছিলেন, নিদর্শন হিসেবে এটা কেমন? তাই এখন রিচার্ড তার প্রার্থনা নিয়ে খুব সতর্ক। সে আমাকে বলত, আমি ইদানীং ঈশ্বরের কাছে যা কিছুই চাই সাথে এটাও বলি ঈশ্বর যাই কর একটু নরম হয়ে কর। ঠিক আছে?

মন্দিরের মেঝে পরিষ্কার করার সময় একদিন রিচার্ড আমাকে দেখছিল। সে ভাগ্যবান, সে রান্নাঘরে কাজ করে। রাতের খাবারের এক ঘণ্টার আগেই তার সেখানে যেতে হয়। কিন্তু আমাকে মন্দিরের মেঝে পরিষ্কার করতে দেখতে তার ভাল লাগে। তার কাছে এটা খুব মজার। তখন আমি তাকে এই প্রশ্নটা করি, কেন সে আমাকে এভাবে দেখে।

তুমি কেন এই ব্যাপারে এতো ভাবছো মুদির দোকান?

কেননা কিছু হচ্ছে না?

কে বলল?

আমি আমার মনকে স্থির করতে পারি না।

www.pathagar.org

ভুলে গেছ নাকি আমাদের গুরু কি শিখিয়েছেন– তুমি যদি ধ্যানের একটা ইচ্ছা নিয়ে বস তাহলে অন্য কেউ কি করছে এটা তোমার বিষয় না। তাই তুমি তোমার সাথে অন্যের তুলনা করছ কেন?

কারণ আমার ধ্যানে কি হচ্ছে তা যোগের সাথে যায় না।

মুদি দোকান তোমার কোনো ধারণা নেই আসলে।

আমি কখনো কোনো দৃশ্য দেখি না। আমার কোনো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়নি।

তুমি কি কিছু সুন্দর রঙ দেখতে চাও। না নিজেকে জানতে চাও? তোমার উদ্দেশ্য কি?

আমি দেখেছি ধ্যান করার সময় আমি কেবল নিজের সাথে তর্ক করি।

এটা তোমার অহং। নিশ্চিত হতে চায় সব তার অধীনে আছে কিনা। এটাই অহংয়ের কাজ। এটা তোমাকে একা করে রাখে, তোমার দুটো আলাদা সত্তা প্রকাশ করে, তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে তুমি ভুল করছ, তুমি ভেঙে পড়েছ, তুমি একা।

কিন্তু এটা কি কখনো আমার কাজে আসবে?

না। এটা তোমাকে সাহায্য করবে না। এর একমাত্র কাজ হচ্ছে ক্ষমতা ধরে রাখা। এবং এই মুহূর্তে তোমার অহং মৃত্যু ভয়ে আছে কেননা এটা নত হয়ে যাচ্ছে। তুমি আত্মিক পথে চলছ সোনা এবং সেই এলোমেলো দিন শেষ। খুব দ্রুত তোমার অহং আর কাজ করবে না এবং তোমার হৃদয় তখন সকল সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তাই তোমার অহং তার জীবন বাঁচাতে লড়ছে, তোমার মন নিয়ে খেলছে, তার কর্তৃত্ব ধরে রাখতে চাইছে, তোমার মনের চোখের সামনে একটা সম্মোহনী কলম ধরে পৃথিবীর সব কিছু থেকে তোমার মনোযোগ নিয়ে নিতে চাইছে। ওর কথা শুনো না।

তুমি কিভাবে ওর কথা না শুনে পার?

কখনো বাচ্চাদের হাত থেকে খেলনা কেড়ে নিয়েছ? তারা ক্ষেপে যায় তাই না? তারা হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার শুরু করে। তাই তাদের হাত থেকে খেলনা কেড়ে নেওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে তাকে খেলার জন্য অন্য কিছু দাও। তার মনোযোগ বদলে দাও। জোর করে মন থেকে ভাবনা ঝেড়ে ফেলার চেয়ে মনকে আরও ভাল কিছু দাও খেলার জন্য। এমন কিছু যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

যেমন?

যেমন ভালোবাসা, মুদির দোকান। শুদ্ধ ঐশ্বরিক ভালোবাসা।

৪৫

প্রতিদিন ধ্যানগুহায় যাওয়াটা তখন একটা আধ্যাত্মিক সুখানুভূতির ব্যাপার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি সেখানে গড়িমসি করতাম। যেমনটা আমার কুকুর গবাদি পশুর চিকিৎসালয় যাওয়ার সময় করত, যে সবাই এখন যত ভাল ব্যবহারই করুক না কেন

www.pathagar.org

একটু পরই সূঁইয়ের খোঁচা খেতে হবে। কিন্তু রিচার্ডের সাথে শেষ কথোপকথনের পর আমি এক সকালে আবার নতুন উদ্যমে গিয়েছিলাম। ধ্যান করতে বসে আমার মনকে বলেছিলাম, শোনো, আমি বুঝতে পারছি, তুমি ভয় পাচ্ছ। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে অপদস্থ করব না। আমি কেবল তোমাকে শান্তিতে আরাম করতে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

একদিন একজন সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিল যে, মনের বিশ্রামাগার হচ্ছে হৃদয়। সারাদিন মন শুনতে পায় ঘণ্টা ধ্বনি, তর্ক আর কোলাহল, এবং সে যা চায় তা হলো, নিস্তব্ধতা। একমাত্র হৃদয়ের নীরবতাতেই মন শান্তি খুঁজে পায়। সেখানেই আমাদের যেতে হবে।

আমি ভিন্ন একটা মন্ত্র নিয়ে আবার চেষ্টা করছিলাম। এটা এমন একটা মন্ত্র যা ভাগ্যক্রমে অনেক আগেই পেয়েছিলাম।

হাম-সা।

সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ, 'আমি তাই।' যোগীরা বলে থাকে হাম-সা একটা খুবই প্রাকৃতিক শব্দ, যা আমাদের ঈশ্বর আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ, শ্বাস নেওয়ার সময় হাম, ছাড়ার সময় সা। যাইহোক, হাম শব্দটার উচ্চারণ খুব নরম, যেমন হা-হা হা ম। যতক্ষণ আমরা বেঁচে থাকব, প্রতিটা মুহূর্তে আমরা শ্বাস নেব আর ছাড়ব, এই মন্ত্রটার পুনরাবৃত্তি করেই যাব। আমি তাই, আমি অলৌকিক, আমি ঈশ্বরের সাথে আছি, আমি ঈশ্বরের একটা অভিব্যক্তি, আমি আলাদা নই, আমি একা নই, আমি একটা পৃথক সত্তার সীমাবদ্ধ নকশা নই। হাম-সা আমার কাছে সবসময় সহজ আর আরামদায়ক। ওঁম নামাহ শিবায়ার চেয়ে এটা দিয়ে ধ্যান করা সহজ। তবে এটা যোগের প্রাতিষ্ঠানিক মন্ত্র নয়। তাই পরদিন আমি সেই সন্ন্যাসীর সাথে এ নিয়ে কথা বলেছিলাম। সে বলেছিল হাম-সা দিয়েই চালিয়ে যেতে। যেহেতু এটা আমার ধ্যানে সাহায্য করছে। সে বলেছিল, যেটা তোমার মনে আলোড়ন তোলে তা দিয়েই ধ্যান কর।

তাই একদিন সেটা নিয়েই বসেছিলাম।

হাম-সা, আমি তা।

নানান ভাবনা আসছিল। কিন্তু আমি তাদের পাত্তা দিচ্ছিলাম না। বরং তাদেরকে মায়ের মতন করে বলছিলাম, বিচ্ছুরা আমি তোমাদের চিনি। বাইরে গিয়ে এখন খেলা কর, মা ঈশ্বরের কথা শুনছেন।

হাম-সা–

আমি তা।

আমি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিংবা ঘুম নয় অন্য কিছু। ধ্যানে আপনি কখনোই নিশ্চিত হতে পারবেন না আপনি যাকে ঘুম ভাবছেন তা আসলে ঘুম কিনা। মাঝে মাঝে এটা কেবল চেতনার আর একটা স্তর। যখন আমি জেগে যাচ্ছিলাম বা তাকে যাই বলুক আমি বুঝতে পারছিলাম নরম নীল বৈদ্যুতিক শক্তি তরঙ্গ রূপে আমার শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে। অনুভূতিটা কিছুটা ভড়কে ওঠার মতো কিন্তু অসাধারণ। কি করতে হবে আমি জানতাম না তাই আমি আভ্যন্তরীণভাবে সেই শক্তির সাথে কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, আমি তোমাকে বিশ্বাস

www.pathagar.org

করি এবং সেটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রসারিত হয়ে সাড়া দিয়েছিল। সেটা তখন ভয়াবহ ক্ষমতাসম্পন্ন, চেতনা অবলুপ্ত করার মতো। যা আমার মেরুদণ্ডের আগা থেকে বেয়ে উপরে উঠে আমার ঘাড়ে এমনভাবে লেগে ছিল যেন তা বাঁকা হয়ে পড়ে যাবে। আমি তাই হতে দিয়েছিলাম এবং এরপর অদ্ভুত আসনে বসেছিলাম যেভাবে একজন ভাল যোগী বসে। কিন্তু আমার বাম কান, বাম কাঁধের দিকে কে যেন টানছিল। আমি জানি না কেন আমার মাথা এবং কাঁধ এমন করছিল কিন্তু আমি তাদের সাথে তর্কে যাইনি তারা যেন একরকম জেদ করছিল। নীল আলোর ঘূর্ণিটা আমার শরীরে তখনো প্রবাহিত হচ্ছিল এবং আমি একধরনের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। সেটা এমন ভীষণ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল তখন যে আমার মনে হচ্ছিল আমি আর সহ্য করতে পারব না। আমি খুব ভয় পেয়ে শক্তিটাকে বলেছিলাম, আমি এখনো তৈরি নই। তারপর ঝট করে চোখ খুলে দেখলাম, সব চলে গেছে আমি তখন সেই কক্ষে ফিরে গিয়েছি, ফিরে গিয়েছি আমার আশেপাশের জগতে। ঘড়ি দেখে বুঝেছিলাম, এক ঘণ্টা আমি সেখানে ছিলাম বা সেখান থেকে অনেক দূরে ছিলাম।

আমি হাঁপাচ্ছিলাম। খুব হাঁপাচ্ছিলাম।

৪৬

অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল, ঐ গুহায় কি হয়েছিল এবং সেই কুণ্ডলীকৃত শক্তিটা কি তা বুঝতে হলে 'গুঢ়' এবং 'বন্য' এই দুটো ব্যাপার আলোচনা জরুরী হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর প্রতিটা ধর্মে কিছু সংঘবদ্ধ সাধকের দল থাকেন যারা স্রষ্টার সাথে সরাসরি এবং সর্ব উৎকৃষ্ট সংস্পর্শের চেষ্টা করে থাকেন। এই রহস্যের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যখন তারা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন দেখা যায় সবার সাথে একই ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে ধ্যানের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে তাদের মিলনের সময়টাতে পুরো শরীরে একটা নীল বৈদ্যুতিক আলোর অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায়। জাপানিরা এই শক্তিকে বলে 'কি,' চাইনিজরা একে 'চি,' বালিনিজরা একে বলে 'টাকসু,' খ্রিস্টানরা একে বলে 'পবিত্র উদ্দীপনা,' কালাহারি বুশ ম্যানরা একে বলে 'নিয়ম,' তাদের পবিত্র পুরুষরা ব্যাখ্যা করে গেছেন এটা শাপের মতো একটা শক্তি যা মেরুদণ্ড বেয়ে মাথায় একটা ছিদ্র করে দেয়, যাতে ঈশ্বর প্রবেশ করতে পারেন। ইসলামিক সুফি কবিগণ স্রষ্টার এই শক্তিকে বলেছেন 'প্রিয়তম' এবং এটাকে নিয়ে ভক্তিমূলক কবিতা লিখেছেন। অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীরা বর্ণনা করেন আকাশ থেকে সর্পিল কিছু নেমে এসে কবিরাজকে অপার্থিব কোনো ক্ষমতা দিয়ে থাকে। জিউইশ কাব্বালাহ সংস্কৃতিতে বলা হয়ে থাকে আত্মিক আরোহণের সময় ঐশ্বরিক সম্মিলন ঘটে থাকে যে, যেন একটা অদৃশ্য শক্তির ধারা মেরুদণ্ড বরাবর বেয়ে ওঠা।

www.pathagar.org

আবিলর সেন্ট তেরেছা, ক্যাথলিকের সবচেয়ে রহস্যময় ব্যক্তিত্ব স্রষ্টার সাথে তার মিলনের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, অনুভূতিটা এমন যেন তার সত্তার সাতটা স্তর ভেদ করে শরীরে আলোর আরোহণ হচ্ছিল। যার পর তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বিস্ফোরিত হতেন। ধ্যানের ঘোরে তিনি এমন পর্যায়ে চলে যেতেন যে অন্যান্য নান রা তার নাড়ীর স্পন্দন পেতেন না। তিনি তার অনুসারী নানদের অনুরোধ করতেন যেন তারা যা দেখে তা কাউকে না বলে। যেহেতু ব্যাপারটা অন্যরকম এবং এতে নানান বিতর্ক উঠতে পারে। সবচেয়ে কঠিন কাজটা হচ্ছে সেই সাধক তার স্মৃতিচারণে লিখে গেছেন যে, 'ধ্যানের সময় কোনো ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি বা মস্তিষ্কের ব্যবহার করা যাবে না। এমন কি কোনো আকুল আবেদনও জানানো যাবে না। এটা ঈশ্বরের আগুন নিভিয়ে দেয়। একবার যদি ছটফটে মন নানান কথা তুলতে থাকে আর তর্ক করতে থাকে এবং তাতে যদি যুক্তি থাকে। এটা দ্রুত কল্পনা করবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। কিন্তু আপনি যদি এই ভাবনাগুলো এড়াতে পারেন তাহলে ঈশ্বরের দিকে আরোহণ করতে পারবেন,' তেরেসা ব্যাখ্যা করেছেন, তা হবে একটা মহিমান্বিত সম্মোহন, একটা স্বর্গীয় অনুভূতি, যাতে সত্যিকারের বোধি লাভ করা যায়। এ যেন না জেনেই পারস্যের দুর্বোধ্য কবি হাফিজের কথার প্রতিধ্বনি যিনি দাবি করেছিলেন, 'কেন আমরা ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হব না? আমরা কি সবাই এমনিতেই চিৎকার করতে থাকা মাতাল নই?' তেরেছা তার আত্ম সমালোচনায় বলেছেন, 'এই স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা যদি পাগলামিও হয় আমি তোমার কাছে অনুনয় করছি ফাদার আমাদের সবাইকে পাগল করে দাও।'

এখনো সেন্ট তেরছার লেখা পড়লে আপনি তার ভেতর থেকে বের হয়ে আসা সেই উন্মত্ত অভিজ্ঞতা অনুভব করতে পারবেন। তারপর প্রাচীন স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে, সংযত হয়ে, দায়িত্বের সাথে, ক্ষমা চেয়েছেন– সেখানে তিনি একজন স্বৈরাচারী ধর্মীয় নিগ্রহের মধ্যে ছিলেন। তার সেই উত্তেজনার জন্য তিনি লিখেছেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন যদি আমি বেশি সাহস দেখিয়ে থাকি।' ক্রমে তার একই কথার পুনরাবৃত্তি অন্তঃসার শূন্য ভেবে কেউ আর পাত্তা দেয়নি। কেননা তাকে কেবল একজন নারী একজন জঘন্য কীট হিসেবে দেখিয়েছিল। বইটা পড়লে আপনি তার মসৃণ স্কার্টের পেছন দিকটা দেখতে পাবেন এবং শেষের কয়েক গাছি চুলের আগলে রাখাও দেখতে পাবেন। আর তার ঐশ্বরিকতা, তা যেন গোপনীয় একটা জ্বলজ্বলে লুকানো অগ্নি উৎসব।

ভারতীয় যোগী সংস্কৃতিতে, এই গুপ্ত ঐশ্বরিক জিনিসের নাম 'কুণ্ডলিনী শক্তি' যেটা একটা প্যাঁচানো সাপের মতো মেরুদণ্ডের মূলে শুয়ে আছে। যা কেবল একজন দক্ষ ব্যক্তির ছোঁয়ায় বা অলৌকিক ঘটনায় মুক্ত হয়। আর তারপর তা সাতটা চক্র বেয়ে উপরে ওঠে। যাকে আমরা আত্মার সাতটা স্তরও বলতে পারি। এবং শেষে যা মাথা ফুঁড়ে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়। যোগীরা বলেন এই চক্র সকল শরীরে থাকে না তাই সব শরীরে তা খুঁজে লাভ নেই। এটা থাকে বিশেষ কিছু শরীরে। যে শরীরের উদাহরণ দিতে শ্রমণ শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের বলেন, এ যেন শরীর থেকে আর একটা নতুন সত্তা টেনে বের করে আনা যেভাবে খাপ

www.pathagar.org

থেকে তরবারি বের করা হয়। আমার বন্ধু বব, একজন যোগী এবং মস্তিষ্ক বিজ্ঞানী দুইই। সে আমাকে বলেছিল, সে নাকি আগে এই চক্র ধারণার বিপক্ষে ছিল এবং সে আসলেই একটা মানব শরীর কেটে কুটে দেখতে চাইত এমন কিছু আছে কিনা। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অভাবনীয় ধ্যানের অভিজ্ঞতার পর সে তার নতুন একটা সংজ্ঞার সাথে একমত হয়েছে। সে বলেছিল, যেমন লেখার ক্ষেত্রে আক্ষরিক সত্য এবং কাব্যিক সত্য আছে। তেমনি মানুষের সত্তাতেও একটা আক্ষরিক শারীরবিদ্যা এবং কাব্যিক শারীরবিদ্যা আছে। একটা আমরা দেখতে পাই আর একটা পাই না। একটা হাড়, মাংস আর দাঁত দিয়ে তৈরি আর একটা শক্তি, স্মৃতি এবং বিশ্বাস দিয়ে তৈরি। কিন্তু তারা দুটিই সত্য।

যখন ধার্মিকতা আর বিজ্ঞান একই বিন্দুতে ছেদ করে তখন আমার ভাল লাগে। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে কিছুদিন আগে একটা খবর পড়েছিলাম যে, একদল মস্তিষ্ক গবেষক একটা ধ্যানরত তিব্বতিয়ান সাধকের মাথায় মস্তিষ্ক স্ক্যানিংয়ের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি লাগিয়েছিল। তারা দেখতে চেয়েছিল একটা এমন উচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত চেতনায় কি দেখা যায়? বৈজ্ঞানিকভাবে এই আলোকিত অবস্থার মুহূর্তকে কী বলে? সাধারণভাবে চিন্তারত মানুষের মাথায় ভাবনার বৈদ্যুতিক ঝড় এবং আবেগের ঘূর্ণি চলতেই থাকে, মস্তিষ্ক স্ক্যানিংয়ে তা হলুদ আর লাল আলোর ঝলকানি হিসেবে প্রদর্শিত হয়। বেশি রাগান্বিত বা আলোড়ন তোলা ভাবনাগুলো উত্তপ্ত এবং ঘাঢ় লাল রঙের আলো হয়ে জ্বলে। কিন্তু সকল সাধকগণ সকল সাংস্কৃতিক ধ্যানের সময় মস্তিষ্কের স্থিরতার কথা বর্ণনা করেছেন এবং তারা বলেছেন, ঈশ্বরের সাথে মিলনের সময় তারা অনুভব করেন তাঁদের মাথার খুলি দিয়ে একটা নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যোগ সংস্কৃতিতে একে বলে নীল মুক্তা। এবং প্রতিটা অন্বেষক এটাই খোঁজেন। সেই তিব্বতিয়ান সাধু যাকে ধ্যানের সময় বিশ্লেষণ করা হচ্ছিল তিনি তার মস্তিষ্ককে পুরোপুরি শান্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কোনো লাল এবং হলুদ বাতি জ্বলছিল না। অবশ্যই সেই লোকটার মাথার ঠিক মাঝখান থেকে স্নায়ুর সকল শক্তির সংকেত সংগ্রহ করা হচ্ছিল, আপনি সেটা সেই মনিটরে দেখতেও পারতেন– একটা ছোট ঠাণ্ডা, নীল আলোর মুক্তা। যেরকমটা যোগীরা সবসময় বর্ণনা করে থাকে।

এটা কুণ্ডলিনী শক্তির আধার।

রহস্যময় ভারতে এবং অনেক সামানস্টিক সংস্কৃতিতে কুণ্ডলিনী শক্তি নিয়ে কাজ করা বিপজ্জনক মনে করা হয়। পরিচালনায় ভুল হলে বা অনভিজ্ঞ যোগী পুরোপুরি পাগল হয়ে যেতে পারে। একজন শিক্ষক দরকার এক্ষেত্রে। দরকার একজন গুরুর যিনি এই পথে পরিচালনা করবেন এবং একটা আদর্শ নিরাপদ স্থান যেমন আশ্রম যেখানে থেকে অনুশীলন করতে হবে। একে বলে গুরুর স্পর্শ কিংবা স্বপ্নে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে এমন অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হওয়া যা প্যাঁচানো অবস্থা থেকে কুণ্ডলী শক্তিকে মুক্ত করে তা ঈশ্বরের পথে উপরের দিকে প্রেরণ করে, এই মুক্তির মুহূর্তকে বলে শক্তিপথ, ঐশ্বরিক অভিষেক। এটা একজন আলোকিত গুরুর তার শিষ্যকে দেওয়া সবচেয়ে মহান উপহার। ব্যাপারটা এমন যে, ভ্রমণ শুরু হয়ে গেছে, শক্তি মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.org

আমার শক্তিপথ অভিষেক হয়েছিল আশ্রমে থাকার দুই বছর আগে। নিউইয়র্কে ক্যাটস্কিলে তার আশ্রমে সপ্তাহ শেষের একটা অনুষ্ঠানে যখন আমি প্রথমবারের মতো আমার গুরুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সত্যি বলতে আমি তখন তেমন কিছুই অনুভব করিনি। আমি আশা করেছিলাম যে, স্রষ্টার সাথে একটা জাঁকজমক মুখোমুখি হবে, কিংবা নীল আলোর বিচ্ছুরণ হবে। আমি আমার শরীর তন্নতন্ন করে খুঁজেছিলাম কিন্তু সেখানে বরাবরের মতো প্রচণ্ড ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই পাইনি। আমার মনে আছে, আমি ভাবছিলাম আমার হয়ত এমন একটা উন্মুক্ত শক্তির মতো অদ্ভুত কিছু অনুভব করার বিশ্বাস নেই। মনে আছে আমি খুব যুক্তি দিয়ে চিন্তা করছিলাম। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নয়। তাই হয়ত আমার ভক্তির পথ রহস্যের নয় যুক্তির দিকে গিয়েছিল। আমি প্রার্থনা করতে পারতাম, বই পড়তে পারতাম, মজার ভাবনা ভাবতে পারতাম কিন্তু সেন্ট তেরেসার বর্ণনা অনুযায়ী সেই ঐশ্বরিক ধ্যানের মঙ্গলালোকে আরোহণ করতে পারতাম না। কিন্তু এটা ঠিক তখনো আমি ধার্মিক অনুশীলন পছন্দ করতাম, কেবল মেনে নিয়েছিলাম বোধ হয় কুণ্ডলিনী শক্তি আমার জন্য নয়।

তার পরদিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমরা আর একবার গুরুর কাছে জড়ো হয়েছিলাম। তিনি আমাদের দিয়ে ধ্যান করিয়েছিলেন এবং ধ্যানের মাঝে হঠাৎ আমি ঘুমিয়ে, কিংবা তাকে যাই বলে, পড়েছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নে আমি একটা সমুদ্রের তীরে ছিলাম। প্রচণ্ড ঢেউ উন্মত্তভাবে আছড়ে পড়ছিল, আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছিল। হঠাৎ আমার সামনে একজন লোক আবির্ভূত হলো। সে ছিল আমার গুরুর শিক্ষক। একজন মহান ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী গুরু যাকে শুধু স্বামীজী নামে ডাকা হয়। স্বামীজী মারা গেছেন ১৯৮২ সালে। আশ্রম জুড়ে তার ছবি দেখে কেবল তাকে আমি চিনি এবং স্বীকার করছি শুধু এই ছবি দেখে আমার সবসময় তাঁকে একটু বেশি ভয়ানক, একটু বেশি শক্তিশালী, একটু বেশি রাগান্বিত মানুষ মনে হয়েছে। আমি এই ধারণা অনেক দিন ধরেই মনে পুষে রেখেছিলাম। তাঁর ছবি থেকে চোখ এড়িয়ে চলতাম। মনে হতো ছবিগুলো যেন দেয়াল থেকে আমাকে দেখছে। তাকে দেখে জাঁদরেল মনে হতো। আমি যেমন ধরনের চাই তিনি তেমন গুরু নন। সেই মৃত, এখনো ক্রুদ্ধ চরিত্রের চেয়ে আমার কাছে লাবণ্যময়ী, সমবেদনা পূর্ণ, জীবন্ত নারী শিক্ষকই আমার প্রিয় ছিল।

কিন্তু তখন স্বামীজী আমার স্বপ্নে তার সকল শক্তি নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। তিনি সেই ঢেউয়ের দিকে নির্দেশ করে কঠোরভাবে বলছিলেন, 'আমি তোমাকে এই ঢেউয়ের আরও কাছে এগিয়ে আসা বন্ধ করার উপায় বের করতে বলব।' ভয়ে আমি একটা নোটবুক বের করে আঁকি ঝুঁকি করে নানান আবিষ্কার নানান নকশা আঁকতে শুরু করেছিলাম, যাতে ঢেউ থামানো যায়। আমি প্রচুর দেয়াল, খাল, বাঁধ এঁকেছিলাম। আমার সকল নকশাই অকেজো হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি জানতাম এটা আমার আওতাধীন না। আমি স্থপতি না। কিন্তু অনুভব করতে পারছিলাম স্বামীজী আমাকে অস্থির আর আবেগি হিসেবে দেখছিলেন। ভয় পেয়ে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার কোনো পরিকল্পনাই সেই ঢেউগুলো আয়ত্তে আনার মতো যৌক্তিক ও সক্ষম ছিল না।

www.pathagar.org

ঠিক তখন শুনতে পেয়েছিলাম স্বামীজী হাসছেন। আমি তখন মুখ তুলে সেই ছোট মানুষটার দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি সত্যিকার অর্থে পেট কাঁপিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলেন, আনন্দে বেঁকে যাচ্ছিলেন, হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে পড়েছিল।

তিনি সেই উন্মত্ত, শক্তিশালী, অসীম, উত্তাল সমুদ্রের দিকে নির্দেশ করে বলেছিলেন, 'বল হে প্রিয়, তুমি যদি বিনয়ী হও, তাহলে এটা থামাতে কিরকম পরিকল্পনা করবে?'

৪৭

দুই রাত ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম আমার ঘরে একটা সাপ প্রবেশ করছে। কোথায় যেন পড়েছি এটা একটা আত্মিক রূপক। এরকম কেবল পূবের ধর্মেই মানা হয় তা নয়, সেন্ট ইগনাটায়াস তার সমস্ত গুপ্ত অভিজ্ঞতা জুড়ে সর্পিল কিছু দেখতে পেতেন। কিন্তু তাতে কি সাপের দর্শনটাতো কম ভয়ানক নয়! আমি ঘুম থেকে ঘেমে নেয়ে জেগে উঠতাম। এর চেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, জাগার পর আমার মন আমাকে দ্বৈত সময়ে পাক খাওয়াতে শুরু করেছিল। আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। এতটা আমার বিবাহবিচ্ছেদের সময়ও হয়নি। আমার মন আমার ব্যর্থ বিবাহিত জীবনে উড়ে যাচ্ছিল আর তার সাথে জড়ানো সকল লজ্জা আর ভয় আমাকে আবার ফুঁসিয়ে তুলছিল। এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে আমি আবার ডেভিডের কথা ভাবছিলাম। মনে মনে তার সাথে তর্ক করছিলাম। যেন একটা পাগল, একজন একা মহিলা ছিলাম আমি। যে সমস্ত কষ্ট সে আমাকে দিয়েছে একে একে সব মনে পড়ছিল। পাশাপাশি মনে পড়ছিল তার সাথে কাটানো সুন্দর সময়টাও। আমাদের সুখের সেই আনন্দ বিভ্রম! আমি কেবল পারছিলাম না ভারতে থেকে সেই মধ্যরাতে, তাকে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ফোন করতে। জানি না কেন? তার জন্য মনটা হাপিত্তেশ করছিল কিনা কিংবা আমি কি তার কাছে আবার আমাকে ভালোবাসতে ভিক্ষা চাইছিলাম কিংবা তার চরিত্রের সকল দোষ ত্রুটির জন্য তার প্রতি অভিযোগ করছিলাম কিনা? ভাবছিলাম, এ সবকিছু আবার ফিরে আসছে কেন এখন?

আমি জানতাম এ-বিষয়ে সেখানকার প্রাক্তনরা কি বলত। বলত, এসবই স্বাভাবিক, সবাই এর মধ্যে দিয়েই গেছে। সেই তীব্র ধ্যানের কারণে সব কিছু বেরিয়ে আসছে। এজন্য তুমি তোমার ভেতরের পুঞ্জিভূত দুঃস্বপ্ন উগরে দিচ্ছ। কিন্তু আমি এমন একটা মানসিক অবস্থায় ছিলাম যে আর সহ্য করতে পারছিলাম না এবং এ-ব্যাপারে কোনো বাউন্ডুলে তত্ত্বও শুনতে রাজী ছিলাম না। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, পেটের সব কিছুই উগলে বের হয়ে আসছিল। ঠিক বমির মতো।

www.pathagar.org

এরপর কসরৎ করে আবার নিজেকে ঘুম পাড়াতে সমর্থ হয়েছিলাম এবং আবারও স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু তখন সাপ না একটা বিশাল দুষ্ট কুকুর আমাকে তাড়া করে বলছিল, আমি তোমাকে মেরে ফেলব, আমি তোমাকে মেরে ফেলব আর খেয়ে ফেলব।

কাঁদতে কাঁদতে আর কাঁপতে কাঁপতে আমি আবার জেগে উঠেছিলাম। আমি আমার রুমমেটদের বিরক্ত করতে চাই না বলে গোসলখানায় গিয়ে লুকিয়েছিলাম। গোসলখানা! সব সময় গোসলখানা। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু হ্যাঁ আমি আবার সেই গোসলখানায়, মধ্যরাতে, একাকীত্বে, মেঝেতে মুখ দিয়ে কেঁদেছিলাম। হ্যাঁ নিথর পৃথিবী! আমি তোমার সাথে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর তোমার ভয়াবহ গোসলখানা নিয়েও।

যখন কোনো মতেই কান্না থামছিল না আমি আমার নোটবুক আর কলম নিয়েছিলাম। টয়লেটের পাশে বসে একটা শূন্য পৃষ্ঠা খুলে দ্রুত বিষণ্নতা থেকে বাঁচতে আমার পরিচিত প্রশ্ন-উত্তর শুরু করেছিলাম।

আমি তোমার সাহায্য চাই।

এটা লিখে তারপর মুক্তির একটা লম্বা নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলাম। কেন না আমার নিজের হাতের লেখার মাধ্যমে আমার নির্ভরযোগ্য বন্ধু আমাকে উদ্ধার করতে বিশ্বস্তভাবে এগিয়ে এসেছিল।

'আমি এখানেই। ঠিক আছে? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যাব না।'

৪৮

এরপর দিন সকাল। ধ্যানের একেবারে জগাখিচুড়ি অবস্থা। আমি আমার মনকে বলেছিলাম একটু সরে দাঁড়াতে, যাতে আমি ঈশ্বরকে খুঁজতে পারি। কিন্তু আমার দিকে চোখ পাকিয়ে স্থির কণ্ঠে সে বলেছিল, তুমি কখনো তোমাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। সারাটাদিন নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছিল আর লজ্জা লাগছিল এই জন্য যে, যারা আমার জীবন থেকে সরে গেছে তাদের জন্যই কিনা তখন আমি জীবনকে ভয় পাচ্ছিলাম! আমি আবার গোসলখানায় লুকিয়ে কেঁদেছি বলে আমি আমার আবেগ নিয়ে লজ্জিত ছিলাম। আমার গুরু তো আমাকে ভেঙে পড়তে নিষেধ করেছিলেন, তাতে অভ্যাস হয়ে যায় যে। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল আমার গুরুইবা আমার সমস্যার কি বুঝবেন? তিনি তো নিজে আলোকিত।

আমি কারো সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম না। এমনকি কারো মুখও দেখতে চাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণের জন্য টেক্সাসের রিচার্ডের চোখও ফাঁকি দিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু সে ঠিকই রাতের আহারের সময় খুঁজে বের করে আমার পাশে বসেছিল। সাহসী লোক একটা! আমার নিজস্ব অনিচ্ছার ধোঁয়া সরিয়ে সে আমার

www.pathagar.org

পাশে বসতে পেরেছিল। বরাবরের মতো মুখে টুথপিক নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল,

তোমার এই অবস্থা কেন হয়েছে?

আমি বলেছিলাম,

জিজ্ঞেস করো না।

কিন্তু এরপর আগা গোড়া সব বলে দিয়ে পরে বলেছিলাম,

সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো আমি এখনো ডেভিডকে মন থেকে তাড়াতে পারছি না। ভেবেছিলাম আমি ওকে ভুলে গেছি। কিন্তু এখন যেন আবার সব ফিরে আসছে।

সে বলেছিল,

আরও ছয় মাস সময় দাও। তোমার ভাল লাগবে।

আমি ইতোমধ্যে এক বছর সময় দিয়েছি, রিচার্ড।

তাহলে আরও ছয় মাস দাও। আরও ছয় মাস ছুঁড়ে ফেলে দাও যেন এসব ঠিক হয়ে যায়। এ ধরনের সমস্যা সময় নেয়।

আমি ষাঁড়ের মতো নাক দিয়ে নিশ্বাস ফেলেছিলাম,

সে বলেছিল,

মুদি দোকান আমার কথা শোনো। কোনো একদিন তুমি আজকের দিনে ফিরে তাকিয়ে ভাববে, আহ! অনুশোচনা করার কি সুন্দর দিন ছিল সেটা। তুমি দেখতে পাবে তুমি কষ্ট পাচ্ছিলে, তোমার মন ভেঙে ছিল, কিন্তু তোমার জীবন পাল্টাচ্ছিল এবং সবচেয়ে উপযুক্ত একটা স্থানে তুমি ছিলে। পূজা করার কী সুন্দর স্থান এটা! করুণাধারায় চারপাশ ঘেরা। সময়টাকে গ্রহণ কর, প্রতিটা মুহূর্ত গ্রহণ কর। ভারতে যা ঘটার তা ঘটতে দাও।

কিন্তু আমি তাকে আসলেই ভালোবাসি।

সমস্যা দেখছি। আচ্ছা তাহলে তুমি কারো প্রেমে পড়েছিলে তাই তো? তুমি কি দেখনি তখন কি হয়েছিল? এই লোকটা তোমার গভীরে স্পর্শ করেছিল যেখানে তুমি নিজেও পৌঁছাতে পারোনি। মানে তুমি অতুলনীয় কিছু পেয়েছিলে। কিন্তু যে ভালোবাসা তুমি অনুভব করেছিলে সেটা ছিল একটা শুরু। তুমি কেবল ভালোবাসার একটা স্বাদ পেয়েছিলে। মিষ্টি-মধুর সীমাবদ্ধ পার্থিব ভালোবাসা। দেখতে অপেক্ষা কর যে তুমি এর চেয়েও কত গভীর ভালোবাসতে পার। একদিন এই পুরো পৃথিবীকে ভালোবাসার ক্ষমতা তোমার হবে। হেসো না।

আমি হাসছি না। এবং দয়া করে আমাকে নিয়ে হেসো না। কিন্তু আমার মনে হয় এই লোকটাকে ভুলতে আমার সময় লাগবে কারণ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম ডেভিড আমার সোল-মেট। আমার আত্মার সঙ্গী।

হয়ত সে তাই ছিল। তোমার সমস্যা হলো তুমি এই শব্দটার মানে বুঝতে পারছ না। মানুষ মনে করে একজন সোল মেটই তার জন্য উপযুক্ত সঙ্গী এবং সে তাই যা সে চায়। কিন্তু একটা সত্যিকারের সোল মেট হচ্ছে একটা আয়না, এমন একজন ব্যক্তি যাকে সামনে ধরলে নিজের লুকানো সবকিছু দেখতে পাওয়া যায়। এমন একজন মানুষ যে তোমাকে নিজের দিকে মনোযোগী করে তুলতে পারে। যাতে ব্যক্তি তার জীবন বদলে নিতে পারে। জীবনের পথে যাদের যাদের সাথে

www.pathagar.org

দেখা হবে তাদের মধ্যে একজন সত্যিকারের সোল-মেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। কেননা তারা কান্নার দেয়াল ভেঙে ব্যক্তিকে জাগাতে পারে। কিন্তু সারা জীবন একজন সোল মেটের সাথে থাকা? নাহ! খুব কষ্টের। সোল মেট তোমার জীবনে আসবে তোমার নিজের কাছে নিজের অচেনা অংশটা প্রকাশ করতে এবং তারপর তারা চলে যাবে এবং এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে। তোমার সমস্যা হচ্ছে তুমি সেইরকম একজনকে হারাতে চাচ্ছ না। এটা এখন শেষ লিজ। ডেভিডের কাজ ছিল তোমাকে ঝাঁকিয়ে তোমাকে জাগানো, তোমাকে সেই বিচ্ছিরী বিবাহিত জীবন থেকে বের করে আনা, নিজের সম্মানবোধের মাথা চাড়া দেওয়া, নিজের অপারগতা আর নিজের আসক্তি জানা, মন ভেঙে হৃদয় খুলে রাখা যাতে সেখানে কিছু আলো প্রবেশ করতে পারে, তোমাকে খ্যাপাটে আর অনিয়ন্ত্রিত করে তোলা যাতে তুমি তোমার জীবন পাল্টাতে পারো। এরপর তোমার ধর্মীয় গুরুর সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই ছিল তার কাজ এবং সে তা খুব ভালভাবেই করেছে। কিন্তু এখন সব শেষ। সমস্যা হচ্ছে তুমি মানতে চাচ্ছ না এই সম্পর্কটা আসলে খুব অল্প সময়ের জন্যই ছিল। তুমি সেই কুকুরের মতো করছ সোনা, যে কিনা একটা খালি শূন্য টিনের বাক্স চেটেই যাচ্ছে, আরও পুষ্টিকর মজাদার কিছু পেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তুমি যদি সতর্ক না হও তাহলে এমনই একটা টিনের বাক্স তোমার মুখে সারা জীবনের জন্য আঁটকে যেতে পারে। তাই এটা ফেলে দাও।

কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি।

বাসো।

তার অভাব বোধ করি।

কর। যখনই তার কথা ভাববে তার জন্য কিছু ভালোবাসা পাঠাও এরপর ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। তুমি ডেভিডের এক আনা সম্ভাবনাও ছাড়তে চাচ্ছ না কেন না তুমি ভাবছ এরপর তুমি একা হয়ে যাবে। এবং লিজ গিলবার্ট মারাত্মক ভয় পায় একা হয়ে গেলে কী হবে ভেবে। কিন্তু এখানে তোমার যে জিনিসটা বুঝতে হবে মুদি দোকান তা হলো, এই মানুষটার জন্য তোমার ভেতরে যে আসক্তি আছে তা যদি তুমি খালি করে দাও তা হলে কি হবে জানো? সেখানটাতে একটা খালি জায়গা তৈরি হবে। একটা দরজা উন্মুক্ত হবে। আর আন্দাজ করে নাও সেই দরজা দিয়ে স্রষ্টা কি করবেন? প্রবল বেগে ঈশ্বর ছুটে আসবেন এবং তোমার স্বপ্নের চেয়েও বেশি ভালোবাসা দিয়ে জায়গটা পূর্ণ করে দেবেন। তাই ডেভিডকে দিয়ে শুধু শুধু জায়গটা আটকে রেখো না। তাকে যেতে দাও।

কিন্তু আমি আর ডেভিড যদি...

সে আমাকে থামিয়ে দিলো,

দেখো এটাই তোমার সমস্যা। তুমি অতিরিক্ত চাও। যেখানে মেরুদণ্ড থাকার কথা সেখানে ইচ্ছের অস্থি আছে তোমার।

এই লাইনটা আমাকে সেদিনের প্রথম হাসিটা হাসালো। তারপর আমি রিচার্ডকে জিজ্ঞেস করি,

www.pathagar.org

আচ্ছা তাহলে এই কষ্ট কমতে কতদিন লাগবে?

তোমার নির্দিষ্ট দিন জানতে হবে?

হ্যাঁ।

তুমি কি ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রাখবে?

হ্যাঁ।

তোমাকে একটা কথা বলি মুদি দোকান, তোমার সহ্য শক্তি কম।

এই কথায় আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। সহ্য কম! আমার! এই অপমানের জন্য আমি অনেক কষ্টে রিচার্ডকে চড় দেওয়া হতে নিজেকে সংযত করলাম। একটু পর আমার বিরক্তিতে উসকে ওঠা মন সত্যটার সামনে এসে দাঁড়ালো। তাৎক্ষণিকভাবেই বুঝলাম কথাটা হাস্যকর সত্য। সে একদম ঠিক। আমার মাথার আগুন যত দ্রুত লেগেছিল তত তাড়াতাড়ি নিভে গেল।

আমি বললাম,

তুমি ঠিকই বলেছ।

আমি জানি আমি ঠিক বলেছি সোনা। শোন তুমি একজন শক্তিশালী নারী। তুমি জীবনে যাই চেয়েছ তাই পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছ। এবং শেষের কিছু প্রেমের সম্পর্কে তুমি যা চেয়েছ তা পাওনি এতেই তোমার মন বিগড়ে গেছে। তোমার স্বামী তোমার ইচ্ছামতো আচরণ করেনি কিংবা ডেভিডও তোমার মন বোঝেনি। এই প্রথম তোমার মতো জীবনটা চলেনি। একজন অধৈর্য ব্যক্তির কাছে এর চেয়ে কষ্টের কিছু নেই যে তার ইচ্ছামতো জীবন চলছে না।

আমাকে অধৈর্য বলবে না। দয়া করে।

কেন মুদি দোকান তোমার যে কোনো ধৈর্য সহ্য নেই আগে এটা কেউ বলেনি?

উমমমম... হ্যাঁ বলেছে। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের পর এমন হয় যে কেউ যদি নিজের সম্পর্কে বাজে সত্য বলে তা শুনতে পারার ক্ষমতা কিছুদিনের জন্য হারিয়ে যায়। তাই আমি মেনে নিলাম এটা। ঠিক আছে। তুমি হয়ত ঠিক। আমার হয়ত নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ কম। বাজে লাগল শুধু তুমি খেয়াল করেছ। কিন্তু আমার মনে হয় না এটা আমাকে দেখেই নিশ্চিত হওয়ার মতো সত্য। মানে আমি বাজি ধরতে পারি মানুষ আমাকে প্রথমে দেখেই বুঝতে পারে না যে আমার ধৈর্য কম।

রিচার্ড এতো জোরে হাসে যে তার মুখ থেকে টুথপিকটা প্রায় পড়ে যায়।

তারা পারে সোনা। রে চার্লস তোমার অধৈর্যপনা দেখতে পায়।

ঠিক আছে। আমি মনে করি এই বিষয়ে আমাদের কথা এখানেই শেষ। ধন্যবাদ।

তোমার ভুলে যাওয়া শিখতে হবে তা না হলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তুমি ঠিক মতো ঘুমাতে পারবে না। কেবল জীবনকে এপিঠ ওপিঠ করে ব্যর্থ হিসেবে নিজেকে পাবে– আমার কি হলো? আমার সকল ভালোবাসার সম্পর্কগুলো এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? আমি কেন এভাবে হেরে যাচ্ছি? অনুমান করে বলি, তুমি কাল সারারাত এটাই করেছ।

আমি বলেছিলাম,

ঠিক আছে রিচার্ড যথেষ্ট হয়েছে। আমি তোমাকে আর আমার আশেপাশে দেখতে চাই না।

www.pathagar.org

আমার টেক্সাসের জেষ্ঠ্য যোগী উত্তর দিয়েছিল,
দরজা বন্ধ করে রাখ তাহলে।

৪৯

আমার যখন নয় বছর তখন আমি একবার সত্যিকারের আধ্যাত্মিক চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। হয়ত এরকম চিন্তার বয়স সেটা ছিল না। কিন্তু আমি বরাবর ইঁচড়ে পাকা গোছের। তখন গ্রীষ্মকাল আমি ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে উঠবো। আমার বয়স তখন নয় কি দশ হবে। সেই একক থেকে দশক সংখ্যার রূপান্তরের মধ্যে কিছু একটা ছিল যা আমাকে আমার অস্তিত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। যা মানুষের সাধারণত পঞ্চাশ বছরে হয়। তখন আমার মনে হচ্ছিল আমার জীবন খুব দ্রুত যাচ্ছে। এইতো সেদিন আমি শিশু শ্রেণিতে ছিলাম আর আমি এমন দ্রুত তরুণী হয়ে যাব তারপর মধ্যবয়স্ক, তারপর বুড়ো হবো তারপর মরে যাব। এবং সবার বয়সই এমন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। সবাই খুব দ্রুত মরে যাবে। আমার বাবা মা মরে যাবে, আমার বন্ধুরা মরে যাবে, আমার বিড়াল মরে যাবে। আমার বড় বোন তখন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পড়ত। আমার মনে হচ্ছিল কদিন আগেই সে প্রথম শ্রেণিতে গেল যেন কয়েক মুহূর্তই হয়েছে তার। আর এরপর হাইস্কুলে! তার মরার আগ পর্যন্ত সে খুব বেশি সময় পাবে না। এসব কেন হয়?

এই দুশ্চিন্তার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এমন কোনো কিছু ঘটেনি যাতে আমার মাথায় এই দুশ্চিন্তাগুলো আসতে পারে। কোনো বন্ধু বা আত্মীয় মারা যায়নি, আমি আমাদের মরণশীলতার প্রথম স্বাদ পাইনি। কিংবা মৃত্যু নিয়ে আমি বিশেষ কিছু পড়িনি বা দেখিনি। এমনকি আমি তখনো চারলট ওয়েব পড়িনি। দশ বছরে আমি যে ভয় পেয়েছিলাম তা মানুষের মরণশীলতার অনিবার্য যাত্রার সহজাত এবং পরিপূর্ণ অনুভব ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এবং এটা নিয়ন্ত্রণ করার মতো বা বোঝার মতো আমার কোনো আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল না। আমরা প্রটেস্টান্ট কিন্তু তেমন ধার্মিক কিছু না। কেবল বড়দিন আর থ্যাংকস গিভিং-এর দিন দুচার শ্লোক বলতাম আর চার্চে যেতাম কোনোমতে। রবিবার সকালে আমার বাবা বাসায় থাকতেই পছন্দ করতেন। তার প্রার্থনা ছিল খামারে কাজ করা। আমি দলীয়ভাবে ধর্ম সঙ্গীত গাইতাম কারণ আমি গান গাইতে পছন্দ করতাম। আমার সুন্দর বোনটা বড়দিনের নাটকে ফেরেশতার ভূমিকায় অভিনয় করত। আমার মা গির্জাকে তার এলাকার সেচ্ছাসেবক কাজের সদর দফতর হিসেবে ব্যবহার করতেন। এমনকি গির্জাতেও ঈশ্বরকে নিয়ে তেমন কোনো কথা বার্তা হতো না। সেটা ছিল নতুন ইংল্যান্ড, এবং ঈশ্বর শব্দটাতে নিউইয়র্কবাসীরা অস্বস্তিতে পড়ে যেত।

আমার অসহায় বোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আমি চাইতাম মহাবিশ্বের কর্মকাণ্ডে একটা বিরাট বিরতি হোক, যেরকম বিরতি নিউইয়র্কের স্কুলের একটা

www.pathagar.org

পিকনিকে খাওয়ার সময় ভূগর্ভস্থ রাস্তার কাজে আমি দেখেছিলাম। আমি চাইতাম সময়কে ডেকে বলতে কিছুক্ষণের জন্য যেন সে থেমে থাকে, যে পর্যন্ত না আমি সব বুঝে যাই। আমি চাইতাম মহাবিশ্ব তার কার্যক্রম এই জন্য বন্ধ করে দিক যাতে আমি তা মুঠিতে চেপে ধরতে পারি। রিচার্ড যাকে অধৈর্যপণা বলে সেটাই মনে হয় তখন শুরু হয়েছিল। অবশ্যই আমার সকল দুঃখ, চিন্তাগুলো অনর্থক ছিল। সময়কে আমি যত কাছ থেকে দেখছিলাম তা তত দ্রুত চলছিল। সেই গ্রীষ্মকালটাও দ্রুত কেটে গিয়েছিল এবং আমি তখন প্রতিটা দিন শেষে আর একটা দিন চলে গেছে ভেবে দুঃখ পাচ্ছিলাম আর কান্নায় ভেঙে পড়ছিলাম।

উচ্চ মাধ্যমিকে আমার একজন সহপাঠী ছিল, যে এখন বিকলাঙ্গ বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করে। সে বলে অটিস্টিক বাচ্চারা নাকি সময়ের বয়ে চলা নিয়ে দুঃখবোধে ভোগে। তারা যেন কখনোই মানসিকভাবে মরণশীলতার কথা একবারের জন্য ভুলতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। রবের একটা রুগী প্রতিদিন সকালের শুরুতে সেদিনের তারিখ জানতে চায় এবং দিন শেষেও জিজ্ঞেস করে। রব, আবার কখন ফেব্রুয়ারি চার তারিখ হবে? এবং রবের উত্তর দেওয়ার আগেই সেই লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে দুঃখের সাথে বলে, আমি জানি আমি জানি কখনোই না...আগামী বছরের আগে না। ঠিক না?

এই অনুভূতিটা আমি খুব ভালভাবে জানি। আমি জানি এই দুঃখ পরের বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লম্বা হবে। এই দুঃখ মানুষের জীবনের অনেক বড় কষ্টের অভিজ্ঞতা। যতদূর জানি আমরা এই গ্রহের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী যাদের এই উপহারটা বা অভিশাপটা দেওয়া হয়েছে যে, আমরা আমাদের মরণশীলতার কথা জানি। এখানে সকল প্রাণীই সমান ভাবে মরে যায়। আমরা শুধু ভাগ্যবান একটা জাতি যারা এই বিষয়টা নিয়ে প্রতিদিন ভাবতে পারি। এই তথ্যটা আপনি কিভাবে সামলাতেন যদি আমার মতো নয় বছরে এটা আপনার মাথায় ভর করত। এক্ষেত্রে আমি তখন দক্ষভাবে যা করতে পারতাম তা কেবল, কান্না করা। পরে কয়েক বছরের মধ্যে এই শোক আমাকে যত দ্রুত পারা যায় জীবনের নানান অভিজ্ঞতা, নানান উপভোগের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যেহেতু এতো কম সময়ের জন্য পৃথিবীতে এসেছি তাই আমার তা উপভোগ করতে তখনই যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হচ্ছিল। তাই এতো ভ্রমণ, এতো প্রেম, এতো আকাঙ্ক্ষা এতো এতো পাস্তা। আমার বোনের একটা বন্ধু ভাবত ক্যাথরিনের অনেকগুলো ছোট বোন আছে। কেননা লোকে এরকমটা শুনতেই থাকত যে, ক্যাথরিনের যে বোনটা আফ্রিকা গিয়েছিল, যে বোনটা প্রজনন খামারে কাজ করছিল, যে বোনটা নিউইয়র্কের একবার মদ পরিবেশনকারী হিসেবে কাজ করেছিল, বোনটা একটা বই লিখছে, যে বোনটা বিয়ে করছে, আসলেই কি সব একজন ব্যক্তি! তবে হ্যাঁ এইসব কিছু এক ব্যক্তি করলেও আমি যদি পারতাম নিজেকে ভেঙে কয়েকটা লিজ-এ পরিণত করতে, আমি অবশ্যই তা করতাম। যাতে জীবনের একটা মুহূর্তও আমাকে হারাতে না হয়। হ্যাঁ, আমি নিজেকে কয়েকটা লিজ গিলবার্টে পরিণত করেছিলাম, যাদের সবাই একসময় সেই ত্রিশ বয়সের দিকে, এক রাতে, কোনো শহরতলীর গোসলখানায়, অবসাদে বন্দি হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.org

এখানে বলে রাখা উচিত যে, আমি এটা জানি সবাই এরকম আধ্যাত্মিক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে যায় না। আমাদের কেউ কেউ মরণশীলতার এই দুশ্চিন্তাকে কঠিনভাবে নেয় আবার কেউ কেউ পুরো ব্যাপারটাকে সহজভাবেই দেখে। পৃথিবীতে আপনি অনেক নির্লিপ্ত মানুষের সাথে পরিচিত হবেন আবার অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হবেন যারা পৃথিবীর কার্যক্রমকে মহিমান্বিত বিষয় হিসেবে দেখে থাকে। যারা এর অমীমাংসিত বিষয়গুলোর খুঁতগুলো নিয়ে ভাবে না। আমার এক বন্ধুর দাদি তাকে সবসময় বলত, পৃথিবীতে এমন কোনো গুরুতর সমস্যা নেই যা স্নানের জন্য উষ্ণ পানির, এক গ্লাস হুইস্কি বা একটা সাধারণ প্রার্থনার বই ঠিক করতে পারে না। কিছু মানুষের মতে এটা ঠিক। কিছু মানুষের জন্য যে কোনো সমস্যা এর চেয়ে আরও বেশি মূল্যায়ন জরুরী।

আমি এখন আমার আয়ারল্যান্ডের দুগ্ধ খামারি বন্ধুর কথা উল্লেখ করব। ভারতীয় আশ্রমে ভক্তি সাধনা শিক্ষার সাথে তাকে মেলানো যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় সীন জন্মই নিয়েছে আমার মতো মানব জাতীর অস্তিত্বের কার্যক্রম বোঝার আগ্রহ, পাগলামি, কঠিন তাড়না নিয়ে। তার প্যারিসের ছোট পরিসরে এইসব প্রশ্নের উত্তর সে পায়নি। তাই ১৯৮০ সালে সে খামার ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গিয়েছিল। যোগের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ শান্তি খোঁজার জন্য। কয়েক বছর পর সে আবার আয়ারল্যান্ডের দুধের খামারে ফিরে গিয়েছিল। একদিন সে তার বাবার সাথে পাথরের পুরোনো বাড়িটার রান্নাঘরে বসেছিল। তার বাবা একজন কৃষক এবং কম কথার মানুষ। সীন তখন অদ্ভুত ভারতের সকল আবিষ্কারের কথা তার বাবাকে বলছিল। সীনের বাবা হাল্কা কৌতূহল নিয়ে শুনছিল আর আগুনের কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে হুক্কা টানছিল। সীন বলেছিল, বাবা... এই ধ্যান শিক্ষা, প্রশান্তির জন্য চরম একটা পদ্ধতি। এটা আসলেই একজনের জীবন বাঁচাতে পারে। এটা শেখায় কীভাবে মনকে নিশ্চুপ আর শান্ত রাখতে হয়।

তার বাবা তার দিকে ফিরে মিশ্র মনোভব নিয়ে বলেছিলেন, আমার মন এমনিতেই শান্ত বাবা। তারপর সে আবার আগুনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন।

কিন্তু না আমার, না সীনের মন শান্ত। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই আগুনের দিকে তাকিয়ে কেবল জাহান্নাম দেখতে পায়। আমি জানপ্রাণ দিয়ে শিখতে চাই কি করলে সীনের বাবার মতো জন্মগতভাবেই সব বুঝে যাওয়া যায়! অয়াল্ট হুইটম্যান একবার লিখেছিলেন, উপভোগ করো, প্রসন্নভাবে, দয়াশীলভাবে, আদর্শভাবে, ঐকিকভাবে জীবনকে টেনে তার গতি পরিবর্তন কর, এর বাইরে ভেতরের খেলা দেখ এবং অবাক হও। আর আমি! উপভোগের বদলে দুশ্চিন্তা করি, দেখার বদলে রহস্যের গন্ধ পাই, সব বিষয়ে মাথা ঘামাই। এক দিন প্রার্থনায় আমি ঈশ্বরকে বলেছিলাম, দেখো– আমি বুঝি অপরীক্ষিত জীবন খুব একটা ভাল না কিন্তু তুমি কখনো ভেবেছ আমার কখনো অপরীক্ষিত দুপুরের খাবারও খেতে হয়?

বুড্ডিস্ট লরের একটা গল্প আছে বুদ্ধের উৎকর্ষে পৌছানো আর বোধি লাভ নিয়ে। উনচল্লিশ দিন ধ্যানের পর বিভ্রমের পর্দা যখন পড়ে গেল এবং মহাবিশ্বের সত্যিকারের তত্ত্ব যখন সেই মহান গুরুর কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল, তাকে চোখ

www.pathagar.org

খুলে তাৎক্ষণিক বলতে শোনা যায় 'এটা শেখানো অসম্ভব।' কিন্তু তারপর সে তার মন বদলে ফেলে এবং সিদ্ধান্ত নেয় তার পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়া উচিত, অনন্ত অল্প কিছু ছাত্রকে এই ধ্যানের পদ্ধতিটা শিখিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি জানতেন খুব অল্প কিছু মানুষ তার এই শিক্ষা গ্রহণ করবে বা উৎসাহী হবে। তার মতে বেশির ভাগ মানবতার চোখ প্রতারণার ধুলার স্তরে জমাট বেঁধে আছে তারা সত্য দেখতে পায় না, তাকে যেই সাহায্য করুক না কেন। আর অল্প কিছু, মনে হয় সীনের বাবার মতো কেউ কেউ প্রাকৃতিকভাবেই পরিষ্কার চোখের অধিকারী, এতটাই শান্ত তাদের মন যে তাদের কোনো সাহায্য বা নির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাদের চোখ ধুলায় জমাট তাদের হয়ত সঠিক শিক্ষকের প্রয়োজন। যাতে কোনো একদিন সে একদম পরিষ্কার দেখতে পায়। গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি সেই সংখ্যা লঘুদের উপকারের জন্য তাদের শিক্ষক হবেন যাদের চোখ ধুলায় জমাট।

আমার ধারণা আমি এই মধ্যস্তরের ধুলায় জমাট চোখের মানুষ। কিন্তু আমি জানতাম না। আমি কেবল জানতাম আমি আত্মার শান্তি খুঁজে মরছি এবং এমন একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছি যা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ– আমি যখন আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম আমি ভারতে এক আশ্রমে আত্মিক অনুসন্ধানে যাচ্ছি সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, ওহহো। আমার একটা অংশ এটা করতে চায় কিন্তু আমার এরকম করার আসলেই কোনো ইচ্ছা নেই। আমি জানি না আমার আরও বিকল্প ছিল কিনা। কিন্তু এতগুলো বছর আমি মানসিক সন্তুষ্টি লাভের জন্য কত কিছু কত ভাবেই না করেছি কিন্তু শেষে তা আমাকে আরও তলিয়ে দিয়েছে। জীবনে– যদি আপনি এর পেছনে খুব জোরে ছুটতেই থাকেন এটা আপনাকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সময়– আপনি যদি একে ডাকাতের মতো খুঁজে ফেরেন তবে তা সবসময় আপনার কাছ থেকে এক ধাপ দূরে থাকবে না হয় এক রুম থেকে আর এক রুমে ফাঁকি দিয়ে বেড়াবে। এইমাত্র যে হোটেলে তাকে পাকড়াও করতে গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে যাবেন সে তার পিছন দরজা গলে পালিয়ে যাবে, ছাইদানিতে অসমাপ্ত পোড়া সিগারেট রেখে যাবে আপনাকে উপহাস করতে। কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে থামতেই হচ্ছে কেন না আপনি পারবেন না। আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে আপনি একে ধরতে পারবেন না। পারার কথা না।

কিছু ক্ষেত্রে যেমন রিচার্ড বলে, যেতে দাও, ছেড়ে দাও। চুপচাপ বসে থাক এবং ভেতরে শান্তি আর সন্তুষ্টি আসতে দাও। ছেড়ে দেওয়া, অবশ্যই একটা ভয়ের কাজ তাদের জন্য যারা ভাবে পৃথিবী ঘুরছে কারণ এর মাথায় একটা হাতল আছে এবং যা ব্যক্তিগতভাবে ঘুরাতে হয়। যদি এক মুহূর্তের জন্য হাতলটা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তা হবে পৃথিবীর শেষ দিন। কিন্তু ছেড়ে দিয়ে দেখ মুদি দোকান। এই বার্তাটাই আমি পাচ্ছি। স্থির হয়ে বস এবং নিজের ভেতরের নিষ্ঠুর অংশগ্রহণকে বিরতি দাও, দেখো কি হয়। পাখিরা উড়তে উড়তে হঠাৎ পড়ে যাচ্ছে না, গাছেরা শুকিয়ে মরে যায়নি, নদী লাল রক্তের রঙে বয়ে চলছে না। জীবন বয়ে চলছে। এমনকি ইটালিয়ান পোস্ট অফিস খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যাবে, তোমাকে ছাড়াই সব চলবে। তোমার এমন

www.pathagar.org

কেন মনে হয় তোমার ক্ষুদে ব্যবস্থাপনা ছাড়া পৃথিবী চলবে না? যা হওয়ার তা তুমি হতে দিচ্ছ না কেন?

আমি এই যুক্তিটা শুনেছি এবং আমার কাছে এটা ভাল লেগেছে। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে আমি এতে বিশ্বাস করেছিলাম। তারপর আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম, আমার সকল অস্থিরতা আর্তনাদ করছিল, সকল পাগলামি সমগ্র বোকাটে আগ্রাসী ক্ষুধার্ত চরিত্র জিজ্ঞেস করছিল, তাহলে এতো শক্তি সামর্থ্য দিয়ে আমি করব?

উত্তরটাও এসে গিয়েছিল। আমার গুরুর উপদেশ– ঈশ্বরকে খোঁজ। এভাবে খোঁজ যেন তোমার মাথায় আগুন লেগেছে আর তুমি পানি খুঁজছ।

৫০

তারপরের দিন ধ্যানের মধ্যে আমার সকল ঘৃণ্য, মর্মান্তিক ভাবনাগুলো আবার ফিরে এসেছিল। আমার কাছে সেগুলো বিরক্তিকর দূর-আলাপনী ব্যবসায়ীদের মতো, সবসময় অসময়ে ফোন করে। ধ্যান করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম আমার মন কোনো কাজের জায়গা নয়, যেখানে আসলে আমি গুটিকয়েক জিনিস নিয়েই কেবল ভাবতে পারি এবং সেগুলোই আমি একাধারে ভেবে যাই। আমি বিশ্বাস করতাম এই ব্যাপারটার আনুষ্ঠানিক নাম হওয়া উচিত 'তা দেওয়া।' আমি আমার বিবাহবিচ্ছেদের ভাবনাকে তা দিচ্ছিলাম, আমার বিবাহিত জীবনের যত জ্বালা, সকল ভুল এবং আমার স্বামীর সকল ভুল, সেই কালো অধ্যায় থেকে কোনো সাড়া আসেনি, তারপর আমি ডেভিডের ভাবনাকে 'তা' দেওয়া শুরু করেছিলাম।

খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার। সত্যি বলতে আমি ভারতের এমন একটা বিশুদ্ধ স্থানে কেবল নিজের সাবেক প্রেমিক নিয়ে ভাবছিলাম? আমি আসলে কী? আমি কী একটা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া কিশোরী?

এবং তারপর আমার একটা গল্প মনে পড়েছিল। এটা মনোবিদ বন্ধু ডেবোরাহ বলেছিল একবার। কম্বোডিয়ার রিফ্যুজিদের মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ দেওয়ার জন্য ১৯৮০ সালের দিকে একবার ফিলাডেলফিয়ায় তাকে একটা দলের সাথে কাজ করতে ডাকা হয়েছিল। সবই নৌকায় বাস করা লোকজন যারা কিছুদিন হয় শহরে এসেছে। ডেবোরাহ একজন অসাধারণ মনোরোগ চিকিৎসক। কিন্তু সেও অনেক ভয়ে ছিল। সেই কম্বোডিয়ান মানুষগুলো এমন একটা পরিবেশে ছিল যেখানে মানুষ মানুষের ওপর হামলে পড়ে বেঁচে থাকে– গণহত্যা, ধর্ষণ, নিগ্রহ, উপোস, তাদের আত্মীয়ের চোখের সামনে খুন হয়ে যেতে দেখে, তাদের দীর্ঘদিনের নৌকা বন্দি জীবন এবং পশ্চিমে ভয়াবহ জলযাত্রা যেখানে লাশগুলো হাঙ্গরের খাবার হয়ে যায়। ডেবোরাহ বুঝতে পারছিল না এদের কি ধরনের মনোচিকিৎসা দেবে? কিভাবে সে তাদের ভোগান্তির সম্পর্কযুক্ত চিকিৎসা দেবে। ইত্যাদি...

www.pathagar.org

কিন্তু ডেবোরাহ বলেছিল,

কিন্তু জানো না তো। একজন পরামর্শদাতা পেয়ে তারা যেসব বিষয়ের সমাধান চেয়েছিল তা হলো এমন, 'রিফ্যুজি ক্যাম্পে থাকাকালীন সময়ে আমি এক লোকের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, এবং তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সে আসলেই আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু এরপর আমরা ভিন্ন নৌকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। এরপর সে আমার চাচাতো বোনের সাথে জড়িয়ে যায়। এখন সে তাকে বিয়ে করেছে কিন্তু আমাকে বলে সে নাকি এখনো আমাকে ভালোবাসে। সে আমাকে ফোন করতে থাকে। আমি জানি আমার উচিত তাকে না করে দেওয়া। কিন্তু আমি এখনো তাকে ভালোবাসি, তার কথাই ভাবতে থাকি। আমি জানি না আমি কী করব!

জীব হিসেবে আমরা সবাই ঠিক এমন। এটা আমাদের আবেগের ভিত্তি। একবার আমি প্রায় একশো বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ মহিলার সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, দুটো প্রশ্ন নিয়ে মানবজাতি দ্বন্দ্বে আর যুদ্ধে লিপ্ত হয় আর তা হলো, আমাকে কতটা ভালোবাসো? ক্ষমতা কার হবে? সব কিছুই কোনো না কোনোভাবে মানিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু ভালোবাসা আর নিয়ন্ত্রণ এই দুটো প্রশ্ন আমাদের বার বার ভাবায়, আমাদের উৎকণ্ঠিত করে তোলে এবং যুদ্ধ, কষ্ট আর ভোগান্তি বাঁধিয়ে দেয়। এই জিনিস নিয়েই আমি সেই আশ্রমে ভুগছিলাম। আমি যখন আমার নিজস্ব নীরবতায় বসে নিজের মনের দিকে তাকাতাম, তখন, কেবল আকাঙ্ক্ষা আর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন মনে উদয় হতে থাকত। সেইসব প্রশ্নের তোলপাড়ই আমাকে সামনের দিকে এগুতে দিত না।

সেই সকালে এক ঘণ্টা ধ্যানের গভীরে এই বাজে চিন্তাগুলো জাপটে ধরার পর আমার মনে নতুন একটা বুদ্ধি এসেছিল। আমি আমার হৃদয়কে বলেছিলাম সে কি আমার আত্মার ভেতর মনের কার্যকলাপের একটা ভাল প্রতিচ্ছবি এঁকে দিতে পারবে? যেন আমি ভাবতে পারি আমি ব্যর্থ নই, আমি কেবল একটা মানুষ। ভাবনা এগিয়ে এসে বরাবরের মতো বলেছিল, ঠিক আছে তাই হবে। কিন্তু এরপর পাশাপাশি তার অন্য অনুচর আবেগরাও এসে উপস্থিত হয়েছিল, আমার বিষণ্ন, আবেগী, একা আর রাগ বাড়তে লাগল। কিন্তু তারপর আমার হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত একটা গোপন সাড়া শুনতে পেয়েছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম, এই ভাবনাগুলো দিয়ে আমি তোমাকে বিচার করব না।

আমার মন প্রতিবাদের চেষ্টা করেছিল,

হ্যাঁ কিন্তু তুমি একটা ব্যর্থ একটা বাউন্ডুলে, তুমি কখনো কিছু পাবে না...

আমার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ গর্জন করে উঠছিল। এমন কিছু আমি আগে শুনিনি। এটা এমন একটা অন্তর্গত চিরন্তন একটা গর্জন যে আমি আমার মুখ চেপে ধরেছিলাম। কারণ আমার ভয় হচ্ছিল যদি আমি মুখ খুলি আওয়াজ বাইরে বের হয়ে আসবে। সেটা টেট্রয়েটের দালানের ভীত নাড়িয়ে দেওয়ার মতো গর্জন।

এবং সে যা চিৎকার করে বলেছিল, তা হলো,

তোমার কোনো ধারণা নেই আমার ভালোবাসা কত মজবুত!

www.pathagar.org

কিচমিচ করা বাজে ভাবনাগুলো বাতাসে উড়ে গিয়েছিল। পাখির মতো, খরগোশের মতো ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল। নীরবতা এসেছিল। একটা প্রচণ্ড, কম্পমান, সম্ভ্রান্ত নীরবতা। আমার হৃদয়ের সিংহ তার নতুন রাজত্বে সন্তুষ্টির সাথে আসন নিয়েছিল তারপর সে তার বিশাল চোয়াল চেটে, হলুদ চোখ বুঁজে, ঘুমাতে চলে গিয়েছিল।

এবং তারপর সেই নীরবতায়, শেষমেশ আমি ঈশ্বরের সাথে ধ্যান শুরু করেছিলাম।

৫১

টেক্সাসের রিচার্ডের একটা মিষ্টি অভ্যাস ছিল। যখনই সে আমার পাশ দিয়ে যেত আমার অন্যমনস্ক বিভ্রান্ত চেহারা দেখে সবসময় বলে উঠত,

ডেভিড কেমন আছে?

আর আমি সবসময় উত্তর দিতাম,

নিজের চরকায় তেল দাও। আমি কী ভাবছি তা তুমি জানো না মিস্টার।

আসলে সে সবসময় ঠিকই বুঝত। আর একটা অভ্যাস ছিল আমার ধ্যানের কক্ষ থেকে বের হওয়ার সময় সে আমার জন্য অপেক্ষা করত। কারণ যখন আমি সেখান থেকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসতাম তখন আমার উদ্ভ্রান্ত খিচড়ে যাওয়া চেহারা দেখতে নাকি তার খুব ভাল লাগত। যেন আমি একটা লড়াকু কুমির বা ভূতের সাথে যুদ্ধ করে বের হয়ে এসেছি। সে বলেছিল, সে কখনো কাউকে এভাবে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে দেখেনি। আমি তা জানতাম না কিন্তু এটা ঠিক ধ্যানের কক্ষে যা হতো তা আমার জন্য একটু বেশি মাত্রার ছিল। শেষ কয়েকবার ধ্যানের সময় সবচেয়ে মারাত্মক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যখন আমি আমার মেরুদণ্ডে জমানো কিছু শক্তির ঘূর্ণি ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন ভেবে মজা লাগে যে কুণ্ডলিনী শক্তি ব্যাপারটা আমি রূপকথা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। শক্তিটা যখন আমার শরীর বেয়ে উপরে উঠত তখন এটা অল্প কিছু যন্ত্রপাতির ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের মতো গর্জন করত। এবং এটা আমাকে যা করতে বলত তা হলো,

'তুমি কি দয়া করে তোমার ভেতরটা বাইরের দিকে বের করে দেবে, যাতে তোমার ফুসফুস তোমার হৃদপিণ্ড আরও বাজে জিনিসগুলো বেরিয়ে আসে আর সেখানে মহাবিশ্বটা জায়গা নিয়ে নিতে পারে এবং আবেগের ক্ষেত্রেও একই জিনিস কর তো দেখি।'

আমি সব দিক থেকে বোবা, অসাড়, অচেতন হয়ে পড়তাম। আমি যথাক্রমে গরম, ঠাণ্ডা, ঘৃণা, লোভ, ভয় এরকম চেতনার প্রতিটা অবস্থা অনুভব করতাম। সব শেষে আমি আমার পায়ের পাতার ওপর এভাবে টলতে টলতে বের হয়ে আসতাম

www.pathagar.org

যেন আমি দুর্ভিক্ষের কাকের মতো কতকালের অভুক্ত, তৃষ্ণার্ত। সমুদ্রতটে তিন দিনের ছুটিতে আসা নাবিকের মতো কামার্ত।

রিচার্ড সব সময় সেখানে আমাকে দেখে হাসার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। আমার ক্লান্ত আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় চেহারা দেখে সে সবসময় একই কথা বলত,

আচ্ছা! জীবনে তুমি ঠিক মতো কিছু করতে পেরেছ?

কিন্তু সেই সকালে যখন ধ্যানগুহাতে আমি সিংহের গর্জন শুনেছিলাম, যেটা বলছিল, 'তোমার কোনো ধারণা নেই আমার ভালোবাসা কত গভীর।' আমি সেই ধ্যানগুহা থেকে যোদ্ধা রানীর মতো বের হয়ে এসেছিলাম। রিচার্ড আমাকে জিজ্ঞেস করার সুযোগই পায়নি যে আমি জীবনে কিছু করতে পেরেছি কিনা। এর আগেই আমি তার চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম, 'আমি পেরেছি ভায়া।'

ঠিক আছে। উদযাপন করার মতো একটা খুশির ব্যাপার। চলো বাচ্চা! তোমাকে শহরে নিয়ে গিয়ে আমি এখন থামস আপ খাওয়াব।

থামস আপ ভারতের একটা কোমল পানীয়। কিছুটা কোকাকোলার মতো কিন্তু কর্ন সিরাপের নয়গুণ এবং ক্যাফেইনের তিনগুণ। আমার ধারণা এর ভেতর মেথাফেটামাইনও কিছুটা আছে। এটা খেলে আমি দ্বৈত দেখতাম। সপ্তাহে কয়েকবার রিচার্ড আর আমি গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম আর এক বোতল করে থামস আপ খেতাম। আশ্রমের নিরামিষজাতীয় খাবারের শুদ্ধতার বিপরীতে ভিন্ন একটা অভিজ্ঞতা। সব সময় অবশ্য সতর্ক থাকতে হত আমাদের ঠোঁট যাতে বোতলের মুখে লেগে না যায়। কিন্তু ভারতে ভ্রমণের ব্যাপারে রিচার্ডের নিয়ম অন্যটা। সে বলত,

সব কিছু নিজে স্পর্শ করবে।

গ্রামে ঘুরতে আমাদের ভাল লাগত। সেখানে গেলেই মন্দিরগুলোতে সম্মান জানাতে বিরতি নিতাম এবং মি. পানিকরকে কুশল জিজ্ঞেস করতাম। পানিকর একজন দর্জি যার সাথে দেখা হলেই হাত ঝাঁকিয়ে বলত, আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য বোধ করছি। আমরা সেদিন গরুর খামারে গিয়েছিলাম। ভারতে গরু পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়, আমরা ব্যাপারটা খুব উপভোগ করতাম। আমার মনে হতো গরুরা এই সুবিধাটা নেয়। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার মাঝখানে বসে থাকে কেন না তারা পবিত্র তারা এরকম যা খুশি করতে পারে। আমরা কুকুর দেখেছিলাম তারা একে অপরকে এভাবে খোঁচাচ্ছিল যেন তারা তখন নরকে চলে যেতে পারে। আমরা রাস্তায় মহিলাদের কাজ দেখেছিলাম। তারা সেই আগুনের মতো গরম রোদের তাপে মুগুরের বাড়ি দিয়ে পাথর ভাঙ্গছিল, তাও আবার খালি পায়ে। গলার হার, হাতের চুড়ি আর ঝলমলে শাড়িতে তাদের অদ্ভুত রকম সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমাদের দেখে তারা ঝকঝকে হাসি দিয়েছিল। বুঝতে পারিনি এমন ভয়াবহ অবস্থায়, এমন কঠোর পরিশ্রম করে তারা কীভাবে খুশি থাকে। এমন ভারী মুগুর নিয়ে পিচ গলা রোদে কাজ করে তো পনের মিনিটেই ক্লান্ত হয়ে মরে যাওয়ার কথা। আমি দর্জি পানিকরকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছিল, পৃথিবীর এই এলাকার মানুষরা কঠোর পরিশ্রম করার জন্যই জন্মেছে আর তারা অভ্যস্তও। সে আরও বলেছিল,

www.pathagar.org

আমরা এখানে খুব বেশিদিন থাকি না।

সেটা অবশ্যই একটা দরিদ্রগ্রাম। কিন্তু একেবারে ভারতীয় গ্রামের মতো ততটা না। আশ্রমের চ্যারিটি উপস্থিতি এবং কিছু পশ্চিমা মুদ্রা কিছুটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তৈরি করেছে। এমন নয় যে সেখানে খুব বেশি কিছু কিনতে পাওয়া যায়। তবু আমি আর রিচার্ড সেখানে ঘুরে ফিরে দেখতে পছন্দ করতাম। কিছু মালা আর ছোট ছোট ঠাকুরের মূর্তি। কিছু কাশ্মীরি বুদ্ধিমান বিক্রেতা ছিল যারা সব সময় তাদের মাল আমাদের কাছে গছিয়ে দিতে চাইত। এমনই একজন সেদিন আমাদের পিছে পিছে এসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল,

ম্যাডাম কী তার ঘরের জন্য মাদুর খুঁজছেন?

এই কথায় রিচার্ড খুব মজা পেয়েছিল। আমার যে ঘর বাড়ি নেই সেই ব্যাপারটা নিয়ে দুষ্টামি করে বলেছিল,

হা করে থেকো না ভাই! এই বুড়ো মেয়ের মাদুর রাখার মতো কোনো মেঝে নেই।

সাহসী কাশ্মীরি বিক্রেতা উপদেশ দিয়েছিল,

তাহলে হয়ত ম্যাডাম তা দেয়ালে টাঙাতে চাইবেন।

রিচার্ড বলেছিল,

দেখো। ইদানীং ম্যাডাম দেয়ালেরও অভাবে আছেন।

আমি আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছিলাম,

কিন্তু আমার একটা সাহসী মন আছে।

রিচার্ড হাড্ডি ছুঁড়ে দেওয়ার মতো সেই প্রথমবার আমার পক্ষে ভাল কিছু বলেছিল,

এবং আরও খাঁটি কিছু গুণও আছে।

৫২

আশ্রম জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা আসলে ধ্যান নয়। ধ্যান কঠিন তবে জীবন নস্যাৎ করার মতো না। সেখানে আমার জন্য এর চেয়েও কঠিন কিছু বিষয় ছিল। যেটা আমরা আশ্রমে প্রতিদিন ধ্যানের এবং সকালের নাস্তার পরে করতাম। তখন সকালগুলো অনেক লম্বা মনে হতো। সেটা একটা ভজন। নাম গুরু-গীতা। রিচার্ড একে 'গীত' বলে। আমার গীত নিয়ে খুব সমস্যা হতো। আমি সেটা পছন্দ করতাম না, কক্ষনোই না, প্রথম যেদিন নিউইয়র্কের আশ্রমে শুনেছিলাম সেদিন থেকেই না। আমি যোগ সংস্কৃতির সকল শোক, আর স্তুতি পছন্দ করতাম। কিন্তু গুরু-গীতা আমার কাছে দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর আর অসহ্য ছিল। সেটা কেবল আমার মতামত। অন্যরা সেটা পছন্দ করে শান্ত হয়েই শুনত। কেন কে জানে?

www.pathagar.org

কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা ছিল। কেননা গুরু-গীতা ১৮২ টা পঙক্তির দীর্ঘায়িত ভজন! মাঝে মাঝে আমি তাই এই ভজনানুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকি। প্রতিটা পঙক্তি অবোধ্য সংস্কৃত ভাষার সারমর্ম। মুখরা, অন্তরা, শেষাংশ মিলে পুরো স্তুতি গানটা শেষ হতে সময় লাগত দেড় ঘণ্টা। এটা কিন্তু নাশতার আগে এবং সকালের বিশ মিনিটের শ্লোক এবং যোগ সাধনার পর। কি অবস্থা হয় বলেন! গুরু-গীতার জন্যই সকাল তিনটায় উঠতে হতো।

সুরটা আমার ভাল লাগত না, কথাগুলোও না। আমি যদি কথাটা আশ্রমের কাউকে বলতাম তারা উত্তর দিত, 'আহা! কিন্তু এটা খুবই পবিত্র।' হ্যাঁ কিতাবি ব্যাপার কিন্তু আমি প্রতিদিন সকালে নাস্তার আগে এটা জোরে জোরে গাওয়ার পক্ষে ছিলাম না।

আত্মিক দিক থেকে গুরু-গীতা চমৎকার রকম শুদ্ধ। এটা যোগের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ স্কন্ধ পুরাণের উপযুক্ত সংস্করণ। এর বেশির ভাগ অংশই হারিয়ে গিয়েছে, অল্প কিছু সংস্কৃত শব্দে ভাষান্তরিত হয়েছে। যোগী ধর্মগ্রন্থে এটা প্রায় সক্রেটিসের ভঙ্গিতে কথোপকথনের মতো লেখা আছে। দেবীপ্রভাতি এবং সর্বশক্তিমান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত শিবার সাথে এই কথোপকথন। সৃষ্টিশীলতা (নারী) এবং চেতনা (পুরুষ)-এর ঐশ্বরিক প্রতীক হচ্ছে প্রভাতী এবং শিবা। প্রভাতী মহাবিশ্বের পরিচালন শক্তি আর শিবা তার নিরাকার জ্ঞান। শিবা যাই কল্পনা করেন প্রভাতী তাতে জীবন দান করেন। একজন স্বপ্ন দেখেন আর একজন তার উপাদানের যোগান দেন। তাদের নৃত্য, তাদের মিলন বা তাদের যোগ এই দুইই মহাবিশ্ব এবং তার বিকাশের জন্য।

গুরু-গীতায় দেবী, দেবকে পৃথিবীর সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন করেন এবং দেব সেই উত্তরগুলো দেন। আমার শরীরে খোঁচাতে থাকত কথাগুলো। আমি প্রথমে আশা করেছিলাম আশ্রমে থাকাকালীন সময়ে গুরু-গীতা আমার ভাল লেগে যাবে। আমি ভেবেছিলাম ভারতের পরিবেশে থাকাকালীন আমি শিখে যাব কিভাবে এটা ভালোবাসতে হয়। কিন্তু এর উল্টোটাই হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ সেখানে থাকার পর গুরুগীতা স্বাভাবিক অপছন্দের

তালিকা থেকে ভয়ানক অপছন্দের স্তরে চলে গিয়েছিল। আমি সেটা এড়িয়ে চলা শুরু করেছিলাম এবং তার বদলে সকালটাতে অন্যান্য কাজ করা শুরু করে দিয়েছিলাম। আমার মনে হতো সেটা আমার আত্মিক বিকাশে আর কোনো সহায়তা করবে না। এর চেয়ে আমি অন্য কাজকে উপযুক্ত মনে করতাম। যেমন কিছু লেখা, কিংবা গোসল করা কিংবা পেনসিলভানিয়ায় আমার বোনকে ফোন করা এবং জানা তার বাচ্চারা তখন কি করছে।

টেক্সাসের রিচার্ড সবসময় আমাকে বকাঝকা করত এটা এড়িয়ে যেতাম বলে। সে বলত,

আমি খেয়াল করেছি আজ সকালে তুমি গীত গাওয়ার সময় ছিলে না।

আমি বলতাম,

আমি অন্যভাবে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করছি।

তারপর সে বলত,

সেটা কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে?

www.pathagar.org

কিন্তু মোট কথা ভজনে গেলেই আমার মাথা গরম হয়ে যেত। মানে শারীরিক ভাবে আর কি। আমার মনে হতো আমি যেন গাইছি না আমাকে বেঁধে টেনে নেওয়া হচ্ছে। আমার ঘাম ছুটে যেত। খুবই কষ্টের ব্যাপার আমি এমন একজন মানুষ যে সব সময় ঠাণ্ডার মধ্যে থেকেছি। আর জানুয়ারিতে সেখানকার পরিবেশ শুধু সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে। ভজনের সময় যখন সবাই উলের চাদরের তলে গাদাগাদি করে বসে মাথায় টুপি পড়ে শীত তাড়াত। সেসময় আমি ভজন গুনগুন করে নিজের উপরের আবরণ ছাড়াতাম, অতিরিক্ত ব্যবহৃত খামারের ঘোড়ার মতো মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়ে যেত আমার। গুরু-গীতার পর মন্দির থেকে বের হয়ে আসতাম এবং সেই শীতের সকালের বাতাসেও আমার চামড়া ফুঁড়ে কুয়াশার মতো ঘাম বেরোত। ভয়ংকর, সবুজ, দুর্গন্ধযুক্ত কুয়াশা। শরীরের প্রতিক্রিয়াটা কিছুটা এমন যে আমি যখনই তা গাইতে যেতাম আবেগের গরম ঢেউ এসে আমাকে আঘাত করত এবং আমি সেটা গাইতেও পারতাম না। কেবল কাকের মতো কা কা ছাড়া। খুব বিরক্ত লাগত। আগেই বলেছি যে, এটা ১৪২ টা পঙক্তির।

তাই কিছুদিন পর এমনই একটা বিচ্ছিরি ভজনের পর্বের পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে সেখানকার আমার একজন শিক্ষকের কাছে আমি উপদেশ নেব। তিনি আমার খুব প্রিয়, তিনি একজন সন্ন্যাসী। তার নামটা বিরাট। যার অর্থ হচ্ছে যে, 'তিনি সেই প্রভুর অন্তরে বাস করেন যার বাস নিজ অন্তরে।' তিনি জাতীতে আমেরিকান, বয়স ষাট, চটপটে, শিক্ষিত। একসময় নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ নাটকের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এখনও তার ব্যক্তিত্বে একটা আকর্ষণীয় সম্ভ্রম বোধ ধরে রেখেছেন। সন্ন্যাসের দীক্ষা নিয়েছিলেন আরও ত্রিশ বছর আগে। আমি তাকে পছন্দ করি কারণ তিনি বেশ বিজ্ঞ এবং হাস্যোচ্ছল। ডেভিডকে নিয়ে একটা অন্ধকার সময়ে আমি একবার তাঁর কাছে আমার মনের কষ্ট জানিয়েছিলাম। তিনি তখন ধৈর্য নিয়েই শুনেছিলেন এবং যতটা পেরেছিলেন আমাকে সমবেদনামূলক উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন,

এখন আমি আমার পোশাকে চুমু খাব।

তারপর তিনি তার জাফরান রঙের পোশাকে সজোরে চুমু খেয়েছিলেন। ভেবেছিলাম এটা হয়ত কোনো উচ্চমার্গীয় ধর্মীয় আচার হবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি কি করছেন। তিনি বলেছিলেন, এই জিনিসটাই আমি করি যখন আমার কাছে কেউ ভালোবাসার সমস্যা নিয়ে আসে। আমি তখন কেবল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি একজন সন্ন্যাসী এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে বর্তমানে আমার কোনো সমস্যা নেই।

তাই আমি জানতাম, তাকে বিশ্বাস করে আমার গুরু-গীতা নিয়ে সমস্যাটা বলা যায়। একদিন রাতের আহারের পর আমরা একসাথে বাগানে যাই তারপর তাকে বলেছিলাম, আমি ভজনকে কী পরিমাণ অপছন্দ করি আর আমি তা আর করতেও চাই না। তিনি শুনে খুব হেসেছিলেন। পরে বলেছিলেন,

তোমার ভাল না লাগলে গাওয়ার দরকার নেই। তোমার যা ভাল লাগে না তা করতে বাধ্য করার এখানে কেউ নেই।

কিন্তু লোকে বলে এটা আত্মিক সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ।

www.pathagar.org

তা ঠিক। কিন্তু আমি তোমাকে এটা বলব না যে এটা না পারলে তুমি নরকে যাবে। একটা জিনিসই আমি তোমাকে বলব, তোমার গুরু এ ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। গুরু-গীতা যোগের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রচনা এবং হয়ত ধ্যানের পর এটাই তোমার জন্য বেশী প্রয়োজন। তুমি যদি আশ্রমে থাক তাহলে তোমার গুরু আশা করবেনই তুমি এই ভজন প্রতিদিন সকালে করবে।

এমন নয় আমার সকালে ঘুম থেকে উঠতে সমস্যা হয়।

তাহলে সমস্যাটা কি?

আমি তখন তাকে বুঝিয়ে বললাম গুরু-গীতা গাওয়ার সময় কি ভয়ানক অনুভূতি হয় আমার। যেন একটা অত্যাচার।

তিনি বলেছিলেন,

বাহ! নিজেকে দেখো কথাটা বলতে গিয়ে তুমি কেমন কুঁকড়ে গেছ।

তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আমার একইসাথে শীত লাগছিল ও বগল তলায় চটচটে ঘাম জমে যাচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

এর বদলে তখন কি আমি অন্য কোনো প্রার্থনা করতে পারি? আমি মাঝে মাঝে দেখেছি গুরু-গীতায় না গিয়ে ধ্যানাগারে গেলে আমার ভেতর দারুণ আলোড়ন হয়।

আহ স্বামীজি তাতে তোমার ওপর মনঃক্ষুণ্ন হবেন না? যেখানে সবাই এতো কঠোর পরিশ্রম করছে সেখানে শরীরে শক্তির ঘূর্ণন নিয়ে শুধু পড়ে থাকলে তোমাকে হয়ত ভজন চোর ছাত্র হিসেবে দেখবেন তিনি। দেখো ভজন কোনো মজার গান হওয়ার তো কথা না। এর কাজ আলাদা। এটা এমন একটা বাণী যার অভাবনীয় ক্ষমতা আছে। এটা একটা আত্ম-পরিশোধনকারী মহান অনুশীলন। এটা তোমার ভেতরের সকল দূষিত জিনিস, ক্ষতিকারক আবেগ পুড়িয়ে ফেলবে। এবং যেহেতু তুমি ভজন করার সময় এমন শক্তিশালী শারীরিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া অনুভব কর তাতে আমার ধারণা এতে তোমার ওপর খুব অন্য রকম প্রভাব ফেলবে। প্রক্রিয়াটা হয়ত কষ্টকর কিন্তু নিঃসন্দেহে উপকারী।

আপনি কিভাবে এতে মনোযোগ বা আগ্রহ ধরে রাখেন?

আমি ভাবি কোনটা বেশি উপকারী? কাজটা কঠিন বলে ছেড়ে দেওয়া? নাকি সারা জীবন দুঃখ কষ্ট অসম্পূর্ণতার মধ্যে গুমরে মরা।

আপনি কি আসলেই এই মাত্র বললেন, গুমরে মরা?

হ্যাঁ আমি বলেছি।

আমি তাহলে কী করব?

তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নাও তুমি কি করবে। কিন্তু যেহেতু আমাকে প্রশ্ন করেছ আমার উপদেশ চেয়েছ তাই আমি বলব- তুমি ভজনে মনোযোগ দাও। বিশেষ করে তোমার যখন এমন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়। যদি কোনো কিছু তোমাকে এতো চরম পর্যায়ে নাড়া দেয় তাহলে নিশ্চিত থাক এটা তোমার ক্ষেত্রে কাজ করছে। এটাই গুরু-গীতার কাজ। এটা অহংকে মেরে ফেলে খাঁটি ছাইয়ে পরিণত করে। এটা হয়ত অনেক শ্রমসাধ্য কাজ। এটার যে ক্ষমতা আছে তা যুক্তি দিয়েই বুঝতে পারবে। তুমি এই আশ্রমে আর মাত্র এক সপ্তাহ থাকবে তাই না? আর তারপর

www.pathagar.org

তুমি ভারত জুড়ে ঘুরেফিরে মজা করবে। তুমি তখন মুক্ত। তাই আর সাত দিন সাত বার ভজনটা কর। তারপর তোমার আর এটা করতে হবে না। মনে রাখবে আমাদের গুরু কি বলেছেন, নিজের আত্মিক গবেষণার গবেষক নিজেই হবে। তুমি এখানে কোনো ভ্রমণকারী বা সাংবাদিক নও। তুমি এখানে একজন অন্বেষক। তাই অনুসন্ধান কর।

তাহলে আপনি আমাকে পেরেক থেকে নামাবেন না?

তুমি যখন খুশি নিজেকে পেরেক থেকে মুক্ত করতে পারবে, লিজ। আমরা যাকে স্বেচ্ছাস্বাধীন বলি, ঐশ্বরিকতা কিছুটা তার সাথেই চুক্তিবদ্ধ।

৫৩

তাই তারপর দিন আমি মনস্থির করে ভজন করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু গুরু-গীতা আমাকে বিশ-ফুট উঁচু কংক্রিট এর সিঁড়ি থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল। তারপর দিন আরও খারাপ অবস্থা হয়েছিল। আমি প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে জেগে উঠেছিলাম কিন্তু মন্দিরে যেতে না যেতেই ঘেমে-নেয়ে, ভেঙে, সেদ্ধ হয়ে এক সা। নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম, 'মাত্র তো দেড় ঘণ্টা এই দেড় ঘণ্টায় তুমি যেকোনো কিছুই তো করতে পারো। দেখো তোমার কত বান্ধবীর তো ডেলিভারি রুমে প্রসব বেদনা নিয়ে চৌদ্দ ঘণ্টাও কাটায়।' কিন্তু তারপর তখনো মনে হচ্ছিল আমাকে সেই চেয়ারটাতে পেরেক ঠুকে বসিয়ে রাখলেও বুঝি এতো খারাপ লাগত না। মনে হচ্ছিল আমার ওপর উল্কাপাত হচ্ছে। যেন মেনোপোজাল নারীদের মতো আমার শরীর জ্বালা করছে কিংবা মনে হচ্ছিল আমার বুঝি কোনো শক্তি নেই কিংবা কোনো পাগল আমাকে কামড়ে দিয়েছে।

এই পৃথিবীর সবার ওপরে আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। বিশেষ করে আমার গুরুর শিক্ষক সেই স্বামীজীর ওপর যিনি এইপ্রথম এই গুরু-গীতা ভজনের নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। এই স্বর্গীয় যোগীর সাথে সেটাই আমার প্রথম কঠিন সম্মুখীন হওয়া নয়। তাঁকেই আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। সমুদ্র সৈকতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঢেউ থামাতে আমি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করব এবং আমার সব সময় মনে হত তিনি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

স্বামীজী তার সমগ্র জীবনে একজন কঠোর যোগী একজন আত্মিক অগ্নিকুণ্ড ছিলেন। আসিসির সেইন্ট ফ্রান্সিস-এর মতো, স্বামীজী একটা ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পারিবারিক ব্যবসায়ে তার অভিষেক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি যখন তরুণ তখন তার গ্রামের কাছেই একজন পবিত্র মানুষের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল এবং সেই ঘটনা তাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন তার তরুণ কালে স্বামীজী একটা মাত্র ধুতি পরে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন এবং বছরের পর বছর একজন সত্যিকারের আত্মিক শিক্ষকের খোঁজে ভারতের পবিত্র

www.pathagar.org

স্থানগুলোতে তীর্থযাত্রা করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে তিনি একজন সাধকের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি যেমনটা চান তেমন কারো সাথে তার দেখা হয়নি। তিনি না খেয়ে খালি পায়ে, হিমালয়ের তুষার ঝড়ের মধ্যে বাইরে ঘুমিয়ে, ম্যালেরিয়া আমাশয়ে ভুগেও সে সময়টাকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে ঘোষণা করে গেছেন। শুধু খুঁজে গিয়েছিলেন কেউ হয়ত তাকে স্রষ্টা দেখাতে পারবে। সেই বছরগুলোতে স্বামীজী হয়ে উঠেছিলেন যোগ পারদর্শী একজন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ, একজন রন্ধনবিদ, একজন স্থপতি, একজন মালী, একজন সংগীতজ্ঞ এবং একজন তলোয়ার যোদ্ধা। এই বছরগুলোতেও তিনি কোনো গুরুর সন্ধান পাননি। শেষমেশ একজন নগ্ন, পাগলাটে ঋষির সাথে দেখা হয়েছিল তিনি তাকে গ্রামে ফিরে যেতে বলেছিলেন আর সেখানে পবিত্র মানুষটার সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। তাঁর সাথে কাজ করতে বলেছিলেন।

স্বামীজী মেনে নিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে সেই পবিত্র মানুষের সবচেয়ে অনুগত ছাত্র হয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি বোধি লাভ করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি নিজেই একজন গুরু হয়ে উঠেছিলেন। সময়ের সাথে সাথে তার আশ্রমটা তিনটা কক্ষের বন্ধ্যা খামার বাড়ি থেকে উন্মাতাল বাগানে পরিণত হয়েছিল। তারপর তিনি বিদেশ ভ্রমণের অনুপ্রেরণা লাভ করে বিশ্বব্যাপী যোগ বিপ্লব ঘটানো মনস্থ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি আমেরিকাতে এসে সবার ঘুম উড়িয়ে দেন। এক দিনে একশো থেকে হাজার লোককে শক্তিপথের ঐশ্বরিক দীক্ষা দেন। তাঁর কিছু তাৎক্ষণিক এবং রূপান্তরযোগ্য ক্ষমতা ছিল। দ্য রিবারেন ইউগিন ক্যালেন্ডার একজন সম্মানিত নাগরিক অধিকারের নেতা, মার্টিন লুথার কিং জে আর এর সহচর এবং এখন হারলেমের গির্জার ব্যাপ্টিস্ট যাজক, তিনি ১৯৭০ সালে স্বামীজীর সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন। তিনি নাকি স্বামীজীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মনে মনে ভেবেছিলেন, 'হম্বি তম্বি করে লাভ নেই। তুমি নিজের সম্পর্কে যা জানো না এই লোক সেটাই জানে।'

স্বামীজী দীক্ষা দিতেন উদ্যম, প্রতিশ্রুতি আর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের। তিনি প্রায় মানুষকে তার 'জড়' মানে অলসতার জন্য ভর্ৎসনা করতেন। তার দুর্বিনীত পশ্চিমা অনুসারীদের জীবনধারায় তিনি প্রাচীন নিয়মানুবর্তিতার প্রবর্তন করেন, তাদের আদেশ দেন, যেন তারা নিজস্ব স্বেচ্ছাচারী যাযাবর জীবন যাপনে শক্তি আর সামর্থ অপচয় না করেন। তিনি তাঁর চলার লাঠিটা ছুঁড়ে মারতেন তো আবার বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তিনি জটিল ছিলেন, প্রায়ই বিতর্কিত হতেন কিন্তু পৃথিবী বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। আমাদের পশ্চিমে যে যোগ ধর্মগ্রন্থের প্রবেশ ঘটেছে তা একমাত্র এই স্বামীজীর জন্য। তিনি এই গ্রন্থের ভাষান্তর এবং এর দার্শনিক রচনার পুনঃপ্রচার করেছিলেন যা খোদ ভারতবর্ষেই অনেকটাই অচর্চিত।

আমার গুরু স্বামীজীর সবচেয়ে অনুগত ছাত্রী ছিলেন। তিনি স্বামীজির একজন শিষ্য হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার ভারতীয় বাবা মা আগে থেকেই গুরুর শিষ্য ছিলেন। তিনি যখন শিশু ছিলেন তখন থেকেই ক্লান্তিহীনভাবে দিনে আঠারো ঘণ্টা ভজন করতেন। স্বামীজী তার সম্ভাবনা বুঝতে পেরেছিলেন। যখন

www.pathagar.org

আমার গুরু সবে তরুণী তখনই তাকে তার অনুবাদক হিসেবে বেঁছে নিয়েছিলেন। তিনি স্বামীজীর সাথে বিশ্ব-ব্যাপী ঘুরে বেড়িয়েছেন ফলে তার নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তিনি অনুভব করতে পারতেন স্বামীজি তার হাঁটু দিয়েও মাঝে মাঝে তার সাথে কথা বলতেন। ১৯৮২ সালে আমার গুরু তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষিত হন।

সত্যিকারের সকল গুরুর একটা মিল হচ্ছে তারা আত্ম-অনুধাবনের একটা স্থির অবস্থানে থাকেন কিন্তু বাহ্যিক চরিত্র ভিন্ন। আমার গুরু আর তার শিক্ষকের বাহ্যিক পার্থক্য বিশাল। তিনি একজন নারী, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষিত, আপাত বুদ্ধিমতী একজন পেশাদার নারী। আর স্বামীজী ছিলেন কখনো বদ-মেজাজি দক্ষিণ ভারতের রাজকীয় বুড়ো সিংহ। আমার মতো নব্য ইংল্যান্ডের ভদ্র মেয়ে না। তাই আমার জীবন্ত গুরুকে অনুসরণ করাই আমার জন্য সহজ ছিল। তিনি শোভন আচরণে অভ্যস্ত। তিনি এমন একজন যাকে বাড়িতে নিয়ে বাবা মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু স্বামীজী! যোগের পথে এসে আমি যখন তাঁর ছবি আর তাঁর সম্পর্কে গল্প শুনেছিলাম, তখনই বুঝে গিয়েছিলাম যে এই চরিত্রটা আমার মাথা থেকে নামবে না। এমন বিশাল ব্যক্তিত্ব যে আমার তাকে ভয়ই লাগত।

কিন্তু আমি তখন ভারতের এমন জায়গায় যেটা কিনা তাঁরই বাড়ি। পরে দেখেছিলাম আমি আসলে যা চাই তা হলো স্বামীজী। আমি যা অনুভব করি তা হলো স্বামীজী। আমার সকল প্রার্থনায় আর ধ্যানে আমি যার সাথে কথা বলি তিনি হলেন স্বামীজী। আগা গোড়া সেটা স্বামীজীর রাজ্য। আমি সেখানে স্বামীজীর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ছিলাম এবং তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। মৃত্যুর পরও তখনো কি যেন খুব জীবন্ত আছে তাঁর, কি যেন এখনো উপস্থিত সেখানে। যখন আমি খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতাম তখন আমার যাকে প্রয়োজন ছিল তিনিই সেই শিক্ষক, কারণ আমি তাঁকে দোষারোপ করতে পারতাম এবং আমার ভুল আমার ব্যর্থতাগুলো দেখাতে পারতাম এবং তিনি তখন কেবল হাসতেন আর হাসতেন। তার হাসি আমার রাগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং কাজটা শেষ করার দিকে ঠেলে দিয়েছিল এবং অবোধ্য সংস্কৃত ভাষার গুরু-গীতা নিয়ে পরিশ্রম করার সময় আমি তাকে সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছিলাম। মনে মনে সারাক্ষণ স্বামীজীর সাথে বাচালের মতো বকবক করে যেতাম। যেমন,

তোমার তো আমার জন্য কিছু করা উচিত কেন না আমি তোমার জন্য এসব করছি। আমার এখানে কোনো ভাল ফল পাওয়ার কথা। শুদ্ধ হতে পারলে ভাল হতো।

আগের দিন আমি ভজনের বইয়ের দিকে তাকিয়ে খুব রেগে গিয়েছিলাম। খেয়াল করেছিলাম মাত্র পঁচিশ নাম্বার পঙক্তিতেই আমি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলাম, ঘামছিলাম– মানুষের মতো ঘামছিলাম না, ঘামছিলাম পনিরের মতো– এবং আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম,

তুমি কি আমার সাথে মজা করছ।

www.pathagar.org

কয়েকজন মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল আর নিঃসন্দেহে তারা আশা করছিল আমিও যাতে তাদের মতো মাথাটা ঘাড়ের চারপাশে ভূতের মতো ঘোরাতে থাকি।

প্রতিটা মুহূর্তে আমার মনে পড়ছিল আহা! একসময় রোমে থাকতাম! আরামে অবসরে আমার সকালটা পেস্ট্রি আর কফি খেয়ে, খবরের কাগজ পড়ে কাটাতাম। আহা!

সেটা নিঃসন্দেহে চমৎকার একটা সময় ছিল।

কিন্তু এখন তা কত দূরের!

৫৪

সকালটাতে একটু বেশি ঘুমিয়েছিলাম। শুধু বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমনটা। চারটা পনেরো বাজা পর্যন্ত ঝিমিয়ে গুরু-গীতার মাত্র এক মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেকে টেনে বিছানা থেকে নামিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছিলাম। জামা গায়ে দিয়ে বিরক্তিতে রেগে খিটখিটে মেজাজ নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে দেখি, আমার রুমমেট আমার আগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে সাথে দরজাটা তালাবন্ধ।

এরকম একটা কাজ তার তো করার কথাই না। এটা এতো বড় কোনো ঘর না যে, সেখানে ঘুমন্ত আমাকে দেখতে পাবে না। এর ওপর সে একজন দায়িত্ব-সম্পন্ন এবং বাস্তববাদী মহিলা সাথে পাঁচজন অস্ট্রেলিয়ান বাচ্চা কাচ্চার মা। কাজটা তার সাথে যায় না। কিন্তু সে এটাই করেছিল। আমাকে রীতিমত তালাবন্ধ করে রেখে গিয়েছিল।

আমি জানালা দিয়ে লাফ দিয়েছিলাম।

রেলিঙের বাইরে আমার ঘর্মাক্ত হাতের তালু দিয়ে আঁকড়ে ধরে এক মুহূর্ত অন্ধকারে ঝুলে থেকে নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

তুমি দালানটা থেকে লাফ দিচ্ছ কেন?

তীব্র নিশ্চয়তার সাথে আমার উত্তর এসেছিল, 'আমাকে গুরু-গীতায় যেতে হবে।' তারপর আমি নিজের হাত ছেড়ে দিয়ে, প্রায় বারো থেকে পনেরো ফিট উঁচু থেকে কংক্রিটের ফুটপাত বরাবর লাফ দিয়েছিলাম। কোনোকিছুর সাথে খোঁচা লেগে আমার ডান পায়ের চামড়া ছিলে গিয়েছিল। আমি তা পাত্তা দেইনি। শুধু নিজেকে উঠিয়ে খালি পায়ে দৌড় দিয়েছিলাম। আমার হৃদপিণ্ডের শব্দ আমার কানেই বাজছিল। এক দৌড়ে মন্দিরে গিয়ে একটা আসন খুঁজে পেয়েছিলাম আর গিয়েই আমার প্রার্থনার বই খুলে ভজন শুরু করে দিয়েছিলাম। সারাক্ষণ আমার পা থেকে রক্তপাত হচ্ছিল আর আমি গুরু-গীতা গাইছিলাম।

কয়েক পঙক্তি পরেই আমার সকালের সহজাত ভাবনা মাথা চাড়া দিয়েছিল। আর তা হলো, 'আমি এখানে আসতে চাই না।' এরপর যেন শুনতে পেয়েছিলাম স্বামীজী হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছেন, 'মজার তো। কিন্তু তোমার কাজ কর্ম দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি এটা খুবই পছন্দ কর।'

www.pathagar.org

আমি তাকে উত্তরে বলেছিলাম,

আচ্ছা যান আপনি জিতলেন।

সেখানে রক্তপাত হতে থাকা অবস্থায় গান গাইতে গাইতে ভাবছিলাম এখন আমার আর এই আত্মিক অনুশীলনের মাঝে সম্পর্কটা বদলানোর সময় এসেছে। গুরু-গীতা খাঁটি ভালোবাসার স্তুতি কিন্তু কিছু একটা আমাকে নিষ্ঠার সাথে এই ভালোবাসার কাজটা করতে বাধা দিচ্ছিল। এর প্রতিটা পঙক্তি গাওয়ার সময় আমার মনে হচ্ছিল যে আমার এমন একজনকে খোঁজা উচিত যাকে এই ভজনটা উৎসর্গ করতে পারি। যে আমার সাথে এই খাঁটি ভালোবাসার অংশ হতে পারে। এবং আমি খুঁজে পেয়েছিলাম– নিক।

নিক আমার আট বছর বয়সি ভাতিজা। বয়স অনুযায়ী ভয়ানক চটপটে, চতুর, স্পর্শকাতর এবং জটিল। তার জন্মের কয়েক মিনিটের মধ্যে সকল চিৎকাররত নবজাতকের মধ্যে সেই ছিল একমাত্র শিশু যে একটুও কাঁদেনি বরং বড়দের মতো পার্থিব ও দুশ্চিন্তার দৃষ্টি নিয়ে চারপাশ দেখছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে অনেকবার জন্মেছে এবং বুঝতে পারছিল না আবার জন্মানোতে তার ঠিক কতটা উত্তেজিত হওয়া উচিত। সে এমন একটা বাচ্চা যার জন্য জীবনটা সরল নয়, একটা এমন শিশু যে সবকিছু বেশি রকম দেখে, শুনে, অনুভব করে। এমন একটা শিশু যে তার আবেগ এতো দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যে, আমরা রীতিমত ভড়কে যাই। আমি এই ছেলেকে খুব গভীরভাবে ভালোবাসি। হিসাব করে দেখেছিলাম ভারত আর পেনসিলভানিয়ার সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী তখন নিকের ঘুমানোর সময়। তাই আমি গুরু-গীতা আমার ভাতিজা নিককে উৎসর্গ করে গেয়েছিলাম যেন সে একটু ঘুমাতে পারে। সে তার মনকে স্থির রাখতে পারে না বলে তার অনিদ্রাজনিত সমস্যা আছে। তাই এই স্তুতিটার প্রতিটা স্বর্গীয় বাক্য আমি আমার ভাতিজাকে উৎসর্গ করি। আমি এই গানটাকে এই আকুতি দিয়ে পুর্ণ করেছিলাম যাতে আমি তাকে জীবনের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে পারি। প্রতিটা বাক্য দিয়ে আমি তাকে পুনঃনিশ্চিত করতে চাইছিলাম যে পৃথিবী যতই কঠিন আর নিষ্ঠুর হোক না কেন সব কিছুই ঠিক হয়ে যায় কেন না তার জন্য অনেক ভালোবাসা রয়েছে। সে শুদ্ধ আত্মা দিয়ে ঘিরে আছে যারা তার জন্য সব কিছু করতে পারে। শুধু তাই নয় তার নিজস্ব জ্ঞান আর ধৈর্য আছে যা নিজের ভেতরের সেই সত্তাকে দাফন করতে পারে যা মাঝে মাঝে জেগে উঠে তাকে কষ্ট দেয়। সে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য উপহার। আমি এই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে তাকে এই কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল করে দেখেছিলাম, আমি কাঁদছি। কিন্তু আমার কান্না মুছে ফেলার আগেই গুরু-গীতা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেড় ঘন্টা চলে গিয়েছিল কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল দশ মিনিটের মতো। বুঝতে পেরেছিলাম সেই নিকই আমাকে এর ভেতর দিয়ে সহজে নিয়ে গিয়েছে। যে ছোট আত্মাকে আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম সে নিজেই আমাকে আসলে সাহায্য করেছে।

আমি মন্দিরের সামনে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করেছিলাম আমার ঈশ্বরকে, ভালোবাসার মহান শক্তিকে, আমার গুরুকে আমার ভাতিজাকে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্তরে নেমে (বুদ্ধিমত্তার স্তরে নয়) বুঝতে পেরেছিলাম যে এই শব্দগুলো, এই ধারণাগুলো, এই মানুষগুলোর মধ্যে আসলে কোনো বিভেদ নেই। তারপর আমি ধ্যানাগারে ঢুকে আমার সকালের নাস্তার কথা ভুলে দুই ঘন্টা স্থির হয়ে বসে স্তুতি করেছিলাম।

www.pathagar.org

বলার প্রয়োজন নেই যে, এরপর আমি আর কখনোই গুরু-গীতা এড়িয়ে যাইনি এবং এটা আশ্রমে আমার সবচেয়ে পবিত্র কাজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং অবশ্যই টেক্সাসের রিচার্ড আমার জানালা দিয়ে লাফ দেওয়া নিয়ে খুব মজা পেয়েছিল। প্রতিদিন রাতের আহারের শেষে সে আমাকে বুঝিয়ে দিত,

ঠিক আছে তাহলে তুমি কাল ভোরে গুরু-গীতায় আসছ? তবে হ্যাঁ এইবার কিন্তু সিঁড়ি বেয়েই নামবে? ঠিক আছে।

পরের সপ্তাহে আমি আমার বোনকে ফোন করার পর বলেছিল কেন যেন ইদানীং নিকের ঘুমাতে কোনোরকম সমস্যা হচ্ছে না। এর কিছুদিন পর এমনিতেই আশ্রমের লাইব্রেরিতে ভারতীয় সাধক শ্রীরাম কৃষ্ণ নিয়ে পড়ছিলাম। এবং সেই বইয়ে উল্লেখিত একটা কাহিনি পড়তে গিয়ে অবাক হয়েছিলাম। একজন মহিলা অন্বেষক একবার সেই মহান সাধকের কাছে এসে স্বীকার করেছিলেন যে, সে খুব একটা ভাল শিষ্য নয়। তার ভয় হয় যে সে আসলে ঈশ্বরকে তত ভালোবাসেন না। তখন এই সাধক জিজ্ঞেস করেছিলেন,

এমন কিছু কি নেই যাকে তুমি ভালোবাসো?

তখন সেই শিষ্য স্বীকার করেছিলেন তার একটা ভাতিজা আছে, সেই ভাতিজাকেই সে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তখন রাম কৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন,

তাহলে সেই তোমার কৃষ্ণ, তোমার প্রিয়তম। তাকে সেবা করাই তোমার জন্য ঈশ্বরের সেবা করা।

কিন্তু এগুলো তেমন কিছুই না আসল ঘটনা ঘটেছিল যেদিন আমি জানালা দিয়ে লাফ দিয়েছিলাম। সেই সন্ধ্যায় আমি আমার রুমমেট ডেলিয়ার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম সে আমাকে তালাবন্ধ করে রেখে চলে গিয়েছিল। সে যেন আকাশ থেকে পড়েছিল আর বলেছিল,

আমি কেন এমন একটা কাজ করতে যাব? বিশেষ করে যখন আজ সারাটা সকাল তোমাকে নিয়েই ভেবেছি। গতরাতে আমি আসলেই তোমাকে নিয়ে ভয়াবহ একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি সারাদিন এই স্বপ্নটা মাথা থেকে নামাতে পারিনি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

বল আমাকে, কি স্বপ্ন দেখেছ?

আমি দেখেছিলাম তোমার গায়ে আগুন লেগেছে। তোমার বিছানায়ও আগুন। আমি তোমাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু ততক্ষণে তুমি সাদা ছাইয়ে পরিণত হয়েছ।

৫৫

তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমার আশ্রমে থাকা জরুরী। এটা আমার আসল পরিকল্পনা ছিল না। আমার আসল পরিকল্পনা ছিল সেখানে ছয় সপ্তাহ থেকে কিছু ঐশ্বরিক

www.pathagar.org

অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভারত ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়ব। উমমম...হয়ত ঈশ্বরকে খুঁজব। আমার কাছে মানচিত্র, গাইড বই, পাহাড়ে চড়ার জুতো সব কিছু ছিল! আমার তালিকায় বিশেষ বিশেষ মন্দির, মসজিদ এবং পবিত্র মানুষ জনের নাম ছিল যাদের সাথে আমি দেখা করতে মনস্থ করেছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছি সেটা ভারত! সেখানে অনেক কিছু দেখার ছিল, বোঝার ছিল। অনেক অনেক পথ ঘুরে দেখার ছিল, মন্দির ছিল, হাতী এবং উট যাতে চড়ার ইচ্ছা ছিল। মনে হতো গঙ্গা না দেখে যেতে পারলে আমি খুবই আশাহত হব, রাজস্থানি মরুভূমি, মুম্বাইয়ের সিনেমা পাড়া, হিমালয়, পুরোনো উপায়ে চা গাছ লাগানো, বেন-হুর উপন্যাসের রথ যাত্রার মতো কলকাতার রিকশা ভ্রমণ। মার্চ মাসে দালাই লামার ধর্মশালায় গিয়ে তার সাথে দেখা করার পরিকল্পনা ছিল। আশা করেছিলাম তিনি আমাকে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

কিন্তু সেই নামহীন ছোট গ্রামের ছোট্ট আশ্রমে নিজেকে সেভাবে আটকে রাখার কোনো পরিকল্পনাই আমার ছিল না।

অন্যদিকে জৈন শিক্ষকরা সব সময় বলে, 'তুমি চলন্ত পানিতে নিজের প্রতিফলন দেখতে পাবে না। শুধু স্থির পানিতেই তা দেখা যায়।' তাই তখন অন্য কোথায় চলে যাওয়ার মানে ছিল আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাওয়া। আর যখন সেই ছোট মঠে এতো কিছু ঘটছিল, যেখানে প্রতি মুহূর্তে আত্ম-দর্শন এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের এমন সাংগঠনিক সুবিধা আছে তবে আমার কি আসলেই কোনো ট্রেনের কামরায় চড়ে, পাকস্থলীতে কিছু কৃমি নিয়ে, পিঠে ব্যাগ নিয়ে ছুটোছুটি করা উচিত ছিল? আমি কি তা পরেও করতে পারতাম না? আমি কি দালাই লামার সাথে অন্য কোনো সময় দেখা করতে পারতাম না? দালাই লামা কি সব সময় সেখানেই থাকবেন না? আর যদি তিনি মারাও যান তাহলে কি তারা আর একজন খুঁজে পাবে না? আমার কি ইতোমধ্যেই একটা সার্কাসের কাজ করা মহিলার মতো মার্কা মারা পাসপোর্ট ছিল না? আরও বেশি বেশি ভ্রমণ কি আমাকে কোনো আধ্যাত্মিক বিপ্লব এনে দিত?

আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করতে হবে। সারাদিন আমি এই চিন্তাই করছিলাম। রিচার্ড বলেছিল,

তুমি এখানেই থাকো মুদি দোকান। ঘুরে ফিরে দেখার চিন্তা মন থেকে বাদ দাও। এর জন্য তোমার সারাটা জীবন পড়ে আছে। তুমি এবার একটা আত্মিক ভ্রমণে আছ সোনা। মনোযোগ নষ্ট কর না আর সম্ভাবনাকে মাঝপথেই গুঁড়িয়ে দিও না। তুমি এখানে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে এসেছ। তুমি আসলেই সেই পথে এগুচ্ছো।

কিন্তু ভারতে সুন্দর সুন্দর দেখার মতো জায়গার ব্যাপারটার কি হবে? পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত থেকে এসে কোথাও না গিয়ে কেবল একটা আশ্রমে পুরোটা সময় জুড়ে থাকা একটা দুঃখের বিষয়।

মুদি দোকান সোনা। তুমি তোমার বন্ধু রিচার্ডের কথা শোনো। তুমি আগামী তিন মাস প্রতিদিন এই ধ্যানাগারে বস। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি তুমি এমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখবে যে আগ্রার তাজমহলের গায়ে তোমার ঢিল ছুঁড়তে ইচ্ছা হবে।

www.pathagar.org

৫৬

এক সকালে ধ্যান করার সময় নিজের যে ভাবনাগুলো আবিষ্কার করেছিলাম সেগুলো বলছি শুনুন,

আমি ভাবছিলাম, 'ভারত ভ্রমণ শেষে আমি কোথায় থাকব। আমি নিউইয়র্কের একই আবর্তে আর ফিরে যেতে চাই না। একটা নতুন শহরে গেলে কেমন হয়! অস্টিন এক্ষেত্রে ভাল হবে এবং শিকাগোতে সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য আছে। যদিও সেখানে ভয়াবহ শীত। কিংবা আমি তো অন্য কোনো দেশেও থাকতে পারি। শুনেছি সিডনি শহরটা নাকি এক্ষেত্রে বেশ ভালো। আমি যদি নিউইয়র্ক থেকে সেখানে কম খরচে থাকতে পারি তাহলে একই পরিমাণ টাকায় একটা বেশি শোবার রুম পাব। আমি তাহলে সেটাকে ধ্যানের জন্য ঠিক করব। চমৎকার হবে! ঘরের রং করব সোনালি কিংবা ঘন নীল। নাহ নীলও না সোনালিও না...'

হঠাৎ নিজের ভাবনার রেল গাড়িটা খেয়াল করে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম,

তুমি এখন ভারতে, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পূন্যার্থিদের জায়গায়। এখানে আধ্যাত্মিক সাধনার বদলে তুমি চিন্তা করছ এক বছর পর তুমি কোন শহরের কোন ঘরে ধ্যান করবে! যার বর্তমান কোনো অস্তিত্বই নেই। তুমি কীভাবে এমন গণ্ড মূর্খের মতো আচরণ করছ? তুমি ঠিক এই মুহূর্তে যেখানে আছ সেখানে ধ্যান করার কী হবে?

আমি নীরবে মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করে আমার মনোযোগ টেনে ধরেছিলাম। কয়েক মিনিট পর আমি আবার বিরতি নিয়ে ভাবছিলাম, নিজেকে গণ্ডমূর্খ কেন ডেকেছি? এটা ঠিক না।

এরপর আবার ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম, সোনালি রং করলে ভালোই হবে। আমি চোখ খুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম, আহা! এর চেয়ে মনোযোগ কী আমি দিতে পারব না?

তাই সেই সন্ধ্যায় আমি নতুন কিছু করতে চেয়েছিলাম। তখন একজন মহিলার সাথে পরিচিত হয়েছিলাম যিনি ভিপাসসানা ধ্যানের ওপর গবেষণা করছিল। ভিপাসসানা বৌদ্ধ ধর্মের একটা অতি মাত্রায় গোঁড়া আর প্রখর ধ্যান। আসলে এটা কেবল একটা আসন। একটা প্রাথমিক ভিপাসসানা আসন শিক্ষার জন্য দশ দিন সময় লাগে। যেক্ষেত্রে একাধারে দুই ঘণ্টা করে এক দিনে লাগাতার দশ ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে হয়। এটা একটা অতিমাত্রার হাস্যকর আধ্যাত্মিক চর্চা। আপনার ভিপাসসানা শিক্ষক কিন্তু আপনাকে একটা মন্ত্রও দেবেন না। এক্ষেত্রে মন্ত্রের সাহায্য এক ধরনের প্রতারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভিপাসসানা ধ্যানে নিজের মনকে শুদ্ধ সম্মাননা জানানো হয়, মনকে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং নিজস্ব ভাবনাকে পরিপূর্ণ সম্মতি দেওয়া হয় কিন্তু একটাই শর্ত তা হচ্ছে আসন থেকে নড়া যাবে না।

www.pathagar.org

শারীরিকভাবে এটা অত্যন্ত কঠিন। একবার কোথাও বসলে সেখান থেকে শরীর নাড়ানো যাবে না, আপনার অস্বস্তি যত তীব্রই হোক না কেন কেবল সেখানে বসে নিজেকে বলতে হবে, 'আগামী দুই ঘণ্টায় আমার জায়গা থেকে নড়ার কোনো কারণই নেই।' আপনি যদি অস্বস্তি বোধ করেন তাহলে এই অস্বস্তির ওপরই আপনাকে ধ্যান করতে হবে এবং এর ফলে শরীরে যে কষ্ট হবে সেটা চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে। বাস্তব জীবনে আমরা শারীরিকভাবে, আবেগ দিয়ে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে সবসময় আমাদের অস্বস্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করি। এটা আমাদের দুঃখ এবং বিপদ-আপদ এড়ানোর একটা কৌশল। ভিপাসসানা ধ্যান আমাদের শেখায় এই দুঃখ, শোক আসলে মূল্যহীন। কিন্তু যদি নিজেকে স্থির বৃক্ষের মতো রোপণ করতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন মানব জীবনে সকল ঘটনা, আনন্দ এবং অবসাদ, সমানভাবেই ঘটে যায়।

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম শেখায়, 'পৃথিবীটা মৃত্যু আর ধ্বংসে পুড়ে খাক হয়ে যায় তবু বিজ্ঞ লোকেরা পৃথিবীর এই সমস্যা জেনেও দুঃখ করতে বসে না।' অন্য অর্থে বলা যায়, 'মানিয়ে নাও।'

আমার মনে হয়নি ভিপাসসানা আমার জন্য খুব জরুরি কিছু। এটা আমার আধ্যাত্মিক সাধনার কল্পনার জন্য বেশি কঠোর। আমার কল্পনা সব সময় প্রজাপতির মতো। সমবেদনা, ভালোবাসাপূর্ণ একজন বন্ধু-সুলভ ঈশ্বরের আশে-পাশে যা ঘুরে বেড়ায়। ভিপাসসানাতে ঈশ্বরকে নিয়েও কোনো কথা থাকতে পারে না। কিছু কিছু বৌদ্ধের মতে ঈশ্বরের কল্পনা নির্ভরতার চূড়ান্ত বস্তু হিসেবে দেখা হয়, সর্বশেষ অস্পষ্ট নিরাপত্তার চাদর, শুদ্ধ 'বিচ্ছিন্নতার' ক্ষেত্রে সর্বশেষ বাধা। তখন আমার সাথে 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটার একটা খুব ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল। ইতোমধ্যে আমি এমন কিছু অন্বেষকের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম যারা সকল মানুষের সাথে যে কোনো রকম আবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে ছিলেন। যখন তারা এমন শুদ্ধ বিচ্ছিন্নতার সাধনার কথা বলতেন আমার তখন ইচ্ছা করত তাদের হাত ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে বলি,

ওহহো। এটাই একটা শেষ জিনিস যা আমাকে শিখতে হবে।

এখনো আমাকে খুঁজে নিতে হবে জীবনের ঠিক কোথায় একটা বিজ্ঞ বিচ্ছিন্নতার আবাদ করলে তা শান্তি বয়ে আনবে। এবং এক সন্ধ্যায় লাইব্রেরিতে ভিপাসসানা ধ্যানের ব্যাপারে পড়ার সময় আমি খেয়াল করে দেখেছিলাম জীবনের কতটা সময় আমি ডাঙ্গার মাছের মতো খাবি খেয়ে নষ্ট করেছি, কতটা সময় নষ্ট করেছি ভাল না লাগার হতাশায় ব্যর্থ হয়েছি আরও বেশি আনন্দ পেতে। আগে আমি কেবল ভাবতাম কোথায় গেলে আমি সব পেয়ে যাব কিংবা কারা আমাকে ভালোবাসে সব চাওয়া পূর্ণ করবে। ঈশ! সবসময় নিজেকে বাজে সময়ের এবড়ো থেবড়ো রাস্তায় না টেনে হিঁচড়ে যদি স্থির হয়ে থাকা শিখতাম তাহলে হয়ত আরও কিছুটা ধৈর্য ধরা শিখতাম।

সেই সন্ধ্যায় যখন আমি আশ্রমের বাগানে একটা নীরব বেঞ্চ খুঁজে পেয়েছিলাম আর সেখানে ভিপাসসানা পদ্ধতিতে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তখন এই সকল প্রশ্ন আবার আমার কাছে ফিরে এসেছিল। কোন নড়াচড়া নয়, কোন উত্তেজনা নয়,

www.pathagar.org

এমনকি কোনো মন্ত্রও নয়– কেবল শুদ্ধ সম্মাননা। দেখি কি হয়! দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ভুলে গিয়েছিলাম ভারতের প্রেক্ষাপটে কী বেরিয়ে আসতে পারে আর; তা হলো মশা। আমি যখন সেই দারুণ গোধূলিবেলায় বেঞ্চে বসেছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলাম মশারা আমার মুখের বিরুদ্ধে কুচকাওয়াজ করছে, প্লেনের মতো ল্যান্ড করে সম্মিলিত হামলা করছে আমার মাথা, হাঁটু, বাহুতে। এবং তাদের ছোট মাত্রার সে কী ভীষণ কামড়! আমার তা ভাল লাগেনি। একদিকে মনে হয়েছিল ভিপাসসানা অনুশীলনের জন্য সেটা সঠিক সময় নয়। আর এক দিকে মনে হয়েছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থিরভাবে বসার জন্য দিনের কোন সময়টাই বা উপযোগী? এমন কোনো সময় আছে কি যখন কোনো অস্বস্তির গুঞ্জন পাওয়া যাবে না, মনোযোগ নষ্ট হবে না বা নিজের ভেতর চঞ্চলতা জেগে উঠবে না। তাই আমার গুরুর উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি একটা সিদ্ধান্ত নেই, যে আমাদের নিজের ভক্তি সাধনার বিজ্ঞানী নিজেদেরই হতে হবে। যদি এর মধ্যে একবার বসে থাকা যায়? মশাগুলোকে তাড়াতে নিজের শরীরে চড় বা ঝাড়া না মেরে যদি আমি সেই অস্বস্তিতেই বসে থাকতে পারি? আমার জীবনের কেবল সেই এক ঘণ্টা!

তাই আমি তা করেছিলাম। দেখছিলাম কীভাবে মশারা আমার রক্ত চুষে খাচ্ছে। আমার ভেতরের একটা অংশ বলছিল, এই ছোট একটা পরীক্ষায় কি আর হবে! আর একটা অংশ বলছিল, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের এটা একটা প্রথম ধাপ। আমি যদি এই নিরীহ শারীরিক অস্বস্তির মধ্যে বসে থাকতে পারি তাহলে অন্য কি কি সমস্যার মধ্যে আমি বসে থাকতে সমর্থ হব? আবেগের সমস্যা? সেটা কি আর কঠিন থাকবে আমার কাছে? হিংসা, রাগ, ভয়, হতাশা, একাকীত্ব, লজ্জা, বিরক্তি?

প্রথম দিকে সেই চুলকানি আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। এবং একই সাথে সেটা একটা সাধারণ জ্বালাপোড়ায় পরিণত হয়েছিল এবং আমি সেই জ্বলুনিতে বিজয় উল্লাস বোধ করছিলাম। আমি সেই ব্যথাকে এর বিশেষ কাজ থেকে শুদ্ধ সংবেদন অনুভবে পরিণত হতে দিয়েছিলাম। ভাল বা খারাপ না, কেবল তীব্র। সেই তীব্রতা আমাকে আমার কাছ থেকে ধ্যানের গভীরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি সেখানে দুই ঘণ্টা বসেছিলাম। যেন আমার মাথায় একটা পাখি নেমে এসে বসেছিল। আমি খেয়াল করিনি।

একটা বিষয়ে পরিষ্কার করে বলে নেই। আমি জানি মানবতার ইতিহাসে এটা সহ্যের বিপরীতে কোনো বিশাল পদক্ষেপ নয় এবং এর জন্য আমি কংগ্রেসে পুরস্কার দাবি করছি না কিন্তু আমার এই ভেবে অদ্ভুত শিহরণ হচ্ছিল যে পৃথিবীতে আমার চৌত্রিশ বছর বয়সে এমন কখনো হয়নি যে আমাকে মশা কামড়িয়েছে এবং আমি তাকে চড় মারিনি। আমার জীবনের লক্ষ লক্ষ ব্যথা বা আনন্দের সংকেত, যখনই কিছু ঘটেছে, আমি প্রতিক্রিয়া করেছি। কিন্তু সেখানে আমি তা এড়িয়ে গেছি। আমি সেদিন এমন কিছু করছিলাম যা আমি আগে কখনো করিনি। মেনে নিচ্ছি তা খুবই ছোট কিছু কিন্তু কতদিন তা আমি কি বলতে পারব? এবং আজ যা করিনি তা যে কত দিন আর না পেরে থাকব?

ধ্যান শেষ হয়ে গেলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। প্রায় বিশটা মশার কামড় খুঁজে পেয়েছিলাম কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে সব

www.pathagar.org

যন্ত্রণা চলে গিয়েছিল। সকল কামড়ের দাগগুলো বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সব কিছু মিলিয়ে গিয়েছিল, সবকিছু...

৫৭

ঈশ্বরের পথ আর সাধারণ পার্থিব জীবনের পথ আলাদা। ঈশ্বরের খোঁজে আকর্ষণীয় জিনিসগুলোর বিপরীত পাশে ছুটতে হয়। যেটা আসলে খুব কঠিন। এক্ষেত্রে অনেক প্রিয় এবং বহুদিনের অভ্যস্ত সহজাত অভ্যাসগুলো ছেড়ে দিতে হয় এই আশায় যে এর বদলে আরও বড় কিছু পাওয়া যাবে। একজন ভাল সাধক হতে হলে পৃথিবীর প্রতিটা ধর্ম যুগে যুগে একই ধরনের নিয়মকেই উৎসাহিত করেছে আর তা হলো– ভোরে উঠে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা, নিজের সৎগুণগুলো ঝালিয়ে নেওয়া, একজন ভাল প্রতিবেশী হওয়া, নিজেকে এবং অন্যকে সম্মান করা, নিজের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা। আমরা সবাই জানি ঘুমিয়ে থাকা খুব সহজ। অনেকে তো ঘুমিয়েই থাকে কিন্তু কেউ কেউ তো আছে যারা সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে, মুখ ধুয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বসে পড়ে এবং চেষ্টা করে আগামী দিনগুলোতেও যেন এই সাধনা তারা ধরে রাখতে পারে।

ভাল কোনো ফলের নিশ্চয়তা ছাড়াই পৃথিবীর তাবৎ ধর্মপ্রাণ মানুষরা এইসব আচার অভ্যাস পালন করে গেছেন। অবশ্যই অনেক ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মগুরু এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে এসব করলে কি কি ভাল ফল ব্যক্তি পেতে পারে কিংবা এগুলো পালন না করলে নানান শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত কিছুই কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে কেননা শেষটা আমরা কেউ জানি না। ভক্তি হচ্ছে অনিশ্চিত একটা শ্রম। বিশ্বাস হচ্ছে এমন কিছু বলা যে, 'হ্যাঁ আমি মহাবিশ্বের এই রহস্যকে মেনে নিয়েছি এবং আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যা আমি বুঝতে পারব না।' এই কারণে আমাদের 'আস্থাতে ঝাঁপ' দিতে বলা হয়েছে। কেননা কোনো ঐশ্বরিক কল্পনার ওপর একমত হওয়ার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যৌক্তিকতা থেকে অজানাতে ঝাঁপ দেওয়া। আর আমি গুরুত্ব দেই না প্রতিটা ধর্মে পণ্ডিতগণ কতটা যত্নে অজস্র বই দিয়ে প্রমাণ দিয়ে যেতে চেয়েছেন যে তাদের এই ধর্মবিশ্বাস যৌক্তিক। যদি আস্থা যুক্তি দিয়ে বিচার করা হয় তবে তা আর আস্থা থাকল না। আস্থা হচ্ছে সেই বিশ্বাস যার কোনো প্রমাণ নেই, যেটা ধরা ছোঁয়া যায় না। আস্থা হচ্ছে অন্ধকার জেনেও দ্রুত গতিতে ছুটে চলা। আমরা যদি আগেই বুঝে ফেলি জীবনের মানে কি এবং ঈশ্বরের আচার কি এবং আমাদের আত্মার গন্তব্য কোথায় তাহলে আমাদের বিশ্বাস আস্থায় পরিণত হবে না এবং সেটা মানবিকতার জন্য তেমন কোনো সাহসী কাজ থাকবে না আর। সেটা হয়ে যাবে একটা বিশুদ্ধ ইনস্যুরেন্স পলিসি।

আমি ইনস্যুরেন্স ব্যবসায় আগ্রহী নই। আমি নাস্তিকতায় ক্লান্ত, আমি আত্মিক দূরদর্শিতায় বিরক্ত, আমার মহান বিষয়ে তর্ক আর যুক্তি ভাল লাগে না। আমি আর

www.pathagar.org

এসব শুনতে চাই না। আমি কোনো প্রমাণ, নিশ্চয়তা, সাক্ষ্যের ধারও ধারি না। আমি কেবল চাই ঈশ্বরকে। আমি আমার ভেতরে ঈশ্বরকে চাই। যেভাবে সূর্যালোক পানির ভেতরে খেলে বেড়ায় আমি চাই ঠিক তেমনভাবে আমার শিরায় শিরায় ঈশ্বর বয়ে চলুক।

৫৮

দিনে দিনে আমি আরও বুঝে শুনে আরও বিশেষভাবে প্রার্থনা করছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল যে, স্রষ্টার কাছে এতো এতো অকাজের এবং অন্যমনস্ক প্রার্থনা পাঠানোর কোনো অর্থ হয় না। প্রতিদিন ধ্যানের পূর্বে আমি কিছুক্ষণ হাঁটু গেড়ে মন্দিরের মেঝেতে মাথা ছুঁইয়ে স্রষ্টার সাথে কথা বলতাম। প্রথম প্রথম সেই স্বর্গীয় কথোপকথনে আমি ততটা মনোযোগী ছিলাম না। নিজের কাছেই তা শোনাত ক্লান্ত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিরক্তিকর। মনে আছে একদিন আমি মন্দিরের মেঝেতে কপাল ছুঁইয়ে ঈশ্বরকে বিড়বিড় করে বলছিলাম, আমি জানি না আমি কি চাই। আচ্ছা তোমার নিশ্চয়ই কোনো পরিকল্পনা আছে তাই এ-ব্যাপারে কিছু কর। করবে না?

ঠিক এমনটাতো আমরা আমাদের হেয়ার ড্রেসারকেও বলে থাকি। এবং আমি দুঃখিত, এই শেষ নয়। নিশ্চিত থাকেন ঈশ্বর এই প্রার্থনা ভ্রূ কুঁচকেই বিচার করবেন আর বলবেন, 'যেদিন তুমি পুরোপুরি গুরুত্বের সাথে আমার কাছে কিছু চাইতে পারবে সেদিন আমাকে ডেকো।'

ঈশ্বর কিন্তু ইতোমধ্যেই জানেন আমি কি চাই? কিন্তু আমি কি জানি? নিজের সকল অসহায়ত্ব নিয়ে ঈশ্বরের পায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা পুরোটাই একটা মহৎ কাজ। ঈশ্বরই জানেন আমি কতবার তা করেছি। কিন্তু অন্যরকম কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই নিজের মতো করে অন্য কিছুও করতে হবে।

এ-ব্যাপারে খুব মজার একটা ইটালিয়ান কৌতুক আছে, একজন গরিব মানুষ প্রতিদিন গির্জায় গিয়ে একজন সাধকের মূর্তির সামনে প্রার্থনা করে, প্রিয় ঈশ্বর দয়া করে, দয়া করে, দয়া করে আমাকে একটা লটারি জেতার সৌভাগ্য দান করুন। এক মাস ধরে এই প্রার্থনা চলতে থাকে। অবশেষে সেই সাধক তার মূর্তি থেকে বের হয়ে জীবন্ত রূপ ধারণ করেন। তারপর বিরক্তিতে গরিব মানুষটার দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রিয় বৎস দয়া করে, দয়া করে, দয়া করে একটা টিকিট কেনো।

প্রার্থনা এক ধরনের দ্বৈত সম্পর্ক, যেখানে অর্ধেক কাজ আমার নিজের। আমি যদি রূপান্তর চাই কিন্তু জানিই না আসলে আমি কি চাই তাহলে কীভাবে তা পাব? সোজাসুজি স্পষ্টভাবে নিজের সুইচ্ছাগুলো উল্লেখ করার মধ্যে প্রার্থনার অর্ধেক

www.pathagar.org

সুফল নিহিত। যদি আপনার তা না থাকে তাহলে আপনার সকল প্রার্থনা হাড়-হীন ফাঁপা এবং জড় হয়ে থাকবে। তারা ঠাণ্ডা কুয়াশায় আপনার পায়ের পাতায় ঘুরে বেড়াবে, কখনোই উপরে উঠতে পারবে না। তাই আমি কিছুটা সময় নিয়ে ভেবে নেই আসলে আমি কি চাই। আমি ততটা সময় ধরে হাঁটু গেড়ে মন্দিরের মেঝেতে কপাল ছুঁইয়ে রাখি যতক্ষণ না আমি একটা সুগঠিত সুনির্ধারিত প্রার্থনা ভেবে নিতে পারি। যদি আমার মধ্যে গুরুত্ব জেগে না ওঠে তাহলে আমি ততক্ষণ মেঝেতেই অপেক্ষা করি। কাল যেটা কাজের তা আজ কাজের নাও হতে পারে। এতে প্রার্থনা আমেজহীন গুনগুন থেকে নিষ্প্রভ এবং বিরক্তিকর হয়ে যেতে পারে। সতর্ক থাকা শিখতে হলে আমাকে আমার নিজের আত্মার সজাগ প্রহরী হতে হবে।

'ভাগ্য' সেটাও আমি মনে করি স্বর্গীয় মহিমা এবং নিজের স্বেচ্ছা সামর্থ্যের সাথে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক। এর অর্ধেকের ওপর আপনার কোনো আয়ত্ত নাই এবং বাকি অর্ধেক পুরোটাই আপনার হাতে। মানুষ পুরোপুরি ঈশ্বরের হাতের পুতুল নয়, না সে পুরোপুরি নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা। কিছুটা করে সে দুটোই। আমাদের জীবন সার্কাসের এর সেই খেলার মতো যেখানে পাশাপাশি দ্রুতগামী দুটো ঘোড়ায় পা দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। যেখানে একটা 'পা' ভাগ্য নামক ঘোড়ায় থাকে আর এক পা 'স্ব ইচ্ছা' নামক ঘোড়ায়। এক্ষেত্রে প্রতিদিন নিজেকে যে প্রশ্নটা করতে হয় তা হলো কোনটা কোন ঘোড়া? কোন ঘোড়াটাকে নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করা ছেড়ে দেবেন আর কোন ঘোড়াটাকে আপনি আপনার আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করবেন।

আমার ভাগ্যের অনেক কিছুই আমার আয়ত্তের বাইরে আবার অনেক কিছু আমার আওতাধীন। আমার নিজের সন্তুষ্টির জন্য কিছু টিকিট আমি কিনতে সমর্থ্য। আমি কীভাবে আমার সময় কাটাবো, কার সাথে কাটাবো, কার সাথে আমি আমার শরীর, জীবন, টাকা, সামর্থ্য ভাগ করে নেব এইসবই আমার নিজের হাতে। আমি কি খাব, কি পরব, কি নিয়ে লেখাপড়া করব এসবও আমার নিজের হাতে। যদি কোনো অপ্রত্যাশিত সমস্যা বা সুযোগ আসে তাহলে সেটা কিভাবে সামাল দেব সেটাও আমার নিজের হাতেই আছে। কখন আমার দৃষ্টিভঙ্গি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বদলে নিতে হবে। আমি কেমন শব্দ এবং সুরে অন্যের সাথে কথা বলব তাও ঠিক করে নিতে পারি। এবং সবচেয়ে বেশি আমি আমার ভাবনাকে বদলে নিতে পারি।

শেষের বুদ্ধিটা আমার জন্য নতুন ছিল। আমি আমার দুশ্চিন্তার ডিমে তা দেওয়া বন্ধ করতে পারার অসমর্থতা জানানোর পর টেক্সাসের রিচার্ড সর্বপ্রথম এই ধারণার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল,

মুদি দোকান যেভাবে প্রতিদিন তুমি তোমার পোশাক বাছাই কর সেভাবেই তুমি তোমার ভাবনাকে বাছাই করে নিও। এই শক্তিটার আবাদ তুমি করতে পারবে। তুমি যদি তোমার জীবনের খারাপ ভাবনাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে চাও। এটাই একমাত্র উপায়। কেননা তুমি যদি নিজের ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে না পার তাহলে সারাজীবন তুমি বড় ঝামেলায় পড়তে থাকবে।

www.pathagar.org

এমনিতে মনে হবে ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করাটা খুবই অসম্ভব কিছু। কিন্তু ভাবুন যদি আপনি তা পারেন। ব্যাপারটা অস্বীকার এবং নিগ্রহ করার নয়। আমাদের ক্ষতিকর ভাবনাগুলোকে অস্বীকার এবং নিগ্রহ করার মাধ্যমে কোনো ভাল ফল পাওয়া যাবে না। টেক্সাসের রিচার্ডের মতে বরং এই ক্ষতিকর ভাবনাগুলোকে মেনে নিয়ে বুঝে নিতে হবে এদের উৎপত্তি কোথায় এবং কেন তারা মনে আসছে এবং তখন মহান ক্ষমতা আর সহ্যশক্তি দিয়ে তাদের শেষ করে দিতে হয়। মানসিক সমস্যার চিকিৎসার সময় হাত মোজা পরার মতো একটা চর্চা এটা। আপনাকে আত্মিক অনুশীলন করে এটা জয় করতে হবে। এটা এমন একটা অনুশীলন যার মাধ্যমে কোনো কিছু হতে দেওয়া, কোনো কিছুতে আফসোস না হওয়ার মতো। নিজের পুরোনো অভ্যাস, হিংসা এবং পরিচিত চিত্র হারিয়ে ফেলার মতো। অবশ্যই এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। এটা কোনো শিক্ষা নয় যে আপনি শুনেই তা করে ফেললেন। এটা একটা ক্রমাগত অনুশীলন। ইটালিয়ান ভাষায় যাকে বলে, দেবো ফঁরমা লে অসসা মানে, 'আমার হাড্ডি আমাকেই বানাতে হবে।'

তাই আমি সারাদিন সতর্ক হয়ে আমার ভাবনা পাহারা দেওয়া এবং তার দেখাশোনা শুরু করেছিলাম। আমি সারাদিনে সাতশোবার জপতে থাকতাম যে, 'আমি আমার মনে কোনো অস্বাস্থ্যকর ভাবনার আশ্রয় দিতে চাই না।' যখনই একটা বাজে চিন্তা মনে আসত তখনই আমি বলতে থাকতাম, 'আমি আমার মনে কোনো অস্বাস্থ্যকর ভাবনার পোতাশ্রয় বানাতে চাই না।' সেদিন নিজেকে প্রথম 'পোতাশ্রয়' শব্দটা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। যেটা একসাথে একটা নাম-পদ আবার একই সাথে এটা একটা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। পোতাশ্রয় অবশ্যই এমন একটা জায়গা যেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় আবার যেখানে প্রেবেশ করার অনুমতি দেওয়া যায়। আমি আমার মনের পোতাশ্রয়ের ছবি কল্পনা করি। কিছুটা এলোমেলো, ঝড়ে বিধ্বস্ত কিন্তু সুন্দর গভীরতায় অবস্থিত। আমার মনের পোতাশ্রয়টা একটা খোলা সৈকত, আমার নিজের দ্বীপের একমাত্র প্রবেশপথ। যেটা একটা তরুণ আগ্নেয়গিরির দ্বীপ কিন্তু অবশ্যই এটা উর্বর এবং সম্ভাবনাময়। দ্বীপটাতে কিছু যুদ্ধ হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু এখন তা নতুন নেতৃত্বে শান্তির পক্ষে কাজ করছে এবং এর জন্য নতুন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং এখন সাত সমুদ্র পার হয়ে এই খবরটা প্রচার হোক যে পোতাশ্রয়ে প্রবেশের নিয়ম কানুন কত কঠিন করা হয়েছে।

এখানে কোনো কঠিন এবং ক্রুটিযুক্ত ভাবনা আসতে পারবে না। কোনো প্লেগ আক্রান্ত ভাবনার জাহাজ, কোনো দাস বোঝাই জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ এসবই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি ভাবনাগুলো হয় অনাহারী, নির্বাসিত, অসন্তুষ্ট, বাঁচাল, বিদ্রোহী এবং ভয়াবহ গুপ্ত ঘাতক, উচ্ছৃঙ্খল পতিতা, কুটনি এবং পলাতক রাজদ্রোহীদের মতো তাহলে এখানে আসার কোনো দরকার নেই। নরখাদক ভাবনারা তো কোনো মতেই আসতে পারবে না। এমনকি ধর্ম প্রচারকদেরও খুব সাবধানে পরীক্ষা করে আসতে দেওয়া হবে তাঁদের নিয়মানুবর্তিতা যাচাই করে। এটা একটা শান্তির পোতাশ্রয়। এমন একটা গর্বিত এবং মনোরম দ্বীপের প্রবেশপথ

www.pathagar.org

যে দ্বীপে এখন কেবল শান্তির আবাদ হয়। আমি বলেছিলাম প্রিয় ভাবনারা তোমরা যদি এই আইন মেনে চলতে পারো তাহলেই আমার মনে তোমাদের স্বাগতম জানাই। নাহলে সমুদ্রের যে পথ দিয়েই তোমরা আসবে সেই পথেই তোমাদের ফেরত পাঠাবো।

এটা আমার অভিযান এবং তা চিরকালের জন্য।

৫৯

সতেরো বছরের একটা ভারতীয় মেয়ের সাথে আমার খুব সখ্যতা হয়েছিল। তার নাম তুলসি। সে প্রতিদিন আমার সাথে মন্দিরের মেঝে ঘঁষামাজা করত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা বাগানের ভেতর দিয়ে একসাথে হেঁটে বেড়াতাম সাথে ঈশ্বর আর রক সংগীত নিয়ে কথা বলতাম। এই দুই বিষয়ে তুলসির সমান ভক্তি ছিল। যদি দেখতেন! কি মিষ্টি বই-পোকা একটা মেয়ে তুলসি। চশমার একটা লেন্স ভেঙে কার্টুনের মাকড়সার জালের মতো হয়ে যাওয়ার পরও সে তা চোখে পরা বন্ধ করেনি আর তাতেও তাকে সমান সুন্দর দেখাত। তুলসি আমার কাছে একাধারে অনেক মজার একটা বিদেশী জিনিস, সে একজন তরুণী, একজন গেছো মেয়ে, একজন ভারতীয় মেয়ে, তার পরিবারের বিদ্রোহী মেয়ে। তার এমন একটা আত্মা আছে যা ঈশ্বরের জন্য পাগল আর ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা স্কুলগামী মেয়ের প্রেমের মতো। সে গুনগুন করে মজার ইংরেজি বলত। এমন ইংরেজি যা কেবল ভারতবর্ষেই শুনতে পাওয়া যায়। যেখানে কিছু ঔপনিবেশিক শব্দ আছে যেমন স্প্লেনডিড এবং ননসেন্স। মাঝে মাঝে অনেক বড় বাক্য যেমন, 'সকালে ঘাসে হাঁটা অনেক ভাল যখন শিশির মাটিতে জড়ো হয় যাতে রক্তের চাপ এবং তাপমাত্রা প্রাকৃতিকভাবে কমে।' আমি যেদিন তাকে বলেছিলাম এক দিনের জন্য আমি মুম্বাই যাচ্ছি।' তুলসি বলেছিল,

দয়া করে সতর্ক হয়ে দাঁড়াবে, কেননা সেখানে বাস অনেক দ্রুতগামী।

বয়স এবং আকার, দুটোতেই সে আমার অর্ধেক।

তুলসি এবং আমি একদিন হাঁটার সময় বিয়ে নিয়ে অনেক কথা বলেছিলাম। তখন খুব দ্রুত তার বয়স আঠারো হয়ে যাবে। সেটা এমন একটা বয়স যখন তাকে আইনানুযায়ী বিবাহযোগ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং বিয়ের কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে। এটা অনেকটা এভাবে শুরু হবে যে- আঠারো বয়সের পর তুলসিকে সকল বিয়েতে শাড়ি পরে যেতে হবে। এটা হবে তার নারীত্বের একটা প্রমাণ। তারপর কিছু ভাল ভাল আম্মা, খালা এসে তার পাশে বসে তাকে নানান প্রশ্ন করতে শুরু করবে, তোমার বয়স কত? তোমার পারিবারিক বর্ণনা কি? তোমার বাবা কি করেন? তুমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাচ্ছ? তোমার কি করতে ভাল লাগে? তোমার জন্মদিন কবে? জানেন! তুলসির বাবা তখন একটা

www.pathagar.org

খাম পেয়েছিল যেখানে এক ভদ্রমহিলার নাতির ছবি পাঠানো হয়েছিল। ছেলেটা মুম্বাইয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছে। ছবির সাথে রাশিফল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তান্ত পাঠানো হয়েছিল। এর সাথে একটা আবশ্যিক প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার মেয়ে কি বিয়ে করতে রাজী আছে?

তুলসি বলেছিল,

ব্যাপারটা ফালতু।

কিন্তু সেখানে বাচ্চাদের সার্থকভাবে বিয়ে দিতে পারা পরিবারের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তুলসির একটা খালা আছে যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে তার মাথার সব চুল কেটে ফেলেছিল কারণ তার আঠাশ বছর বয়সি বড় মেয়ের অবশেষে বিয়ে হয়েছে এবং সেই মেয়ের বিয়ে হওয়াটা খুব কঠিন কিছুই ছিল। বিয়ের ক্ষেত্রে এই সমাজে তার নানান ত্রুটি ছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তুলসিকে, ভারতে কি কি কারণে একটা মেয়ের বিয়ে হওয়া কঠিন। সে আমাকে নানান কারণ দর্শিয়েছিল।

যদি কেউ ভাল রাশির জাতিকা না হয়, যদি কারো বয়স বেশি হয়, যদি কারো গায়ের রঙ কালো হয়, যদি সে বেশি শিক্ষিত হয় এবং তার থেকে যদি উন্নত অবস্থানে অবস্থিত কাউকে না পাওয়া যায় এবং বর্তমানে এটা নাকি একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন না একজন নারী তার স্বামীর চেয়ে বেশি শিক্ষিত হতে পারে না। কিংবা তার যদি কোনো প্রেম থাকে আর তা যদি এলাকায় রটে যায় আর তখন বর পাওয়া ভীষণ মুশকিল হয়ে যায়।

আমি দ্রুত তালিকাটা ঘেঁটে দেখেছিলাম ভারতীয় সমাজে আমি বিয়ের জন্য কতটুকু যোগ্য। আমি জানি না আমার রাশিটা ভাল না খারাপ, আমি তো অবশ্যই বয়স্কা এবং আমি অতিমাত্রায় শিক্ষিতের সারিতে আছি এবং আমার জনসমক্ষে প্রকাশিত চরিত্র ইতোমধ্যেই কলঙ্কিত। আমি দেখতেও খুব লাবণ্যময়ী নই। যাক অন্তত আমার গায়ের রঙটা তো সাদা। এই একটা শর্তই কেবল আমার পক্ষে ছিল।

এক সপ্তাহ আগে নাকি তুলসিকে তার এক চাচাতো বোনের বিয়েতে যেতে হয়েছিল, এবং সে বলছিল, সে কি পরিমাণ ঘৃণা করে এই বিয়ের নিয়ম নীতি তা বলার মতো নয়। বিয়ের পোশাক-আশাক নাচ-গান আড্ডা আলোচনা কিছুই ভাল লাগে না। এর চেয়ে মন্দিরের মেঝে মুছে ধ্যান করা ভাল ছিল। তাদের পরিবারের কেউ এটা বুঝতে চায় না, তার ঈশ্বর ভক্তিকে তারা অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখে। তুলসি বলেছিল, আমার পরিবারে সবাই ধরেই নিয়েছে আমি আলাদা। আমি এমন একটা নাম তৈরি করেছি যে সবাই ভাবে আমি এমন একজন মানুষ যাকে কিছু করতে বলা হলে তার উল্টোটা করবে। আমার রাগও আছে। আমি পড়াশোনায়ও তেমন আগ্রহী নই। যদিও এখন থেকে হবো, কেননা আমি এখন কলেজে যাব আর সেখানে আমি নিজের ইচ্ছামতো বাছাই করে নেব আমি কি পড়ব আর কি পড়ব না। আমি আমাদের গুরুর মতো মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়তে চাই। আমাকে খুব পাজী হিসেবে দেখা হয়। আমাকে কিছু করাতে হলে তার উপযুক্ত কারণ দেখাতে হয়। আমার মা আমার এই বিষয়টা জানেন তাই কোনো মতামত চাপাতে চাইলে খুব ভাল ভাল কারণ দেখান কিন্তু বাবা তা করেন না। তিনি যে কারণ দেখান সেগুলো আমার কাছে খুব

www.pathagar.org

একটা উপযুক্ত মনে হয় না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এই পরিবারে আমি কি করছি কেন না আমি তাদের কারোর মতোই নই।

সে সময় তুলসির যে চাচাতো বোনটার বিয়ে হয়েছিল তার বয়স একুশ এবং তুলসির বড় বোনের বয়স বিশ। সে তখন বিবাহযোগ্যার তালিকায় ছিল। তার মানে এরপর তুলসির পাত্র যোগাড় করার ভীষণ চাপ পড়বে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কি কখনো বিয়ে করতে চায়? সে বলেছিল,

না আ আ আ...

এবং আমরা বাগান থেকে দেখছিলাম শব্দটা সূর্যাস্ত পর্যন্ত লম্বা হয়ে গিয়েছিল।

সে বলেছিল,

আমি তোমার মতো ঘুরতে চাই।

তুমি জানো, তুলসি, আমি সবসময় এমন করে ঘুরে বেড়াইনি। আমি বিয়ে করেছিলাম।

সে তার ভাঙা চশমা ভেদ করে আমার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিল। তার চোখে ছিল ধাঁধাঁ। এর চেয়ে আমি যদি বলতাম আমি একসময় শ্যামলা ছিলাম তাও হয়ত সে হজম করে নিত। শেষতক সে বলেছিল,

তুমি বিয়ে করেছিলে? ভাবাই যায় না।

কিন্তু এটা সত্য, করেছিলাম।

তুমিই কি সম্পর্কটা শেষ করেছ?

হ্যাঁ।

এটা প্রশংসনীয় কাজ করেছ যে তুমিই সম্পর্কটা মিটিয়ে দিয়েছ। তোমাকে এখন সুখিই দেখায়। কিন্তু আমার কি হবে? কেন আমি ভারতে জন্ম নিয়েছি? কি ভয়ানক! আমি কেন এই পরিবারে জন্ম নিয়েছি? কেন আমাকে এত এত বিয়ে বাড়িতে যেতে হয়?

তারপর তুলসি তার বিষণ্ণতার বলয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল আর আশ্রমে শোভনীয় শব্দসীমা অনুযায়ী– চিৎকার করছিল, 'আমি হাওয়াই এ চলে যেতে চাই।'

৬০

টেক্সাসের রিচার্ড বিয়ে করেছিল। তার দুটো ছেলেও আছে। দুজনই এখন বড় হয়ে গেছে, বাবার সাথে দুজনেরই খুব ভাব। মাঝে মাঝে গল্প করতে করতে বা অন্য কথা প্রসঙ্গে রিচার্ড তার সাবেক স্ত্রীর কথা উল্লেখ করত এবং তখন তার কথা শুনে মনে হতো সে তাকে তখনো স্নেহের চোখেই দেখে। শুনেই আমার হিংসা হতো, মনে হতো রিচার্ড কতটা সৌভাগ্যবান বিবাহবিচ্ছেদের পরও সে কিনা এখনো তার সাবেক বৌয়ের বন্ধু। আমার ভয়াবহ বিবাহবিচ্ছেদের স্মৃতিতে এটা একটা বাজে প্রভাব ফেলে, যখন শুনি কোনো দম্পতি আপোষে মীমাংসা

www.pathagar.org

করেছে। আমার সত্যিই তখন হিংসা হয়। এর চেয়েও খারাপ হচ্ছে আমার তখন মনে হয় কত প্রেমময় ব্যাপারটা। কি চমৎকার ভাবেই তারা আলাদা হয়ে গেছে। শুনেই যে কেউ বলবে,

কি দারুণ! তারা নিশ্চয়ই দুজন দুজনকে ভালোবাসতো।

তাই আমি একদিন রিচার্ডকে এ-নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মনে হচ্ছে তুমি এখনো তোমার বউয়ের খুব ভক্ত। তোমরা কি এখনো ঘনিষ্ঠ?

সে স্বাভাবিক ভাবেই বলেছিল,

নাহ! তার ধারণা আমি আমার নিজের নাম বদলে বেজন্মা রেখেছি। আমি একজন বেজন্মা।

ব্যাপারটা নিয়ে রিচার্ডের মাথা ব্যথা নেই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার নিজের সাবেক স্বামীও এমন ভেবেছিল যে আমি আমার নামটাও বদলে ফেলেছিলাম। মনটাই ভেঙে যেত তখন। আমার বিবাহবিচ্ছেদের সবচেয়ে কঠিন বিষয়টা হচ্ছে আমার সাবেক স্বামী আমাকে কখনোই তাকে ছেড়ে দিয়েছি বলে ক্ষমা করেনি। যত ব্যাখ্যা দিয়ে আর ক্ষমা চেয়ে তার পায়ের কাছে পড়ে থাকি না কেন, তাতে কোনো লাভ হতো না। যে পরিমাণ অপবাদ নিজের মাথায় নেই আর তাকে ছেড়ে যাওয়ার বদলে যে পরিমাণ সম্পদের মায়া আমি ত্যাগ করি না কেন এবং যে পরিমাণ অনুতাপই করি না কেন, তাতে আমাকে সে কখনোই বলতে আসত না যে,

"আমি তোমার উদারতায় আর সততায় খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে ডিবোর্স দিয়ে খুব ভাল লাগল"

না তখনো আমি খালাস পাইনি এবং সেই খালাস না পাওয়া কালো গর্তটা তখনো আমার ভেতরে ছিল। এমনকি সকল সুখ আর উত্তেজনার মুহূর্তেও আমি বেশিক্ষণ তা ভুলে থাকতে পারতাম না। সে এখনো আমাকে ঘৃণা করে এবং মনে হতো যেন এ থেকে আমি কখনোই মুক্তি পাব না, কখনো ছাড়া পাব না।

আশ্রমে একদিন আমার বন্ধুদের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছিলাম। একজন নতুন সদস্যও ছিল সেখানে যিনি নিউজিল্যান্ডবাসী, পেশায় সীসা ব্যবসায়ী। সে কোথাও শুনেছিল যে আমি একজন লেখক এবং সেও তেমনই একজন কবি এই কথাটা বলার জন্য আমাকে সে খুঁজে নিজেই পরিচিত হতে এসেছিল। তখন নিউজিল্যান্ডে তার 'আ পাম্বার প্রগ্রেস' নামে একটা মারাত্মক আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে। বইটা তার নিজস্ব আত্মিক অন্বেষণ নিয়ে লেখা। নিউজিল্যান্ডের একজন কবি, টেক্সাস এর রিচার্ড, আইরিশ এর দুগ্ধ খামারি, ভারতীয় গেছো মেয়ে তুলসি, এবং খড়ের মতো সাদা চুল, ভাস্কর্যের মতো হাস্যকর চোখের একজন বৃদ্ধা যে একজন সাউথ আফ্রিকান যাজিকা। ভারতে এই আমার বন্ধু-মহল। এমন উচ্ছল একটা দল আশ্রমে থাকতে পারে, তা আমি ভাবতেও পারিনি।

একদিন দুপুরের আহারের সময় আমরা সবাই বিয়ে নিয়ে কথা বলছিলাম। তখন নিউজিল্যান্ডের সীসা ব্যবসায়ী কবি বলেছিল,

বিয়ে হচ্ছে একটা অপারেশন যাতে দুটি মানুষকে একসাথে সেলাই করে দেওয়া হয় আর ডিভোর্স হচ্ছে একধরনের ব্যবচ্ছেদ যা শুকাতে অনেক দিন লাগে। যত

www.pathagar.org

দীর্ঘদিন তুমি বিবাহিত থাকবে কিংবা যত বাজেভাবে সেলাইটা করা হবে, তার ক্ষত সারতে ততদিন লাগবে।

কয়েক বছর ধরে আমি যে ব্যথার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তা হলো বিবাহবিচ্ছেদ পরবর্তী বা ব্যবচ্ছেদ পরবর্তী জ্বালা। যেন কোনো ভূতুড়ে অঙ্গ এখনো চারপাশে ঘুরে শেলফের সকল জিনিস নাড়িয়ে যাচ্ছিল।

টেক্সাসের রিচার্ড খুবই অবাক হয়েছিল যে আমি নিজের প্রতি সারাজীবন কেমন ধারণা পোষণ করব তা কি আমার সাবেক স্বামী ঠিক করবে! এবং আমি বলেছিলাম,

তা জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে এখনো আমার বিগত স্বামীর মতামত খুব শক্তিশালী আমার কাছে। সত্য বলতে আমি এখনো প্রায় আশা করে আছি লোকটা আমাকে ক্ষমা করে দেবে। আমাকে মুক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেবে।

আয়ারল্যান্ডের দুগ্ধ খামারি সব শুনে বুঝে বলেছিল,

সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করলে তোমার সময়ের যৌক্তিক ব্যবহার হবে না।

কি করব বন্ধুরা অন্য মহিলারা এমনিতে যা না করে তার চেয়ে বেশি করেছি আমি অপরাধ বোধ থেকে।

ক্যাথলিক যাজিকা তাতে একমত হয়নি,

অপরাধ বোধ! সেটা তোমার অহং চালাকি করে তোমার অপরাধ বোধকে নৈতিক উন্নতি হিসেবে দেখায়। এই ফাঁদে পা দিও না প্রিয়।

তাহলে কী জন্য আমি আমার বিয়ের বিষয়টা ঘৃণা করি? এজন্য যে সেটার কোনো সমাধান হয়নি। নাকি একটা খোলা ক্ষতের মতো জায়গাটা যা কখনোই ভাল হবে না।

রিচার্ড বলেছিল,

তুমি যদি তাই চাও। তুমি যদি এভাবে ভাবতে সিদ্ধান্ত নাও তবে তাই হোক। আমাকে আর নাক গলাতে বল না।

নাহ! কখনো না। কখনো তো তা শেষ হবে। আমি কেবল জানতে চাই তা কিভাবে? দুপুরের আহারের পর নিউজিল্যান্ডের কবিটা আমাকে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল আমি যাতে রাতের আহারের পর তার সাথে ধ্যান গুহায় দেখা করি। তাই আমি রাতের আহারের পর তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে তাকে অনুসরণ করতে বলেছিল আমার জন্য নাকি কি উপহার আছে। সে আমাকে আশ্রম বরাবর হাঁটিয়ে একটা দালানের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দালানটা আমি আগে কখনো দেখিনি। তারপর সে একটা ঘরের তালা খুলে তার পেছনের সিঁড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল সে সেই জায়গার ব্যাপারে আগে থেকেই জানতো, কেন না সে সকল শীতাতপ বিভাগগুলো ঠিক করে নিয়েছিল এবং কিছু কিছু ঘর তালাবন্ধ করে রেখেছিল। সিঁড়ির উপরের একটা দরজা সেটার তালা সে খুলেছিল নাম্বার একটা সমন্বয় করে। সে এসব করেছিল খুব দ্রুত হয়ত তার স্মৃতি থেকে। তারপর আমরা একটা চমৎকার ছাদে উঠে গিয়েছিলাম। ছাদটা সিরামিকের টুকরো দিয়ে টালি করা। গোধূলির আলোতে তা একটা আলোর প্রতিফলন করা পুকুরের মতো ঝকঝক করছিল। সে আমাকে ছাদ বরাবর একটা ছোট টাওয়ারে নিয়ে গিয়েছিল। একটা মিনার ছিল সেখানে! এবং সে আমাকে আরও একটা সিঁড়ির ধাপ

www.pathagar.org

দেখিয়েছিল। আমাকে সেই নড়বড়ে উঁচু মিনারের ওঠার মুখে ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, আমি এখন তোমাকে এখানে একা রেখে চলে যাব। তুমি এখন উপরে উঠছ। সেখানে ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ না তা শেষ হয়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

কি শেষ হওয়া পর্যন্ত?

সীসা ব্যবসায়ী আমার দিকে তাকিয়ে আমার হাতে একটা ফ্ল্যাশ লাইট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল,

শেষ হয়ে গেলে যাতে নিচে নামতে পারো তাই লাইটটা দিয়ে গেলাম। তারপর একটা ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে দিয়ে সে চলে গিয়েছিল।

আমি সেই মিনারের চূড়ায় উঠে গিয়েছিলাম। তখন আমি ছিলাম সেই আশ্রমের সবচেয়ে উঁচু জায়গায়। সেখান থেকে ভারতের একটা নদী অববাহিকার অনেকটা দেখা যাচ্ছিল। যতদূর চোখ যাচ্ছিল কেবল পর্বত এবং জমি। মনে হচ্ছিল জায়গাটা সাধারণ ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত নয় কিন্তু দারুণ ছিল জায়গাটা। হয়ত সেখানকার বাসিন্দা থাকা অবস্থায় আমার গুরু সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখত এবং মজার ব্যাপার ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যাস্ত দেখা যাচ্ছিল। উষ্ণ বাতাস ছিল। আমি কবির দেওয়া কাগজটার ভাঁজ খুলেছিলাম।

স্বাধীনতার জন্য নির্দেশনা–

১। জীবনের রূপান্তর ঈশ্বরের নির্দেশনায় হয়।

২। তুমি এখন একবারে উপরের দিকের ছাদে উঠেছ। তোমার আর অসীমের মাঝে এখন কোনো পার্থক্য নেই। তাই যেতে দাও।

৩। দিনের শেষভাগ তখন। এমন একটা সময় যখন যা কিছু সুন্দর ছিল তাকে বর্তমানেও সুন্দরে পরিণত করার সময়। তাই যেতে দাও।

৪। তুমি সমাধানের জন্য প্রার্থনা করেছিলে। তুমি যে এখানে এসেছ এটা ঈশ্বরের সাড়া দেওয়া। যেতে দাও, এবং দেখ তারারা ফুটে উঠেছে ভেতরে এবং বাইরে।

৫। সমস্ত হৃদয় দিয়ে করুণার জন্য প্রার্থনা কর এবং যেতে দাও।

৬। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দাও নিজেকে ক্ষমা কর এবং যেতে দাও।

৭। তোমার উদ্দেশ্য হোক নিরর্থক ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া তাই যেতে দাও।

৮। দেখ কীভাবে দিনের উত্তাপ রাতের শীতলতায় বদলে যায়।

৯। যখন কোনো সম্পর্কের কর্ম সম্পাদিত হয়ে যায় তখন কেবল ভালোবাসাই থেকে যায়। এটাই নিরাপদ তাই যেতে দাও।

www.pathagar.org

১০। যখন তোমার অতীত তোমার জীবনে অতিবাহিত হয়ে যায় তখন যেতে দাও। তারপর নিচে নেমে আস এবং তোমার জীবনের বাকি অংশ আবার শুরু কর। প্রচণ্ড আনন্দের সাথে।

প্রথম কয়েক মিনিট আমি হাসি থামাতে পারিনি। আমি পুরো উপত্যকার উপরের অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম, আমগাছের ছাতার ওপর দিয়ে, বাতাস আমার চুলগুলোকে পতাকার মতো উড়াচ্ছিল। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল আর আমি পেছনে শুয়ে পড়ে তারাগুলোর ফুটে ওঠা দেখছিলাম। আমি ছোট একটা সংস্কৃত প্রার্থনা গুণগুণ করছিলাম, যখনই একটা করে নতুন তারা ফুটে উঠছিল তখনই আমি সেই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করছিলাম। যেন তারাগুলোকে ডেকে বাইরে আনছি। কিন্তু তারপর সেগুলো এতো দ্রুত ফুটে উঠছিল যে আমি সামলে উঠতে পারছিলাম না। দ্রুত আকাশটা ঝলমলে তারার একটা প্রদর্শনি হয়ে উঠেছিল। তখন আমার এবং ঈশ্বরের মাঝে যা ছিল তা হলো শূন্যতা।

তারপর আমি চোখ বুজে বলেছিলাম,

প্রিয় ঈশ্বর আমাকে সব কিছু দেখাও আর সবকিছু বোঝাও। আমি ক্ষমা আর আত্ম সমর্পণ সম্পর্কে জানতে চাই।

আমি বহুদিন ধরে যা চাচ্ছিলাম আসলে তা হলো আমার বিগত স্বামীর সাথে সত্যিকারের কথোপকথন কিন্তু অবশ্যই এরকম কিছু হওয়ার নয়। যা চাচ্ছিলাম তা হলো সমাধান, একটা শান্তির সমাবর্তন, যা থেকে আমরা একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় যেতে পারি যে আমাদের বিবাহিত সম্পর্কে আসলে কি কি ঘটেছে এবং আমাদের ডিভোর্সের কদর্যতাকে একটা পারস্পরিক ক্ষমা ঘোষণা। কিন্তু মাসের পর মাস ধরে চিকিৎসা আর ধ্যান কেবল আমাদের আরও দূরে সরিয়ে দিয়ে যার যার অবস্থানে স্থায়ী করে রেখেছে। আমাদের এমন দুজন মানুষে পরিণত করেছিল যারা একে অপরকে কখনো মুক্তি দিতে পারবে না। আমি নিশ্চিত এখনো আমাদের মুক্তি প্রয়োজন। আমি সে ব্যাপারেও নিশ্চিত যে আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার নিয়ম হচ্ছে যে এক ইঞ্চিও স্বর্গীয় মহিমার কাছে যাওয়া যাবে না যে পর্যন্ত না অপবাদ দেওয়ার নেশাময় সুতা কেউ আঁকড়ে ধরে রাখে। ধূমপান ফুসফুসের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি অসন্তুষ্টি আত্মার জন্য ক্ষতিকর, এমনকি এর এক টানও নিলে সমস্যা হবে। এরকম প্রার্থনার কি কোনো মানে আছে যে, 'আজ আমাদেরকে নিত্যদিনের হিংসার অংশ দান কর।' আপনি যদি আমার সীমিত জীবনে কাউকে দোষারোপ করে যেতে চান তাহলে এই ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখবেন আর ঈশ্বরকে চুমু খেয়ে বিদায় জানাবেন। তাই আমি সে রাতে ঈশ্বরের কাছে যা চেয়েছিলাম তা হলো,

যদিও বাস্তবতা হলো আমার সাবেক স্বামীর সাথে আমার কথা বলতে পারার কোনো কারণ নেই কিন্তু এমন একটা স্তর যদি থাকত যাতে আমরা যোগাযোগ করতে পারি? এমন একটা স্তর যেখানে আমরা একে অপরকে ক্ষমা করতে পারি?

আমি শুয়ে ছিলাম পৃথিবীর অনেক উচ্চতায় এবং আমি ছিলাম একদম একা। জানি না, কি করতে হবে তা জানার আগে কত মিনিট আর কত ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল করেছিলাম আমি কেবল একটা জিনিসই ভেবে যাচ্ছিলাম আর

www.pathagar.org

তা হলো আমার স্বামীর সাথে কথোপকথন। মনে মনে বলেছিলাম, তাহলে তার সাথে কথা বলি। এই মুহূর্তেই বলি। আমিতো ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ভাবছিলাম কত মানুষ ক্ষমা না করে ক্ষমা না পেয়ে মাটির নিচে চলে যায়। ভাবছিলাম কত মানুষের এমন সহোদর, বন্ধু অথবা বাচ্চা অথবা প্রেমিক ছিল যাদের সহানুভূতি আর কৈফিয়ত দেওয়ার আগেই তারা জীবন থেকে চলে গিয়েছে। একটা মুমূর্ষু সম্পর্ক থেকে বেঁচে ওঠা মানুষরা অসমাপ্ত কাজ কিভাবে সহ্য করতে পারে? ধ্যানের সেই স্থান থেকে আমি উত্তর খুঁজে পেয়েছিলাম– তুমি সেই কাজটা শেষ করতে পার নিজেই, তোমার ভেতরেই। এটা কেবল সম্ভব নয় এটা জরুরি।

আর তারপর নিজেকে বিস্মিত করে ধ্যানের ভেতরেই আমি একটা অদ্ভুত কাজ করেছিলাম। আমার সাবেক স্বামীকে ভারতের সেই ছাদে আমার সাথে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলাম। তাকে বলেছিলাম,

সে কি এই বিদায়ী অনুষ্ঠানে আমার সাথে দেখা করতে আগ্রহী।

তারপর অপেক্ষা করছিলাম যতক্ষণ না তার আগমন অনুভব করি। এবং সে এসেছিল তার আগমন ছিল একেবারে বাস্তব। আমি বাস্তবিক ভাবেই তার ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম।

আমি বলেছিলাম,

কি খবর প্রিয়।

আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু দ্রুত বুঝতে পেরেছিলাম আমার কাঁদার দরকার নেই। কান্না একটা শারীরিক কাজ। আর সেদিন ভারতের রাতে সেই সন্ধ্যায় যখন দুই আত্মা মিলিত হয়েছিল সেখানে শরীরের কোনো দরকার ছিল না। যে দুজন ব্যক্তির উঁচু ছাদে কথা বলার প্রয়োজন তারা তখন আর মানুষ নয়। তাদের কথা বলারও প্রয়োজন ছিল না। তারা বিগত স্বামী-স্ত্রীও নয়, না তারা মধ্য পশ্চিমের জেদি উচ্চ শ্রেণির নিউইয়র্কবাসী, না তারা একজন চল্লিশের পুরুষ আর ত্রিশের নারী, তারা সেই ছোট মনের মানুষ নয় যারা দিনের পর দিন তাদের যৌনতা, টাকা আর আসবাব নিয়ে লড়ে গেছে– এগুলো প্রাসঙ্গিক নয়। এই স্তরের সম্মিলনের কারণ হচ্ছে তারা কেবল দুটি ঠাণ্ডা নীল আত্মা। যারা কিনা সব বুঝে গেছে। তাদের শরীর বাতিরেকে, তাদের অতীত সম্পর্কের জটিল ইতিহাস ব্যতিরেকে, তারা এখানে একত্রিত হয়েছে অসীম প্রজ্ঞায়। আমি দেখছিলাম সেই নীল ঠাণ্ডা আত্মা দুটো একে অপরের চারপাশে ঘূর্ণির মতো ঘুরে, একত্রিত হয়ে, আবার বিভক্ত হয়ে নিজেদের মিল ও সাদৃশ্য নির্দেশ করছিল। তারা সব জানতো এবং তারা অনেক আগে থেকেই সব জানতো এবং তারা সবসময় সব কিছু জানবে। তাদের একে অপরকে ক্ষমা করার কিছু নেই। তারা ক্ষমা করেই জন্ম নিয়েছে।

এই সুন্দর প্রত্যাবর্তন আমাকে যা শিখিয়েছিল তা হলো, 'এ থেকে দূরে থাক লিজ। এই সম্পর্কে তোমার অংশগ্রহণ শেষ। আসো এ থেকে আমরা অন্য কিছু শুরু করি। তুমি তোমার জীবনে এগিয়ে যাও।'

অনেক পরে আমি আমার চোখ খুলে বুঝেছিলাম সব শেষ। শুধু আমার বিয়ে বা আমার বিবাহবিচ্ছেদই নয়। একে ঘিরে আমার যত বিবর্ণ ফাঁপা দুঃখবোধ ছিল সব

www.pathagar.org

শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি অনুভব করছিলাম আমি মুক্ত। পরিষ্কার করে নেই– এর মানে এই নয় যে আমার বিগত স্বামীর কথা আমার আর মনে পড়বে না বা তাকে ঘিরে কোনো আবেগ ঘুরপাক খাবে না। এটা ছিল এমন যে, সেই ছাদের আনুষ্ঠানিকতা আমাকে অবশেষে একটা জায়গা দিয়েছিল যেখানে ভাবনা আর অনুভূতিগুলোর জন্য একটা বাড়ি বানাতে পারি। আর যখনই তারা জেগে উঠবে তারা সেখানেই থাকবে। জানি তারা সবসময়ই জেগে উঠবে কিন্তু যখনই তারা ঝামেলা করা শুরু করবে আমি তাদের সেখানে পাঠিয়ে দেব। সেই ছাদের স্মৃতিতে। সেই দুই আত্মার ভালোবাসার স্থানে যেখানে তারা একে অপরকে জেনেছিল। সব কিছু বুঝেছিল।

এই কারণেই আনুষ্ঠানিকতাটা ছিল। আমরা আত্মিক অনুষ্ঠান করি যাতে আমাদের বেশিরভাগ আনন্দের জটিল ভাবনা কিংবা শোকের জন্য একটা নিরাপদ আরামদায়ক জায়গা খুঁজে নিতে পারি। যাতে আজীবন সেই অনুভূতিগুলো আমাদের টেনে নিতে না হয় এবং তার ভারে ঝুঁকে পড়তে না হয়। আমাদের সবার নিরাপত্তার জন্য এমন পদ্ধতির প্রয়োজন আছে এবং আমি বিশ্বাস করি যদি আপনার সংস্কৃতিতে এমন নিয়ম বা পদ্ধতি না থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার পীড়াদায়ক আবেগকে সংযত করতে একজন সীসা ব্যবসায়ী আর কবির সহযোগিতা নিয়ে নিজের পদ্ধতি নিজেই আবিষ্কার করতে পারেন। আপনি যদি আপনার নিজের তৈরি অনুষ্ঠানে নিজেই প্রাণ আনতে পারেন, তাতে ঈশ্বর তার মহিমা ঢেলে দেবেন। আর এই জন্য আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন।

তাই আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমার গুরুর সেই ছাদে নিজের হাতের ওপর দাঁড়িয়ে আমার মুক্তির উচ্ছ্বাস উদযাপন করছিলাম। নিজের শক্তি ও ভারসাম্য অনুভব করছিলাম। আমার পায়ের পাতায় রাতের মৃদু বাতাস বয়ে যাওয়া অনুভব করছিলাম। এরকম নিজের হাতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একজন অশরীরী নীল আত্মার জন্য সম্ভব নয় কিন্তু একজন মানুষের জন্য সম্ভব। আমাদের হাত আছে আমরা চাইলে তার ওপর দাঁড়াতে পারি। এটা আমাদের একটা সুবিধা। এটা মরণশীল জীবনের একটা আনন্দ এবং এ কারণে ঈশ্বরের আমাদের প্রয়োজন। কেননা আমাদের হাত দিয়ে কোনো কিছু অনুভব করাতে ঈশ্বর ভালোবাসেন।

৬১

টেক্সাসের রিচার্ড সেদিন অস্টিন চলে যাচ্ছিল। আমি তার সাথে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিলাম। আমরা দুজনই খুব দুঃখী ছিলাম। রিচার্ড ভেতরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা অনেকক্ষণ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল,

আমি যখন লিজ গিলবার্টকে ক্ষেপাতে পারব না তখন আমি কি করব?

www.pathagar.org

তারপর বলেছিল,

আশ্রমে তোমার খুব ভাল অভিজ্ঞতা হয়েছে তাই না। কয়েক মাস আগে থেকে তোমাকে এখন একদম অন্যরকম দেখায়, মনে হয় তুমি যে দুঃখ বয়ে বেড়াচ্ছিলে তা থেকে মুক্তি পেয়েছ।

আসলেই ইদানীং নিজেকে খুব সুখি মনে হয় রিচার্ড।

ঠিক আছে কিন্তু মনে রেখো যখন এখান থেকে বের হবে তখন কিন্তু দরজায় সেই দুঃখগুলো অপেক্ষা করে থাকবে। যাওয়ার সময় তুমি আবার সেগুলো তুলে নিয়ে যাবে না তো?

আমি সেগুলো আর তুলে নেব না।

ভাল মেয়ে।

তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছ। তোমাকে আমার পশমওয়ালা হাতের ভাঙা নখওয়ালা পায়ের ফেরেশতা মনে হয়।

হ্যাঁ ভিয়েতনামের পর আমার পায়ের নখের কোনো উন্নতি হয়নি। কষ্টের ব্যাপার।

এর চেয়েও খারাপ কিছু হতে পারত।

তা ঠিক অনেক মানুষের অবস্থা এর চেয়ে খারাপই হয়েছে। আমার তো তাও পা জোড়া রক্ষা পেয়েছে। না আমি এ জীবনটা অনেক আরামের পেয়েছি, বাচ্চা। যেমন তুমিও পেয়েছ এটা কখনো ভুলো না। পরের জন্মে তুমি হয়ত রাস্তার পারের ইট ভাঙা সেই মহিলার জীবন পাবে, জীবনটা মজার নাও হতে পারে। তাই এখন যা পেয়েছ তা মেনে নাও। ঠিক আছে? কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে শেখো, তুমি অনেক দিন বাঁচবে। এবং মুদি দোকান একটা উপকার করবে? জীবনে এগিয়ে যাও। যাবে না?

হুম।

আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো। ভালোবাসার জন্য নতুন কাউকে খুঁজে নিও। সেরে ওঠার জন্য সময় নাও কিন্তু নিজের হৃদয় কারো সাথে ভাগ করে নিতে ভুলো না। তোমার জীবনটাকে ডেভিড আর তোমার বিগত স্বামীর স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে রেখ না।

না আমি তা করব না।

এবং হঠাৎ করেই আমি বুঝতে পারছিলাম এটা সত্য আমি তা করব না। আমার পুরাতন দুঃখ হারানো প্রেম এবং অতীতের ভুল সব আমার চোখের সামনে শুকিয়ে যাচ্ছিল। সময়ের সারিয়ে ওঠানোর ক্ষমতা, ধৈর্য এবং ঈশ্বরের মহিমায় সব ক্ষয়ে যাচ্ছিল।

তারপর রিচার্ড আবার কথা বলে উঠেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে বাস্তব কথাটা বলেছিল,

যাই হোক একটা কথার কথা আছে না, কারো দেওয়া কষ্ট থেকে সেরে উঠতে অন্য কারো ছায়াতলেই থাকতে হবে।

আমি হেসে উঠেছিলাম,

তাই হবে রিচার্ড। তুমি এখন নিশ্চিন্তে টেক্সাস ফিরে যেতে পার।

www.pathagar.org

সে ভারতীয় জনশূন্য এয়ারপোর্টের পার্কিং জোনে চোখ বুলিয়ে বলেছিল,
সেটাই ভালো। কেন না এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে ভাল কিছু দেখছি না।

৬২

রিচার্ডকে এয়ারপোর্টে বিদায় জানিয়ে ফেরার পথে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম অনেক বক বক করেছি আর না। সত্য বলতে আমার সারা জীবনে আমি প্রচুর কথা বলেছি। এবং আশ্রমে থাকাকালীন সময়ে আসলেই প্রচুর বকবক করেছি আমি। সেখানে আমার সময় আর মাত্র দুই মাস। সেই দুই মাস শুধু কথা বলে আর আড্ডা দিয়ে আত্মিক অনুশীলনের এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করার কোনো মানে ছিল না। আর সেই অনুশীলন যখন হচ্ছিল পৃথিবীর অপর প্রান্তে এসে তেমন শুদ্ধ একটা ঐশ্বরিক জায়গায়। সেখানে আমি আমার চারপাশে ককটেল ফাটানোর মতো আড্ডার ব্যবস্থা করে গেছি বরাবর। শুধু রিচার্ডের সাথেই আমি ক্রমাগত বকবক করিনি, মজা করিনি আমি সবসময় কারো না কারো সাথে ঝোলাঝুলি করেই গেছি। কিছু মনে করবেন না আমি আশ্রমেও নিজেকে আবিষ্কার করেছি পরিচিতদের সাথে সময় কাটানোর জন্য সময় নির্ধারণ করছি, কিংবা কাউকে বলছি, 'আমি দুঃখিত আমি দুপুরের খাবারের সময় তোমার সাথে আড্ডা দিতে পারিনি কেন না আমি সাক্ষীকে কথা দিয়েছিলাম আমি তার সাথে খাব হয়ত সামনের মঙ্গলবার আবার আমরা একসাথে বসব।'

এই জীবনভর চলে আসছে। আমি ঠিক এমনই। কিন্তু দেরিতে হলেও আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম যে এটা একটা স্বর্গীয় দায়িত্ব। নিঃসঙ্গতা আর নীরবতা আত্মিক অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিশ্বব্যাপী পরিচিত এবং তা পালন করার খুব ভাল কারণ ছিল সেখানে। মুখের জবানের নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলন করা মানে মুখ দিয়ে শক্তি নির্গত হওয়ায় বাধা দেওয়া। নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। এবং শব্দ, শব্দ, শব্দের বদলে পৃথিবীকে নির্মলতা, শান্তি এবং মঙ্গলালোকে পূর্ণ করা। আমার গুরুর শিক্ষক স্বামীজী এই আশ্রমে নীরবতার ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন, ঐশ্বরিক অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তিনি সেটা করতে বাধ্য করতেন। তিনি বলতেন নীরবতাই একটা সত্যিকারের ধর্ম। এটা খুবই হাস্যকর একটা ব্যাপার যে যেখানে নীরবতার রাজত্ব করার কথা সেখানে আমি কত কথা বলেছিলাম!

তাই আমি আর একটা সামাজিক প্রাণী হতে চাচ্ছিলাম না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আর হৈচৈ, আড্ডা, কৌতুক নয়। আর কোনো আলোর কথা বা আড্ডার ঝড় নয়। মৌখিক প্রশংসার মুদ্রায় আর কোনো নাচ নয়। বদলানোর সময় এসে গেছে। সেই রিচার্ডও এখন চলে গেছে। আমার সেখানে অবস্থানের পুরোটা সময় আমি পরিপূর্ণ নীরবতায় ভরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেটা কঠিন হলেও

www.pathagar.org

অসম্ভব ছিল না। কেন না নীরবতাকে সেখানে সার্বজনীনভাবে সম্মান জানানো হয়। সেখানকার পুরো সমাজটাই আত্মিক কাজের নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন হিসেবে সেই কাজে সম্মতি জানায়। এমনকি বইয়ের দোকানে তারা একধরনের ব্যাজ বিক্রি করে যাতে লেখা থাকে, 'আমি মৌন ব্রতে আছি।'

আমি এমন চারটা ছোট ছোট ব্যাজ কিনতে যাচ্ছিলাম।

আশ্রমে ফিরে যেতে যেতে সেই কল্পনায় ডুবে গিয়েছিলাম আমি কতটা নীরব হতে যাচ্ছি। আমি বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার মতো চুপচাপ হয়ে যাচ্ছি। আমি নিজেকে নিশ্চুপ মেয়ে হিসেবে পরিচিত হওয়ার কল্পনা করছিলাম। আমি কেবল আশ্রমের নিত্যদিনের কর্মসূচী তুলে নেওয়ার, একা একা খাদ্য গ্রহণের, সারাদিন ধ্যানে নীরব হয়ে থাকার, মন্দিরের মেঝে পরিষ্কার করার, টু শব্দ না করে, অন্যের সাথে আমার যোগাযোগ কেবল একটা সুন্দর হাসি দিয়ে করার কথা ভাবছিলাম। লোকজন আমার সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞেস করবে, 'ঐ নীরব মেয়েটা কে যে সবসময় মন্দিরের পেছনের অংশে হাঁটু গেড়ে চুপচাপ পরিষ্কার করে যায়? সে কখনো কথা বলে না, সে একটা রহস্যময়ী। আমি কল্পনাও করতে পারি না তার কণ্ঠস্বর কেমন। এমনকি বাগানে তার পেছন থেকে আসার শব্দও পাওয়া যায় না। বাতাসের মতোই নীরব তার চলাফেরা। নিশ্চয়ই সে সারাক্ষণ ঈশ্বরের জন্য ধ্যানরত থাকে। আমি তার মতো এমন নীরব মেয়ে আর একটাও দেখিনি।'

৬৩

এর পরদিন সকালে আমি হাঁটু গেড়ে বসে আবার মন্দিরের মেঝে পরিষ্কার করছিলাম আর নিজের ভেতর নীরবতার আলোকচ্ছটা অনুভব করছিলাম। ঠিক তখন একটা ভারতীয় ছেলে এসে আমার কাছে একটা বার্তা নিয়ে এসেছিল। আমাকে তাই তাৎক্ষণিকভাবে সেবা অফিসে হাজির হতে হয়েছিল। আশ্রমের স্বার্থহীন কাজের সংস্কৃত সংস্করণ হচ্ছে 'সেবা,' যেমন– মন্দিরের মেঝে ঘঁষা মাজা। সেবা অফিস আশ্রমের সকল কাজের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। তাই আমি সেখানে কৌতূহল নিয়ে জানতে যাই যে আমাকে কেন ডাকা হয়েছে। এবং সেই দারুণ মহিলাটা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল,

আপনি কি এলিজাবেথ গিলবার্ট?

আমি তার দিকে চেয়ে সুন্দর করে হেসে নীরবে মাথা ঝাঁকালাম। তারপর সে আমাকে বলেছিল আমার কার্যপদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। তাও ব্যবস্থাপনার বিশেষ অনুরোধে। আমি আর মন্দির ঘঁষামাজার দলের অংশ নই। আশ্রমের অন্য কাজের জন্য তারা আমাকে বাছাই করেছে এবং আমার নতুন কাজের পদবি ছিল 'চাবি রক্ষক।'

www.pathagar.org

৬৪

সেটাও অবশ্যই স্বামীজির আরও একটা কৌতুক ছিল। যেন তিনি বলছিলেন, 'তুমি মন্দিরের পেছনের দিকে কাজ করা একজন চুপচাপ মেয়ে হতে চাও? উ ম ম কিন্তু অনুমান করতো দেখি কি হতে যাচ্ছে?'

আশ্রমে সবসময় এমনই হয়। আপনার কি করা প্রয়োজন বা আপনি কি হতে চান এ নিয়ে আপনি যত বড় সিদ্ধান্তই নিন না কেন, এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে আপনার নিজের কাছেই খোলাসা হয়ে যাবে আপনি নিজের সম্পর্কে কত কম জানেন। আমি জানি জীবিত অবস্থায় স্বামীজি এ কথাটা কতবার বলেছেন কিংবা আমি জানি না মৃত্যু পর্যন্ত কতবার আমার গুরু কথাটার পুনরাবৃত্তি করবেন কিন্তু আমি মনে হয় তাদের জোরালোভাবে বলা এই সত্যটা এখনো পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি।

'তুমি যেমন তাতেই ঈশ্বরের বাস।'

তুমি যেমন।

যোগ ধ্যানে যতটা একটাও পবিত্র সত্য আছে তবে এই লাইনটাই তা ধারণ করে আছে। স্রষ্টা আপনার ভেতর বিরাজ করেন কিন্তু আপনি যেমন ঠিক তেমনটাতেই। ঈশ্বর দেখতে চান না যে আপনি অন্য সাধু সন্ন্যাসীদের মতো আচরণ করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং আপনাকে ঐশ্বরিক ব্যক্তি না হয়ে ছিটগ্রস্ত রোগীর মতো দেখাক। আমাদের সবারই এরকম ধারণা আছে যে শুদ্ধ হতে হলে আমাদের চরিত্রের বিরাট, নাটকীয় পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের স্বাতন্ত্রের বলি দিতে হবে। একে পূর্বের জ্ঞানীরা বলে ভুল-চিন্তা। স্বামীজী বলতেন, 'প্রতিদিনের আত্মত্যাগে আত্মত্যাগ করার কারণ খুঁজে মন, এটা তার প্রবৃত্তি হয়ে যায়,' যাতে বিষণ্নতার জন্ম হয়, শান্তি পাওয়া যায় না। সে ক্রমাগত সন্ন্যাস আর আত্মত্যাগের শিক্ষা দিয়ে গেছেন কিন্তু তা নিজস্ব প্রয়োজনেই– এমন নয় যে সেটাই একজনের দরকার। ঈশ্বরকে জানতে হলে আপনাকে কেবল একটা বিষয় আত্মত্যাগ করতে হবে আর তা হলো ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভক্তির অনুভূতি। অন্যথা আপনি যেমন তেমনই থাকবেন আপনার সহজাত চরিত্রে।

ভাবতাম আচ্ছা তাহলে আমার সহজাত চরিত্রটা কি? আমি সেই আশ্রমে শিখতে ভালোবাসি কিন্তু আমার ঐশ্বরিক উচ্চস্থানে যাওয়ার জন্য নিজের চরিত্র থেকে নীরবে পিছলে শুভ্র স্বর্গীয় হাসির যে ব্যক্তি হতে চেয়েছিলাম সে কে? হয়ত আমি তাকে টেলিভিশনে দেখেছি। দুঃখজনক হলেও সত্যি আমি সেরকম কখনোই হতে পারব না। আমি সবসময় এমন ভৌতিক কোমল হৃদয়ের স্বপ্ন দেখেছি। সবসময় চুপচাপ শান্ত মেয়ে হতে চেয়েছি। হয়ত হুবহু তাই হতে চেয়েছি এই জন্য যে আমি তা নই। এই একই কারণে আমার কাছে মনে হয় ঘন-কালো চুল খুব সুন্দর, অবিকল তেমনটা

www.pathagar.org

কারণ আমার তা নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা নিয়ে শান্তিতে থাকা উচিত। যদি ঈশ্বর মনে করতেন আমাকে একটা ঘন-কালো চুলের লাজুক মেয়ে হিসেবে পৃথিবীতে পাঠানো উচিত তবে তিনি তাই করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। নিজেকে যেমন ভাবেই গড়া হয়েছে তা মেনে নেওয়া এবং নিজেকে তাতে সঁপে দেওয়াই মঙ্গল।

প্রাচীন পিথাগোরিয়ান দার্শনিক সেক্সটাস যেমন বলেছিলেন, 'বুদ্ধিমান মানুষরা সব সময় নিজের মতো হয়।'

এর মানে এই নয় যে আমি কখনো ধার্মিক হতে পারব না। এর মানে এই নয় যে আমি ঈশ্বরের প্রেমে গড়াগড়ি খেতে পারব না। এর মানে এই নয় যে আমি মানবতার সেবা করত পারব না। এর মানে এই নয় যে আমি মানুষ হিসেবে নিজেকে উন্নত করতে পারব না। আমার গুণগুলোর উৎকর্ষ সাধন করতে পারব না বা খুঁতগুলোকে কমাতে পারব না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমি কখনোই একজন ওয়াল ফ্লাওয়ার হতে পারব না কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমি আমার কথা বলার অভ্যাসে গুরুত্বের সাথে নজর দিতে পারব না, ভালোর জন্য কিছু প্রবর্তন করতে পারব না, নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করতে পারব না। হ্যাঁ আমি কথা বলতে পছন্দ করি কিন্তু সম্ভবত আমি আর কাউকে অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকব, সম্ভবত আমাকে আর সস্তা বিষয়গুলোতে হাসতে হবে না, হয়ত আমার নিজের ব্যাপারে ক্রমাগত কথা বলার প্রয়োজন হবে না। কিংবা একটা নিজস্ব ধারণা হচ্ছে, অন্য কেউ কথা বলার সময় তাতে হস্তক্ষেপ করা আমি বন্ধ করতে পারব। যত সৃষ্টিশীল ভাবেই আমি আমার হস্তক্ষেপ করি না কেন কোনো লাভ নেই যদি না আমি এটা এভাবেই ভাবতে থাকি যে, 'তুমি যা বল তার চেয়ে আমি যা বলি তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' কিংবা আমি ব্যাপারটা এভাবে দেখব না যে, 'আমি বিশ্বাস করি আমি তোমার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

এসব পরিবর্তন হয়ত উপকারে আসত। কিন্তু তারপরও এতসব করেও আমি একজন শান্ত শিষ্ট চুপচাপ মেয়ে হিসেবে পরিচিতি পেতাম না। সেটা যত সুন্দর একটা দৃশ্যই হতো না কেন বা আমি যত কঠোর চেষ্টাই করতাম না কেন কোনো লাভ নেই। কারণ সত্যি বলতে আমরা কার সাথে (স্বামীজী) সেখানে কাজ করছিলাম তা বুঝতে হবে। সেবা সেন্টারের মহিলাটা আমাকে যখন নতুন চাকরি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'এই অবস্থানের জন্য আমাদের আলাদা পদবী আছে। আমরা একে বলি 'ছোট মোহনভোগ' কেন না যাকে এই কাজটা করতে হয় তাকে খুব সামাজিক ও চটপটে হতে হয় এবং সারাদিন হাসতে হয়।

কেবল করমর্দনের জন্য হাত এগিয়ে দিয়ে নিজের পুরোনো ভ্রান্তি এবং ঘোষণাকে একটা নীরব বিদায় জানিয়ে এটা বলা ছাড়া আমি কি বলতে পারতাম।

'ম্যাডাম, আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

www.pathagar.org

৬৫

বসন্তে আশ্রমে একটা ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ঠিকঠাক হয়েছিল, আমি সেটারই আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করব। তখন প্রতিটা অনুষ্ঠানে কম করে হলেও একশো জন ভিনদেশী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে সাত থেকে দশ দিনের জন্য আসবে। গভীর ভাবে ধ্যান করতে। আমার কাজ ছিল সেখানে থাকাকালীন অবস্থায় তাদের সেবা করা। সেখানে বেশির ভাগ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা মৌন অবস্থায় থাকবে। ভক্তির অনুশীলন হিসেবে অনেকের জন্য এটা নতুন একটা কাজ এবং একমাত্র আমিই ছিলাম এমন একজন যে কোনো সমস্যা দেখলে কথা বলতে পারবে।

ঠিক তাই। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে আমার কাজের শর্তেই আমাকে বাকপটু হতে হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সমস্যা শুনতে হবে এবং তার সমাধান দিতে চেষ্টা করতে হবে। হয়ত তাদের রুমমেট বদলাতে হবে কিংবা ভারত সম্পর্কিত কোনো হজমের গোলযোগের কারণে তাদের চিকিৎসকের সাথে কথা বলতে হবে– তখন আমি তার সমাধান করার চেষ্টা করব। আমার সবার নাম জানতে হবে এবং তারা কোথা থেকে এসেছে তাও জানতে হবে। আমি একটা বিজ্ঞপ্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াব, কিছু অভিযোগ নেব এবং দেখাশোনা করব।

শুনতে পেয়েছিলাম, হ্যাঁ পদটাতে আমাকে হুইসেলও রাখতে হবে।

অনুষ্ঠান শুরু হতেই বোঝা গিয়েছিল আমি এই পদের জন্য কতটা যোগ্য। আমি আমার নামের ব্যাজ নিয়ে স্বাগতম জানানোর টেবিলে বসে ছিলাম। মানুষগুলো ত্রিশটা আলাদা আলাদা দেশ থেকে এসেছিল। কেউ সেখানে পুরাতন কিন্তু কেউ কেউ ছিল একদম নতুন। সেখানে সকাল দশটায় প্রায় ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রা আর অনেকেই সারা রাত ধরে প্লেনে চড়ে এসেছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল গাড়ির পেছনের বাক্স থেকে তারা এইমাত্র জেগে উঠেছে। যেন তারা বুঝতেই পারছিল না তারা সেখানে কিভাবে গেল এবং কি করছিল? যেন তারা আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার লোভে কখনো এখানে আত্মিক আচারে আসতে চেয়েছিল কিন্তু সেটা এতই আগেকার কথা যে তারা তখন তা মনে করতে পারছে না।

হয়ত সেই সময়ের মধ্যে কুয়ালালামপুরে তাদের লাগেজ হারিয়ে গিয়েছিল। তারা তৃষ্ণার্ত কিন্তু এও জানত না তারা পানি পান করতে পারবে কি না। তারা ক্ষুধার্ত কিন্তু জানত না দুপুরের খাবার সেখানে কখন দেওয়া হয় কিংবা কোথায় জলখাবারের দোকান পাওয়া যাবে। তাদের জামা কাপড়ের নির্বাচনও ভুল ছিল। অমন গরমে সিল্কের কাপড় আর পায়ে ভারী বুট জুতা! তারা সেটাও জানত না সেখানে এমন কেউ কি আছে যে রাশিয়ান জানে।

আমি কিছুটা রাশিয়ান ভাষা জানি।

আমি তাদের সাহায্য করতে পারছিলাম। আমি সাহায্য করার জন্য খুব উপযোগী। সারাজীবন ধরে আমার ভেতরে যে শৃঙ্গ গজিয়ে উঠেছে তা আমাকে

www.pathagar.org

শিখিয়েছে মানুষের অনুভূতি পড়তে পারা। আমি আমার সকল অনুমানকে খুব স্পর্শকাতর বড় শিশুর মতো লালন করেছি, আমার শ্রবণপ্রখরতা তৈরী হয়েছে বার রক্ষক হিসেবে এবং অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক হিসেবে কাজ করে, যত্ন নেওয়ার দক্ষতা আমি অর্জন করেছি বছরের পর বছর কারো স্ত্রী, কারো প্রেমিকা হয়ে থেকে। আমি এসব কিছু জড়ো করেছিলাম যাতে এই কঠিন কাজ করতে আসা ভাল মানুষগুলোকে সাহায্য করতে পারি। আমি তাঁদের মেক্সিকো থেকে, ফিলিপাইন থেকে, আফ্রিকা থেকে, ডেনমার্ক থেকে ডেট্রয়েট থেকে আসতে দেখেছিলাম। ক্লোজ এনকাউন্টার অফ দ্য থার্ড কাইন্ড ছবির একটা দৃশ্যে বুঝতে পারেনি বলে রিচার্ড ড্রেফুসসহ অন্য অন্বেষকদের যেভাবে হাইমিংয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এবং স্পেস শিপের সামনে ঢুকানো হচ্ছিল, দৃশ্যটা ঠিক তেমন ছিল। আমি তাঁদের সাহসে আমার বুকটা ভরিয়ে দিয়েছিলাম। সেই মানুষগুলো তাঁদের পরিবার ছেড়ে অনেক দূরে মৌন আচারে এসেছিল। তাও একেবারে অচেনা লোকে বোঝাই ভারতে। সবাই তাদের জীবনে এরকম কাজ করতে পারে না।

আমি সেই সকল মানুষকে ভালোবাসতাম। এমনকি ধ্যানে বসে থাকতে থাকতে মানুষের পশ্চাত ভাগে যে ব্যথা হয় তাও অনুভব করতে পারতাম। আমি তাদের মস্তিষ্কের ভেতর সেই ভয়কে টের পেতাম সামনের ধ্যানের দিনগুলোতে তারা কিসের সম্মুখীন হতে যাচ্ছিল। আমার সেই ভারতীয় লোককে ভাল লাগত যে আমার কাছে নিপীড়িত বেশে আসত, এসে জানাত তার ঘরে একটা চার ইঞ্চি মাপের ভারতীয় দেব গণেশের মূর্তি আছে যার একটা পা হারিয়ে গেছে। সে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল। সেটা নাকি খুবই খারাপ লক্ষণ। সে চেয়েছিল দুপুরের খাবারের সময় একজন ব্রাহ্মণ পূজারী যাতে ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে মূর্তিটা সরিয়ে নিয়ে যায়। সে খুব ভয়ে ছিল। আমি তাকে শান্ত করেছিলাম, তার রাগের কথা শুনেছিলাম তারপর সেই ভারতীয় গেছো মেয়ে তুলসিকে পাঠিয়েছিলাম সে খেতে গেলে যাতে মূর্তিটা সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে। এর পরের দিন আমি একটা ছোট বার্তা পাঠিয়েছিলাম, যে আমি আশা করছি সে এখন আগের চেয়ে ভাল আছে কেন না মূর্তিটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং যে কোনো প্রকার সমস্যার কথা সে আমাকে জানাতে পারে। পুরস্কার স্বরূপ সে আমাকে মুক্তির একটা হাসি উপহার দিয়েছিল। যে ফ্রেঞ্চ মহিলাটা তার গমের এলার্জি নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে সেও ভীত ছিল। যে আর্জেন্টাইন লোকটা যোগ অনুশীলনকারী পুরো দলের সাথে একটা পরামর্শ করতে চাইছিল যে কিভাবে বসলে তার হাঁটুতে ব্যথা করবে না সেও ছিল ভীত। তারা সবাই ভয় পাচ্ছিল। তারা তাদের নিজের আত্মা আর মনের নিজস্ব নীরবতার ভেতর যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একজন অভিজ্ঞ ধ্যানীর জন্যও এই রাজ্য সমান অপরিচিত। সেখানে কত কি হতে পারে।

সেই আচারের সময় তারা একজন দারুণ মহিলার তত্ত্বাবধানে ছিল। পঞ্চাশ বছরের একজন সাধিকা। যার প্রতিটা দৃষ্টি আর শব্দ সমবেদনায় পূর্ণ। কিন্তু এতো আন্তরিক সাধিকা থাকতেও তারা তখনো ভীত ছিল কেন না তারা যেখানে যাবে তাদের সাথে এই মহিলা কেন কেউই যেতে পারবে না।

www.pathagar.org

আচার অনুষ্ঠান যখন শুরু হয়েছিল। আমার এক বন্ধুর চিঠি আসে যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে একজন ওয়াইল্ড লাইফ সিনেমা নির্মাতা। ভ্রমণকারী সংঘের সম্মাননায় সে নিউইয়র্কের ওয়ান্ডর্ফ অ্যাস্টোরিয়ায় একটা বর্ণাঢ্য রাতের খাবারের আয়োজনে আমন্ত্রিত ছিল। সে বলেছিল এমন সাহসী মানুষদের সাথে উপস্থিত থাকতে পারাটা একটা দারুণ ব্যাপার। এদের সবাই পৃথিবী ঘুরে অনেক বিপদসংকুল দূরবর্তী এলাকা, পর্বতমালা, ক্যানিয়ন, নদী, সাগরের গভীরে, বরফাচ্ছাদিত ভূমি এবং আগ্নেয়গিরি চষে বেড়িয়েছে। সে বলেছিল এদের মধ্যে অনেকেই নিজের কিছুটা হারিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে শার্কের কামড় এবং অন্যান্য বিপদে পায়ের পাতা, নাক, হাতের আঙুল এসব হারিয়েছে।

সে লিখেছিল,

'একই সাথে একই জায়গায় এতগুলো সাহসী মানুষ তুমি কখনো দেখনি।'

কিন্তু আমি মনে মনে বলেছিলাম, তুমিই এখনো কিছুই দেখনি মাইক।

৬৬

অনুষ্ঠানের বিষয় আর উদ্দেশ্য ছিল তূরীয় স্তর- মানব চেতনার অধরা চতুর্থ স্তর। যোগীদের মতে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে তিনটা স্তরেই ঘুরপাক খায় আর তা হলো হাঁটা, স্বপ্ন আর স্বপ্নহীন গভীর ঘুম। কিন্তু একটা চতুর্থ মাত্রাও আছে। এই চতুর্থ মাত্রা হচ্ছে অন্য সকল স্তরের সাক্ষী। অন্য স্তরগুলোর যুক্ত করার পরিপূর্ণ জানান। এটা হচ্ছে একটা খাঁটি চেতনা, একটা বুদ্ধিসম্পন্ন চেতনা। যেমন জেগে উঠলে স্বপ্ন সম্পর্কে ব্যক্তিকে জাগানো এই চেতনার কাজ। আপনি অজ্ঞান বা আপনি ঘুমাচ্ছেন কিন্তু কেউ একজন আপনাকে আপনার ওপর নজর রাখছে। এমনকি আপনার স্বপ্নের ওপর তার চোখ আছে- কে এই সাক্ষী? আর কে সে, যে সবসময় পেছনে দাঁড়িয়ে মনের কার্যক্রমের দিকে খেয়াল রাখে, এর ভাবনা দেখাশোনা করে? যোগীরা বলে সেটা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন। আপনি যদি সেই স্তরে নিজেকে উন্নীত করতে পারেন তাহলে আপনি সবসময় ঈশ্বরের সাথে থাকতে পারবেন। মানব চেতনার চতুর্থ স্তরেই কেবল ঈশ্বরের উপস্থিতি সবসময় জানান দেবে। যে স্তরকে তুরীয় বলে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন আপনি তুরীয় স্থানে আছেন কিনা। আপনি যদি মঙ্গলালোকে স্থির থাকেন তাহলে বুঝবেন আপনি তুরীয় স্তরে আছেন। তুরীয় স্তরে যারা থাকেন তাদের মন কখনোই দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোগে না মেজাজের উঠানামা হয় না, সময় নিয়ে দুশ্চিন্তা করে না এমনকি কোনো ক্ষতিতেও তাদের মনে আঁচড় কাটে না। প্রাচীন যোগী ধর্মগ্রন্থ উপনিষদে বর্ণিত আছে তূরীয় স্তরের যারা অধিষ্ঠিত আছেন তাদের বর্ণনা এমন, যে শুদ্ধ, পরিষ্কার, অকার্যকর, শান্ত, রুদ্ধশ্বাস, নিঃস্বার্থ, অসীম, অক্ষয়, অপলক, অন্তর্গত, অজন্মা, স্বাধীন সেই তার নিজের

www.pathagar.org

বিশালত্বে বিরাজ করে। মহান সাধকগণ, মহান গুরুগণ, মহান নবীগণ সবাই সবসময় তূরীয় স্তরে ছিলেন। আমাদের অনেকেই এই স্তরে কখনো কখনো থাকি তবে তা এতো দ্রুতগামী মুহূর্তে যে আমরা বুঝতে বা ধারণ করতে পারি না। আমরা বেশির ভাগ মানুষেরা হয়ত দুই মিনিটের জন্য এই স্তরের অভিজ্ঞতা অর্জন করি। পরিপূর্ণ মহিমার একটা অব্যক্ত এবং এলোমেলো উপলব্ধি যার সাথে বাহ্যিক পৃথিবীর কোনো যোগ নেই। ধরুন আপনি একজন সাধারণ মানুষ পার্থিব জগতের বোঝা বয়ে চলছেন এবং তারপর হঠাৎ এ কি হলো! কিছুই তো বদলায়নি, তবু আপনি স্বর্গীয় মহিমায় আন্দোলিত হচ্ছেন, উচ্ছ্বসিত হচ্ছেন, বিস্মিত হচ্ছেন, পরম সুখের বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন। সবকিছু কোনো কারণ ছাড়াই একদম সঠিক মনে হচ্ছে।

অবশ্যই আমাদের বেশির ভাগের জীবনেই এই স্তর যত দ্রুত আসে তত দ্রুতই চলে যায়। এটা এমন হয় যে আপনি এই অন্তর্গত সুখকে একটা কৌতুক হিসেবে দেখেন এবং দ্রুত বাস্তব জীবনে ফিরে যান, নিজের পুরাতন দুশ্চিন্তা এবং বাসনার হাতে বন্ধী হয়ে পড়েন আবার। শতকের পর শতক ধরে মানুষ এই যথার্থ মুহূর্তটা ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে যায়- মাদক, যৌনতা, ক্ষমতা এবং আড্রেনলিন এবং সুন্দর সুন্দর জিনিসের জড় করে- কিন্তু তা ধরে রাখতে পারেনি। আমরা সবাই টলস্টয়ের পৌরাণিক গল্পের সেই ভিক্ষুকের মতো যে কিনা নিজে সোনার পাত্রের ওপর বসে সব পথিকের কাছে ভিক্ষা করে গেছে। বুঝতেই পারিনি সৌভাগ্য ঠিক আমাদের নিচেই ছিল সবসময়। আপনার গুপ্তধন আপনার পরিপূর্ণতা আপনার মাঝেই আছে। কিন্তু তা পেতে হলে, অবশ্যই আপনার মনের ব্যস্ত আন্দোলনকে বন্ধ করতে হবে, অহংয়ের বাসনা বাদ দিতে হবে এবং হৃদয়ের নিস্তব্ধতার ভেতর ঢুকতে হবে। কুণ্ডলিনী শক্তি, মহান স্বর্গীয় শক্তি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

'সবাই এখানে এই কারণেই এসেছে।'

প্রাথমিকভাবে আমি এই বাক্যটা লিখে আমি যা বোঝাতে চেয়েছিলাম তা ছিল, এই জন্য ভারতের সেই আশ্রমের সেই অনুষ্ঠানে একশ জন মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্র হয়েছে। কিন্তু বাক্যটা দ্বারা আসলে আমি যা বোঝাতে চেয়েছি তার সাথে যোগীগণ ও দার্শনিকগণ একমত হবেন। 'এই জন্যই সবাই এখানে এসেছে।' এর নিগুঢ় অর্থ হচ্ছে, স্বর্গীয় মহিমার খোঁজই আমাদের মানব জন্মের কারণ। এ কারণেই আমরা জন্ম নিয়েছি এবং এ কারণেই পৃথিবীতে সকল ভোগান্তি, সকল দুঃখ যথার্থ লাভজনক- কেবল এই অসীম ভালোবাসা অনুভব করার সুযোগের জন্য। এবং একবার যদি আপনি এই স্বর্গীয় অনুভূতি নিজের ভেতর অনুভব করতে পারেন তাহলে কি আপনি তা ধরে রাখতে পারবেন? কারণ যদি তা পারেন... মঙ্গল।

পুরোটা অনুষ্ঠান আমি পার করি মন্দিরের পেছন দিকে বসে থেকে, আধো আলো ছায়ায় নীরবে অংশগ্রহণকারীদের পর্যবেক্ষণ করে। আমার কাজ তাদের আরাম এবং স্বস্তির দিকে খেয়াল রাখা, সতর্কভাবে খেয়াল রাখা কেউ সমস্যায় পড়ে কিনা কিংবা কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় কিনা। তারা সবাই সেই অনুষ্ঠানে নীরবতার শপথ নিয়েছিল। প্রতিদিন সমগ্র আশ্রম স্থিরতায় সিক্ত হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের নীরবতা গভীর হতে থাকা অনুভব করতে পারতাম। তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা আশ্রমের অন্যান্য সদস্যরা পা টিপে হাঁটতাম এমনকি খাবারের সময়ও নিঃশব্দে

www.pathagar.org

খেতাম। সকল আড্ডাবাজ লোকেরা এমনকি আমিও চুপচাপ তখন চারপাশে মধ্যরাতের নীরবতা। একেবারে নিঝুম নিঃশব্দের আমেজ সেখানে রাত তিনটার দিকে পাওয়া যায় যখন সবাই একদম একা থাকে। এই নীরবতার ধারাবাহিকতাই দিনের আলোতে ধরে রাখা হতো, পুরো আশ্রম জুড়ে।

সেই একশো আত্মা যে ধ্যান করছিল আমি জানতাম না তারা কি ভাবছে, কি অনুভব করছে কিন্তু আমি জানতাম তারা কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইছে। এবং আমি দেখেছিলাম আমি এই মানুষগুলোর জন্য ক্রমাগত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। অদ্ভুত লেনাদেনার মতো সেগুলো। যেমন, 'প্রিয় ঈশ্বর আমার জন্য যে মহিমা বরাদ্দ করে রেখেছেন এই চমৎকার মানুষদের তা দিয়ে দিন।' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মানুষগুলোর সাথে ধ্যান করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আমার। আমি কেবল নিজের আত্মিক অনুসন্ধানে নজর না দিয়ে তাদের ভালোমন্দের দিকে খেয়াল রাখতে চাইতাম। কিন্তু আমি খেয়াল করেছিলাম প্রতিদিন আমি তাদের সম্বলিত স্বর্গীয় উদ্দেশ্যের তরঙ্গে উন্নীত হচ্ছি। যেভাবে কিছু স্কেভেঞ্জিং পাখিকে পৃথিবী থেকে উত্থিত তাপ অনেক উঁচুতে নিয়ে যায়। ততটা উঁচুতে নিজের ডানার সাহায্যেও তারা উড়তে পারে না। তাই সম্ভবত একারণেই এটা যখন ঘটে তখন বোঝা যায় না। একদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমি মন্দিরের পেছনে বসে আমার চাবি রক্ষকের দায়িত্বপালন করা অবস্থায় আমার বুকে ব্যাজ এবং অন্যান্য সবসহ হঠাৎ পৃথিবীর দ্বার থেকে স্রষ্টার হাতের ঠিক মাঝখানে চলে গিয়েছিলাম।

৬৭

একজন পড়ুয়া এবং অন্বেষক হিসেবে অন্য কারো ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে আমি সব সময় বিষণ্ণ বোধ করি। বিশেষ করে যখন কেউ স্থান কাল অতিক্রম করে অসীমের সাথে মিলিত হওয়ার কথা বলে। গৌতম বুদ্ধ, সেন্ট তেরেসা থেকে দুর্বোধ্য সুফিগণ এবং তা থেকে আমার গুরু এমন অনেক আত্মা শতকের পর শতক ধরে এর বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছেন যাতে স্বর্গীয় সত্তার সঙ্গ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু কখনোই এসব বর্ণনায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। দেখবেন প্রায়ই এই ব্যাপারটার বর্ণনা দিতে গিয়ে অবর্ণনাতীত শব্দটার অবতরণ করা হয়। এমনকি স্বর্গীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনায় রুমির মতো বাকপটু পরিবেশনকারীও লিখেছেন, তিনি তখন এসব কিছু বাদ দিয়ে নিজেকে ঈশ্বরের আস্তিনে বেঁধে রেখেছেন। কিংবা হাফিজ যিনি বলেছেন তিনি এবং ঈশ্বর এমন অবস্থায় ছিলেন যেন দুজন মোটা মানুষ এক নৌকায়। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন– আমরা একে অপরের সাথে ধাক্কা খাচ্ছিলাম আর হাসছিলাম। এই কবিদেরও আমি পেছনে ফেলে দিয়েছি। আমি এই বিষয়ে আর পড়তে চাই না। আমি তা অনুভব করতে চাই। শ্রী রমণ মহশ্রী স্বর্গীয় সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক লম্বা বক্তৃতা

www.pathagar.org

দিতেন তারপর সম্পূর্ণ বক্তব্য এই উপদেশ দিয়ে মুড়ে দিতেন, 'এখন যাও। খুঁজে বেড়াও।'

তাই তখন আমি তা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছি না মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা বর্ণনার বাইরে। যেভাবেই হোক আমি তা বর্ণনা করার চেষ্টা করব। সে সময় আমাকে যেন অসীমের পোকায় কাটা ছিদ্র দিয়ে টেনে নেওয়া হচ্ছিল এবং সেই প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাওয়ার সময় আমি হঠাৎ পুরো পৃথিবীর কার্যক্রম বুঝে উঠেছিলাম। আমার শরীর ছেড়ে, আমার কক্ষ ছেড়ে, এই গ্রহ ছেড়ে সময়ের বুকে পা রেখে শূন্যতায় প্রবেশ করেছিলাম। একই সময়ে আমি নিজে শূন্য হয়ে শূন্যতাকেই দেখছিলাম। শূন্যতা এমন একটা যায়গা যেখানে রয়েছে অসীম শান্তি এবং প্রজ্ঞা। শূন্যতার চেতনা এবং বুদ্ধিমত্তা আছে। শারীরিক অর্থে নয়– এমন নয় আমি লিজ গিলবার্ট ঈশ্বরের পায়ের রানের মোটা মাংসখণ্ড হয়ে ছিলাম। আমি কেবল ঈশ্বরের একটা অংশ ছিলাম।

স্রষ্টার অংশ হওয়ার সাথে সাথে আমি এই মহাবিশ্বের একটা ছোট অংশ ছিলাম এবং একেবারে মহাবিশ্বের সমান আকারের। সবাই জানে পানির বিন্দু সমুদ্রে মিলিয়ে যায় কিন্তু খুব কম মানুষই জানে সমুদ্র জল বিন্দুতে মিশে যায়– ঋষি কবিরা লিখেছেন এটা। এবং আমি এখন ব্যক্তিগতভাবে তাতে একমত।

এটা কোনো দৃষ্টিবিভ্রম ছিল না। আমি যা অনুভব করেছিলাম তা ছিল সত্য। একেবারে প্রকৃত ঘটনা। সেটা ছিল বেহেশত। সেটাই ছিল আমার এ-যাবতকালে অনুভব করা সবচেয়ে গভীর ভালোবাসা। কিন্তু তাতে বিজয় উল্লাস ছিল না, ছিল না উত্তেজনা। সেই ঘটনা আমার ভেতরে অহং বোধ এবং প্রচণ্ড আবেগ জন্ম দিয়ে যায়নি যে আমার ভেতরটা বিজয় উল্লাস আর উত্তেজনা দেখাবে। সেটা ছিল কেবল অবশ্যম্ভাবী একটা ঘটনা। যেমন আপনি অনেকক্ষণ ধরে একটা অপটিক্যাল ইল্যুশনে তাকিয়ে আছেন। রহস্য এবং আঁধার উদঘাটনের জন্য চোখ কচলে যাচ্ছেন এবং হঠাৎ বোঝার, দেখার ভঙ্গি বদলে গেল এবং আপনি সব পরিষ্কার দেখতে পেলেন। দুটো ফুলদানী আসলে দুটো মুখ। আর একবার যখন আপনি দেখতে পেয়েছেন আর কখনো তা দেখতে কষ্ট হবে না।

আমি মনে মনে বলেছিলাম, এটাই তাহলে ঈশ্বর। আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে ধন্য বোধ করছি।

পার্থিব কোনো কিছুর তুলনা দিয়ে আমি কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম তার ব্যাখ্যা করতে পারব না। সেখানে না আলো না অন্ধকার, না বড় না ছোট। সেটা আসলে কোনো জায়গাও না যে দাঁড়ানো যায়। আমিও ঠিক আমার মতো ছিলাম না। তখনো আমার ভাবনাগুলো ছিল কিন্তু তারা ছিল খুব ভদ্র, শান্ত এবং পর্যবেক্ষণশীল। আমি কেবল সাবলীলই বোধ করছিলাম না এবং সবার সাথে সব কিছুর সাথে মিলিত হচ্ছিলাম। আমার অবাক লাগছিল এবং মজাও লাগছিল যে এই অনুভূতি ছাড়া মানুষ কিভাবে অন্য কোনো কিছু অনুভব করতে পারে। আমার নিজের সম্পর্কে পুরোনো ধারণাগুলোর জন্যও আমি পুলকিত হলাম যে আমি কে আমি কেমন? আমি একজন মহিলা, আমি একজন আমেরিকান, আমি একজন লেখিকা, আমি একজন বাঁচাল। এই সব ধারণাগুলোও আমার কাছে মিষ্টি আর সঠিক মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল যখন আমরা আমাদের অসীমত্বের ধারণা পাই না তখন কত ক্ষুদ্র বাক্সে নিজের সত্তার পরিচয় ঠেসে গুঁজতে থাকি।

www.pathagar.org

আমি অবাক হয়েছিলাম, সারাজীবন কেন আমি সুখের পেছনে দৌড়িয়েছি যখন সুখ আমার নিজের ভেতরই আছে। আমি জানি না কতক্ষণ এই মিলনের মহান তরঙ্গে আমি ভাসছিলাম। তারপর হঠাৎ একটা ভাবনা এসেছিল, আমি এই অভিজ্ঞতাটা সারাজীবন ধরে রাখতে চাই। তারপর আমি কেবল 'আমি চাই।' এই শব্দটা নিয়ে লোফালুফি করছিলাম তারপর আমি পৃথিবীতে পিছল খেয়ে নামছিলাম। আমার মন আপত্তি জানাচ্ছিল। আমি এখান থেকে যেতে চাই না– কিন্তু তবুও আমি পিছল খেয়ে নেমে যাচ্ছিলাম। এভাবে,

আমি চাই!
আমি চাই না!
আমি চাই!
আমি চাই না!

সেই উন্মত্ত ভাবনার প্রতিটা পুনরাবৃত্তিতে আমি বিভ্রমের স্তর থেকে স্তরে পতিত হচ্ছিলাম। ঠিক যেভাবে একজন কমেডি নায়ক একটা দালান থেকে পড়ে যাওয়ার সময় এক ডজন কাচের ক্যানভাস একটার পর একটা ভেঙে নিচে পড়তে থাকে। ফিরে আসার নিরর্থক বাসনায় আমি আবার আমার ছোট সীমানায়, আমার নিজস্ব মরণশীল সত্তার কাছে, আমার সীমাবদ্ধ কৌতুক মাখা পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলাম। আমি দেখছিলাম আমার অহং ফিরে আসছে যেভাবে পলারয়েড ফটোগ্রাফ প্রক্রিয়াজাত হওয়ার সময়ে আস্তে আস্তে ছবিটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে, এই তো চেহারা এই তো মুখের রেখা, এইতো ভ্রূ– হ্যাঁ এই তো শেষ হলো। নিজের পুরোনো সাধারণ একটা ছবি। সেই স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা হারিয়ে ফেলায় নিজের মধ্যে একটা ভয়, একটা কম্পন অনুভব করছিলাম। আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। এই কম্পনের পাশাপাশি আমি একজন সাক্ষী, নিজের চেয়ে বুদ্ধিমান আর বিজ্ঞ একটা স্বত্ত্বা অনুভব করছিলাম, যে কেবল তার মাথা নাড়ছিল আর হাসছিল এই জেনে যে, আমি যদি এমন বিশ্বাস করি এই আশীর্বাদ যদি আমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল তাহলে অবশ্যই আমি এখনো তা বুঝিনি। আমার আরও অনুশীলন করতে হবে। সে অনুধাবনের মুহূর্তে ঈশ্বর আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমাকে পিছলিয়ে নামতে দিয়েছিলেন তার আঙুল দিয়ে শেষ করুণাধারা আর অব্যক্ত বার্তায় নির্দেশ করেছেন,

'তুমি আবার এখানে ফিরে আসতে পারবে যখন তুমি পুরোপুরি বুঝতে পারবে যে তুমি সবসময়ই এখানে ছিলে।'

৬৮

●

এর দুদিন পর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সবাই মৌনতা থেকে বের হয়ে এসেছিল। সাহায্য করেছিলাম বলে কত কত মানুষ আমাকে আলিঙ্গন করেছিল!

www.pathagar.org

আমি মুখে বলেই চলছিলাম, 'আরে না! আপনাকেই ধন্যবাদ।' আর ভেতরে এই ভেবে বিষণ্ন বোধ করছিলাম, যে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সেই শব্দগুলো কত অপ্রতুল। তারাই বরং আমাকে যে উচ্চ আসনে উন্নীত করেছিল সেই বিশাল কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এক সপ্তাহ পর আরও একশ জন মানুষ আরও একটা অনুষ্ঠানের জন্য এসেছিল। সেই একই শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই একই অন্তর্গত গুপ্ত চেষ্টা এবং সেই একই সকরুণ নীরবতা সব কিছুরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল এবং তার সাথে অনুশীলন রত ছিল নতুন নতুন আত্মা। আমি তাদের ওপরও নজর রাখতাম এবং সকল সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে আমিও তাদের সাথে তৃরীয় স্তরে খাবি খেতাম। আমার কেবল হাসি পেত যখন কেউ ধ্যান শেষে আমাকে জানাতে আসতো যজ্ঞের এই অনুষ্ঠানে আমি তাদের চোখে শান্ত, নরম এবং তরঙ্গায়িত রূপে ছিলাম। এটা কি আমাকে নিয়ে আশ্রমের শেষ কৌতুক? যখনই আমি আমার কোলাহল মুখর, আড্ডাবাজ স্বভাবকে মেনে নিয়েছিলাম আমার অন্তর্গত চাবি রক্ষক পেশাকে পুরোপুরি জড়িয়ে ধরেছিলাম, তখনই কি না আমি হয়ে উঠেছিলাম মন্দিরের পেছনে বসে থাকা শান্ত মেয়ে!

সেটা আশ্রমে আমার শেষ সপ্তাহ। আশ্রমটা কেমন করে যেন বিগত কয়েকদিনের সামার ক্যাম্প অনুভূতিটা শুষে নিয়েছিল। প্রতিদিন সকালেই বাসে কিছু নতুন মালামাল উঠত এবং চলে যেত। নতুন কেউই আসত না। প্রায় মে মাস এসে গিয়েছিল ভারতের সবচেয়ে উষ্ণ সময়ের শুরু। এবং জায়গাটা যেন স্থির হয়ে যাচ্ছিল। মনে হতো না আর কোনো অনুষ্ঠান হবে। তাই আমাকে নতুন করে কাজ দেওয়া হয়েছিল। সেটা ছিল অফিসের রেজিস্ট্রেশন বিভাগে। যেখানে আমার কাজ ছিল একাধারে মিষ্টি ও তিতকুটে। মানে আমার সকল বিদায়ী বন্ধুদের তথ্য কম্পিউটারে তুলে রাখা। অফিসে আমি মেডিসিন অ্যাভিনিউর একজন হেয়ার ড্রেসারের সাথে কাজ ভাগাভাগি করে নিতাম। আমরা দুজন একা আমাদের ভোরের প্রার্থনা করতাম, কেবল আমরা দুজনই ঈশ্বরের স্তুতি গাইতাম।

একদিন সকালে মেডিসিনের হেয়ার ড্রেসারটা বলল, আমরা যদি এই স্তুতিতে তাল লয় যোগ করতে পারতাম তবে হয়ত একে উন্নত অষ্টকে নিয়ে যেতে পারতাম। জানো এইজন্যই আমার গান সংগীতশিল্পী কাউন্ট ব্যাসির ঐশ্বরিক সংস্করণের মতো শোনায় না?

আমি সেখানে অনেক সময় একা থাকতে পারছিলাম। ধ্যান গুহায় কাটাচ্ছিলাম প্রায় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের সাথে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারছিলাম, এইগ্রহে নিজের কোনো অস্তিত্বই বিরক্ত করত ন। মাঝে মাঝে শক্তির শারীরিক এবং স্বপ্নিল অভিজ্ঞতা হচ্ছিল, মেরুদণ্ডের ঘূর্ণি, রক্ত বলকে ওঠা বন্যতায়। আমি যতটা পারতাম তাতে কম বাধা দিতাম। অন্য সময় কিন্তু আবার একটা মিষ্টি শান্ত সন্তুষ্টি অনুভব করতাম এবং সেটাও ছিল চমৎকার। আমার মনের সেই বাজে কথাগুলো তখনো মাঝে মাঝে আমাকে তাদের গরম চোখ দেখিয়ে যেত কিন্তু আমি তখন আমার ভাবনার নক্সাটা জানতাম তাই তখন আর বিরক্ত হইনি। আমার ভাবনাগুলো আমার সেই পুরোনো প্রতিবেশীর মতো হয়ে গিয়েছিল যারা কিছু

www.pathagar.org

বিরক্তিকর হলেও ভালোবেসে ফেলার মতো। 'যেমন জনাব এবং বেগম ইয়াক্কিতি ইয়র্ক এবং তাদের তিন বাচ্চা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা আমার ঘরে এসে হামলে পড়ে না। এই মহল্লায় আমাদের আলাদা আলাদা ঘর আছে।'

কয়েক মাসে আমার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল আমি কিন্তু তা বুঝতে পারছিলাম না। আমার যে বন্ধুরা অনেকদিন ধরে যোগ শিখছিল তারা বলেছিল, 'আশ্রম থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তুমি বুঝতে পারবে না তোমার মধ্যে কতটা পরিবর্তন হয়েছে।' সাউথ আফ্রিকার যাজিকা বলেছিল, 'স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পরই কেবল বুঝতে পারবে তোমার ভেতরের জিনিসপত্রগুলো কতটা নতুন করে গোছগাছ হয়ে আছে।'

সেই মুহূর্তে আমি অবশ্যই বুঝতে পারছিলাম না স্বাভাবিক জীবন কি। মানে তখন আমার ইন্দোনেশিয়ার কবিরাজের সাথে থাকতে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাহলে সেটাই কি আমার স্বাভাবিক জীবন! কি জানি হতেও পারে। ভেবেছিলাম, যাই হোক আমার বন্ধুরা যেহেতু বলেছে পরিবর্তনগুলো পরে বোঝা যাবে। হয়ত দেখা যাবে দীর্ঘমেয়াদী ঘোরগুলো কেটে যাবে এবং সেই বিচ্ছিরি চিরস্থায়ী ধরনটাও বদলে যাবে। যে জ্বালা একসময় পাগল করে দিত তা আর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারবে না। যে পুরোনো কষ্টগুলো সহ্য করা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তা হয়ত পাঁচ মিনিটের জন্যও আর ফিরে আসবে না। বিষাক্ত সম্পর্কগুলো বাতাসে মিলিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে এবং উপকারী ভাল মানুষগুলো জীবনে আবির্ভূত হতে শুরু করবে।

তার আগের রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। দুশ্চিন্তায় নয়, কেমন যেন একটা প্রত্যাশার উত্তেজনায়। জামা কাপড় পরে আমি বাগানে হাঁটতে বের হয়েছিলাম। চাঁদ ছিল লোভনীয় রকম পরিপক্ক এবং পরিপূর্ণ। চারদিকে রুপার মতো ঝলমলে আলো ছড়িয়ে ঠিক যেন আমার উপরেই ঝুলছিল সেটা। বাতাসে জুঁই ফুলের সুভাস এবং এর সাথে ঝোপের মাথায় ফুটে থাকা একধরনের মাতাল ফুলের সুবাসও ছিল যা সেখানে কেবল রাতের বেলায় ফুটত। দিনের বেলায় খুব গরম এবং আদ্রতা বেশি ছিল। কিন্তু তখন কিছুটা কম গরম ও উষ্ণ ছিল। গরম বাতাস আমার চারপাশে ঘিরে রেখেছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম, আমি আমার চপ্পলের ওপর দাঁড়িয়ে, আমি ভারতে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে শাক সবজী খেয়ে কয়েক মাসের যোগ অনুশীলনের পর আমার নিজেকে খুব জীবন্ত ও স্বাস্থ্যবান লাগছিল। জ্যোৎস্না স্নাত ঘাসের বুক চিরে আমি সেই নিচু তৃণভূমি বরাবর দৌড়ে গিয়েছিলাম। কুয়াশা ভেজা ঘাসে আমার চপ্পল শব্দ করছিল, শিপ্পা-শিপ্পা-শিপ্পা-শিপ্পা, এবং এই শব্দ ছাড়া পুরো উপত্যকা জুড়ে অন্য কোনো শব্দ ছিল না। আমি বিজয়িনীর মতো পার্কের মাঝের ইউক্যালিপটাসের ঝোপ পর্যন্ত একটানে দৌড়ে গিয়েছিলাম। শোনা যায় সেখানে দেবতা গণেশের একটা মন্দির ছিল (গণেশ হচ্ছে বাধা দূর করার দেবতা)। গাছগুলো দিনের উত্তাপে তখনো গরম ছিল আমি তাদের একটাকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরেছিলাম। মানে আমি আমার হৃদয় দিয়ে গাছটাকে চুমু খেয়েছিলাম। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে রেখেছিলাম যে, যেকোনো আমেরিকান বাবা মায়ের কাছে এটা একটা দুঃস্বপ্ন যে তার সন্তান নিজেকে খুঁজতে ভারতে গেছে আর শেষমেশ চাঁদের আলোয় গাছের সাথে গোপন মেলামেশা শুরু করেছে।

www.pathagar.org

কিন্তু সে রাতে যে ভালোবাসা অনুভব করেছিলাম তা ছিল খাঁটি এবং ঐশ্বরিক। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন উপত্যকার চার পাশে তাকিয়ে সব কিছুর মাঝেই ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। কী গভীর এবং প্রচণ্ড খুশি হয়েছিলাম আমি! অনুভূতিটা যেমন ছিল ঠিক সেজন্যই আমি প্রার্থনা করেছিলাম এবং সেজন্যই আমি প্রার্থনা করি।

৬৯

বলাই হয়নি আমি আমার শব্দ খুঁজে পেয়েছিলাম অবশেষে। জানেনই তো আমি কতটা বইয়ের পোকা সেটা লাইব্রেরি ছাড়া অন্য কোথায়ই বা খুঁজে পেতাম। যেদিন থেকে জিউলিও বলেছিল রোমের শব্দটা হচ্ছে 'যৌনতা' আর জিজ্ঞেস করেছিল আমার শব্দটা কি? সেদিন থেকে আমি আমার শব্দটা খুঁজে বেড়িয়েছি। আমি তখন উত্তরটা জানতাম না। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম যখনই তা দেখতে পাব আমি তা চিনে ফেলব।

শেষ সপ্তাহে আশ্রমে আমি তা দেখতে পেয়েছিলাম। যোগের পুরোনো বাণীতে আমি একজন প্রাচীন অন্বেষকের বর্ণনা পড়েছিলাম। সেই ব্যাখ্যায় একটা সংস্কৃত শব্দ দেখতে পেয়েছিলাম 'অন্তবাসীন।' এর মানে হচ্ছে যে সীমানায় থাকে। প্রাচীনকালে এটা প্রচলিত একটা ধারণা ছিল। এই শব্দ দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হতো যে কর্মব্যস্ত পার্থিব জীবন ছেড়ে বনের ধারে গিয়ে বাস করা শুরু করত যেখানে আত্মিক গুরুরা বাস করতেন। অন্তবাসীন তখন আর গ্রামবাসী হিসেবে বিবেচিত হতো না। সে স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনও যাপন করত না। সে কিন্তু তূরীয় স্তরেও বাস করত না কিংবা ঋষিদের মতো আত্ম উপলব্দির জন্য গভীর বনেও বাস করত না। একজন অন্তবাসীন ছিল এ দুয়ের মধ্যবর্তী একজন। সে ছিল সীমানা বাসী। সে এমন এক জায়গায় বাস করত যেখান থেকে এই দুই ধরনের পৃথিবীই দেখা যায়। কিন্তু তার দৃষ্টি থাকত অজানায় এবং সে ছিল একজন পণ্ডিত।

প্রথম যখন অন্তবাসীনের সংজ্ঞা পড়েছিলাম, আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চিনতে পেরে যেন মনটা লাফিয়ে উঠেছিল। আরে! এটা তো আমার শব্দ! আধুনিক যুগে অজানা বনে থাকা বা তার সীমানায় থাকা গালভরা গল্পের মতো। কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে আপনি এখনো সেখানে থাকতে পারেন। আপনি চাইলে আপনার পুরোনো ভাবনা এবং নতুন বোধের মাঝখানের ঝকমকে কিনারায় থাকতে পারেন। এমন একটা অবস্থানে যেখানে আপনি সবসময় শিখছেন। সেটা এমন একটা সীমানা যা আসলে আপনার গবেষণা আর নতুন চৈতন্যের সাথে সদা বিরাজমান। সেই রহস্য ঘেরা ও অজানা বন সবসময় আপনার কাছ থেকে কয়েক ফিট দূরে থাকবে তাই আপনাকে তা অনুসরণ করতে হলে ধীরে সুস্থেই চলাফেরা করতে হবে। আপনাকে থাকতে হবে অস্থির, চলন্ত, কোমল, এমনকি পিচ্ছিল। মজার ব্যাপার হলো এর এক দিন আগেই আমার নিউজিল্যান্ডের সীসা ব্যবসায়ী বন্ধু আশ্রম ছেড়ে চলে

www.pathagar.org

গিয়েছিল, এবং যাওয়ার আগে সে আমার হাতে আমার ভ্রমণ সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা বিদায়ী কবিতা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আমার সেই কথাগুলো মনে আছে,

এলিজাবেথ থাকে, না দূরে না কাছে
না ইটালিয়ান প্রবাদে আর বালির স্বপ্নে।
এলিজাবেথ, থাকে কেবল মাঝামাঝিতে,
ঘুরে বেড়ায় মৎস্যগন্ধা পিচ্ছিলতায়।

তখন বিগত কয়েক বছরে আমি অনেক সময় ব্যয় করেছি এটা খুঁজতে যে আমি আসলে কি হতে চাই। একজন স্ত্রী? একজন ভ্রমণবিদ? একজন শিল্পী? একজন যোগী? একজন মা? একজন প্রেমিক? একজন খাদক? কিন্তু না। অন্ততপক্ষে পুরোপুরি আমি এর একটাও নই। আমি পাগলা খালা লিজও নই। আমি কেবল একটা পিচ্ছিল আনত্বাসীন। কাছে না দূরে কেবল মাঝামাঝিতে-নতুনত্বের চমৎকার, ভয়ানক বনের ধারের, সদা চলন্ত সীমানার একজন ছাত্রী।

৭০

আমার বিশ্বাস পৃথিবীর সকল ধর্ম মূলত চলাচলের একটা রূপকযানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে গেছে। আপনি যখন স্রষ্টার সাথে মিলিত হতে যাবেন তখন আপনি আসলেই পার্থিব জীবন থেকে অন্তর্গত জীবনে যেতে চাইবেন অন্তবাসীনের তত্ত্ব অনুযায়ীই ধরুন আপনি গ্রাম থেকে বনে যেতে চাইবেন এবং সেখানে নিয়ে যেতে হলে আপনার কিছু মহান পদ্ধতির বা উপায় বা রূপকের প্রয়োজন হবে। যে রূপকটাকে হতে হবে আসলে অনেক বড়, জাদুময়, এবং শক্তিশালী। হতে হবে কল্পনার চেয়েও বড় একটা নৌকা কেন না আপনাকে অনেকটা দূর বয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই রূপকেই।

আসলে রহস্যময় গবেষণা থেকেই ধর্মীয় প্রথাগুলোর উদ্ভব। কিছু সাহসী স্বেচ্ছাসেবী নতুন ঐশ্বরিক পথের সন্ধান করেছেন। স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা লাভের পর ঈশ্বরের বার্তাবাহক হিসেবে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তার জাতির কাছে ফিরে এসেছেন স্বর্গের গল্প এবং সেখানে যাওয়ার মানচিত্র নিয়ে। তারপর অন্যরা সেই শব্দ, কাজ, প্রার্থনা বা সেই ঈশ্বরের বার্তাবাহককে অনুসরণ করে গেছেন। মাঝে মাঝে তা সার্থক হয়েছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এইসব মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি এবং ঐশ্বরিক আচারের চর্চা করে গেছে অন্য স্থানের লোকের কাছে পৌছে দিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তা তেমন সফল হয়নি। তার চেয়ে নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা জনপ্রিয় কোনো পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটাকে সার্থক মতবাদে রূপান্তরিত হতে দেয়নি।

ভারতে মনোযোগের উদাহরণ দিতে গিয়ে একজন মহান সাধকের একটা কাহিনি প্রচলিত আছে। সেই সাধকটা সবসময় তার বিশ্বাসী শিষ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন।

www.pathagar.org

একদিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আর তার অনুসারীগণ ঈশ্বরের নাম জপতেন। একটাই কেবল সমস্যা ছিল, সেই সাধকের একটা তরুণ বিড়াল ছিল। সে সবসময় মন্দিরে মিউ মিউ করে হেঁটে বেড়াত এবং গড়গড় করত এবং সবার ধ্যানের মাঝে বিরক্ত করত। তাই বাস্তব বুদ্ধিতে সাধকটা আদেশ দিয়েছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত ধ্যান চলবে ততক্ষণ যেন বিড়ালকে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়, যাতে সে কাউকে বিরক্ত করতে না পারে। ধীরে ধীরে এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, বিড়ালকে বেঁধে তারপর ধ্যান করতে বসা– বছর যেতেই অভ্যাসটা একটা ধর্মীয় আচারে বদলে গিয়েছিল। প্রথমে বিড়ালকে না বেঁধে কেউ ধ্যান করতে পারে না। তারপর একদিন যখন বিড়ালটা মরে গিয়েছিল সাধকের শিষ্যরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল একটা বড় ধর্মীয় সমস্যা– একটা বিড়াল না বেঁধে তারা এখন কিভাবে ধ্যান করবে! তারা কিভাবে ঈশ্বরের কাছে পৌছাবে! তাঁদের মনের ভেতরে যে বিড়ালটা অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে!

তাই খুব সাবধান, এই গল্পটাই সতর্ক করে দেয় যে ধর্মীয় আচারের পুনরাবৃত্তি কেবল অভ্যাসবশতই করতে হয় না। বিশেষ করে ধর্ম বিভাজনের এই পৃথিবীতে যেখানে তালিবান আর খ্রিস্টান জাতীরা আন্তর্জাতিক মানের যুদ্ধ করে যাচ্ছে ঈশ্বরের নামে কার অধিকার আছে আর ঈশ্বরের কাছে পৌছানোতে কার আচার পদ্ধতি সেরা তা প্রমাণের চেষ্টায়। এটা মনে রাখাই শ্রেয় যে বিড়ালকে বেঁধে রাখতে পারলেই কেউ উচ্চ আসীনে উন্নীত হতে পারবে না। এই আসন কেবল নিজের ভিতরে স্বর্গীয় সত্তা অনুভব করার ক্রমাগত তাড়না থেকেই পাওয়া সম্ভব। ভক্তির জন্য নিয়মানুবর্তিতার মতো নমনীয়তাও জরুরী।

আপনার কাজ হচ্ছে এটা মেনে নেওয়া রূপকের সন্ধান করতে থাকা, পদ্ধতি এবং শিক্ষকগণের সন্ধান করতে থাকা যারা আপনাকে ঐশ্বরিকতার কাছে নিয়ে যাবে। যোগ ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ঈশ্বর সকল শুদ্ধ প্রার্থনা এবং সকল কর্মে সাড়া দেন মানুষ যাকেই তার পূজ্য হিসেবে গ্রহণ করুক না কেন ঈশ্বর তাতেই বিরাজ করেন। কেবল সেই প্রার্থনাগুলো করতে হবে নিষ্ঠার সাথে। উপনিষদের একটা লাইন আছে, মানুষ পথ বেছে নিতে পারে সোজা বা বাঁকা, নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী, যার যাকে সবচেয়ে সেরা মনে হয় এ সকলই পৌছে যায় তার কাছে ঠিক যেভাবে নদী সমুদ্রে মিশে যায়।

ধর্মে আর একটা উপাদান হচ্ছে, বিশৃঙ্খল পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা নেওয়া এবং প্রতিদিন যে অব্যক্ত বিষয়গুলো ঘটে আমাদের আশেপাশে তার ব্যাখ্যা করা। নিরীহরা ভুগছে, দুষ্ট মানুষরা পুরস্কৃত হচ্ছে– আমরা এসব কেন করছি। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বলে, মরার পর সব পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে, বেহেশত না হয় জাহান্নামে। সব ন্যায়বিচার করা হবে যার যার হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া হবে। একেই জেমস ডয়েল বলতেন, জল্লাদ ঈশ্বর– একটা পুরুষ সত্তা যে তার নিজ বিচারকার্যে অটল, শয়তানকে শাস্তি দিতে আর ভাল মানুষকে পুরস্কৃত করতে। পৃথিবীর বিশৃঙ্খলার সম্পর্কে উপনিষদ সব ধারণাকে নাড়িয়ে দেয়। পৃথিবীর বিশৃঙ্খলতা নিয়ে তারা তেমন নিশ্চিত নয় বরং তাদের মতে আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা এমন দেখে থাকি। সেই বইয়ে কারো প্রতি কোনো সুবিচার বা প্রতিশোধের নিয়ম উল্লেখ নেই

www.pathagar.org

বরং সেখানে বলা আছে প্রতিটা কাজের একটা পরিণাম আছে। তাই সেটা বুঝে নিজের কার্য নির্ধারণ করতে হবে। কেউ সহসাই সেই পরিণাম দেখতে নাও পেতে পারে। যোগ সব সময় দূরদৃষ্টিতে বিশ্বাসী। উপনিষধের মতে এইসব সমস্যারও একটা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে। যদিও ব্যক্তিগতভাবে ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যক্তি বুঝতে পারে না।

বলা হয়ে থাকে, 'দেবতারা রহস্য পছন্দ করেন এবং প্রমাণকে ঘৃণা করেন।' সবচেয়ে ভাল এটাই যে, আমরা যদি আমাদের অবোধ্য এবং ভয়াবহ পৃথিবীর সাথে তাল মিলাতে চাই তাহলে অন্তর্গত ভারসাম্য বজায় রাখাই আমাদের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত– আর তাতে যতটাই না পাগল দেখাক আমাদের।

আমার যোগী বন্ধু শিন এটা এভাবে ব্যাখ্যা করেছে– ধরে নাও পৃথিবী একটা বিরাট সুতোর চরকা। তোমাকে জিনিসটার একদম মাঝে থাকতে হবে। একেবারে চাকার কেন্দ্রে, যেখানে সকল চাকা প্রচণ্ড রকম ঘুরছে সেই কিনারায় নয়, সেই হট্টগোলে থাকলে তোমার মাথা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেই শান্ত কেন্দ্রই হচ্ছে তোমার হৃদয়। যেখানে ঈশ্বর তোমার ভেতর থাকেন। তাই পৃথিবীর উত্তর খোঁজা বন্ধ কর। কেবল একেবারে কেন্দ্রে আসার চেষ্টা কর। শান্তি পাবে।

আত্মিক কথোপকথনের মধ্যে এটা আমাকে অনেক নাড়া দিয়েছে। আমার ক্ষেত্রে কথাগুলো কাজে দিয়েছে এবং আমি যদি এমন কিছু পাই যা ভাল কাজ করবে তা তো ব্যবহার করবই।

নিউইয়র্কে আমার এমন অনেক বন্ধু আছে যারা ধার্মিক নয়। আমি বলব, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই হয় তরুণ বয়সে ধর্মীয় পথ হারিয়ে ফেলেছে নয় তারা কখনোই ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে জীবন শুরু করেনি। স্বভাবতই অনেকে আমার এই নতুন পাওয়া স্বর্গীয় পবিত্রতা অনুসন্ধানী জীবন নিয়ে কটূক্তি করে। যেমন আমার কম্পিউটার সারাই করার সময় আমার বন্ধু ববি একবার টিপ্পনী কেটে বলেছিল,

তোমার অলৌকিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তুমি সামান্য একটা সফটওয়্যারও ডাউনলোড করতে পার না।

আমি সেই কৌতুকে হেসে গড়িয়ে যাই। আমার মনে হয় এইসব কিছুই মজার। অবশ্যই তাই।

আমি এও দেখেছি যে, আমার কিছু বন্ধুরা বয়স বাড়াতে কোনো কিছুর ওপর বিশ্বাস আনতে চায়। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা অনেকগুলো বন্ধনে আঁটকে পড়ে। এই যেমন তাদের বাস্তবজ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা। তখনো সেই মানুষগুলো এমন একটা পৃথিবীতে বাস করে যেখানে ধারাবাহিকভাবে বন্য, ভয়ঙ্কর এবং সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব একটা অস্তিত্ব কাজ করে। ঐ মানুষগুলোর এবং আমাদের জীবনের সুখ দুঃখের মহান এবং ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আমাদের মাঝে একটা আত্মিক অনুষঙ্গের চাহিদা সৃষ্টি করে যা বিলাপ করে বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রকাশ করা হয় কিংবা একটা সংজ্ঞা খুঁজে বেড়ায়। সমস্যাটা হচ্ছে কাকে পূজা করব ? কার কাছে প্রার্থনা করব?

আমার একটা বন্ধু আছে যার প্রিয় মায়ের মৃত্যুর পরই সন্তান জন্ম নিয়েছিল। হঠাৎ এই লাভ এবং লোকসানের পর আমার সেই বন্ধুর একটা পবিত্র স্থানে যেতে তাড়না জাগে বা কোনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করার তাগিদ জাগে। যেখানে সে

www.pathagar.org

তার আবেগকে একরকম উগরে দিতে পারবে। আমার সেই বন্ধুটা জন্মগত ক্যাথলিক হিসেবে লালিত পালিত হয়েছে কিন্তু বড় হয়ে গির্জায় তার আর মন বসেনি। অবশ্যই সে একজন হিন্দু এবং একজন বৌদ্ধ বা এরকম পাগলাটে কোনো কিছু হতে অস্বস্তি বোধ করবে। তাহলে সে এখন কি করবে? আমাকে যেমন বলেছিল সে, তুমি কি চেরি কুড়ানোর মতো ধর্ম কুড়াতে চাও!

এটা একটা ভাবাবেগ। পুরো সম্মান জানিয়েই আমি তাতে অমত করছি। আমি মনে করি একজন মানুষের চেরি কুড়ানোর পরিপূর্ণ অধিকার আছে যখন ব্যাপারটা হয় স্রষ্টার মাঝে শান্তি খোঁজার। আমি মনে করি একজন মানুষের সেই রূপক খোঁজার পরিপূর্ণ অধিকার আছে যা তাকে পার্থিব জীবন থেকে পার করে তার ইচ্ছের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে। সেই গন্তব্যে যেখানে ব্যক্তি শান্তি পায়। এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এটা মানবতার পবিত্রতা খোঁজার ইতিহাস। যদি মানব সম্প্রদায় ভক্তি সাধনায় অনুসন্ধিৎসু না হতো তাহলে হয়ত এখনো আমাদের মধ্যে অনেকে মিশরের সেই বিড়ালকে পূজা করতে থাকত এবং ধর্মীয় চিন্তার এই বিপ্লব চেরি কুড়ানোর সাথেই সঙ্গতি পূর্ণ। আপনি বেছে নেবেন যেটা কার্যকর এবং যেখানে কার্যকর সেখানেই যাবেন এবং আপনি আলোর দিকে যেতেই থাকবেন।

ভারতের পবিত্র ধর্মাবলম্বিরা বিশ্বাস করেন পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বিরা এক একটা সুতা বহন করেন এবং এই সুতাগুলো সব সময় একে অপরকে খুঁজে বেড়ায়। এবং এগুলো একসাথে মিলে শেষে যে দড়ি তৈরি হয় তা আমাদের এই কালো ইতিহাস থেকে এক অন্য ভুবনে নিয়ে যায়। সমসাময়িক দালাই লামা এই তত্ত্বটা সবচেয়ে ভাল রকম পুনরাবৃত্তি করেছেন। তার পশ্চিমা ছাত্রদের এই বলে নিশ্চিন্ত করেছেন যে, তার শিষ্য হতে হলে তাদের বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করার কোনো দরকার নেই। তিনি স্বাগত জানিয়ে বলেছেন বৌদ্ধ ধর্মে যা কিছু ভাল লাগে তা বের করে নিয়ে তাঁদের স্ব স্ব ধর্মে তার চর্চা তারা করতে পারবে। সবচেয়ে অসম্ভব এবং রক্ষণশীল স্থানেও হঠাৎ আপনার এই ঝকঝকে ধারণা মাথায় আসতে পারে যে বিভিন্ন মতাদর্শ ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের যে শিক্ষা দেয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব তার চেয়ে অনেক বিশাল। ১৯৫৪ সালে পোপ পিয়াস এক্স আই লিবিয়া সফরে কিছু ভ্যাটিকান প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন তাতে লিখিত নির্দেশ ছিল, ভেবো না তোমরা নাস্তিকদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেছ। মুসলমানরাও মোক্ষ লাভ করেছে। দৈবযোগ অনেক ভাবেই হতে পারে।

কিন্তু সে অর্থ নয় এখানে অনেক হচ্ছে অসীম। আমাদের মধ্যে অনেক পবিত্র মানুষরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের একটা শাশ্বত ছবিই দেখতে পান। কিন্তু এই ছবিগুলো যদি জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে ঈশ্বরের একটা ছবি পাওয়া যাবে যেখানে সবই একরকম এবং যেখানে সবাই অন্তর্ভুক্ত আছেন। এক্ষেত্রে আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার আমাদের স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা কি সমগ্র মানব জাতির ঐশ্বরিক সাধনার একটা অংশ নয়? সেই বিস্ময়ের খোঁজে যতদূর সম্ভব তত দূর যাওয়া আর তাতে না থামতে চাওয়া কি আমাদের অধিকার নয়? যদি সেই খোঁজে ভারতে এসে চাঁদের আলোয় গাছকে কিছু মুহূর্তে চুমু খাওয়া হয় সেটা কি অপরাধ?

www.pathagar.org

কোণায় বসে থাকা, সেটা আমিই। শব্দের মাঝে নিজেকে খুঁজে নেওয়া, সেটা আমিই। স্পট লাইট হাতে নেওয়া, সেটা আমিই, সেভাবেই আমি আমার ধর্ম বেছে নিয়েছি।

৭১

আমার ফ্লাইট ছিল সকাল সাতটায়। আমি ঠিক করেছিলাম রাতে আর ঘুমাবো না বরং বাকি রাতটা ধ্যান গুহায় প্রার্থনা করে কাটিয়ে দেব। আমি দেরিতে শুতে যাওয়ার মানুষ নই কিন্তু একটা অন্যরকম অনুভব আশ্রমে শেষ রাতটা জেগে কাটানোর তাড়না দিচ্ছিল। ভেবেছিলাম, জীবনে কত রাতই তো কত কিছু করে পার করেছি- ভালোবাসাবাসি করে, তর্ক করে, দূরের পথে গাড়ি চালিয়ে, নেচে-গেয়ে, দুশ্চিন্তা করে আবার মাঝে মাঝে একই রাতে এ-সব কিছুর সম্মিলনে, কিন্তু, কখনো কোনো রাতের ঘুম ঈশ্বরের প্রার্থনায় কাটাইনি।

আমি আমার ব্যাগ গুছিয়ে মন্দিরের দরজায় রেখে দিয়েছিলাম যাতে ভোর হওয়ার আগে ট্যাক্সি এলেই তা দ্রুত টেনে ওঠাতে পারি। তারপর পাহাড়ে উঠে ধ্যানগুহায় গিয়ে বসেছিলাম। সেখানে আমি তখন একাই ছিলাম কিন্তু ইচ্ছা করেই এমন জায়গায় বসেছিলাম যেখান থেকে আমার গুরুর শিক্ষক আর সেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, সেই বিগত সিংহ যে এখনো কেমন করে যেন সেখানে আছেন সেই স্বামীজির ছবিটা দেখতে পাই। আমি চোখ বুঁজে মন্ত্রের আবির্ভাবের অপেক্ষা করছিলাম, নিজের চক্র বেয়ে স্থিরতায় নেমে এসেছিলাম। সেখানে নামার পর মনে হয়েছিল পৃথিবী থেমে আছে। নয় বছর বয়সে সময়ের নিষ্ঠুর গতিতে ভয় পেয়ে যেমনটা স্থির পৃথিবী চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটা। আমার হৃদয়ের ভেতরের ঘড়িটা থেমে গিয়ে দেয়াল থেকে দিন পঞ্জিকাটা উড়ে গিয়েছিল। আমি যা বুঝতে পেরেছিলাম তা নিয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম। আসলে আমি ঠিক প্রার্থনা করছিলাম না আমি নিজেই একটা প্রার্থনা হয়ে উঠেছিলাম।

আমি সেখানে সারা রাত বসে থাকতে পারতাম। এবং সেটাই করেছিলাম।

আমি জানি না আমার ট্যাক্সির চলে আসার সময় ঠিক কি আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা স্থিরতার পর কে যেন আমাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আমার তো এখন ইন্দোনেশিয়ার পথে বের হয়ে যাওয়ার কথা। কি অদ্ভুত! তাই আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আর স্বামীজীর ছবির সামনে একটা প্রণাম করেছিলাম যে কিনা একজন গুরু, একজন চমৎকার এবং একজন ভয়ানক মানুষ তারপর ঠিক তার ছবির পাশে মাদুরের নিচে আমি একটা কাগজের টুকরো রেখে দিয়েছিলাম। ভারতে থাকাকালীন চার মাস সময়ে যে কবিতা দুটো আমি লিখেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সেদুটোই আমার লেখা প্রথম কবিতা। নিউজিল্যান্ডের সীসা ব্যবসায়ী হয়ত এক্ষেত্রে আমার অনুপ্রেরণা। প্রথম কবিতাটা

www.pathagar.org

সেখানে যাওয়ার এক মাস পর লিখেছিলাম। আর দ্বিতীয়টা ফেরার দিন সকালে লেখা।

এই দুই কবিতার মধ্যবর্তী স্থান, মধ্যবর্তী সময়টাই আমার জন্য আশীর্বাদের ভূমি।

৭২

ভারতের আশ্রম থেকে দুটো কবিতা :

প্রথম :

এইসব অমৃত সুধা আর স্বর্গসুখের গল্প শুনলে
আমার কেবল রাগ হয়,
আমার ঈশ্বরের দিকে চলার পথে
সেরকম ধূপ-ধানির মিষ্টি সুভাসতো ভেসে বেড়ায়নি
তাই আমি এর কিইবা জানি বন্ধু!
এই পথে আমি যেন একটা বিড়াল
যাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পায়রার খোঁপে
সাথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেই সব যন্ত্রণাকে যারা নরকের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

ঈশ্বরের দিকে আমার এই পথ যেন শ্রমিকের বিদ্রোহ
সাংগঠনিক সম্মিলনের আগে তাদের মুক্তিই নেই,
তাদের হাতের অস্ত্র-শস্ত্রও ভয়ানক,
জাতীয় পাহারাদার কি এতো সহজে
তাঁদের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়!

আমার পথটা আমার অগোচরেই ভেঙে ফেলেছে
একজন অদেখা, শ্যাম-বর্ণের, ছোট-খাঁটো মানুষ।
যে ঈশ্বরকে ভারত জুড়ে অনুসরণ করেছে
কাদায় শরীর ডুবিয়ে, খালি পায়ে, ক্ষুধায়, ম্যালেরিয়ায়
ঘুমিয়েছে মানুষের দরজায়, সেতুর নিচে– ভবঘুরে হয়ে।
শীঘ্রই সে গৃহ অভিমুখে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল জানেনই তো–
এবং সে এখন আমার পিছু নিয়েছে,
বলছে, পেয়েছ লিজ?
আচ্ছা! গৃহ অভিমুখ বলতে কি বোঝায়? বাধ্যতাই বা কি?

www.pathagar.org

দ্বিতীয় :

যেভাবেই হোক
তারা যদি সেখানকার সদ্য কাটা ঘাস এনে
আমার পাজামা বানিয়ে দিত
আমি তাই পড়ে নিতাম।

তারা যদি আমাকে গণেশ বনের
সকল গাছের সাথে ভাব করতে দিত
কসম আমি তাই করতাম।

সেই দিনগুলোতে, বাদবাকি বুঝে নিতে
আমি শিশিরের ঘামে নেয়ে উঠেছিলাম
গাছের বাকলে মুখ ঘঁষেছিলাম
যেন সেটা ছিল আমার প্রভুর পা।

কিন্তু তাতে আমার মন ভরেনি,

তাই তারা যদি
পাখির বাসায় করে আমাকে
সেখানকার মাটি খেতে দিত!
আধটুকু খেয়েই আমি বাকি রাতটা
শান্তিতে ঘুমিয়ে নিতাম।

www.pathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

ইন্দোনেশিয়া

কিংবা
আন্ডারপ্যান্টেও কেমন কেমন লাগে
কিংবা
ভারসাম্য খোঁজার ছত্রিশটি গল্প

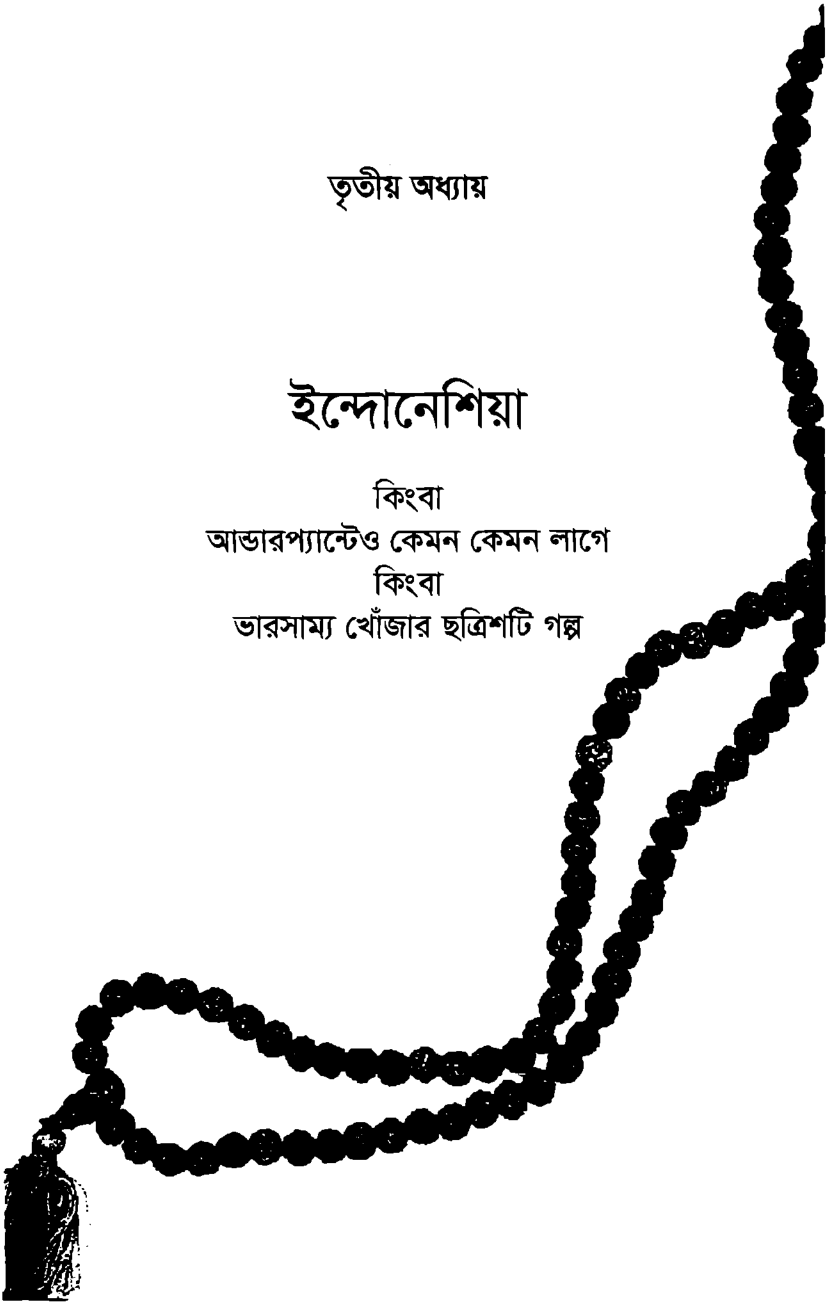

www.pathagar.org

www.pathagar.org

৭৩

সেবার বালিতে যাওয়ার মতো এত কম পরিকল্পনা নিয়ে কোথাও, কখনো যাইনি। আমার সকল অসতর্ক ভ্রমণের মধ্যে সেই ভ্রমণটা সব কিছুর মাত্রা ছাড়ায়। কিছুই জানতাম না, কোথায় থাকব, কি করব, সেখানকার মুদ্রার বিনিময়ের হার কেমন, এয়ারপোর্ট থেকে কিভাবে একটা ট্যাক্সি যোগাড় করব এবং ঠিক কোথায় গিয়ে ট্যাক্সিটা ডাকব। আমার জন্য সেখানে কেউ অপেক্ষা করে ছিল না। ইন্দোনেশিয়াতে আমার কোনো বন্ধু ছিল না। এমনকি বন্ধুর বন্ধুও না। আর জানেনই তো একটা মেয়াদ-উত্তীর্ণ গাইড বই রাখার মানে হচ্ছে সেটা আর না পড়া। চাইলেই ইন্দোনেশিয়াতে চার মাস থাকার অনুমতি আমি পাব না সেটা আমি বুঝতেই পারিনি। দেশটাতে ঢোকার সময় কেবল বুঝতে পেরেছিলাম আমি সেখানে এক মাস থাকার অনুমতি পেয়েছি, ইন্দোনেশিয়ার সরকার আমার যতদিন খুশি সেখানে থাকার ইচ্ছাকে স্বাগত জানিয়ে বাধিত হবেন, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

অমায়িক ইমিগ্রেশন অফিসার আমার পাসপোর্টে শুধু ত্রিশ দিন থাকার অনুমতি দিয়ে একটা সিল মেরে দিয়েছিল। আমি আমার হৃদ্যত্বাপূর্ণ ব্যবহার দিয়ে তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম,

আমি কি আরও কিছুদিন বেশি থাকতে পারি?

সেও আন্তরিকতার সাথে বলেছিল,

না।

বালিনিজরা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য বিখ্যাত। আমি তাকে বলেছিলাম,

দেখুন আমার এখানে তিন থেকে চার মাস থাকার কথা।

আমি উল্লেখ করিনি সেটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী। আমি বলিনি দশ মিনিট হাত দেখে এক কবিরাজ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমি সেখানে তিন থেকে চার মাস থাকব এবং খুব সম্ভবত সেই কবিরাজটা পাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কিভাবে বুঝিয়ে বলা যায়।

কিন্তু তখন মনে নানান ভাবনা এসে হানা দিয়েছিল। আসলে আমাকে সেই কবিরাজ ঠিক কি বলেছিলেন? তিনি কি আসলেই এমন বলেছিলেন যে, আমি আবার বালিতে এসে তার সাথে তিন থেকে চার মাস থাকব? তিনি কি আসলে বলেছিলেন 'তার সাথে? নাকি তিনি বুঝিয়েছিলেন আমি তার আশেপাশে কোথাও থাকব আর দশ বাক্স বিনিময়ে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে হাত দেখিয়ে যাব?' তিনি কি বলেছিলেন

www.pathagar.org

'আমি আসবই' নাকি তিনি বলেছিলেন 'আমার আসা উচিত'? তিনি কি আসলেই বলেছিলেন, পরে দেখা হবে? নাকি বলেছিলেন, কখনো দেখা হবে? সেই সন্ধ্যার পর থেকে আর কখনো তাঁর সাথে আমার দেখা হয়নি। আমি তখন জানি না কিভাবে তার সাথে দেখা করব এবং তার ঠিকানাই বা কি? আমি যে ঠিকানাটা কেবল জানতাম তা হলো,

কবিরাজ,
তার বাড়ির বারান্দা,
বালি, ইন্দোনেশিয়া।

আহ! এটা কোনো কাজের ঠিকানা হলো! আমি এও জানতাম না লোকটা বেঁচে আছে না মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। মনে পড়েছিল, যখন তার সাথে দেখা হয়েছিল সেসময় তিনি অতিমাত্রায় বয়স্ক ছিলেন। ততদিনে তার যে কোনো কিছুই হতে পারে। আমি নিশ্চিতভাবে কেবল তার নামটাই জানতাম। আর জানতাম সে উবুদ শহরের পার্শ্ববর্তী কোনো গ্রামে থাকেন কিন্তু গ্রামের নামটাও আমার মনে ছিল না।

আফসোস হচ্ছিল, 'নাহ এসব আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।'

৭৪

কিন্তু কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য বালি খুব অনুকূল একটা দেশ। সেটা সুদান নয় যে সেখানে অবতরণ করে কি করতে হবে তা বুঝতে পারব না। সেই দ্বীপটা দেলোয়ার প্রদেশের সম আয়তনের এবং পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয়। পুরো দেশটাই যেন আপনাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের ক্রেডিট কার্ড সর্বত্র সহজেই কাজে লাগানো যায়, সর্বত্র আনন্দের সাথে ইংরেজি বলা হয়। খারাপ শোনালেও বলতে হয় যে, আমাকে এটা চাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। কয়েক মাস ধরে, মস্তিষ্কের কোষগুলো আধুনিক ইটালি এবং প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা শিখতে গিয়ে এত এত শব্দ ভাণ্ডারে বোঝাই হয়ে ছিল। তখন আবার ইন্দোনেশিয়ার ভাষা শেখাটা আমি সহজে নিতে পারতাম কিনা কে জানে। এটা আমার জন্য অনেক কঠিন কিছুই হয়ে উঠত। কেননা বালিনিজবাসীদের ভাষা মঙ্গল গ্রহের ভাষা থেকেও অনেক কঠিন। কিন্তু সেখানে থাকাটা কঠিন কিছু ছিল না। এয়ারপোর্টেই আপনি আপনার টাকা বাস্ক মুদ্রায় বদলে নিতে পারবেন, সহজেই একটা ট্যাক্সি খুঁজে পাবেন, যার সেই গাড়ি চালকই আপনাকে একটা চমৎকার হোটেলের ঠিকানা দেবে। এসব কোনো কিছু ব্যবস্থা করাই আপনার জন্য কঠিন হবে না। সেখানে বোমা হামলার পর পর্যটন শিল্পের যে ধ্বস নেমেছিল তাতে বরং সেখানে থাকা আরও সহজ হয়ে গেছে। আমি গতবার আসার পরই হয়েছিল বোমা হামলা। প্রত্যেকেই এখন সাহায্য করতে প্রস্তুত, প্রত্যেকেই যেন কাজের জন্য উদগ্রীব।

www.pathagar.org

তাই আমি উবুদ শহরে যেতে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলাম, আমার কাছে মনে হয়েছিল শুরুর জন্য জায়গাটা চমৎকার। তারপর মাংকি ফরেস্ট রোডের একটা সুন্দর হোটেলে উঠেছিলাম। হোটেলটায় একটা সুন্দর সুইমিং পুল ছিল, আর ছিল নাতিশীতোষ্ণ ঋতুর ফুলগাছে ঘেরা একটা বাগান। ফুলগুলো একটা ভলিবলের চেয়েও বড় আকৃতির, হামিং বার্ড এবং প্রজাপতিদের সুসংগঠিত একটা দল এমনভাবে ছুটোছুটি করছিল যেন তারা সেই ফুলগুলোর সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করছে আর বালিনিজ কর্মীদের কথা কি বলব, হোটেলে ঢোকার সাথে সাথেই আদর আপ্যায়ন আর আপনার সৌন্দর্যের প্রশংসার ফুলঝুরি ছিটিয়ে দেবে তারা। আহ! এর সাথে কামরা থেকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গাছের শীর্ষভাগের দৃশ্য আর সকালের নাশতায় তাজা গ্রীষ্মকালীন ফলের স্তূপ। এক কথায় বলতে গেলে আমি যত জায়গায় ভ্রমণ করতে গিয়েছি তার মধ্যে সেটা শ্রেষ্ঠ জায়গা।

উবুদ বালির একেবারে মাঝামাঝি পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। ধান ক্ষেতের সারী আর হিন্দু মন্দিরে ঘেরা, জঙ্গলের গিরিখাত থেকে কেটে আসা নদী আর আছে দিগন্তে আগ্নেয়গিরির আভাস। উবুদ অনেক আগে থেকে সেই দ্বীপের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেটা এমন একটা জায়গা যেখানে প্রচলিত বালিনিজরা ছবি আঁকা, গান, নাচ, খোঁদাই এবং ধর্মীয় আচার পালন করে থাকে। উবুদ কোনো সমুদ্রতীরে অবস্থিত নয় তাই সেখানে যারা যায় তারা একটু ভিন্ন রুচিসম্পন্ন এবং নির্ঝঞ্ঝাট। যারা সমুদ্রতটে ঢেউয়ের আছড়ে পড়া দেখে পি না কলাডাস খাওয়ার চেয়ে একটা প্রাচীন মন্দির দেখতে আগ্রহ বোধ করে। কবিরাজের ভবিষ্যদ্বাণীর কি হবে তা মাথা থেকে বাদ দিলে উবুদে আমি অনায়াসে কিছুদিন কাটাতে পারতাম। শহরটা অনেকটা সানতা ফের ভূমধ্যসাগরীয় সংস্করণ। শুধু কিছু ব্যাপার আলাদা আর তা হলো যখন তখন বানরের হেঁটে যাওয়া আর সর্বত্র বালিবাসীদের তাদের প্রচলিত জামা-কাপড়ে চলাচল করা। সেখানে আছে ভাল ভাল রেস্তোরাঁ এবং ছোট সুন্দর একটা বইয়ের দোকান। বাটিক, ড্রামিং, অলংকার তৈরি, মাটির জিনিস তৈরি, প্রচলিত ইন্দোনেশিয়ান নাচ এবং রান্না, এসবের একটার পর আর একটা ক্লাসে ভর্তি হয়ে একজন আদর্শ ডিভোর্সি মহিলার মতো নিজেকে আবিষ্কার করতে পারতাম। সেসময় ডিভোর্সিদের যা যা করা উচিত, তা করে আমি সার্থকভাবে আমার পুরোটা সময় সেই উবুদেই কাটাতে পারতাম। আমার হোটেলের একদম বরাবর 'দা মেডিটেশন শপ' নামক একটা দোকান ছিল। সেখানে ব্যানার টাঙানো ছিল, 'প্রতি রাতে ছয়টা থেকে সাতটা। আর সাথে যে প্রতীকটা ছিল তার অর্থ আমি জানি 'পৃথিবীতে শান্তি চিরস্থায়ী হোক।' আহ্ সব যেন আমার জন্যই ছিল।

আমি যখন ব্যাগ থেকে কাপড়-জামা নামিয়ে গোছগাছ করছিলাম, তখন সন্ধ্যা হয়নি। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শহরটা একটু ঘুরে দেখব। আর তখনই আমার মাথায় ভাবনা এসেছিলো কিভাবে আমার কবিরাজকে খুঁজে বের করা যায়। মনে হচ্ছিল সেটা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। হয়ত কয়েকদিন বা সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। তাই আমি হোটেলের প্রবেশ মুখে বসে থাকা সেই কর্মচারী মারিওর কাছে থেমে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে কিনা।

www.pathagar.org

মারিও সেই হোটেলে কাজ করত। হোটেলে প্রবেশের সময়ই আমি তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম। বিশেষ করে তার নাম নিয়ে আলোচনা করার পর। খুব বেশিদিন হয়নি আমি এমন একটা দেশ থেকে এসেছিলাম যেখানে অনেকের নামই মারিও। কিন্তু তাদের কেউ এমন ছোট-খাঁট বালিনিজ পুরুষ ছিল না, যে কি না সিল্কের সেরং পড়ে, কানের গোড়ায় ফুল গুঁজে রাখে। ব্যাপারটা ইটালিয়ানদের সাথে খাপ খায় না, তাই আমাকে তখন জিজ্ঞেস করতেই হয়েছিল,

তোমার সত্যিকারের নাম কি মারিও? এটাতো মনে হচ্ছে না ইন্দোনেশিয়দের নাম!

আমার আসল নাম নয়। আমার সত্যিকারের নাম নেওম্যান।

আলবৎ। আমার বোঝা উচিত ছিল। মারিওর আসল নাম আন্দাজ করে বলার পঁচিশ শতাংশ সম্ভাবনা আমার আসলে আগে থেকেই ছিল।

বালিতে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক জনসংখ্যার একটা বড় অংশের নাম মোট চারটা। নামগুলো হচ্ছে, ওয়াইয়ান, মাহদে, নেওম্যান এবং কেটুট। এই নামগুলোর মানে হচ্ছে যথাক্রমে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। জন্মের সময়গত অবস্থানের ওপর নির্ভর করে এই নামকরণ করা হয়। যদি এক্ষেত্রে পঞ্চম বাচ্চা হয় তবে নামকরণ চক্র অনুযায়ী আবার প্রথমটাই নির্ধারিত হবে। তাই পঞ্চম বাচ্চার নাম হবে এক্ষেত্রে 'ওয়াইআন নাম্বার দুই' এবং সেভাবেই বাকি চারটা যাবে। যদি যমজ বাচ্চা হয় তাহলে আপনি তাদের জন্মের ক্রম অনুযায়ী তাদের নামকরণ করবেন। কারণ বালিতে আসলেই এই চারটি নামই প্রচলিত। উচ্চপর্যায়ের এলিটরা অবশ্য তাদের নাম নিজে নির্বাচন করে নেন। এরকম পুরোপুরি সম্ভাবনা আছে যে একজন ওয়াইআন আর একজন ওয়াইআনকে বিয়ে করেছে এবং তাদের প্রথম সন্তানের নামও ওয়াইআন।

ব্যাপারটা এটাই প্রমাণ করে বালিতে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। আর সেই পরিবারে একজনের অবস্থানটাও কতটা জরুরী। আপনার হয়ত মনে হবে এই ব্যবস্থাপনা জটিল হওয়ার কথা কিন্তু বালিনিজরা কিভাবে যেন তা মানিয়ে নিয়েছে। অবস্থানের সহজবোধ্যতার প্রয়োজনে সেখানে ডাকনাম এত জনপ্রিয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উবুদে একজন সফল নারী ব্যবসায়ী আছেন যার নাম ওয়াইআন। তার একটা ক্যাফে রেস্তোরাঁ আছে যার নাম ক্যাফে ওয়াইআন। সে নিজে আবার 'ওয়াইআন ক্যাফে' হিসেবে পরিচিত। 'ওয়াইয়ান ক্যাফে' শব্দের অর্থ হচ্ছে, ওয়াইআন একজন ব্যক্তি যে কিনা ক্যাফে ওয়াইআনের মালিক। হাহা।

সেখানে কেউ হয়ত এভাবেও পরিচিত হতে পারে, মোটা মাহদে কিংবা নিউমেন রেন্ট এ কার কিংবা বোকা কেটুট যে তার চাচার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার বন্ধু মারিও নিজেও তার নাম নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়ে এই নতুন নামকরণ করেছে। কিন্তু আমি আমার কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করেছিলাম,

কিন্তু কেন মারিও?

কারণ ইটালিও সব কিছু আমি পছন্দ করি।

আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি ইটালিতে বেশ কিছুদিন থেকে এসেছি। সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে এভাবে ডেস্কের পেছন থেকে বের হয়ে এসে আমাকে

www.pathagar.org

বলেছিল, 'এসো, বস, কথা বলি।' তাই আমি বসে তার সাথে কথা বলছিলাম এবং সেভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

সঙ্গতভাবে, সেই সন্ধ্যায় আমি আমার কবিরাজকে খোঁজার পরিকল্পনা আমার বন্ধু মারিওকে দিয়েই শুরু করতে চাচ্ছিলাম। যদি কোনোভাবে সে কেটুট লিয়ার নামে কাউকে চিনে থাকে!

কথাটা শুনে, মারিও ভ্রূ কুঁচকে ভাবছিল,

আমি অপেক্ষা করছিলাম সে হয়ত বলবে, 'আহ! হ্যাঁ! কেটুট লিয়ার! বুড়ো কবিরাজ! সে তো গত সপ্তাহে মারা গেছে। আহারে! খুবই খারাপ লাগে যখন এমন প্রবীণ কবিরাজরা এভাবে চলে যায়...।'

মারিও আমাকে নামটা আবার বলতে বলেছিল এবং সেইবার আমি তাকে নামটা লিখে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ আমি আসলে ভুল ভাবেই উচ্চারণ করছিলাম। চিনতে পেরে মারিওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল,

হ্যাঁ কেটুট লিয়ার।

তখন আমি আবার অপেক্ষা করছিলাম সে হয়ত বলবে,

আহ কেটুট লিয়ার। পাগল একটা লোক। তাকে তো গত সপ্তাহে পাগল মনে করে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

কিন্তু এর বদলে সে বলেছিল,

কেটুট লিয়ার একজন বিখ্যাত নিরাময়কারী।

হ্যাঁ। সেই তো। আমি তাকে চিনি। আমি তার বাড়িতেও গিয়েছি। গত সপ্তাহে আমার চাচাতো বোনকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর বাচ্চাটা সারা রাত কান্না করত। সে তার চিকিৎসা করেছে। একবার আমি তোমার মতো একজন আমেরিকান মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই মেয়েটির এমন মন্ত্রের দরকার ছিল যাতে সে পুরুষের চোখে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। কেটুট লিয়ার তাকে একটা জাদুময়ই ছবি এঁকে দিয়েছিলেন যাতে সে আরও সুন্দর হতে পারে। এরপর থেকে তাকে আমি দেখলেই খেপাতাম। প্রতিদিন তার সাথে দেখা হলেই বলতাম, আরে তাইতো! দেখো দেখো! ছবিটা কাজ করছে। কত সুন্দর হয়ে গেছ তুমি। ছবি কাজ করছে।

মনে পড়েছিল, কয়েক বছর আগে কেটুট লিয়ার তো আমার জন্যও তেমন একটা ছবি এঁকে দিয়েছিল। আমি মারিওকে বলেছিলাম সে আমার জন্যও এমন একটা ছবি এঁকে দিয়েছিল এক সময়।

সে হেসে বলেছিল,

ছবি কি তোমার ক্ষেত্রেও কাজ করছে?

আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম,

আমার ছবিটা ছিল ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য।

সে তখন দ্বিধান্বিত,

তুমি কি পুরুষের চোখে আরও সুন্দর হতে চাও না।

হেই মারিও তুমি কি আমাকে কবিরাজের কাছে কখনো নিয়ে যেতে পারবে? যদি তোমার তেমন ব্যস্ততা না থাকে?

www.pathagar.org

এখন না।

আমি হতাশ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে বলে ফেলেছিল,

এখন না, কিন্তু হয়ত পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যেতে পারব।

৭৫

আর এভাবেই বালিতে প্রথম সন্ধ্যাটা শুরু হয়েছিল। আমি আমার নতুন ইটালিয়ান-ইন্দোনেশিয়ান বন্ধু মারিওর মোটর বাইকে চড়ে বসেছিলাম এবং সে আমাকে নিয়ে ধান ক্ষেতের সারির ভেতর দিয়ে কেটুট লিয়ারের বাড়ির দিকে ছুটে গিয়েছিল। কবিরাজের সাথে এই সাক্ষাৎ নিয়ে আমি দুই বছর ধরে ভেবেছিলাম কিন্তু সেদিন প্রথমে তাকে কি বলব এ-নিয়ে আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। সাক্ষাতের অনুমতি নেওয়া ছিল না বলে আমাকে অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল। আমি দরজার বাইরের চিহ্নটা চিনতে পেরেছিলাম। যার মানে হলো, 'কেটুট লিয়ার-চিত্রশিল্পী।' বাড়িটাকে ঐতিহ্যবাহী বালিনিজ পরিবারের বসতভিটার একটা উৎকৃষ্ট নমুনা বলা যেতে পারে। পুরোটা সীমানা একটা কঠিন পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে একটা উঠান আর পেছনের দিকে মন্দির। বংশানুক্রমিকভাবে পুরো বংশের সবাই সেখানে এরকম দেয়ালের ভেতর, পাশাপাশি ঘরে জীবন কাটায়। আমরা আওয়াজ না দিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম বলে, হয়ত বালিনিজ প্রহরী কুকুরটা ক্ষেপে গিয়েছিল। অবশ্য দরজা নেই, উঠানের মাঝে বসে ছিল বৃদ্ধ কেটুট লিয়ার। গায়ে ছিল সেরং এবং গলফ কুর্তা। ঠিক দুই বছর আগে সে দেখতে যেমন ছিল তখনো ঠিক তেমনটাই ছিল। মারিও কেটুটকে কিছু বলেছিল। আমি ইন্দোনেশিয়ান ভাষা অতটা না বুঝতে পারলেও মনে হয়েছিল, সে তখন একটা সাধারণ পরিচয় দিচ্ছিল। অনেকটা এরকম, 'এই যে এই মেয়েটি আমেরিকা থেকে এসেছে। কি করবে কর।'

কেটুট তার দাঁতহীন হাসি দিয়ে সমবেদনার আর নিশ্চয়তার ঝাঁপি খুলে দিয়েছিল। ভাবছিলাম। 'বাহ! আমাকে দেখি তার ঠিকঠাক মনে আছে।' সে উত্তেজনায় প্রবলভাবে আমার হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলেছিল,

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

হা ঈশ্বর! ততক্ষণে বুঝতে পেরেছিলাম তার মনেই নেই আমি কে।

সে বলেছিল,

আসো আসো ভেতরে আসো।

তার বাড়ির আঙ্গিনা সেটা। সেখানে বেতের বোনা মাদুরও আসবাব হিসেবে বিবেচিত হয়। একেবারে দুবছর আগে যেমনটা ছিল সবকিছু তেমনই ছিল। আমরা দুজনই বসেছিলাম। সাধারণ অনুমানে সে হয়ত ভাবছিল সকল পশ্চিমা দর্শনার্থীদের মতো আমিও তাকে হাত দেখাতে গিয়েছি তাই সে বিনা দ্বিধায়

www.pathagar.org

আমার হাতের তালু তার হাতে নিয়েছিল। সে খুব দ্রুত আমার হাত দেখছিল আর তাতে আমি আবার এই আশায় বুক বেধেছিলাম যে, সে হয়ত গতবারের ভবিষ্যদ্বাণীর সংক্ষিপ্ত কিছু বলবে। আমার মুখ হয়ত তার মনে নেই, কিন্তু আমার ভাগ্য তা, তার দক্ষ চোখে একরকমই থাকার কথা। যতদূর বুঝতে পেরেছিলাম, তাতে তার ইংরেজি বলারও উন্নতি হয়েছিল। এমনকি মারিওর চেয়েও ভাল বলছিল কেটুট। ধ্রুপদী ইংরেজি ছবিতে বুদ্ধিমান বৃদ্ধ চাইনিজ লোক যেভাবে বলে ঠিক সেরকম। ইংরেজির এই সংস্করণকে বলা যায় 'ঘাসফড়িঙ' সংস্করণ। যে কোনো বাক্যের মাঝে আদর সোহাগী ঘাসফড়িঙ আবেগ ঢুকিয়ে দেওয়া যা শুনতে বেশ ভাল শোনায়।

আমি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে কেটুট লিয়ারের ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে চেয়েছিলাম। তারপর তাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছিলাম আমি তার সাথে দেখা করতে দুই বছর আগে একবার এসেছি।

তাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল,

বালিতে প্রথমবার নয় তাহলে।

না, স্যার।

সে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল,

তুমি কি ক্যালিফোর্নিয়ায় থাক?

আমি গভীর উদ্যম নিয়ে বলেছিলাম,

না। আমি নিউইয়র্ক থাকি।

যদিও জানতাম না আমাকে এগুলো বলে কি হবে কিন্তু কেটুট আমাকে বলেছিলেন, 'আমি দেখতে এখন আর তেমন ভাল নই। আমার সব দাঁত পড়ে গেছে। হয়ত কোনোদিন আমাকে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে নতুন দাঁত লাগাতে হবে। কিন্তু দাঁতের ডাক্তার আমি ভয় পাই।'

তিনি তাঁর মুখের ভেতরের খাঁ খাঁ অরণ্য দেখিয়েছিল, যেখানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে। বাম পাশের একটা দাঁতও ছিল না আর ডান পাশের প্রায় সব দাঁত ভাঙা। কোনোমতে হলুদ দন্তমূল দেখা যাচ্ছিল। তিনি নাকি পড়ে গিয়েছিলেন যার কারণে তার সব দাঁত নড়ে গিয়েছে।

আমি তাকে বলেছিলাম,

দুঃখিত।

তারপর আস্তে আস্তে চেষ্টা শুরু করেছিলাম,

আমার মনে হয় না আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন কেটুট। আমি এখানে তিন বছর আগে এসেছিলাম একজন আমেরিকান যোগ শিক্ষকের সাথে।

সে উল্লসিত হাসি দিয়ে জানিয়েছিল,

আন বারোস! আমি চিনি।

'একদম ঠিক। আন বারোস একজন যোগ শিক্ষক। কিন্তু আমার নাম লিজ। আমি এখানে আমার নিজের সাহায্যর জন্য এসেছিলাম। আমি তখন ঈশ্বরকে কাছাকাছি অনুভব করতে চাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে একটা জাদুর ছবি এঁকে দিয়েছিলেন।'

www.pathagar.org

তিনি বিনয়ের সাথে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন,

মনে নেই।

মজার একটা দুসংবাদ। ভাবছিলাম, 'তাহলে বালিতে এখন আমি কি করব?' আমার মনে নেই কেটুটের সাথে পুনরায় সেই সাক্ষাৎ নিয়ে আমি কি কল্পনা করেছিলাম তবে আশা করেছিলাম খুব আবেগীয় একটা পূর্ণর্মিলনী হবে সেটা। যে পর্যন্ত আমার কাছে সেটা সত্য ছিল আমি ভয় পাচ্ছিলাম, তিনি হয়ত মরে গেছেন কিন্তু এমন কখনো ভাবিনি যে তিনি বেঁচে আছেন ঠিকই কিন্তু আমাকে চিনতে পারছেন না।

মনে হচ্ছিল আমি কানা ও বোবা। আমি ভেবেছিলাম আমাদের প্রথম সাক্ষাৎটা আমার মনে যেমন দাগ কেটেছিল তেমন তার মনেও দাগ কেটেছে। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত পরিকল্পনাটা বাস্তবসম্মত না।

তাই আমি তাঁকে সেই ছবিটার বর্ণনা দিতে শুরু করেছিলাম যেটাতে চারটা পা ছিল এবং কোনো মাথা ছিল না। তিনি আমার কথা এমন শান্ত ও ভদ্রভাবে শুনছিলেন যেন কারো সমগ্র জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

আমার এই ব্যাপারটা বলতে ঘৃণা লাগছিল তবু কোনোমতে বলতে হয়েছিল,

আপনি বলেছিলেন আমি আবার বালিতে আসব, তিন চার মাস থাকব। আর আপনি আমার কাছ থেকে ইংরেজি শিখবেন আর আপনি যা জানেন তা আমাকে শেখাবেন।

নিজের এই উত্তেজিত কণ্ঠস্বরটা আমার কাছে ভাল লাগেনি। আমি উল্লেখ করিনি তিনি তখন আমাকে তাঁর পরিবারের সাথে থাকতে বলেছিলেন। যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল তাতে সে কথা বলাটা আরও বেঢপ শোনাত।

তিনি আমার কথা শুনে এভাবে মাথা দুলিয়েছিলেন যেন তিনি বলছিলেন, মানুষজন এমন কথা বললে হাসি তো পাবেই।

আমি ব্যাপারটা সেখানেই শেষ করে দিতে পারতাম কিন্তু যেখানে এতদূর যখন বলেই ফেলেছি শেষ চেষ্টাটা না করলেই নয়। তাই বলেছিলাম,

আমি সেই লেখিকা কেটুট। আমি সেই নিউইয়র্কের লেখিকা।

কোনো একটা কারণে এই কথাটাই কাজ করেছিল। হঠাৎ তার মুখ আনন্দে ঝলমলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখভঙ্গি শুদ্ধ এবং তরল হয়ে উঠেছিল। তার মনে যেন জীবনদায়িনী রোমান মোমের আলো জ্বলে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন,

তুমি! তুমি! আমার মনে পড়েছে।

তিনি তখন আমার দিকে ঝুঁকে আমার কাঁধ তার হাতে নিয়ে ঝাঁকাতে শুরু করেছিলেন, যেভাবে বাচ্চারা ক্রিসমাসের উপহারের মোড়কের ভেতর কি আছে জানতে বাক্সটা ঝাঁকায়।

তুমি ফিরে এসেছ! তুমি ফিরে এসেছ!

আমি বলেছিলাম,

আমি ফিরে এসেছি! আমি ফিরে এসেছি!

তুমি, তুমি, তুমি!

আমি, আমি, আমি!

www.pathagar.org

আমার তখন প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা কিন্তু তা বোঝাতে চাইনি। আমার সেই মুক্তির গভীরতা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

ব্যাপারটা আমাকেও চমকে দিয়েছিল। যেন সেটা একটা সড়ক দুর্ঘটনা। যেন, আমার গাড়ি একটা ব্রিজ থেকে পড়ে নদীর মাঝখানে ডুবে গেছে। আমি কোনোভাবে নিজেকে মুক্ত করে জানালা দিয়ে বের হতে পেরেছি। তারপর অনেক কষ্ট করে সারাদিন সাঁতার কেটেছি প্রায় অক্সিজেনহীন এবং আমার আর্টারি ঘাড় ফেটে বের হচ্ছে এবং আমার গাল দুটি আমার ঘন নিশ্বাসে ফোলা। আর তারপর শ্বাস টেনে বাতাস নিতে পারা। আমি পাড়ে এসে আছড়ে পড়েছি এবং প্রচুর পরিমাণে বাতাস টেনে নিয়েছি এবং সেই আছড়ে পড়ে শ্বাস নিয়েই আমি বেঁচে গেছি।

ঠিক এমনই অনুভব হয়েছিল যখন ইন্দোনেশিয়ান মানুষটা আমাকে বলেছিলেন,

তুমি ফিরে এসেছ!

হ্যাঁ। আমার পরিত্রাণ পাওয়াটা ঠিক এতটাই বড় ছিল। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি অবশেষে তিনি আমাকে চিনতে পারবেন।

আমি বলেছিলাম,

হ্যাঁ আমি এসেছি। অবশ্যই আমি এসেছি।

তিনি বলেছিলেন,

আমি খুব খুশি।

আমরা হাত ধরা অবস্থায় দুজনেই খুব উত্তেজিত ছিলাম। তিনি বলছিলেন,

আমার মনে আছে তুমি যখন প্রথম এসেছিলে! অনেক আগে! তোমাকে এখন তখনকার মতো দেখাত না। দুই বছর আগে থেকে তুমি এখন অনেকটাই অন্যরকম। শেষবার তুমি খুব বিষণ্ন দেখতে ছিলে। এখন কত্ত খুশি। অন্য একটা মানুষ।

এই ধারণাটা– এই যে দুই বছরে একজন মানুষের বদলে যাওয়াটা যেন তাঁর ভেতর খলখলে হাসির কম্পন ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

আমি কেটুটের সামনে আমার কান্না লুকাইনি। সব কান্নার ধারা বর্ষণ করে দিয়েছিলাম।

হ্যাঁ কেটুট আগে আমি অনেক দুঃখী ছিলাম। কিন্তু এখন জীবন ভালোই চলছে।

শেষবার তোমার একটা বাজে বিবাহবিচ্ছেদের ঝামেলা ছিল, ভাল ছিলে না।

আমি তাকে নিশ্চিত করেছিলাম,

না ভাল ছিলাম না।

শেষবার তোমার অনেক দুশ্চিন্তা ছিল অনেক কষ্ট ছিল। তুমি দেখতে কুৎসিত ছিলে, কোনো সৌন্দর্য ছিল না কিন্তু এখন তোমাকে যুবতী মেয়েদের মতো দেখাচ্ছে।

মারিও পরমানন্দে ফেটে পড়েছিল এবং জয়ীর মতো উচ্চারণ করেছিল,

দেখেছ? ছবি কাজ করেছে!

আমি বলেছিলাম,

আচ্ছা আপনি কি এখনো চান আমি আপনার ইংরেজি শেখার ব্যাপারে সাহায্য করি কেটুট?

তিনি বলেছিলেন,

তুমি এখন থেকেই কাজে লেগে যাও।

www.pathagar.org

তারপর কেটুট বামনের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে খুঁড়িয়ে তাঁর বাড়ির ভেতর থেকে চিঠির স্তূপ নিয়ে এসেছিলেন। ভাবছিলাম, চিঠি! তার মানে তার একটা ঠিকানা আছে! তিনি আমাকে চিঠিগুলো জোরে জোরে পড়তে বলেছিলেন। কেননা তিনি ভাল বলতে পারেন কিন্তু তেমন পড়তে পারেন না। আমি ইতোমধ্যে তাঁর সহকারী হয়ে গেলাম। আমি একজন কবিরাজের সহকারী! কি চমৎকার! যারা কোনোভাবে কেটুটের জাদুর ছবি সংগ্রহ করতে পেরেছিল সেইসব বৈদেশিক সংগ্রাহকদের চিঠি ছিল সেগুলো। একটা চিঠি ছিল অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রাহকের। সে হাতে আঁকা ছবির কেটুটের প্রশংসা করে লিখেছিল, 'তুমি এত বিশ্লেষনধর্মী ছবি আঁকার মতো বুদ্ধি কোথায় পেলে?'

তা শুনে কেটুট আমাকে ডিকটেশন দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'কেননা আমি অনেক অনেক বছর অনুশীলন করেছি।'

চিঠিগুলো পড়া শেষ হলে কেটুট তার জীবনের বিগত কয়েক বছরের খবরাখবর জানিয়েছিলেন। তাঁর একটা বৌ আছে। তিনি আমাকে হাত দিয়ে উঠানে একজন ভারী মহিলাকে দেখিয়ে ছিলেন যে কিনা রান্নাঘরের দরজার ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিলাটি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল যেন বুঝতে পারছিল না আমাকে কি প্রথমেই গুলি করবে নাকি প্রথমে বিষ খাইয়ে পরে গুলি করবে। গতবার আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন কেটুট তার মৃতা স্ত্রীর ছবি দেখিয়েছিলেন। তার প্রথম স্ত্রী একজন সুন্দরী বালিনিজ মহিলা, যে কিনা প্রৌঢ় বয়সেও কিশোরীদের মতো দেখতে ছিল। আমি চোখ ঘুরিয়ে তাঁর নতুন স্ত্রীকে দেখেছিলাম, সে রান্নাঘরে ফিরে যাচ্ছিল।

'ভাল মহিলা। খুব ভাল মহিলা।' কেটুট রান্নাঘরের ছায়ার দিকে নির্দেশ করে প্রচার করেছিলেন।

তিনি বলে চলছিলেন, সে তাঁর বালিনিজ রুগী নিয়ে অনেক ব্যস্ত। সব সময়ই তাকে অনেক কিছু করতে হয়। নতুন বাচ্চাদের জন্য জাদু দেখাতে হয়, মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে যেতে হয়, অসুস্থ মানুষদের আরোগ্যের ব্যবস্থা করতে হয়, বিয়েতে যেতে হয়। এর পরের বার কোনো বালিনিজ বিয়েতে গেলে সে আমাকে নিয়ে যাবে। শুধু একটাই সমস্যা তার এখন পশ্চিমা রুগী কম আসে। সেই সন্ত্রাসী বোমা হামলার পর বালিতে তেমন কেউ আসে না। আর সেক্ষেত্রে ভাঙা ইংরেজিতে তিনি বলেছিলেন, 'আমার মনে অনেক দ্বিধা' আর 'ব্যাংক খালি।' তিনি বলেছিলেন,

তুমি প্রতিদিন আমার বাড়িতে আমাকে ইংরেজি শেখাতে আসবে।

আমি খুশি হয়ে মাথা নেড়েছিলাম,

আর আমি তোমাকে বালিনিজ ধ্যান শেখাব। ঠিক আছে?

আমি বলেছিলাম,

ঠিক আছে।

তিনি বলেছিলেন,

তোমাকে বালিনিজ ধ্যান শেখাতে তিন মাসই যথেষ্ট। এভাবে তুমি ঈশ্বরের দেখা পাবে। হয়ত চার মাস লাগবে। তুমি কি বালি পছন্দ কর?

আমি বালিকে ভালোবাসি।

www.pathagar.org

তুমি কি বালিতে বিয়ে করেছ?

না তো।

আমার মনে হচ্ছে খুব দ্রুত এমন কিছু হবে। তুমি কাল আসবে।

তিনি তাঁর সাথে এই বাড়িতে থাকার কথা উল্লেখ করেননি আমিও সে কথাটা তুলিনি। শুধু রান্নাঘরে থাকা তার ভয়াবহ স্ত্রীর দিকে এক ঝলক তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, হয়ত পুরোটা সময় আমি আমার মিষ্টি হোটেলটাতে থাকব তা বরং আরও আরামদায়ক হবে। যাহোক প্রতিদিন তাঁর সাথে দেখা করতে যেতে হলে আমার একটা বাই সাইকেল দরকার ছিল।

আমি বলেছিলাম,

তাহলে যাই এখন। যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

আমার হাত ঝাঁকিয়ে তিনি বলেছিলেন,

তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

সেদিন আমি তাকে প্রথম ইংরেজি শিক্ষাটা দেই। আমি তাকে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম আর দেখা করে খুশি হলাম এই দুইয়ের পার্থক্য শিখিয়েছিলাম। তাকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম আমরা পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছি এটা বলি প্রথমবার যখন আমরা পরিচিত হই। আর অন্য সময়ে প্রতিবার দেখা হওয়ার সময় আমরা বলি 'দেখে খুশি হলাম।' কেননা পরিচয় একবারই হয় মানুষের সাথে মানুষের আর এরপর থেকে দেখা হয় রোজ রোজ বা প্রায়ই।

সে এটা পছন্দ করেছিল। এটাকে অনুশীলন করতে শুরু করেছিল। বলেছিল,

আপনাকে দেখে খুশি হলাম। আমি আপনাকে দেখতে পারি, আমার চোখ আছে। আমি কানা নই। আমি চোখে দেখি।

এতে আমরা সবাই হেসে ফেলেছিলাম। এমনকি মারিওও। কথা দিয়েছিলাম পরদিন সন্ধ্যায় আবারও যাব। সে পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন,

পরে দেখা হবে। তোমার বিবেক তোমার পথ পদর্শক হোক। তোমার যদি কোনো পশ্চিমা বন্ধু থেকে থাকে তাহলে তাকে আমার কাছে হাত দেখার জন্য পাঠিও। সেই বোমা হামলার পর আমার ব্যাংক একদম খালি। আমি একজন স্ব-শিক্ষিত। তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগল লিজ।

আমারও আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগল কেটুট।

৭৬

দুই হাজার মাইল লম্বা ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জ মিলে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম অধ্যুষিত মুসলমান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বালি খুব ছোট একটা হিন্দু দ্বীপ। বালির ব্যাপারটা অদ্ভুত, এটার তো থাকারই কথা না এক হিসেবে। জাভা থেকে এই দ্বীপে হিন্দু ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। ভারতীয়

www.pathagar.org

বণিকগণ এইদিকে হিন্দু ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে। জাভার রাজা বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন। বরদুয়ারে ধ্বংসপ্রাপ্ত ছোট মন্দিরটি ছাড়া তাঁর কোনো নিদর্শন এখন আর অবশিষ্ট নেই। ষোল 'শ খ্রিস্টাব্দে একটা রক্তক্ষয়ী মুসলিম জাগরণের মাধ্যমে সেই রাজ্য সমূলে উৎপাটিত করা হয় এবং শিবের পূজারী হিন্দু রাজবংশ জাভা পালিয়ে যায়। বালির এই ঘটনাকে 'মাজাপাহিত প্রস্থান যাত্রা' বলা হয়ে থাকে। উচ্চশ্রেণির এবং উচ্চবর্ণের জাভাবাসীরা বালিতে কেবল তাদের রাজবংশীয়দের এনেছিলেন। তাদের কারিগর, তাদের পূজারী। তাই বললে বেশি হবে না, বালিতে যারা আছেন তারা সবাই হয় রাজা, না হয় পূজারী, না হয় কোনো পূজারীর বংশধর। আর এ জন্য বালিনিজদের এমন অহংকার এবং বুদ্ধিমত্তা।

জাভানিজরা তাদের সাথে হিন্দু বর্ণ প্রথা আনলেও বর্ণবাদ বালিতে ভারতের মতো ততটা ভয়াবহভাবে কার্যকর হতে পারেনি। তবুও মাঝে মাঝে বালিবাসীরা একটা জটিল সামাজিক যাজক-তন্ত্র নিয়ে ভোগান্তিতে পড়ে। সেখানকার জটিল এবং আবদ্ধ গোত্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে সেটা আমাকে বুঝতে চেষ্টা করতে হয়নি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। আমার ধারণা এর চেয়ে মানুষের ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার করাও সহজ। লেখক ফ্রেড বি আইসম্যান বালিনিজ সংস্কৃতি নিয়ে অনেক ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানে আমার উল্লেখিত এই অংশই নয় বরং পুরো বইতে বালির সম্পর্কে নানান তথ্য আমি তাঁর গবেষণা থেকেই নিয়েছি।

বালিতে সবাইকে একটা গোত্রের অধীনে থাকতে হয়। যাতে সে বুঝতে পারে সে কোন গোত্রের অধীনে এবং সবাই যাতে বুঝতে পারে বাকি সবাই কোন গোত্রের অধীনে। আর কেউ যদি কোনো গুরুতর অবাধ্যতার কারণে গোত্র থেকে বিতাড়িত হয় তাহলে ধরে নিতে হবে সে আগ্নেয়গিরিতে ঝাঁপ দিয়েছে। কারণ সত্যি বলতে সে তখন মরে গেলেও ভালো।

সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি হচ্ছে বালিনিজ সংস্কৃতি। এটা হচ্ছে তাদের কর্ম সম্পাদনা এবং অনুষ্ঠানের একটা মহান সমন্বয়। বালিবাসীরা বদ্ধমূলভাবে, কার্যকরভাবে একটা বিশাল প্রথার ভেতর রয়েছে। এর সাথে নানান কারণ জড়িত তবে বিশেষ করে বলা যায় বালি একটা বিশাল ধান উৎপাদনকারী সমাজ। এই কাজে জাতিগত অংশগ্রহণ এবং কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজন হয়। আর তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হিন্দু ধর্মের ব্যয় বহুল ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ধান চাষ, দেখাশোনা এবং প্রকৌশলের জন্য অবিশ্বাস্য পরিমাণ সামষ্ঠিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। তাই বালির প্রতিটি গ্রামে 'বানজার' আছে। বানজার হচ্ছে সবকিছু দেখাশোনা করার জন্য নাগরিকদের একটা সুসংগঠিত দল। এই দলের ঐক্যমতে রাজনৈতিক, অর্থনীতিক, ধর্মীয় এবং কৃষিকাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বালিতে স্বতন্ত্রতা থেকে সামষ্ঠিকতা বেশি জরুরী। হয় সবাই খাবে, না হয় কেউ খাবে না এমন।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে এখানে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভুললে কি চলে সাতটি আগ্নেয়গিরি সেখানে অবস্থিত। যার সক্রিয় হয়ে যাওয়ার কোনো দিন ক্ষণ কারো জানা নেই। সেখানে থাকলে আপনিও হয়ত ঈশ্বরকে ডাকবেন। হিসাব

www.pathagar.org

করে দেখা গেছে একজন সাধারণ বালিনিজ মহিলাকে তাঁর মোট সময়ের এক-তৃতীয়াংশ হয় নানান আচার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে কাটাতে হয় আর না হয় অনুষ্ঠান শেষে তাঁর পরিষ্কার কার্যে ব্যয় করতে হয়। সেখানে মানুষের জীবন, আচার-অনুষ্ঠানের ক্রমাগত পালাবদলে কাটে। একজনকে অবশ্যই তা সঠিকভাবে, সঠিক উদ্দেশ্যে পালন করতে হয়। তা না হলে যেন পুরো পৃথিবী তাঁর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। মার্গারেট মিড বালিনিজদের এই অবিশ্বাস্য রকম ব্যস্ততা নিয়ে লিখেছিলেন। আর এটা আসলেই সত্য যে, বালিনিজদের অলস মুহূর্ত কিছু কমই আছে। সেখানে কিছু আচার পালন করতে হয় দিনে পাঁচবার এবং অন্য কিছু অবশ্যই দিনে একবার আবার এমন কিছু আছে যা সপ্তাহে একবার, মাসে একবার, বছরে একবার, দশ বছরে একবার, একশো বছরে একবার এবং এক হাজার বছরে একবার। একজন যাজক এবং পবিত্র মানুষ দ্বারা, একটা জটিল পদ্ধতির দিন পঞ্জিকায় এসবের হিসাব রাখা হয়।

বালিতে প্রতিটি মানুষের জীবনে তিনটি উচ্চ পর্যায়ে সুসংগঠিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। আত্মিক তুষ্টির বিশাল আচার অনুষ্ঠানও সারা জীবন ধরে পালন করতে হয়। এতে ১০৮ টি দোষ থেকে আত্মা মুক্ত থাকে। হ্যাঁ! এখানেও সেই সংখ্যা-১০৮ বিদ্যমান। এদের মধ্যে সন্ত্রাস, চুরি, অলসতা আর মিথ্যা অন্তর্ভুক্ত। যৌবনের শুরুতে চারিত্রিক উন্নতির জন্য একটা আচার পালন করতে হয় যেখানে কুকুরের দাঁত বা ভয়াবহ পশুর দাঁত মাটিতে বিছিয়ে রাখা হয়। তাঁর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, শ্বাপদত্বের এত কাছাকাছি নিয়মগুলো বোনা হয়েছে যে এতে মানুষের নিষ্ঠুর মানসিকতা তৈরির ঝুঁকি আছে।

সমগ্র গ্রামের সমবায়ের জাল টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে যেতে পারে যদি একজন কোনো নিয়মের বাইরে কাজ করে। এখানে সবচেয়ে ভাল জিনিসটি হচ্ছে আলাস, যার মানে 'শুদ্ধ করণ' কিংবা 'সুন্দরীকরণ।' বালিতে নারী পুরুষ সকলের জন্য সৌন্দর্য খুব বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। সেখানে সৌন্দর্য পূজা, সৌন্দর্য নিরাপত্তা। শিশুদেরকেও সকল কষ্ট আর অস্বস্তির মধ্যে 'একটি উজ্জ্বল মুখ' মানে একটা বিশাল হাসির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বালির এই পুরো নিয়মটা একটা ম্যাট্রিক্স। বিশাল অদৃশ্য শক্তি, প্রশিক্ষণ, পথ এবং প্রথা এবং এর সারিবদ্ধ জাল। প্রতিটা বালিবাসী জানে এই মহান অবোধ্য সারির মানচিত্রের ঠিক কোথায় সে অবস্থিত। প্রায় প্রতিটা বালিনিজদের নামের দিকে তাকিয়েই দেখুন না– প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ– জন্মলগ্নেই তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় তারা কখন জন্ম নিয়েছে এবং তা কোথায়। হ্যাঁ এভাবেই তাদের পদ্ধতি সাজানো। আপনি এমন একটা মানচিত্রের পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারবেন না যদি আপনার বাচ্চাদের নাম হয় পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। আমার নতুন ইন্দোনেশিয়ান-ইটালিয়ান বন্ধু মারিও আমাকে বলেছে সে তখনই খুশি থাকে যখন সে আত্মিক ও মানসিকভাবে সমতল এবং উল্লম্ব এই দুই অবস্থার ছেদ বিন্দুতে নিজেকে রাখতে পারে। সেজন্য তাকে প্রতি মুহূর্তে জানতে হয় সে ঈশ্বরের সাথে এবং পৃথিবীতে মানুষের সাথে সম্পর্কের কোন অবস্থানে আছে। যদি সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে তার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলবে।

www.pathagar.org

হাস্যকর কথা না, কথাটা সত্য। ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বালিনিজরা আসলেই পৃথিবীর মধ্যে সেরা। সেখানকার মানুষদের কাছে ভারসাম্য রক্ষা একটা শিল্প, একটা বিজ্ঞান, একটা ধর্ম। এই বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে স্থির থাকতে হলে আমার মনে হয় বালিবাসীদের কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে। কিন্তু যতই আমি এই সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়ছিলাম এবং ততই বুঝতে পারছিলাম ভারসাম্যের সেই জাল থেকে আমি কতটা নিচে পড়ে গেছি। অন্তত বালিনিজ নিয়ম অনুযায়ী তো আমি একেবারে ভিন্ন গ্রহের। আমার এমন পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ানোর ঝোঁক, বিয়ে এবং পরিবার থেকে পা বাড়ানোর ইচ্ছা এসব কিছু মিলিয়ে বালিবাসীদের চোখে আমি একটা ভূত। আমি যেভাবে জীবনযাপন করতে পছন্দ করি তা একজন আদর্শ, আত্মসম্মানসম্পন্ন বালিনিজের কাছে দুঃস্বপ্ন। তারা বুঝে উঠতে পারে না, কেউ যদি না জানে সে কোথায় এবং কোন গোত্রের অধীনে তাহলে সে কিভাবে ভারসাম্য খুঁজে পাবে।

বুঝতে পারছিলাম না বালিনিজ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কতটা সমন্বয় করতে পারব। মনে হচ্ছিল সেই মুহূর্তে আমি ভারসাম্যের আরও আধুনিক এবং পশ্চিমা অবস্থানে ছিলাম। আমি আমার তখনকার অবস্থানের ভাষান্তর করেছিলাম 'সমান স্বাধীনতায়' মানে নানান ঘটনার ওপর নির্ভর করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যে কোনো দিক থেকে পতনের সমান সম্ভাবনা যার আছে। বোঝেনই তো জীবনে কখন কি হয় না হয়, তার নেই ঠিক। কিন্তু আমাদের মতো কি হবে না হবে তা বালিবাসীরা বসে বসে দেখে না। সেটা তাদের কাছে ভয়াবহ কিছু। কিভাবে কি হবে তারা তার ব্যবস্থাপনা আগে থেকেই করতে চাইবে যাতে কোনো চ্যুতি না ঘটে।

বালির রাস্তায় আপনি যদি হেঁটে যান তাহলে লোকজন আপনাকে প্রথম যে প্রশ্নটা করবে তা হলো, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? একজন পশ্চিমার কাছে এমন প্রশ্ন করা বিব্রতকর জেরার মতো। কিন্তু বালিতে এই প্রশ্নের মাধ্যমে আপনাকে তারা আটকাতে চাইবে। আপনাকে জালের ভেতর ঢোকাতে চাইবে, এবং তা আপনার নিরাপত্তা আর আরামের জন্যই। আপনি যদি বলতে না পারেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন, এমনি এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাহলে নিশ্চিত থাকুন আপনি আপনার এই নতুন বালিবাসী বন্ধুর বুকে কিছুটা হতাশা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এর চেয়ে ভাল কোনো দিক বেছে নেওয়া, যেকোনো জায়গা, এতে সবাই স্বস্তিতে থাকবে।

বালিবাসীরা যে তৃতীয় প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করবে তা হলো, তুমি কি বিবাহিত? এটাও একটা অবস্থানগত অনুসন্ধান। এটা তাদের জন্য জানা জরুরি যে আপনি আপনার নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তারা চায় আপনি হ্যাঁ বলুন। আপনি হ্যাঁ বললে তারা মুক্তি পায়। আপনি যদি অবিবাহিত হন তাহলে তা সরাসরি বলবেন না। আমি জোরালো পরামর্শ দেই, আপনার যদি বিবাহবিচ্ছেদও হয়ে থাকে তা সরাসরি বলবেন না। যদি আপনার জীবনে এমন কিছু ঘটে থাকে তাহলে বালিবাসীরা কষ্ট পাবে। এটা কেবল তাদের সেই মানচিত্রের জালে আপনার অবস্থানহীনতা নির্দেশ করবে। আপনি যদি একজন অবিবাহিত মহিলা হন এবং বালিতে বেড়াতে আসেন, তখন কেউ যদি

www.pathagar.org

জিজ্ঞেস করে, আপনি কি বিয়ে করেছেন? তাহলে আপনি বলবেন, এখনো না। এটা 'না' বলার একটা ভদ্র পদ্ধতি। যাতে বোঝানো হয় যত শীঘ্র সম্ভব আপনি তা করবেন।

আপনার বয়স যদি হয় আশি, কিংবা সমকামী কিংবা একজন নারীবাদী কিংবা যাজিকা কিংবা আপনি যদি একই সাথে হন একজন আশি বছর বয়সী সমকামী নারীবাদী যাজিকা যে কিনা কখনো বিয়ে করেনি কখনো বিয়ে করবে না, তখনো সম্ভাব্য এই ভদ্রতর উত্তরটাই দেবেন, 'এখনো না।'

৭৭

এক সকালে মারিও আমাকে একটা বাইসাইকেল কিনতে সাহায্য করেছিল। সে তার এক চাচাতো ভাইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। আমি সেখানে একটা চমৎকার পর্বত আরোহণের বাইক, একটা হেলমেট, একটা তালা এবং একটা ঝুড়ি কিনেছিলাম। সব মিলিয়ে আমার লেগেছিল প্রায় পঞ্চাশ ডলারের কাছাকাছি। তখন আমি আমার নতুন শহর উবুদে সচল। অন্তত সেই রাস্তায় নিজেকে তখন নিরাপদ অনুভব করতে পারছিলাম, নিজের বাহনের ওপর নির্ভর করতে পারছিলাম। কেননা সেখানকার রাস্তা সরু, রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণও ভাল না তার ওপর মোটর সাইকেল, ট্রাক এবং টুরিস্ট বাসের প্রচণ্ড চাপ।

তখন সন্ধ্যা। আমি বাইক চালিয়ে কেটুটের গ্রামে কেটুটের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। তার সাথে সেদিন আমি কি করতে যাচ্ছিলাম তা জানতাম না। তবে এটুকু জানতাম, যাই করি না কেন তা একসাথে করব। তবে এটা জানতাম না, আমরা কি ইংরেজি শিখব নাকি ধ্যান শিখব নাকি তার উঠানে বসে প্রাচীন পদ্ধতির আসন শিখব। জানতাম না, কেটুট আমার জন্য কি ভেবে রেখেছে। আমি কেবল তার জীবনে আমন্ত্রণ পেয়েই খুশি ছিলাম।

পৌছে দেখেছিলাম তার বাড়িতে মেহমান। একটা গ্রাম্য ছোট পরিবার যারা তাঁর এক বছর বয়সী কন্যা সন্তানের চিকিৎসার জন্য কেটুটের কাছে এসেছিল। আহা রে বাচ্চাটা তখন কয়েক রাত ধরে দাঁতে দাঁত ঘঁষছিল এবং রাতে ঘুমাতে পারছিল না। সেড়ং গায়ে সুদর্শন বাবা, যার সোভিয়েত যুদ্ধ নায়কের মূর্তির মতো একটা গোবৎস ছিল। মা সুন্দরী এবং লজ্জাবতী। সে আনত ভীরু ভীরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কেটুটের সেবার বিনিময়ে তারা কিছু উপহার নিয়ে এসেছিল আর দুই হাজার রুপিয়াহ যা পঁচিশ সেন্টসের কাছাকাছি। তাল গাছের পাতা দিয়ে বানানো ঝুড়িটা হাতের মুঠোতে ধরে ছিল যা একটা হোটেল বারের ছাইদানির চেয়ে কিছুটা বড়। সেখানে টাকার সাথে একটা ফুলের তোড়া আর কিছু ধানও ছিল। মা তাঁর মাথায় একটা ত্রিতল ঝুড়ি সামলাচ্ছিল। একটাতে ছিল ফল, আর একটাতে ফুল এবং আর একটায় একটা ভাজা হাঁস। তার মাথায় সবকিছু নিয়ে সে এমন চমৎকার ভারসাম্য রক্ষা করছিল যে কারম্যান মিরিন্ডাও যদি তাকে দেখতেন, নিরহঙ্কারভাবে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাতেন।

www.pathagar.org

কেটুটকে তার সঙ্গীদের সাথে সহজাত এবং কৃতজ্ঞ দেখাচ্ছিল। সে বাচ্চাটা সম্পর্কে তাঁর বাবা মায়ের অভিযোগ শুনছিল। তারপর তার উঠানের একটা বাক্স ঘেঁটে একটা খাতা বের করে যা বালিনিজ সংস্কৃত শব্দে বোঝাই ছিল। সে বইটা পণ্ডিতের মতো ঘেঁটে বাচ্চাটার সমস্যার সাথে উপযুক্ত ঔষধের সমন্বয় খুঁজছিল আর পাশাপাশি সারাক্ষণ সেই বাবা মায়ের সাথে কথা আর হাসাহাসি চালিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সে তার নোটবুকের একটা খালি পৃষ্ঠায় একটা ব্যাঙের ছবি এঁকেছিল। তার মতে ছোট মেয়েটির জন্য এটি একটা প্রেসক্রিপশন। বাচ্চাটার ওপর নাকি তখন একটা ছোট খাট দৈত্যর নজর পড়েছে। সে রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে দেখেছিল, এজন্যই সে তার দাঁতে দাঁত ঘঁষছে। দাঁতে দাঁত ঘঁষার জন্য সে তার বাবা মাকে পরামর্শ দিয়েছিল, লাল পেয়াজ বেটে তা মাড়িতে ঘঁষতে এবং এর সাথে দানবকে তুষ্ট করতে তাদের অবশ্যই একটা মৃত মুরগি একটা শূকর কিছু পিঠা নৈবদ্য দিতে। আর এগুলোর সাথে তাদের নানি দাদির নিজস্ব বাগান থেকে ঔষধি লতা-পাতা মিশিয়ে দিতে হবে। এসব কিছু ফেলনা যায় না। পূজার নৈবদ্য দেওয়ার অনুষ্ঠানের পর তারা ঈশ্বরকে দেওয়া এইসব খাবার নিজেরা খেতে পারে। এ খাবার সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা এই ভোগের বাহ্যিক দিকটা নয় আধ্যাত্মিক দিকটাই প্রধান। বালিনিজদের চোখে, ঈশ্বরের যা কিছু ঈশ্বর তা থেকেই নেন। সেই দৃষ্টিতে তেমনি মানুষের অধীনে যা কিছু মানুষ তা থেকেই নেবে– যেমন খাবার।

প্রেসক্রিপশন লেখার পর কেটুট আমাদের উল্টো পাশে মুখ করে বসেছিল। একটা বড় গামলা পানি দিয়ে পূর্ণ করে হালকা দৃষ্টি আকর্ষণ করে শান্ত হয়ে মন্ত্র পড়ছিল। তারপর এই শুদ্ধকৃত পানি দিয়ে কেটুট বাচ্চাটাকে আশীর্বাদ করেছিল। সেই এক বছরের বাচ্চাও যেন জানে বালিনিজ পদ্ধতির একটা পবিত্র আশীর্বাদ নেওয়ার আচার। মা বাচ্চাটা ধরে ছিল আর বাচ্চাটা পানি গ্রহণ করার জন্য তার হাতের তালু বাড়িয়ে ছিল। এক দুই চুমুক খাইয়ে কেটুট বাকিটা বাচ্চাটার মাথায় ঝাপটা দিয়ে দিয়েছিল। একটা সার্থকভাবে সম্পন্ন আচার। বাচ্চাটা তার জন্য ভজন করা এই দাঁতহীন মানুষটাকে দেখে একটুও ভীত ছিল না। কেটুট বাকি পানিটা একটা স্যান্ডউইচের প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখেছিল এবং বাচ্চাটার বাবা মাকে দিয়েছিল যাতে তারা পরে ব্যবহার করতে পারে। বাচ্চার মা যাওয়ার সময় সেই পানির ব্যাগটা নিজে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সে নগর মেলায় গোল্ড ফিস জিতেছে আর সে সেই গোল্ড ফিস নিয়ে যাওয়ার সময় খুব সাবধান, যাতে কোনো মতে ভুল না হয়।

পঁচিশ সেন্টের বিনিময়ে কেটুট লিয়ার তার রুগীদের চল্লিশ মিনিট অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছিলেন। যদি তারা কোনো টাকা দিতে নাও পারত সে একইরকম সেবা দিত। একজন চিকিৎসক হিসেবে এটা তাঁর কর্তব্য। তা না হলে সে হয়ত একজন সাধারণ মানুষে পরিণত হবে এবং ঈশ্বর তার নিরাময়ের ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। প্রতিদিন এমন দশজন দর্শনার্থী আসে কেটুটের কাছে। পবিত্র কোনো বিষয় বা চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে। আর যেদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় সেদিন তার হয়ত একশোর উপরে দর্শনার্থী জমা হয়।

আপনার ক্লান্ত লাগে না?

তিনি বলেছিলেন,

www.pathagar.org

নাহ। আমার পেশা এটা। আমার সখ।

সন্ধ্যার পরও কিছু রুগী এসেছিল কিন্তু আমি আর কেটুট কিছু সময় আলাদা কাটিয়েছিলাম। সেই কবিরাজের সাথে আমি খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যেমন স্বাচ্ছন্দ্য আমি আমার নিজের দাদার সাথে বোধ করতাম। তিনি সেদিন আমাকে বালিনিজ ধ্যানের প্রথম ধারণা দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,

ঈশ্বরকে পাওয়ার অনেক উপায় আছে কিন্তু বেশির ভাগই পশ্চিমাদের জন্য কঠিন।

তাই তিনি আমাকে প্রথমে সহজ কিছু শেখান। যেটা হলো নীরব হয়ে বসে হাসা। আমার এটা খুব ভাল লেগেছিল। এমনকি তিনি আমাকে যখন শিখাচ্ছিলেন, তখনও হাসছিলেন।

বস, হাসো, কী চমৎকার।

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন,

লিজ, তুমি কি ভারতে যোগাসন শিখেছ?

হ্যাঁ কেটুট।

তুমি যোগ করতে পার? যোগাসন তো অনেক কঠিন।

তিনি নিজেকে মোচড়ে পদ্মাসনে আবদ্ধ হয়ে মুখটা পেছনে নিয়ে হাস্যকর রকম করে রেখেছিলেন। কোষ্ঠকাঠিন্য রুগী মলত্যাগ করার সময় যেমন মুখ করে রাখে তেমন। তারপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থানে এসেছিলেন আর হেসে ফেলেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন,

যোগে তারা সব সময় মুখ এমন কঠিন করে রাখে কেন? তুমি যদি এমন মুখ করে রাখ ধনাত্মক শক্তি তো ভয় পেয়েই পালিয়ে যাবে। ধ্যানে তুমি যে কাজটা করবে তা হলো হাসা। চেহারা দিয়ে হাসবে মন দিয়ে হাসবে। ধনাত্মক শক্তি তোমার কাছে এসে নোংরা শক্তি দূর করে দেবে। তোমার কলিজা দিয়ে হাসবে। আজ রাতে হোটেলে অনুশীলন কর। কিন্তু তাড়াহুড়ো কর না খুব চাপ দিও না নিজেকে। বেশি জরুরি ভাবে নিলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। তুমি হাসির মাধ্যমে ধনাত্মক শক্তিকে ডাকবে। আজকের জন্য শেষ আবার দেখা হবে। কালকে আবার চলে এসো। তোমাকে খুব ভাল লাগে লিজ। তোমার বিবেক যেন তোমার পথ প্রদর্শক হয়। বালিতে যদি তোমার কোনো পশ্চিমা বন্ধু থাকে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হাত দেখে দেব। বোমা হামলার পর ব্যাংকে আমার কোনো টাকা নেই।'

৭৮

তার নিজের ভাষ্য অনুযায়ী এই হচ্ছে কেটুট লিয়ারের জীবন কাহিনি :

নয় প্রজন্ম ধরে আমার পরিবার কবিরাজি বিদ্যার সাথে জড়িত। আমার বাবা, আমার দাদা, আমার পরদাদা সবাই জ্যোতিষী ছিলেন। তারা সবাই চাইতেন আমিও

www.pathagar.org

জ্যোতিষী হই। তারা আমার মাঝে আলো দেখতে পেতেন। তারা আমার মাঝে বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্য দেখতে পেতেন। কিন্তু আমি জ্যোতিষী হতে চাইতাম না। এত্ত এত্ত পড়া। এত্ত এত্ত তথ্য। আমি জ্যোতিষীদের বিশ্বাসও করতাম না। আমি হতে চাইতাম চিত্রশিল্পী। আমার এ ব্যাপারে ভাল প্রতিভা আছে।

যখন আমি যুবক ছিলাম। আমার সাথে একজন আমেরিকান ব্যক্তির পরিচয় হয়েছিল। সে অনেক ধনী ছিল। সে হয়ত তোমার মতো নিউইয়র্কের বাসিন্দা ছিল। সে আমার ছবি পছন্দ করেছিল এবং আমার কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিল। আমি প্রতিদিন ছবি আঁকতাম, এমনকি রাতেও। আগের দিনে এখনকার মতো বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না। আমাদের তেলের বাতি ছিল বুঝতে পেরেছ? পাম্প বাতি। এটাকে পাম্প করতে হয় বাতি জ্বলার জন্য। এবং প্রতি রাতে আমি তেলের বাতির আলোয় ছবি আঁকতাম। এক রাতে তেলের বাতি আর জ্বলে না। আমি পাম্প করতে থাকলাম, করতে থাকলাম। হঠাৎ সেটা বিস্ফোরিত হয়ে আমার হাত পুড়ে গেল। আমি হাসপাতালে পোড়া হাত নিয়ে এক মাস কাটালাম। ইনফেকশন হয়ে গেল। ইনফেকশন আমার হৃদপিণ্ড পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছিল আমাকে সিঙ্গাপুর গিয়ে হাত কেটে আসতে হবে। এটা আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল না কিন্তু ডাক্তার বলছিল কিনা সিঙ্গাপুর যেতে হবে। আমি ডাক্তারকে বলেছিলাম আমি প্রথমে আমার গ্রামের বাড়ি যেতে চাই।

সেই রাতে গ্রামে আসার পর আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমার বাবা, আমার দাদা, আমার পরদাদা সবাই এক সাথে এসে আমাকে বলে দিয়েছিলেন কিভাবে আমার হাতের নিরাময় করতে হবে। তারা আমাকে বলেছিলেন চন্দনকাঠ আর জাফরানের নির্যাস তৈরি করে পোড়া যায়গায় দিতে। তারপর জাফরান আর চন্দনের গুড়া করে তা দিয়ে জায়গাটা ঘঁষতে। তারা আমাকে বলেছিলেন, আমি যাতে অবশ্যই তা করি তাহলে আমাকে আমার হাত হারাতে হবে না। এত জীবন্ত একটা স্বপ্ন। যেন তারা সবাই মিলে সত্যিই আমার বাড়িতে ছিলেন।

ঘুম থেকে উঠে বুঝতেই পারছিলাম না কি করব। বুঝতেই পারছেন মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর কখনো কখনো স্বপ্ন একটা কৌতুক ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু আমি বাড়িতে সেই নির্যাস তৈরি করে আমার হাতে দেই তারপর সেগুলো গুঁড়া করে হাত দিয়ে ঘঁষি। আমার হাতে প্রচণ্ড ইনফেকশন, প্রচণ্ড ব্যথা ফুলে ঢোল হয়ে ছিল, কিন্তু সেই নির্যাস এবং গুঁড়া দেওয়ার পর জ্বলুনি ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। ভাল লাগতে শুরু করে। দশ দিনে আমার হাত পুরোপুরি সেরে ওঠে।

এজন্য আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি। আমার স্বপ্নে আমার বাবা, দাদা, পরদাদা আবার এসে আমাকে বলেন আমারও একজন কবিরাজ হওয়া উচিত। আমার আত্মা অবশ্যই ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত। এজন্য তখন প্রথম ছয় দিন আমাকে অবশ্যই উপাস থাকতে হবে। বুঝেছ? কোনো খাবার না কোনো পানি না কোনো শরবত না। কোনো সকালের নাস্তা না। ব্যাপারটা সহজ ছিল না। প্রথম প্রথম আমার গলা শুকিয়ে আসত। আমি সূর্য ওঠার আগে গিয়ে ধান খেতে বসে থাকতাম। সেখানে হা করে বাতাস থেকে পানি খেতাম। তোমরা এটাকে কি বল? ধান ক্ষেতের ভোরের বাতাসের পানিকে? হ্যাঁ কুয়াশা। আমি এই কুয়াশা খেয়ে পার করেছি ছয় দিন। কুয়াশা ছাড়া

www.pathagar.org

আর অন্য কোনো খাবার না। পাঁচ দিনের দিন আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সবকিছু, সবজায়গায় হলুদ রং দেখতে লাগলাম, এমনকি আমার ভেতরেও। না, ঠিক হলুদ না, সোনালি রং। আমি সর্বত্র সোনালি রং দেখতে লাগলাম এমনকি আমার ভেতরেও। এই সোনালি রঙটা হচ্ছেন ঈশ্বর, যিনি আমার ভেতরেও আছেন। যা ঈশ্বর তা আমার ভেতরেও বিরাজ করে। আসলে আমাকে কবিরাজ হতেই হতো। আমি আমার পরদাদার কবিরাজির বই থেকে শিখতে লাগলাম। এই বইগুলো কাগজের তৈরি না। তালের পাতার তৈরি। একে বলে লেটারস। এটা বালিনিজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানকোষ। আমাকে বালির সকল গাছ সম্পর্কে জানতে হলো। খুব সহজ কিছু না। একটার পর একটা আমি শিখতে লাগলাম। আমি নানান মানুষের সমস্যায় তাদের যত্ন নিতে লাগলাম। যখনই কেউ অসুস্থ হতো আমি ওষধি গাছ দিয়ে তার চিকিৎসা করতাম। আর যখন পুরো পরিবার কোনো কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ত আমি তখন আমার আঁকা ছবি দিয়ে তাদের সাহায্য করতে চাইতাম। বলতাম বাড়িতে যাতে ছবিটা রাখে, আর কোনো যুদ্ধ নয়। মাঝে মাঝে মানুষ প্রেমে অসুস্থ হয়ে পড়ে ঠিকঠাক জুটি খুঁজে পায় না। আমি তখন মন্ত্র ও জাদুকরী ছবি দিয়ে সেই সমস্যা সমাধান করি এবং ব্যক্তিকে ভালোবাসা এনে দিতে থাকি। আমি কালো জাদুও শিখি, কালো জাদু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করতে তা শিখতে হয়েছিল। আমার আঁকা জাদুকরী ছবি বাড়িতে লাগালে বাড়িতে ধনাত্মক শক্তি আসে।

তবে আমি এখনও চিত্রশিল্পী হতে চাই। সময় পেলে ছবি এঁকে গ্যালারিতে বিক্রি করি। আমার আঁকা ছবি সবসময় একই বিষয় নিয়ে– যখন বালি ছিল স্বর্গরাজ্য, হয়ত হাজার বছর আগের, জঙ্গলের ছবি, পশুপাখির ছবি, মহিলাদের ছবি, কি যেন বলে? উন্মুক্ত বক্ষা মহিলাদের ছবি। কবিরাজ হওয়ার কারণে ছবি আঁকার সময় বের করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু আমাকে কবিরাজি বিদ্যাকে প্রাধান্য দিতে হবে, এটাই আসল পেশা। আমার সখ। মানুষকে সাহায্য করতেই হবে না হলে ঈশ্বর আমার ওপর রেগে যাবেন। মাঝে মাঝে বাচ্চা প্রসব করাতে হয়, মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করতে হয়, কিংবা দাঁত ওঠা বা বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে হয়। তারপরও মাঝে মাঝে রাত তিনটায় উঠে বৈদ্যুতিক বাতির নিচে আমি ছবি আঁকি। সেটাই একটা সময় যখন আমি নিজের জন্য ছবি আঁকতে পারি। সে সময়টা আমি একা থাকতে ভালোবাসি, ছবি আঁকার উপযুক্ত সময় সেটা।

আমি সত্যিকারের কিছু জাদু দেখাই। মজা করছি না। দুঃসময়েও আমি সবসময় সত্য কথা বলি। আমাকে ভাল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে তা না হলে আমি জাহান্নামে যাব। আমি বালি, ইন্দোনেশিয় ভাষায় কথা বলতে পারি। কিছুটা পারি জাপানি ভাষাও। কিছুটা ইংরেজিও, কিছুটা ডাচ ভাষা। যুদ্ধের সময় অনেক জাপানিরা এখানে ছিল। আমার জন্য খারাপ কিছু হয়নি। আমি তাদের হাত দেখেছি এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছি। যুদ্ধের আগে অনেক ডাচরা এখানে ছিলেন। এখন অনেক পশ্চিমারা এখানে আসেন। সবাই ইংরেজিতে কথা বলেন। আমার ডাচ ভাষা জানা আছে। তুমি কাল কি যেন শেখালে, ইংরেজিতে একে যেন কি বলে? রাস্টি? হ্যাঁ রাস্টি। আমার ডাচ ভাষা রাস্টি মানে জং ধরা।

www.pathagar.org

বালিতে আমি চতুর্থ জাতের। কৃষকদের মতোই নিচু জাত এটা। কিন্তু আমি দেখেছি অনেক উঁচু জাতের মানুষও আমার মতো বুদ্ধিমান না। আমার নাম কেটুট লিয়ার। লিয়ার নামটা আমাকে আমার দাদা দিয়েছেন। যার মানে উজ্জ্বল আলো।

এই আমি, আমার সবিস্তার বর্ণনা।

৭৯

হাস্যকর একটা ব্যাপার হচ্ছে বালিতে আমার তখন তেমন কোনো কাজই ছিল না। একটাই কেবল কাজ ছিল আর তা হলো সন্ধ্যায় কেটুট লিয়ারের কাছে যাওয়া, সেটাও কোনো বিশাল কাজ না। অবশিষ্ট সময় কেমন উদাসীন কাটাতাম। সকালে এক ঘণ্টা আমি আমার গুরুর দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী ধ্যান করতাম আর সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা কেটুটের শিখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে ধ্যান করতাম আর এর মাঝে আমি হাঁটাহাঁটি করতাম, সাইকেলে ঘুরে বেড়াতাম, মাঝে মাঝে মানুষজনের সাথে কথা বলতাম আর দুপুরের খাবার খেতাম। সেই শহরে আমি একটা নিরিবিলি পাঠাগার পেয়েছিলাম, তার কার্ডও পেয়েছিলাম। আর তখন আমার জীবনের মহান ও লোভনীয় সময় কাটছিল সেই বাগানে বই পড়ে। আশ্রমের কঠোর জীবন, তারপর ইটালির নানান শহর জুড়ে ব্যাপক ঘোরাফেরা আর চোখের সামনে যা পড়ে তা খাওয়ার ব্যস্ততার পর আমার জীবনে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ও শান্তিপূর্ণ একটা অধ্যায়। আমার এত অলস সময় ছিল যে আপনি চাইলে তা মেট্রিক টন হিসেবে মাপতে পারতেন।

যখনই আমি হোটেল থেকে বাইরে বের হতাম মারিও ও অন্যান্য কর্মচারীরা আমাকে জিজ্ঞেস করত আমি কোথায় যাচ্ছি এবং যখনই ফিরে আসতাম তারা আমাকে জিজ্ঞেস করত আমি কোথায় ছিলাম। আমি দিব্য চোখে দেখতে পেতাম তাদের ড্রয়ারে তারা তাদের সকল প্রিয়জনের একটা করে মানচিত্র লুকিয়ে রেখেছে যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেকে কোথায় আছে সব লিপিবদ্ধ থাকে। তারা চায় সামগ্রিক আচার আচরণ যাতে সারাক্ষণ তাদের মাথায় নথিভুক্ত থাকে।

আমি তখন রোজ সন্ধ্যার দিকে পাহাড়ে দ্রুত গতিতে সাইকেল নিয়ে বের হতাম। ধান গাছের সারির ভেতর দিয়ে, চমৎকার দৃশ্য আর সবুজের সমাহার দেখতে দেখতে উবুদের উত্তর দিকে যেতাম। ধান ক্ষেতের জমে থাকা স্থির পানিতে আমি গোলাপি মেঘের প্রতিফলন দেখতাম। যেন আকাশ দুটো। একটা বেহেশতে দেবতাদের জন্য আর একটা কাদা মাটিতে ভেজা মরণশীল এই আমাদের জন্য। একদিন আমি বকদের অভয়ারণ্যে গিয়েছিলাম। যেখানে লেখা ছিল, 'হ্যাঁ আছে। আপনারা এখানে বক দেখতে পারবেন।' কিন্তু গিয়ে দেখা গিয়েছিল সেখানে কোনো বক নেই শুধু হাঁস আছে। আমি সেখানে কিছুক্ষণ হাঁস

www.pathagar.org

দেখে পরের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলাম। রাস্তা জুড়ে আমি নারী পুরুষ, শিশু, মুরগি কুকুর ইত্যাদি অতিক্রম করেছিলাম। তারা সবাই নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল, তবে এতটা ব্যস্ত নয় যে থেমে আমাকে শুভ কামনা জানাতে পারবে না।

একদিন একটা জঙ্গলের উঁচু স্থানে আমি একটা বিজ্ঞপ্তি দেখলাম 'শিল্পীদের জন্য বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। রান্নাঘরসহ।' ঈশ্বর কত উদার। কেননা তিন দিন পর আমি তখন সেখানে চলে গিয়েছিলাম। সব গোছগাছ করে সেখানে যেতে মারিও আমাকে সাহায্য করেছিল। এবং হোটেলে তার সকল বন্ধুরা আমাকে একটা আবেগঘন বিদায় জানিয়েছিল।

আমার নতুন বাসাটা একটা নিরিবিলি রাস্তায় ছিল। যার চার দিকে ধানের ক্ষেত। দেয়ালগুলো আইভি গাছে ঢাকা। সেটা অনেকটা কটেজের মতো দেখতে ছিল। বাড়িটা ছিল একজন ইংরেজ মহিলার, যে কিনা গরমকালে সেখানে থাকতেন না। তাইতো আমি সেই চমৎকার জায়গাটায় তার বদলে থাকতে পারছিলাম। সেখানে ছিল একটা উজ্জ্বল লাল রঙের রান্নাঘর, গোল্ড ফিসে ভরা একটা ছোট পুকুর, একটা ছোট মার্বেলের ছাদ, ঝকঝকে মোজাইকের একটা উন্মুক্ত স্নানঘর। আমি যখন চুলে শ্যাম্পু দিতাম, দেখতে পেতাম চকোর পাখি তাল গাছে বাসা বানাচ্ছে। আর ছিল ছোট একটা গোপন পথ শেষে একটা পাখির কলতানে মুখর বাগান। আমি জায়গাটার মালী ছিলাম না। তাই আমি যা করতে পারতাম তা হলো কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে ফুলগুলো দেখা, এমন অদ্ভুত সুন্দর ফুলগুলোর নামও জানতাম না। তাই আমি নিজে নিজে এদের নাম দিয়েছিলাম। আর দেবই বা না কেন? সেটা আমার ইডেন আমার বেহেশতের বাগান? তাই নয় কী? দ্রুত আমি সেই ফুলগুলোর আমার মতন করে নতুন নাম দিয়েছিলাম। যেমন, ড্যাফোডিল গাছ, বাঁধাকপি-তাল, প্রম-পোশাকী আগাছা, সর্পিল প্রদর্শনী, নৈঃশব্দবাতি, একাকী-আঙুর লতা, নজরকাড়া গোলাপি অর্কিড। সেই নতুন শিশুদের মতো ফুলগুলোর সাথে আমার করমর্দন শেষ হয়েছিল। কী পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং অতি প্লাবিত সৌন্দর্য যে চারদিকে ছিল তা আর কি বলব!

আমার জানালার বাইরে হাত বাড়ালেই আমি কলা আর পেঁপে গাছ থেকে পাড়তে পারতাম। সেখানে একটা বিড়াল ছিল। খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমার সাথে খুব আদর আহ্লাদ দেখাত আর খাবার শেষ হলেই বিলাপ করতে থাকত যেন ভিয়েতনামের যুদ্ধের স্মৃতি দৃশ্য তাকে তাড়া করত। আমি বিশেষ কিছু মনে করতাম না। তখন কিছুদিন হয় আমি কোনো কিছুতেই কিছু মনে করতাম না। কোনো রকম মন্দ লাগা আর অসন্তুষ্টি আমি মাথায় আনতেই যেন ভুলে গিয়েছিলাম।

সেখানকার শব্দের জগতও অনেক আকর্ষণীয় ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় জোনাকিরা সেখানে বাদ্য বাজাত আর গানের মূল কথা দিত ব্যাঙেরা। গভীর রাতে কুকুররা এভাবে চেঁচাত যেন তাদের এত ছোট করে দেখা হয় বলে প্রতিবাদ করছে। সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়ে গ্রীষ্মকালীন পাখিদের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা শুরু হতো এবং সূর্য উদয়ের পর এলাকা চুপচাপ হয়ে যেত। প্রজাপতিরা কাজে লেগে যেত। সারাটা বাড়ি আঙুরের লতায় ঢাকা ছিল। মাঝে মাঝে আমার মনে হতো

www.pathagar.org

সেই লতা পুরো বাড়িটা গ্রাস করে নেবে এবং সাথে আমাকেও। আমি নিজে একটা বুনো ফুল হয়ে যাব। বাড়িটার যে ভাড়া আমাকে দিতে হতো, তা নিউইয়র্কে আমার প্রতিমাসের গাড়ি ভাড়ার চেয়েও কম ছিল। একেবারে প্যারাডাইজ।

আর একটা কথা, 'প্যারাডাইস' শব্দটা এসেছে পারস্য থেকে যার অর্থ দেয়াল বেষ্টিত বাগান।

৮০

কিছু সত্য কথা বলা হয়নি এখনো। একটা স্থানীয় পাঠাগারে মাত্র তিন সন্ধ্যা বালির ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করার পর জানতে পেরেছিলাম, বালি সম্পর্কে আমার ধারণা অনেকটাই ভুল। প্রথমবার বালি থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার পর আমি লোকজনকে বলে বেড়িয়েছিলাম এই ছোট দ্বীপটি আসলে একটা সত্যিকারের কল্প-রাজ্য। এমন একটা জায়গা যেখানে কেবল শান্তি, সহানুভূতি এবং ভারসাম্যের অনুশীলন করা হয়। একেবারে যেন ইডেন গার্ডেন। সেখানকার ইতিহাসে কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বা সন্ত্রাস নেই। আমি জানি না এমন একটা ব্যাপক ধারণা আমি কোথা থেকে পেয়েছিলাম, আমি এটা আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রচারও করতাম। সেটা প্রমাণ করতে আমি বলতাম,

আরে সেখানকার পুলিশরাও কানে ফুল গুঁজে রাখে।

বাস্তব ক্ষেত্রে বালিতে এমন ভয়াবহ, রক্তক্ষয়ী বর্বরতা, সংঘর্ষ এবং নিষ্পেষণের ঘটনা আছে যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্য কোথাও নেই। জাভানিজ রাজা প্রথমে যখন সেখানে বসতি স্থাপন করতে গিয়েছিলেন তিনি সেখানে একটা সমাজতান্ত্রিক জাতি গড়ে তোলেন যেখানে বর্ণবাদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সকল বর্ণ প্রথার মতো সেখানেও মধ্যবর্তীদের জন্য এই প্রথা বাস্তবায়নে কোনো ব্যাঘাত মেনে নেওয়া হতো না। বালির মূল অর্থনীতি তখন দাস ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কয়েকশ বছর ধরে যেটা কেবল আন্তর্জাতিক দাস কেনা বেঁচায় ইউরোপের অংশগ্রহণ বাড়ায়নি বরং কিছু সময়ের জন্য মানুষের জীবনের ওপর সেই কেনা বেঁচা অনেকটা জীবনদায়ীও ছিল।

আভ্যন্তরীণভাবে দ্বীপটিতে সব সময় যুদ্ধ চলেছে, ক্ষমতাসীন রাজারা প্রচুর হত্যা ও ধর্ষণ করেছে। প্রতিবেশী রাজ্যের ওপর হামলা করেছে। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ী এবং নাবিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, বালিবাসীদের মারমুখী যোদ্ধা হিসেবে নাম ছিল। তাদের 'আমক' বলা হতো। আমক শব্দটা চলন্ত 'আমক' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এটা একটা বালিনিজ শব্দ। এটা একধরনের যুদ্ধ কৌশল যেখানে একজন হঠাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে হিংস্র রূপে, আত্মঘাতী রূপে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং তাৎক্ষণিক রক্তারক্তি যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যেত। ইউরোপিয়ানরা এই যুদ্ধ চর্চাকে

www.pathagar.org

ভয় করত। ১৮৪৮ সালে ৩০০০০ সুসংগঠিত সেনা বাহিনী নিয়ে বালিবাসীরা ডাচ ঔপনিবেশিকদের সাথে যুদ্ধ করে। তারপর আবার ১৮৪৯ সালে বেশ বড় মাপের যুদ্ধ হয় আবার ১৮৫০ সালেও হয়। তারা ডাচ শাসন থেকে বের হতে পারছিল না। তার কারণ, ক্ষমতাসীন বালি রাজাগণের ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভ এবং পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব। তারা ডাচদের সাথে ভাল ভাল বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে হাত মিলিয়ে একে অপরকে পরাস্ত করতে ব্যস্ত ছিল। তাই বালিকে কল্প রাজ্য খেতাব দেওয়াটা বাস্তবতাকে কিছুটা অপমান করার মতো। এমন তো আর নয় বালি গত সহস্রাব্দ কেবল হেসে আর আনন্দের গান গেয়ে কাটিয়েছে।

কিন্তু ১৯২০ এবং ১৯৩০ এ যখন একদল উচ্চ শ্রেণির পশ্চিমা যোদ্ধারা বালি আবিষ্কার করে। তখন এই সকল হিংস্র ঘটনা ম্লান হয়ে তাদের চোখে প্রকট হয়ে ওঠে সেই দ্বীপের আলাদা বিশেষত্ব। তারা একমত হয় বালি যেন, 'ঈশ্বরদের দ্বীপ' যেখানে সবাই শিল্পী এবং যেখানে কোনো অদ্ভুত আশীর্বাদে মানবতা তখনো অক্ষত ছিল। এই ধারণা, এই স্বপ্ন মন থেকে যেতে চায় না আমি জানি। আমি সহ বেশিরভাগ পরিদর্শকই বালি সম্পর্কে একইরকম ধারণা পোষণ করেছেন। ১৯৩০ সালে বালি পরিদর্শন করতে গিয়ে জার্মান ফটোগ্রাফার জর্জ ক্রাসর বলেছেন, 'আমি ঈশ্বরের ওপর রেগে গিয়েছিলাম তিনি কেন আমাকে বালিতে জন্মগ্রহণ করাননি।' এরকম অপার্থিব নিস্বর্গের সৌন্দর্যের কথা শুনে আসলেই কিছু প্রথম সারির পরিদর্শক আসতে লাগল। ওয়াল্টার স্পাইসের মতো শিল্পী, নোয়েল কোয়ার্ডের মতো লেখক, ক্লেয়ার হল্টের মতো নৃত্য শিল্পী, চার্লি চার্পলিনের মতো অভিনেতা, মার্গারেট মিডের মতো পণ্ডিত। যিনি এখানকার নারীরা উন্মুক্ত বক্ষা হওয়া সত্ত্বেও বালিকে ভিক্টোরিয়ান ইউরোপের মতো রক্ষণশীল বলে উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'পুরো সংস্কৃতিতে এক তোলাও অবাধ যৌনতা নেই।'

১৯৪০ সালে যুদ্ধ শুরু হতে এইসব উৎসব শেষ হয়ে গিয়েছিল। জাপানিজরা ইন্দোনেশিয়া দখল করে নিয়েছিল এবং সেই আশির্বাদপুষ্ট বাগানে বসবাসরত প্রবাসীদের চাকরবাকরসহ পালাতে বাধ্য করেছিল। স্বাধীন হতে চেয়ে ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের মতো বালিও বিভক্ত, সন্ত্রাসের আখড়া হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫০ সালে স্বপ্নলোক আবিষ্কার নামক একটা খবরে বলা হয়েছিল, 'কোনো পশ্চিমা যদি এসময় বালি এসে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই বালিশের তলায় বন্দুক রাখতে হবে।' ১৯৬০ এর দিকে জাতীয়তাবাদী আর সমাজতন্ত্রবিদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে বালি হয়ে উঠেছিল একটা যুদ্ধক্ষেত্র। ১৯৬৫ সালে জাকার্তায় একটা অভ্যুত্থানের পর এই দ্বীপের প্রতিটা সন্দেহভাজন কম্যুনিস্টের জন্য জাতীয়তাবাদী সৈন্য পাঠানো হয়েছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রাম্য কর্তৃপক্ষ আর পুলিশের সহায়তায় জাতীয়তাবাদীরা প্রতিটা পদক্ষেপে ঠাণ্ডা মাথায় নগরবাসীদের মেরে ফেলতে বল প্রয়োগ করেছিল। সেই হত্যাযজ্ঞের পর বালির সুন্দর নদীতে প্রায় এক লাখ লাশ ভেসে গিয়েছিল।

১৯৬০ সালের শেষের দিকে ইডেন গার্ডেনের পৌরাণিক স্বপ্ন আবার ফিরে এসেছিল। তখন ইন্দোনেশিয়ান সরকার আন্তর্জাতিক পর্যটন বিশ্বের জন্য বালিকে আবার ঢেলে সাজাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। 'ঈশ্বরদের দ্বীপ' এই বাক্য দিয়ে একটা

www.pathagar.org

ব্যাপক ও সফল প্রচারণা চালিয়েছিল তারা। পর্যটকরাও তাতে প্রলোভিত হয়ে বালিতে ফিরে এসেছিল। সেটা ছিল খুব উন্মুক্তমনা মানুষদের ভিড়। তাদের মনোযোগ ফেরানো হয়েছিল বালিনিজ সংস্কৃতির ধারণ করা ধর্মীয় এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য দিয়ে। ইতিহাসের কালো অংশ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তখন থেকে এখনো তা এড়িয়ে যাওয়া হয়।

এই সন্ধ্যায় স্থানীয় পাঠাগারে এইসব পড়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, আরে আমি বালিতে আবার কেন এসেছি? পার্থিব আনন্দ আর ধর্মীয় ত্যাগের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজতে তাই না? এখানে এই অনুসন্ধান কি ঠিক আছে? আসলেই কি বালিনিজরা পৃথিবীর অন্য কারো চেয়ে শান্তিপূর্ণ ভারসাম্য ধারণ করে আছে? আমি বলতে চাচ্ছিলাম, তারা এই সমস্ত নাচ-গান, হাসি, প্রার্থনা আর উৎসবের মিলনমেলায় ভারসাম্যপূর্ণ দেখায় কিন্তু আমি জানি আসলে ভেতরে কি চলছে। পুলিশরা অবশ্যই তাদের চুলে ফুল গুঁজে রাখে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অন্যসব দ্বীপের মতো বালিতে সর্বত্র দুর্নীতি চলছে (আমি সরাসরি তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। যখন সেখানে অনৈতিকভাবে চার মাস থাকার জন্য টেবিলের নিচ দিয়ে আমি একজনকে কয়েকশো বাক্স ঘুষ দিয়েছিলাম)। বালিনিজরা পৃথিবীর চোখে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ, ত্যাগী এবং শৈল্পিক মনোভাবসম্পন্ন মানুষ হিসেবে পরিচিত। এর কতটা খাঁটি আর কতটা অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য ভাণ, মিথ্যা প্রচার? আর আমার মতো একজন বহিরাগত সেই উজ্জ্বল মুখের পেছনে দুশ্চিন্তা কতটাই বা অনুধাবন করতে পারত। আসলে আপনি যদি কাছ থেকে ছবিটা দেখেন, দেখবেন যে মসৃণ রেখাগুলো গলতে শুরু করে আস্তে আস্তে একটা অস্পষ্ট ঘোলাটে তুলির রেখা হয়ে গিয়েছে।

তখনকার মতো শুধু এটুকু বলতে পারতাম যে, আমি যে বাড়িটাতে ভাড়া থাকতাম সেটাকে আমি ভালোবাসতাম এবং তাদের ভালোবাসতাম যারা আমার প্রতি কোনো কারণ ছাড়াই কৃতজ্ঞ। আমি তাদের সৌন্দর্যের শিল্প এবং উৎসবকে খুঁজতাম তারা যেমনটা বোঝাতে চায় তাই। কোনো জায়গা সম্পর্কে আমার গবেষণায় আমি যা বুঝবো সত্যটা হয়ত তার চেয়ে জটিল কিছু। বালিনিজরা তাদের ভারসাম্য ধরে রাখার জন্য কি করবে তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি সেখানে গিয়েছিলাম আমার নিজের ভারসাম্য খুঁজতে এবং তখনো মনে হচ্ছিল সেই কাজের জন্য সেই জায়গাটা যথেষ্ট পুষ্টিকর।

৮১

আমি জানতে পারিনি আমার কবিরাজের বয়স কত। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু তিনি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারেননি। আমার মনে আছে, এর দুবছর আগে যখন গিয়েছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন তাঁর বয়স আশি। কিন্তু

www.pathagar.org

মারিও একদিন তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেছিলেন, 'হয়ত পঁয়ষট্টি, ঠিক জানি না।' আবার আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি কোন সালে জন্ম গ্রহণ করেছেন তিনি বলেছিলেন তার জন্মের কথা মনে নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জাপানিরা বালি দখল করেছিল তখন তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। সে হিসেবে তার বয়স দাঁড়ায় বিরাশি। কিন্তু যখন সে তার হাত পোড়ার ব্যাপারটা বলেছিল আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কত সাল ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'মনে নেই হয়ত ১৯২০ সাল হবে।' আর সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় বিশ বছর। সে হিসেবে তাঁর বয়স কত দাঁড়ায়? একশো পাঁচ বছরের মতো। তাহলে আমরা এরকম ভাবতে পারি তাঁর বয়স তখন ছিল ষাট থেকে একশো পাঁচের মধ্যে।

আমি এটাও খেয়াল করেছিলাম যে শারীরিক সুস্থতার ওপর তিনি বয়সের অনুমান করতেন। যেদিন তিনি আসলেই ক্লান্ত থাকতেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, 'মনে হয় এখন পঁচাশি বছর।' কিন্তু যেদিন তিনি বেশ চনমনে বোধ করতেন, তিনি বলতেন, 'আমার মনে হয় আমার বয়স এখন ষাট।' যাই হোক বয়স ধার্য করার এটা অবশ্য খুব ভাল একটা পদ্ধতি। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াবে, আপনার বয়স আজ কেমন বোধ হচ্ছে? এখানে আসল বিষয়টা কি আসলে? আমি তখনো এটা বের করতে চেষ্টা করছিলাম। এক সন্ধ্যায় আমি আসলে খুব সহজভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেটুট আপনার জন্মদিন কবে?

বৃহস্পতিবার, তিনি বলেছিলেন।

এই বৃহস্পতিবার?

না, এই বৃহস্পতিবার না। কোনো এক বৃহস্পতিবার।

ভাল একটা শুরু... কিন্তু এরপর কি কোনো তথ্যই পাওয়া যাবে না? কোন মাসের বৃহস্পতিবার? কোন সালের? কোনো উত্তর পেতাম না। বালিতে জন্মসালের চেয়ে জন্মবারের গুরুত্ব বেশি। এই কারণে খোদ কেটুটই তার জন্মসাল জানেন না। বরং তিনি বলতে পারবেন বৃহস্পতিবার জন্ম নেওয়া বাচ্চাদের প্রতীক দেবতা কে? সে হলো বিধ্বংসী শিবা। এই দিনের জাতক জাতিকার পরিচালক পশু শক্তি দুটো প্রাণীর, বাঘ ও সিংহ। পরিচালক গাছ–বট। পাখি–ময়ূর। বৃহস্পতিবার জন্ম নেওয়া মানুষ সবসময় আগে বলবে, সবার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে, কিছুটা মারমুখী এবং সুদর্শন হবে। কিন্তু তার পরও সব মিলিয়ে ভদ্র চরিত্রের হবে। চমৎকার মেধার এই জাতকের মানুষকে সাহায্য করার মনোবৃত্তি থাকবে।

কেটুটের কাছে যখনই কোনো রুগী জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা বা হৃদয় ঘটিত কোনো সমস্যা নিয়ে আসত, কেটুট সবসময় তাদের জন্ম বার জিজ্ঞেস করতেন। যাতে তাদের জন্য সঠিক প্রার্থনা সাজাতে পারে আর ঔষধ দিতে পারে। কারণ কেটুট বলতেন, 'মাঝে মাঝে মানুষ তার জন্ম বারে অসুস্থ হয়ে পড়ে।' এবং তখন ভারসাম্য রক্ষার জন্য কিছু গ্রহ নক্ষত্রের সমন্বয় করার দরকার হয়। একটা স্থানীয় পরিবার কেটুটের কাছে তার ছোট ছেলেকে দেখাতে নিয়ে এসেছিল। বাচ্চাটার বয়স হয়ত চার বছর ছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সমস্যাটা কী?।' কেটুট তখন আমাকে ভাষান্তর করে বলেছিল তার পরিবারের লোকেরা বলছে, বাচ্চাটা মারমুখী। সে কারো কথা শোনে না। আচরণ খারাপ।

www.pathagar.org

কোনো কিছুতে মনোযোগ দেয় না। বাড়ির সবাই বাচ্চাটাকে নিয়ে ক্লান্ত। মাঝে মাঝে বাচ্চাটাকে হতবিহ্বল দেখায়।

কেটুট তাঁর পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, কয়েক মুহূর্ত বাচ্চাটাকে ধরে রাখতে পারবে কিনা। তারা কেটুট এর কোলে বাচ্চাটাকে বসিয়ে দিয়েছিল এবং বাচ্চাটা কেটুটের বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। কেটুট নিবিড়ভাবে বাচ্চাটার কপালে একটা হাতের তালু ছুঁইয়ে চোখ বুঁজে তারপর আবার বাচ্চাটার পেটে হাত রেখে চোখ বুঁজে ছিলেন। সারাক্ষণ কেটুট বাচ্চাটার সাথে হেসে হেসে কথা বলছিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্রুতই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেটুট বাচ্চাটাকে পরিবারের কাছে দিয়ে একটা প্রেসক্রিপশন এবং পড়া পানি দিয়েছিলেন। কেটুট বলেছিলেন সে বাচ্চাটার বাবা-মায়ের সাথে ওর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে কথা বলে জানতে পারেন বাচ্চাটার জন্ম হয়েছে একটা খারাপ গ্রহের অধীনে এবং তা শনিবার। এ দিনে জন্ম নেওয়া জাতক জাতিকাদের খারাপ শক্তির প্রভাব ধারণ করার সম্ভাবনা থাকে। যেমন কাক শক্তি, পেঁচা শক্তি, যার প্রভাবে বাচ্চাটা মারদাঙ্গা স্বভাবের। এবং পাপেটের শক্তি আর এই কারণেই সে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এই শেষ নবম শনিবারে জন্ম নেওয়াতে বাচ্চাটা রংধনু শক্তি এবং প্রজাপতি শক্তির অধিকারীও এবং এই কারণে তার শক্তি প্রচুর। কিছু ধারাবাহিক আচার অনুষ্ঠান পালন করলে বাচ্চাটার আবার ভারসাম্যে চলে আসবে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কেন বাচ্চাটার মাথায় এবং পেটে হাত রেখেছিলেন? আপনি কি জ্বর মাপছিলেন?

কেটুট বলেছিলেন, আমি তার মস্তিষ্ক পরীক্ষা করছিলাম। কোনো শয়তানি শক্তি আছে কিনা তার মনে?

কি ধরনের শয়তানি শক্তি?

শোনো লিজ, তিনি বললেন– আমরা বালিনিজ। আমরা কালো জাদুতে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি শয়তানী শক্তি আসে নদী থেকে আর আহত ব্যক্তির শরীর থেকে।

বাচ্চাটার কি শয়তানি শক্তি ছিল?

না তার জন্মবারে সমস্যা ছিল কেবল। ওর পরিবার কয়েকটা বলি দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এবং লিজ শোনো তুমি কিন্তু প্রতি রাতে বালিনিজ ধ্যান চালিয়ে যাবে ঠিক আছে? তোমার মন এবং হৃদয় পরিষ্কার রাখবে।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম,

হ্যাঁ প্রতি রাতে।

তুমি তোমার কলিজা দিয়ে হাসবে।

হ্যাঁ। আমার কলিজা দিয়ে হাসব কেটুট। আমার কলিজায় ইয়া বড় একটা হাসি ঝুলিয়ে রাখব।

ভালো। এই হাসিটা তোমাকে সুন্দর নারী হিসেবে তৈরি করবে। এটা তোমাকে সুন্দর থাকার শক্তি দেবে। তুমি এই শক্তি কাজে লাগাতে পারবে– সুন্দরতম শক্তি। এটা কাজে লাগিয়ে তুমি জীবনে যা চাও তা পেতে পারবে।

আমি পুনরাবৃত্তি করেছিলাম,

www.pathagar.org

সুন্দরতম শক্তি। হ্যাঁ! একটা ধ্যানরত বারবি পুতুলের মতো আমি সুন্দরতম শক্তিটা চাই। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন,

তুমি কি এখনো ভারতীয় যোগ অনুশীলন কর?

হ্যাঁ প্রতিদিন সকালে করি।

ভালো। যোগ ভুলে যেও না। তোমার উপকার হবে। দুই ধরনের ধ্যানই তোমার কাজে লাগবে। ভারতীয় এবং বালিনিজ দুটি আলাদা হলেও দুটিই উপকারী। দুটিই একদিকে একইরকম। ধর্মের ব্যাপারেও আমার এই অভিমত। একইরকম।

সবাই এমনটা ভাবে না কেটুট। কিছু মানুষ ঈশ্বরকে নিয়ে তর্ক করতে ভালোবাসে।

দরকার নেই। যদি এমন কারো সাথে তোমার পরিচয় হয় যে ভিন্ন ধর্মালম্বি এবং যে ঈশ্বরকে নিয়ে তর্কে জড়াতে চায়, আমার পরামর্শ হচ্ছে তুমি সেই লোকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং কোনো তর্ক করবে না। আর বলবে, হ্যাঁ আমিও তোমার সাথে একমত। তারপর তুমি তোমার বাড়ি চলে গিয়ে তোমার মতন করে প্রার্থনা করবে। লোকজনের সাথে ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে শান্তি বজায় রাখার জন্য এটা আমার পরামর্শ।

কথা বলার সময় কেটুট তার থুতনি উঁচু করে রাখেন। আমি খেয়াল করে দেখেছি তার মাথা কিছুটা পেছনে হেলিয়ে একইসাথে জিজ্ঞাসু এবং অভিজাত ভঙ্গি ধরে রাখেন। অনেকটা কৌতূহলী বৃদ্ধ রাজার মতো। যেন সে সমস্ত পৃথিবীটা নাক দিয়ে দেখতে পায়। তার মাথায় পুরোপুরি টাক কিন্তু সেটা ঢেকে দেওয়ার জন্য লম্বা পালকের মতো ভ্রূ জোড়া, দেখে মনে হয় এখনই বুঝি সেগুলো উড়াল দেবে। তার মুখের দাঁত না থাকাটা আর পোড়া হাতটা ছাড়া সে অনেক সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনি আমাকে বলেছিলেন যুবক বয়সে তিনি নাকি একজন নৃত্যশিল্পী ছিলেন এবং তখন দেখতেও সুন্দর ছিলেন। আমারও তাই ধারণা। তিনি একবেলা খান। খুব সাধারণ বালিনিজ খাবার ভাতের সাথে হয় মাছ না হয় হাঁস। তিনি প্রতিদিন চিনি দিয়ে এক কাপ কফি খেতে পছন্দ করেন। কেন জানেন? শুধু এই আনন্দটা উদযাপন করতে যে তাঁর কফি খাওয়ার সামর্থ্য আছে। এই ডায়েটে আপনিও একশো পাঁচ বছর বাঁচবেন। তিনি তাঁর শরীর শক্তিশালী রেখেছেন। তিনি বলেছিলেন, প্রতিরাতে ঘুমানোর আগে ধ্যান করে মহাবিশ্বের ধ্বন্যাত্মক শক্তি নিজের অন্তঃস্থলে টেনে নেন। তিনি বলেছিলেন, 'মানব শরীর অন্যান্য সৃষ্টির মতো কেবল পাঁচটি উপাদানে তৈরি। আর তা হলো, পানি (আপা), আগুন (তেজো), বাতাস (বায়ু), আকাশ (আকাশা) এবং পৃথিবী। এবং তোমাকে যা করতে হবে তা হলো ধ্যান করার সময় এই সত্যে ঘনীভূত হতে হবে এবং এই সকল উৎস হতে তুমি শক্তি পাবে এবং তুমি শক্তিশালী থাকবে।'

তার ইংরেজি প্রবাদের সঠিক জ্ঞান প্রমাণিত হয়েছিল। যখন তিনি বলেছিলেন, মানুষ তখন হয়ে ওঠে মহাবিশ্ব। তুমি এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি তখন হয়ে উঠবে সমস্ত সৃষ্টি জগত।

একদিন তিনি সারাদিন খুব ব্যস্ত ছিলেন। বালিনিজ রুগীরা তার সারা উঠান জুড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। তাদের সবাই বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। কৃষক,

www.pathagar.org

ব্যবসায়ী, বাবা-দাদা। একটা বাবা-মা ছিল যারা মাথা থেকে খাবার নামিয়ে রাখছিল না, একটা কালো জাদুগ্রস্থ বৃদ্ধ মানুষ ছিল। একজন যুবক ছিল এবং একজন নারী ছিল যে তার সঙ্গী খুঁজছে আর ছিল নানান ধরনের শারীরিক প্রদাহ নিয়ে কতগুলো বাচ্চা। সবাই ছিল ভারসাম্যের বাইরে, সবার ভারসাম্যের পুনঃস্থাপন করতে হচ্ছিল।

কেটুটের বাড়ির পরিবেশ অবশ্য এমনি রুগীতে ভরপুর থাকত। কেটুটের সেবা নিয়ে ফুরসত পেতে মাঝে মাঝে তিন ঘণ্টাও লেগে যেত। কিন্তু তারা কখনোই তাতে বিরক্ত হয়ে একচুলও না নড়ে বা ক্রোধে চোখ পাকাতো না। বাচ্চাদের অপেক্ষা করার ব্যাপারটাও অন্যরকম ছিল। মায়েদের কোলে হেলান দিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করে বা নিজেদের আঙুল দিয়েই নিজেরা খেলত যাতে সময় কেটে যায়। আমার খুবই মজা লেগেছিল যখন দেখেছিলাম একটা শিশুকে নিয়ে তার বাবা মা কেটুটের কাছে এসেছে কারণ তাদের কাছে মনে হয় বাচ্চাটা খুবই দুষ্ট এবং তার একটা নিরাময় দরকার। সেই ছোট মেয়েটা কিনা দুষ্ট? যে টানা চার ঘণ্টা ধরে রোদের মধ্যে বসে ছিল একচুল অভিযোগ ছাড়া। তার সাথে না ছিল খাবার না খেলনা। সে কিনা দুষ্ট! আমার বলতে ইচ্ছে করেছিল, তোমরা দুষ্ট বাচ্চা দেখতে চাও? আমি তোমাদের আমেরিকা নিয়ে যাব। সেখানে আমি তোমাদের এমন কিছু বাচ্চা দেখাবো যে তোমরা বিশ্বাস করবে দুষ্ট বাচ্চা কি এবং তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি রিটালিনই বা কি? কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় অবশ্য ভদ্র শিশুদের আলাদা মানদণ্ড আছে।

কেটুট প্রতিটা মানুষকেই দেখেছিলেন, একজনের পর একজন আসছিল, যাচ্ছিল। সময় কিভাবে চলে যাচ্ছিল মনে হয় তিনি তা বুঝতেই পারছিলেন না। এরপর কে অপেক্ষা করছে তাতে মনোযোগ না দিয়ে যার যতটা সময় দরকার তাকে তিনি ততটা সময়ই দিচ্ছিলেন। তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর এক বেলার আহার সেই দুপুরের খাবার খেতেও কি না তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। উঠানে আঁঠার মতো লেগেছিলেন একেবারে। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতায় সেখানে বসে শেষ পর্যন্ত সবাইকে সেবা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যায় তাঁর চোখ এভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন তিনি একজন সামরিক যুদ্ধ ক্ষেত্রের চিকিৎসক। তার দিনের শেষ রুগী ছিল একজন খুবই সমস্যাক্রান্ত মধ্যবয়স্ক বালিবাসী। যে কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘুমাতে পারছে না বলে অভিযোগ করেছিল। তাকে যেন ভূতে তাড়া করছিল। সে কেবল একই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছিল, আর তা ছিল একই সাথে দুটো নদীতে ডুবে যাওয়া।

সেদিনের সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারছিলাম না কেটুটের জীবনে আমার ভূমিকা কি? প্রতিদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম তিনি কি আসলেই চান আমি তাঁর আশেপাশে থাকি আর তিনি জোর করেই যাচ্ছিলেন যে আমাকে যেতেই হবে আর তাঁর সাথে সময় কাটাতে হবে। আমার অপরাধ বোধ হতো আমি তাঁর সারাদিনের এতটা সময় নিয়ে নিতাম বলে কিন্তু সন্ধ্যার পর আমি যাওয়ার সময় তিনি সবসময় হতাশ হতেন। আমি আসলে তাকে ইংরেজিও শেখাচ্ছিলাম না। যেভাবে বা যেখানেই তিনি এত বছর ধরে ইংরেজি শিখুন না কেন ততদিনে তা তাঁর মজ্জায় কংক্রিটের

www.pathagar.org

গাঁথুনির মতো গেঁথে গিয়েছিল। নতুন করে তা সংশোধন আর সংযোজনের জায়গা ছিল না। আমি কেবল যা পারতাম তা হলো, প্রতিদিন কারো সাথে দেখা হলে 'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম' না বলে বরং বলতে শেখাতে, 'তোমার সাথে দেখা হয়ে ভাল লাগল।'

এক রাতে শেষ রুগী চলে যাওয়ার পর যুদ্ধ ক্লান্ত কেটুটকে যখন বিধ্বস্ত এবং বুড়োটে দেখাচ্ছিল আমি তখন বলেছিলাম, 'আমার এখন চলে যাওয়া উচিত এবং আপনাকে আরাম করতে দেওয়া উচিত।' তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমার জন্য আমার সবসময় সময় আছে।' তারপর আমাকে, আমার পরিবার, ভারত এবং ইটালি সম্পর্কে কিছু গল্প বলতে বলেছিলেন। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমি আসলে কেটুট লিয়ারের ইংরেজি শিক্ষক না। আমি তার তাত্ত্বিকজ্ঞানের ছাত্র নই কিন্তু আমি আসলে সেই বৃদ্ধ লোকের একটা জরুরি এবং সাধারণ আনন্দ। আমি তার সঙ্গ। আমি এমন একজন যার সাথে তিনি দেশ বিদেশের গল্প করে আনন্দ পান কারণ সেই সুযোগ তার হয়নি।

সে রাতে উঠানে আমাদের একসাথে কাটানো সময়টাতে কেটুট আমার কাছে যা জানতে চেয়েছিলেন তা হলো, মেক্সিকোতে গাড়ি ভাড়া কত এবং কি কারণে এইডস রোগ হয়। এই দুই ব্যাপারেই আমি আমার সাধ্যমতো তাকে তথ্য দিয়েছিলাম। তবে আমি জানি আপনারা অনেকেই আছেন যারা আমার চেয়ে ভাল জানেন এ ব্যাপারে। কেটুট তার জীবনে বালি দ্বীপের বাইরে পা রাখেননি। তিনি তার সারা জীবনের খুব কম সময়ই তাঁর উঠানের বাইরে কাটিয়েছেন। তিনি একবার মাউন্ট আগুং-এর একটা তীর্থস্থানে গিয়েছিলেন। সেটা আত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশাল বড় একটা আগ্নেয়গিরি। কিন্তু তাঁর মতে এর শক্তি অতিরিক্ত বেশি। তিনি যখন ধ্যান করতেন তার মনে হতো সেই শুদ্ধ আগুন তাকে গ্রাস করে ফেলবে। তিনি বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা মন্দিরে যান এবং বিয়েতে অথবা অভিষেক অনুষ্ঠানে তার প্রতিবেশীর দাওয়াতে যান। কিন্তু বেশির ভাগ সময় তাঁকে এখানেই পাওয়া যাবে, পা আড়াআড়ি করে বেতের মাদুরে বসে আছেন আর সাথে আছে তার পর দাদার তালের পাতার চিকিৎসা জ্ঞানকোষ যেটা নিয়ে তিনি মানুষের যত্ন নেয়, ভূত-প্রেত তাড়ান আর মাঝে মাঝে এক কাপ কফি খেয়ে আনন্দ-উদযাপন করেন।

তিনি সেদিন আমাকে ভুল ইংরেজিতে বলেছিলেন,

গতরাতে আমি তোমাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখলাম তুমি তোমার সাইকেল চালিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছ।

আমি তার ব্যাকরণ ঠিক করতে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আপনি এমন একটা স্বপ্ন দেখেছেন যে আমি সাইকেল চালিয়ে সব জায়গায় যাচ্ছি?

হ্যাঁ আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম, 'তুমি সাইকেল চালিয়ে সব জায়গায় ঘুরছ। আমার স্বপ্নে তুমি খুব খুশি ছিলে। সারা পৃথিবী তুমি সাইকেল চালিয়ে ঘুরছিলে এবং আমি তোমাকে অনুসরণ করছিলাম।'

হয়ত এটা তার অবচেতন ইচ্ছা। আমি বলেছিলাম,

www.pathagar.org

হয়ত কোনো একদিন আপনি আমার সাথে দেখা করতে আমেরিকা আসবেন কেটুট।

তিনি তার মাথা নেড়ে আনন্দের সাথেই অপারগতা জানিয়েছিলেন,

নাহ! পারব না লিজ। প্লেনে চড়ার মতো যথেষ্ট পরিমান দাঁত নেই আমার।

৮২

বলতে গেলে কেটুটের বউয়ের সাথে ভাব হতে আমার দেরিই লেগেছিল। তার ডাক নাম নায়মো। যার বড়, মাংসল, শক্ত পশ্চাতভাগ আর পান খাওয়া লাল দাঁত। পায়ের পাতা আর্থরাইটিসের কারণে মারত্মকভাবে বেঁকে গেছে কিন্তু বুদ্ধিতে চকচকে চোখ। প্রথম দর্শনেই আমার ভয় লেগেছিল। গির্জায় যাতায়াত করা সেই ধার্মিক মহিলাদের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল যাদের ইটালিয়ান জানালায় জানালায় দেখা যায়। তার হাব-ভাব দেখে মনে হতো আপনি যদি বিন্দুমাত্র অন্যায় কাজ করে লুকিয়ে রাখেন সে তা ধরে ফেলবে। প্রথমে প্রকাশ্য ভাবেই সে আমাকে সন্দেহ করত। হয়ত মনে মনে বলত, এই লালমুখোটা আমার বাড়িতে কি চায়? কালিঝুলি মাখা রান্নাঘর থেকে আমাকে এভাবে দেখত যে মনে হতো সে আমার এখানে থাকাকে মেনেই নিচ্ছে না। আমি হাসতাম কিন্তু তাকে দেখে মনে হতো সে বুঝতে পারছে না আমাকে কি লাঠি দিয়ে তাড়া করে সেখান থেকে তাড়ানো উচিত হবে কিনা।

তারপর একদিন, ফটোকপি করার ঘটনার পর সব কিছু বদলে যায়।

কেটুটের ছোট ছোট হাতের লেখার পুরোনো নোটবুক এবং খাতার স্তূপ আছে। এগুলো বালিনিজ নিরাময় রহস্য, যার সবই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তার দাদা মরে যাওয়ার পর এইসব তথ্য লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে তিনি সবকিছু তার নোটবুকে তুলে রাখেন। সেই লেখাগুলো আসলে অমূল্য। সকল গাছগাছড়া এবং ঔষধের বিশদ বিবরণ আছে সেখানে। প্রায় ষাট পৃষ্ঠা হস্তরেখা বিষয়ক এবং বাকিটা জ্যোতিষী শাস্ত্রের তথ্য, মন্ত্র এবং নিরাময় কৌশল। একটাই সমস্যা ছিল, সেই নোটবুকগুলোকে ইঁদুর আর ফাঙ্গাসের দৌরাত্ম ভোগ করতে হয়েছে এবং তারা প্রায় ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ছিল। দেখতে ম্লান হলুদ রঙের টুকরো টুকরো এবং ছাতা কুরা পড়া। যেন শরতের ঝরা পাতা। যখনই সে এক পৃষ্ঠা উল্টাত সেই পৃষ্ঠার একেবারে বারোটা বেজে যেত।

একদিন কেটুট যখন তেমনি একটা ক্ষত-বিক্ষত নোটবই হাতে নিয়েছিল, আমি বলেছিলাম, কেটুট আমি আপনার মতো চিকিৎসক নই তবে আমার মনে হচ্ছে বইটা মারা যাচ্ছে।

তিনি হেসে বলেছিলেন, তোমার মনে হচ্ছে এটা মারা যাচ্ছে।

www.pathagar.org

জ্বি স্যার। এটা আমার পেশাগত অভিমত। এই বইটি যদি দ্রুতই কোনো সাহায্য না পায় তাহলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে এটা মারা যাবে।

তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি কি এই বইটা মরে যাওয়ার আগে এটার ফটোকপি করতে পারি? তাঁকে বুঝিয়েছিলাম ফটোকপি জিনিসটা কি এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলাম নোটবুকটা কেবল আমি আমার কাছে চব্বিশ ঘন্টা রাখব তারপর তাকে দিয়ে যাব। কোনো ক্ষতি হবে না জিনিসটার। তার দাদার জ্ঞানকোষ রক্ষায় আমি সতর্ক থাকব আমার এমন আবেগপ্রবণ নিশ্চয়তায় তিনি শেষ পর্যন্ত সম্পত্তিটা দিতে রাজী হয়েছিলেন। আমি শহরে সাইকেল চালিয়ে একটা ইন্টারনেট ও ফটোকপির দোকানে গিয়ে প্রতিটা পৃষ্ঠা ফটোকপি করেছিলাম। তারপর প্লাস্টিক দিয়ে বাঁধাই করা নতুন কপিটা পেয়েছিলাম। পরের দিন সন্ধ্যার আগে আমি পুরোনো এবং নতুন দুই রকম কপিই নিয়ে গিয়েছিলাম। কেটুট আশ্চর্য এবং আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি খুশি হয়ে বলেছিলেন, পঞ্চাশ বছরের জন্য শান্তি।

আমি তাকে বলেছিলাম আমি কি অবশিষ্ট লেখাগুলোও ফটোকপি করে দিতে পারি তাতে সবটাই নিরাপদে থাকবে। তিনি আমাকে আর একটা ছেঁড়া-ফাড়া, পোকায় গ্রাস করা জটিল বালিনিজ সংস্কৃত শব্দের এবং জটিল আঁকিবুকির একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বলছিলেন, এই নাও আর একটা রুগী।

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, আমাকে চিকিৎসা করতে দিন।

সেটাও চরম সফল চিকিৎসা পায়। সেই সপ্তাহ শেষ হতেই আমি বেশ কয়েকটা গ্রন্থ তাকে ফটোকপি করে দিয়েছিলাম। প্রতিদিন কেটুট তার স্ত্রীকে ডেকে আনন্দে উল্লসিত হয়ে সেই কপিগুলো দেখাতেন। নায়মোর মুখের রেখার কোনো পরিবর্তন হতো না তবে সে তার প্রমাণ দ্রুত যাচাই করে দেখত আসলেই সেগুলো সেই নোটবই এর অবিকল নকল বা কপি কিনা।

পরবর্তী সোমবার আমি যখন সেখানে যাই নায়মো আমাকে জেলি জারে করে গরম কফি খেতে দিয়েছিল। সে যখন কফিটা চাইনিজ পিরিচে করে নিয়ে আসছিল আমি তাকে দেখছিলাম, তার রান্নাঘর থেকে কেটুটের উঠান পর্যন্ত সে এভাবে হেলে দুলে আসছিল যেন অনেকটা দূরের পথ সে পাড়ি দিচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম কফিটা কেটুটের জন্য। কিন্তু কেটুটের কফি ততক্ষণে খাওয়া শেষ। এটা সে আমার জন্য বানিয়েছিল। তাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম কিন্তু দেখে মনে হয়েছিল সে আমার ধন্যবাদ দেওয়াতে বিরক্ত হয়েছে। দুপুরের খাবার তৈরির সময় রান্নাঘরের দরজায় মোরগ দেখলে যেভাবে লোকে তাকে হাত ইশারায় তাড়িয়ে থাকে সে ঠিক সেভাবেই হাত নেড়েছিল। কিন্তু পরের দিন সে আমার জন্য এক কাপ কফি এবং এক বাটি চিনি নিয়ে এসেছিল এবং এর পরের দিন এক কাপ কফি, এক বাটি চিনি এবং একটা ঠাণ্ডা আলু সেদ্ধ। সেই সপ্তাহে সে প্রতিদিন একটা করে নতুন পদ যোগ করেছিল। এটা অনেকটা ছোটবেলার বর্ণমালা শেখার কৌশলের মতো– আমি দাদির বাড়ি যাচ্ছি এবং আমি একটা আপেল এনেছি। আমি দাদির বাড়ি যাচ্ছি এবং একটা আপেল ও বেলুন এনেছি। আমি দাদির বাড়ি যাচ্ছি এবং আমি একটা আপেল ও বেলুন এনেছি, একটা জেলির গ্লাসে এক কাপ কফি, এক বাটি চিনি এবং একটা ঠাণ্ডা আলু...

www.pathagar.org

তারপর আমি যখন উঠানে দাঁড়িয়ে কেটুটকে বিদায় জানাচ্ছিলাম তখন নায়মো ঝাড়ু দিতে দিতে আমার পেছনে এসে এভাবে ঝাড়পোছ করছিল যেন তার রাজত্বে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি আমার দুই হাত পিছন দিকে জড়ো করে দাঁড়িয়েছিলাম। সে আমার কাছে এসে এভাবে আমার একটা হাত ধরেছিল যেন সে আমার হাতের তালা খুলে আমার সূচি আঙুল খুঁজে পেয়েছে। তারপর সেই আঙুলের পাশে তার শক্ত বিশাল হাত দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আমাকে একটা লম্বা আলিঙ্গন করেছিল। আমি এই জোরালো আলিঙ্গনে, তার হৃৎস্পন্দনের শব্দে, আমার বাহুতে আমার পেটে সর্বত্র তার ভালোবাসা টের পাচ্ছিলাম। তারপর সে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন মুক্ত করে সাথে সাথেই এভাবে ঝাড়ু দিতে শুরু করেছিল যেন একটু আগে কিছুই হয়নি। আর আমি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে একই সাথে আনন্দের দুই নদীতে ডুবে যাচ্ছিলাম।

৮৩

আমি একটা নতুন বন্ধু পেয়েছিলাম। তার নাম ইউধি। যার সেখানকার উচ্চারণ ইউ ডে। সে মূলত জাভার নাগরিক। এখন ইন্দোনেশিয়ার বাসিন্দা। বাসা ভাড়া নেওয়ার সময় তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। যে বাড়িটায় আমি থাকতাম সেই বাড়ির মালিকের গ্রীষ্মকালীন সময়ের অনুপস্থিতিতে তার সকল সম্পত্তির দেখাশোনা করত ইউধি। ইউধির বয়স সাতাশ, গাঁট্টাগোট্টা শরীর। সে অনেকটা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সার্ফারদের মতো কথা বলত। কথায় কথায় ম্যান, ডুড এসব। তার এমন একটা হাসি ছিল যা দিয়ে সে যে কোনো অন্যায় বন্ধ করে দিতে পারবে আর আছে তার বয়সের চেয়েও লম্বা জটিল একটা জীবন কাহিনি।

জাকার্তায় জন্মগ্রহণ করা ইউধির মা একজন গৃহিণী এবং বাবা এলভিস প্রিসলির একজন ইন্দোনেশিয়ান ভক্ত, যার এয়ার কন্ডিশন এবং রেফ্রিজেরাটরের ব্যবসা ছিল। ইউধির পরিবার ছিল খ্রিস্টান। যা পৃথিবীর এই অংশে মানে দক্ষিণ এশিয়ায় কিছুটা বেমানান। সে আমাকে তার ছোট বেলার কিছু মজার ঘটনা বলেছে, তার প্রতিবেশী মুসলিমরা তাকে ক্ষেপাত এইসব বলে, 'তুমি শূকর খাও' 'তুমি শূকর খাও' আর 'তুমি ভালোবাসো জিউস কে।' ইউধি এসব ক্ষেপানো গায়ে মাখত না। চারিত্রিকভাবেই ইউধি কোনো বিষয়ে এত বিরক্ত হয় না। তার মা মুসলমান বাচ্চাদের সাথে অত মেলামেশা পছন্দ করত না। বিশেষ করে একটা বিষয় নিয়ে তার মায়ের আপত্তি ছিল, মুসলমান বাচ্চারা খালি পায়ে হাঁটে এবং তাদের সাথে থেকে ইউধিও কেন সেরকমভাবে থাকতে চায়। ইউধির মা ওকে বোঝাতো কাজটা স্বাস্থ্যসম্মত না। তাই সে তার ছেলেকে বেছে নিতে বলেছিল, হয় সে বাইরে যাবে, জুতো পায়ে দিয়ে খেলবে না হয় সে ঘরে থাকবে খালি পায়ে। ইউধির কাছে জুতো পরে বাইরে

www.pathagar.org

যাওয়াটা পছন্দ হয়নি তাই সে তার শৈশব এবং কৈশোরের একটা বড় অংশ শোবার ঘরে কাটিয়েছিল। এবং সেখানেই সে শিখেছিল কিভাবে গিটার বাজাতে হয় এবং তা খালি পায়েই।

সেই লোকটার সংগীত জ্ঞান অতুলনীয়। আমি এমনটা দেখিনি। তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নেই কিন্তু সুর তাল লয় সম্পর্কে এমন ধারণা দেখা যায় না। তার এবং তার সাথে বেড়ে ওঠা দুই বোনেরও তাই। সে পূর্ব এবং পশ্চিমের সংগীতের সমন্বয় করে ধ্রুপদি ইন্দোনেশিয়ান লুলা বাই বানিয়েছে, তাতে দিয়েছে রাগের বাঁক এবং পুরোনো দিনের স্টিভ ওয়ান্ডার ফানক। আহ! ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। তার অবশ্যই বিখ্যাত হয়ে ওঠার কথা। একথা শুধু আমি না, যারা যারাই ওর গান শুনেছে সবাই এ ব্যাপারে একমত। হ্যাঁ ছেলেটার তো বিখ্যাত হওয়ারই কথা।

সে মূলত যেটা চাইত তাহলো– আমেরিকায় থাকা এবং সিনেমা জগতে কাজ করা। পৃথিবীর সাথে স্বপ্ন ভাগ করে নেওয়ার স্বপ্ন দেখত সে। তাই তরুণ অবস্থাতেই ইউধি কোনো একটা উপায়ে নিজেকে একটা চাকরির জন্য দাঁড় করিয়েছিল তেমন কোনো ইংরেজি জ্ঞান ছাড়াই। একটা কার্নিভাল ক্রুজ লাইন জাহাজ ছিল সেটা, তার বিশ্বাস ছিল যেভাবেই হোক এটা তাকে জাকার্তার ছোট পরিসর থেকে বিশাল নীল জগতে নিয়ে যাবে। ইউধি যে চাকরি পেয়েছিল তা হলো ব্যবসায়ী অভিবাসীদের উন্মাদ পর্যায়ের চাকরিগুলোর একটি। পাটাতনের নিচে থেকে দিনে বারো ঘণ্টা চাকরি করা আর মাসে একদিন শরীর পরিষ্কার করার সুযোগ পাওয়া। তার সহকর্মীরা ছিল ইন্দোনেশিয়ান এবং ফিলিপিনো। ফিলিপিনো আর ইন্দোনেশিয়রা জাহাজের আলাদা অংশে থাকত, তারা কখনোই মিশত না। জানেনই তো মুসলমান বনাম খ্রিস্টানের দ্বন্দ্ব। কিন্তু ইউধি তার সহজাত চরিত্রে সকলের সাথেই মিশত এবং ধীরে ধীরে এই দুই শ্রেণির এশিয়ান শ্রমিকদের মধ্যে অনেকটা গুপ্তচরের মতো হয়ে গিয়েছিল। সে দেখেছিল আসলে এই কাজের লোক, বাসন মাজা আর তদারকির কাজে নিয়োজিত মানুষগুলোর মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে মিলই বেশি। এরা সবাই অগাধ পরিশ্রম করে একশো ডলার পরিবারের কাছে পাঠানোর জন্য।

যখন প্রথমবার এই ক্রুজ জাহাজটি আমেরিকান পোতাশ্রয়ের দিকে যাচ্ছিল ইউধি সারারাত ধরে সবচেয়ে উঁচু ডেকে বসে বসে আকাশের দিগন্ত রেখায় সেই শহরের রেখা ফুটে ওঠা দেখছিল। কয়েক ঘণ্টা পর সে নিউইয়র্কে নেমে হুট করে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল ঠিক যেমনটা সিনেমায় দেখা যায়। তারপর যখন আফ্রিকান অভিবাসী গাড়ি চালকটি জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কোথায় যাবে? তিনি বলেছিলেন, যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাও। আমি সব ঘুরে দেখতে চাই। কয়েকমাস পরে জাহাজটি আবার নিউইয়র্কে নোঙর ভিড়িয়েছিল। আর সেবার ইউধি বুঝে শুনেই নেমেছিল। ততদিনে ক্রুজ লাইনের সাথে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে তখন আমেরিকা থাকবে বলে ঠিক করেছিল।

জাহাজের পরিচিত এক ব্যক্তির সাথে সে কিছুদিনের জন্য সুবরবান নিউ জার্সিতে থাকত। সেখানে সে একটা শপিং মলের স্যান্ডউইচের দোকানে চাকরি পেয়েছিল।

www.pathagar.org

সেই একই অভিবাসী নিয়মের বারো ঘন্টার চাকরি। আর সেবার ফিলিপিনো নয় মেক্সিকানদের সাথে তার কাজ করতে হয়েছিল। সেই কয়েক মাসে ইংরেজির চেয়ে সে স্প্যানিশ ভাল শিখেছিল। খুব অল্প যেটুকু অবসর পেত তখন সে রাস্তায় ট্রাক চালিয়ে কেবল ঘুরে বেড়াত। এখনো সেই শহরটা সম্পর্কে ইউধি ভাষাহীন। তার মতে সেটা পুরো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসাপূর্ণ জায়গা। তারপর নিউইয়র্কে কোনোমতে সে পুরো পৃথিবী থেকে আসা একদল সংগীতজ্ঞদের দলে ভিঁড়ে গিয়েছিল। সে সেখানে গিটার বাজাত। জ্যামাইকা, আফ্রিকা, ফ্রান্স, জাপান থেকে আগত নানান তরুণ প্রতিভাময়ী সংগীতশিল্পীদের দল ছিল সেটা। সেই দলের মধ্যে সে এনের সাথে পরিচিত হয়েছিল। এন ছোট করে কাটা চুলের একটা সুন্দরী মেয়ে। সে কানেকটিকাট থেকে এসেছিল। মেয়েটি বেজ গিটার বাজাত। তার প্রেমে পড়ে মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল ইউধি। তারা ব্রুকলিনে একটা অ্যাপার্টমেন্টে ভাড়া থাকত আর উচ্ছল ছেলেপুলের দলের সাথে ফ্লোরিডার রাস্তায় একসাথে ভ্রমণ করতে নেমে পড়ত। জীবন ছিল অবিশ্বাস্য রকম সুখি। ধীরে ধীরে তার ইংরেজি অনেকটা শুধরে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সে চিন্তা করছিল কলেজে যাওয়ার।

১১ সেপ্টেম্বর সে তার ছাদ থেকে সেই উঁচু ভবনগুলোর ধ্বসে পড়া দেখছিল। অন্য সবার মতো সেও অনড় অচল হয়ে গিয়েছিল যে, 'এ কি হয়ে গেল! পৃথিবীর মধ্যে এমন প্রেমময় একটা জায়গায় কিভাবে কেউ এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর কথা ভাবতে পারে।' যখন ইউ এস কংগ্রেস ক্রমাগত সন্ত্রাসী হামলা মোকাবেলার জন্য দেশরক্ষা আইন পাশ করিয়েছিল, আমি জানি না তখন ইউধিকে কতটা গঞ্জনা শুনতে হয়েছিল আর কত লোকের চক্ষুশূল হতে হয়েছিল। নতুন অভিবাসী আইন প্রবর্তনের সময় অনেকেই ইসলামী দেশগুলোর সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। সেই আইনের মধ্যে একটা শর্ত ছিল সকল ইন্দোনেশিয় অভিবাসীদের গৃহনিরাপত্তা বিভাগে নিবন্ধন করে তবে আমেরিকায় থাকতে হবে। ইউধি এবং তার অন্য ইন্দোনেশিয় যখন ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে তখন নিরাপত্তা অফিস থেকে ফোন বাজতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই মেয়াদের বেশি থেকে ফেলেছিল, অনেকেই ছিল নির্বাসিত। আর অন্যদিকে নিবন্ধন না করে তারা অপরাধীর মতোই ব্যবহার করছিল। সন্দেহজনক ইসলামিক অন্ধ বিশ্বাসী সন্ত্রাসীরাও তো একইভাবে নিবন্ধন না করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই ইউধি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিবন্ধন করবে। যেহেতু সে একজন আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করেছিল এই তথ্যটা হালনাগাদ করে সে একজন বৈধ নাগরিক হতে চেয়েছিল। লুকিয়ে চুরিয়ে থাকার পক্ষে ছিল না সে।

সে এবং অ্যান অনেক উকিলের সাথে পরামর্শ করেছিল কিন্তু কেউই বলতে পারেনি কি করা উচিত। নাইন এলিভেনের আগে ব্যাপারটায় কোনো ঝামেলা ছিল না। সে তখন বিবাহিত। সে অবলীলায় তার ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে তার বিয়ের তথ্য হালনাগাদ করতে তার ভিসার অবস্থান জানাতে পারত এবং সেভাবেই তার বৈধ নাগরিক হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। কিন্তু এখন? কে জানতো এসব? ইমিগ্রেশন অফিসার বলেছিল, 'আইনটি এখনো পরীক্ষিত না। ওরা আইনটি তোমার ওপরই পরীক্ষা করবে।' তাই ইউধি এবং তার স্ত্রী একজন চমৎকার ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ঘটনাটা খুলে বলেছিল। তাদের বলা হয়েছিল পর দিন

www.pathagar.org

একই সময়ে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যেতে আর পাশাপাশি কড়াকড়ি আদেশ দেওয়া হয়েছিল ইউধি যাতে খালি হাতে যায়। তার স্ত্রীকেও যাতে না নিয়ে যায় এমনকি কোনো উকিলও না। ভাল কিছুর আশা করে ইউধি তার স্ত্রীকে না নিয়ে, পকেটে কিছু না নিয়ে সেখানে গিয়েছিল এবং সেখানেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

তারা তাকে নিউ জার্সির এলিজাবেথ শহরের একটা বন্দিশালায় নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে কয়েক সপ্তাহ অভিবাসী বন্দিদের মাঝে ছিল। তার সাথের সবাইকে তখন দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ঠিকমতো ইংরেজি বলতে পারত না এমন অনেকেই বহু বছর ধরে আমেরিকায় কাজ করছিল। কেউ কেউ তাদের পরিবারকে তাদের গ্রেফতারের বিষয়টা নাকি জানাতেও পারছিল না। বন্দিশালায় তারা একরকম অদৃশ্য ছিল। কেউ জানতো না তারা কোথায় আছে। ইউধির স্ত্রী এনের তার স্বামীকে খুঁজে পাওয়ার ঘটনা নাকি এক ইতিহাস। সেই বন্দিশালার একটা ব্যাপার ইউধির সবচেয়ে মনে আছে আর তা হলো, এক ডজন কয়লার মতো কালো শুকনা ভয়াবহ নাইজেরিয়ান মানুষ। তাদের সবাইকে ইস্পাত বহনকারী জাহাজসমূহের মধ্যে একটা কন্টেইনারে পাওয়া গেছে। তাদের খুঁজে পাওয়ার আগে তারা সেই কন্টেইনারে প্রায় এক মাস লুকিয়ে ছিল। তারা হয়ত আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশে ঢুকতে চেয়েছিল কিন্তু এখন তারা কোথায় এসে পড়েছে তার কোনো ধারণাই তাদের ছিল না। তারা এত বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকত মনে হতো স্পটলাইট দিয়ে এইমাত্র তাদের চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট সময় বন্দিশালায় রাখার পর আমেরিকা সরকার আমার বন্ধু ইউধিকে একজন ইসলামিক সন্ত্রাসী সন্দেহে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেটা ছিল শেষ বছর। আমি জানি না সে কি আর কখনো আমেরিকার আশেপাশে যাওয়ার অনুমতি পাবে কি না। এখনো সে এবং তার স্ত্রী ভেবে পায় না তাদের জীবনের কি হবে। তাদের স্বপ্ন তো এখানে এভাবে ইন্দোনেশিয়ায় বেঁচে থাকার মধ্যে ছিল না।

প্রথম বিশ্বে থাকার পর জাকার্তার বস্তিতে থাকা সহ্য করা যায় না। ইউধি তাই বালিতে গিয়েছিল সেখানে থাকা যায় কিনা তা দেখতে। কিন্তু সেই সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা কঠিন। কেননা সে বালির ভাষা জানে না। সে একজন জাভানিজ আর জাভার মানুষদের সেখানে কেউ এক চুল সহ্য করতে পারে না। বালিতে তাদের চোর এবং ভিক্ষুক হিসেবে দেখা হয়। ইউধিকে নিউইয়র্কের চেয়ে তার নিজের দেশ এই ইন্দোনেশিয়াতেও অনেক কুসংস্কারের মুখোমুখি হতে হয়। সে তখনো জানে না তার কি করা উচিত। হয়ত তার স্ত্রী সেখানে গিয়ে তার সাথে থাকবে কি থাকবে না, সে জানত না। আর থাকবেই না কেন? সেখানে তার জন্য কিবা আছে? তাদের সেই বিবাহিত সম্পর্ক তখন ইমেইল ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে আটকে গিয়েছিল। সেখানে সে একেবারে বেমানান, একেবারে অন্য ঘরানার। সব কিছু ছাপিয়ে সে আসলে বেশি রকম আমেরিকান। ইউধি এবং আমি একই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতাম, নিউইয়র্কের একই রেস্টুরেন্টের কথা বলতাম,

www.pathagar.org

আমরা একই সিনেমার ভক্ত। সন্ধ্যায় সে আমার বাসায় চলে আসত। আমি তাকে বিয়ার খেতে দিতাম আর সে আমাকে গিটারে চমৎকার গান গেয়ে শোনাত। আশা করি সে বিখ্যাত হবে। পৃথিবীতে যদি ন্যায় বলে কিছু থেকে থাকে তার অনেক বিখ্যাত হওয়া উচিত।

সে বলত, ডুড, জীবনটা এমন বিশৃঙ্খল কেন?

৮৪

আমি আমার কবিরাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা জীবন এমন বিশৃঙ্খল কেন?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,

ভুটা ইয়া, দেওয়া ইয়া।

এর মানে কি?

মানুষই খারাপ, মানুষই ভালো। দুটিই সত্যি।

এটা আমার পরিচিত তত্ত্ব। খুব বেশি ভারতীয়, খুব বেশি যোগিক। আমার গুরু যেমনটা অনেকবার ব্যাখ্যা করেছেন, ধারণাটা তেমন। মানুষ জন্মগতভাবে দুই দিকে সমান টান ও প্রসারণ অনুভব করার তাড়না নিয়ে জন্মায়। আলো এবং অন্ধকারের উপাদানের সমান উপস্থিতি আমাদের সবার মাঝেই আছে। তাই এটা যার যার ওপর নির্ভর করে সে ঢালাওভাবে কোন দিকে যাবে। ন্যায় না হিংসার দিকে। এই গ্রহের মানুষের উন্মাদনার কারণ ধর্মের দিকে ভারসাম্যের অভাব এবং তার পরবর্তী বোকামির, সামগ্রিক এবং ব্যক্তিগত, ফলাফল।

আমি আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম,

তাহলে আমরা পৃথিবীতে এই পাগলামির জন্য কি করতে পারি।

কেটুট হেসে উত্তর দিয়েছিলেন,

কিছু না। কেবল কিছু উদারতা যোগ করতে পারি। এটা পৃথিবীর প্রকৃতি। এটা ভাগ্য। নিজের পাগলামি নিয়ে কেবল মাথা ঘামাও। নিজেকে শান্তিতে রাখ।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

কিন্তু আমরা কিভাবে নিজেদের ভেতর শান্তি খুঁজব?

তিনি বলেছিলেন,

ধ্যান। ধ্যানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আনন্দ ও শান্তি। আজ আমি তোমাকে একটা নতুন ধ্যান শেখাবো যা তোমাকে আরও ভাল মানুষে পরিণত করবে। একে বলে 'চার ভাই ধ্যান।' খুব সহজ।

কেটুট ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন, বালিনিজরা বিশ্বাস করে আমরা আমাদের জন্মের সময় আরও চারটি অদৃশ্য ভাই নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেই যারা সারাজীবন আমাদের রক্ষা করে। যখন বাচ্চাটা তার মায়ের গর্ভে থাকে চার ভাই তখনো তার সাথে থাকে। তারা সেখানে জরায়ু, অ্যামিনিউটিক ফ্লুইড, নাড়িভুঁড়ি এবং

www.pathagar.org

হলুদ আঠালো উপাদান হিসেবে বিদ্যমান থাকে। যেটা মাতৃগর্ভে বাচ্চার চামড়াকে রক্ষা করে। বাচ্চা জন্মের পর বাবা-মা বাচ্চার সাথে আগত এই উপাদানগুলোর যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে, নারকেলের খোলে সেগুলো রেখে সদর দরজায় সেগুলো পুঁতে রাখে। ধরে নেওয়া হয় এই নারকেলের খোলে তাদের মরদেহ শান্তিতে শুয়ে আছে এবং সেই জায়গাটাকে সব সময় ঘরের মতো পরিচর্যা করা হয়।

ছোট থেকেই শিশুটিকে এটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়– সে তার সাথে এই চার ভাই নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে– সে যেখানেই যাক না কেন তারাও তার সাথে সেখানে যাবে আর তাকে রক্ষা করবে। এই ভাইগুলো একজন ব্যক্তির সুখি ও নিরাপদ জীবনের জন্য তার মধ্যে এই চার সৎগুণ নিয়ে বসত করে আর তা হলো, বুদ্ধিমত্তা, বন্ধুত্ব, শক্তি এবং কাব্যিকতা যেটা আমি খুব পছন্দ করি। যেকোনো বিপদে উদ্ধার করার জন্য এবং সহযোগিতার জন্য তাদের ডাকা যায়। ব্যক্তি যখন মারা যায় তার এই চার ভাইয়ের ভূত তার আত্মা সংগ্রহ করে তাকে স্বর্গে নিয়ে যায়।

সেদিন কেটুট আমাকে বলেছিল এই পর্যন্ত সে কোনো পশ্চিমাকে এই ধ্যান শেখায়নি। কিন্তু আমাকে শেখাবে কেননা আমি এর জন্য তৈরি। প্রথমে সে আমাকে আমার অদৃশ্য ভাইদের নাম শিখিয়েছিল,

এংগো পাতিহ, মারাগিও পাতিহ, বানাস পাতিহ এবং বানাস পাতিহ রাগিও। সে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে এই নামগুলো যাতে আমি মুখস্থ করে ফেলি এবং সারা জীবন আমার প্রয়োজনে তাদের কাছে সাহায্য চাই। সে বলেছে এদের সাথে কথা বলার সময় ঈশ্বরের সাথে কথা বলার মতো এত ভেবে চিন্তে বলতে হবে না। আমি সহজাত মায়া মমতায় আমার ভাইদের সাথে কথা বলতে পারব। কেননা এটা আমারই পরিবার।

কেটুট বলেছিলেন, সকালে আমি যখন আমার গা ধুই আমি যেন তাদের নাম নেই। প্রতি বেলায় খাবারের সময়, খাবার ভোগ করার আনন্দে আমি যেন তাদের নাম নেই। যখন আমি ঘুমাতে যাব তখন যেন তাদের ডেকে বলি, 'আমি এখন ঘুমবো। ভাইরা, তোমরা জেগে থেকে এখন আমাকে রক্ষা করবে' এবং তারা তখন ঢাল হয়ে আমাকে ভূত-প্রেত থেকে এবং দুঃস্বপ্ন থেকে রক্ষা করবে।

আমি বলেছিলাম,

তাহলে তো ভালোই। আমাকে মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন ভোগায়।

কি ধরনের দুঃস্বপ্ন?

আমি তখন কেটুট কে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেই। খুব ছোটবেলা থেকে একটা দুঃস্বপ্নই আমাকে তাড়া করে যাচ্ছে আর তা হলো একটা লোক আমার বিছানার পাশে ছুরি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্নটা খুবই গভীর হয় আর মানুষটাকেও খুব জীবন্ত লাগে। প্রতিবার আমি চিৎকার করে উঠি। আর সব সময় এরপর আমার হৃদয় ধুক-পুক করতে থাকে, আমার সাথে যারা একই বিছানায় শোয় তাদের কাছে ব্যাপারটা মজার কিছু না। আমার যতদূর মনে পড়ে কয়েক সপ্তাহ পরপরই আমি এই স্বপ্নটা দেখে থাকি।

www.pathagar.org

আমি কেটুটকে তা বলার পর তিনি কিন্তু আমাকে উল্টো বলেছিলেন, বছরের পর বছর আমি নাকি ভুল বুঝে গেছি। ছুরি হাতে লোকটা আসলে আমার কোনো শত্রু না সে আমার চার ভাইয়ের একজন। ছুরি হচ্ছে তার শক্তির প্রকাশ। সে আমাকে আঘাত করছে না সে আমাকে কোনো ভূত প্রেত থেকে রক্ষা করছে। আমি জেগে যাচ্ছি কারণ তখন আমার ভাই হয়ত কোনো ভূত-প্রেতের সাথে লড়ছে আর তাতে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তার হাতে এটা কোনো ছুরি না এটার নাম ক্রিস। খুব ক্ষমতাসম্পন্ন ছোরা। আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই বরং আমার নিশ্চিন্তে শুতে যাওয়া উচিত।

তিনি বলেছিলেন,

তুমি ভাগ্যবতী। তুমি তাদের এভাবে প্রায়ই দেখ। আমি কেবল তাদের ধ্যানের মাঝে দেখতে চেষ্টা করি আর দেখতে পাই। এমন স্বাভাবিকভাবে না। তোমার আত্মিক শক্তি অনেক বেশি। আমার ধারণা কোনো এক দিন তুমি একজন মহিলা কবিরাজ হবে।

আমি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। কিন্তু তখনই তা সম্ভব হবে যখন আমি একটা সিরিয়াল নাটকে নামব।

সেও আমার সাথে হেসেছিল। সে অবশ্যই আমার কৌতুক ধরতে পারেনি। তবে মানুষের কৌতুক করার ব্যাপারটায় সে ভালোবেসেই হেসেছিল। তারপর কেটুট আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল আমার সেই চার ভাইয়ের সাথে কখন কথা বলতে হবে। তাদের অবশ্যই বলতে হবে, আমি কে। এতে তারা আমাকে চিনতে পারবে। আমাকে অবশ্যই একটা গোপন ডাক নাম উল্লেখ করতে হবে যা তারা আমার জন্য ব্যবহার করে। আমাকে অবশ্যই বলতে হবে, আমি লাগো প্রানো।

লাগো প্রানো মানে সুখি শরীর।

তারপর পড়ন্ত বিকেলের সূর্যের আলোয় আমি যখন আমার সুখি শরীরটাকে সাইকেলে করে পাহাড়ে ঠেলে উঠাচ্ছি তখন জঙ্গলের পথে একটা বিরাট বড় বানর গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে আমাকে তার সবকটা দাঁত দেখিয়েছিল। আমি কিন্তু একটুও শিউরে উঠিনি। বরং 'সরে যাও জ্যাক, আমাকে রক্ষা করার জন্য এখন চারটা ভাই আছে' এই কথাটা বলে আমি বানরটার পাশ দিয়ে বুক ফুলিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৮৫

●

এরপর দিন একটা বাস আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল। খুব ছোট একটা বাস তবুও ধাক্কাটা এত জোরালো ছিল যে আমি সেই খোলা রাস্তার ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে একটা সিমেন্টের জলসেচন পরিখার সাথে বাড়ি খেয়েছিলাম। এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে প্রায় ত্রিশটি বালিনিজ মোটর সাইকেল থেমেছিল আমাকে সাহায্য করতে। সবাই আমাকে তাদের বাড়িতে জল-খাবারের জন্য দাওয়াত করছিল। সম্ভাব্য বিপদ বিচারে

www.pathagar.org

ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক একটা ঘটনা। আমার বাই সাইকেলের কিছু হয়নি কিন্তু ঝুড়িটা বেকে গিয়েছিল আর হেলমেটটা ফেটে গিয়েছিল, যাক মাথার চেয়ে হেলমেট ফাটাও ভালো। সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হয়েছিল আমার হাঁটুতে। গভীরভাবে কেটে গিয়ে তাতে কিছু ধুলাবালি আর নুড়ি ঢুকে গিয়েছিল। ক্ষতটা কয়েক দিনের মধ্যে গভীর হয়ে খুব বাজে রকম প্রদাহের দিকে চলে যায়। এমন গ্রীষ্মকালীন আর্দ্র অঞ্চলে এটা স্বাভাবিক।

তাকে বিরক্ত করতে চাইনি কিন্তু কিছু করার ছিল না শেষমেশ আমাকে প্যান্ট গুটিয়ে কেটুট লিয়ারের উঠানে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়েছিল। হলুদ ব্যান্ডেজটা সরিয়ে ক্ষতটা দেখাতেই সে সেটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরে বলেছিলেন,

ইনফেকশন হয়ে গেছে।

হ্যাঁ।

তোমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।

এটা বিস্ময়ের। সে কি চিকিৎসক নয়। কিন্তু কোনো কারণে সে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে চাচ্ছিল না এবং আমি তাকে জোর করিনি। হয়ত সে পশ্চিমাদের ঔষধ দেয় না। কিংবা হয়ত কেটুটের কোনো গোপন বিরাট পরিকল্পনা ছিল। কারণ আমার এই আহত আমাকে শেষমেশ ওয়াইয়ানের সাথে দেখা করিয়েছিল। এবং সে সাক্ষাৎ এরপর থেকে অনেককিছু ঘটে চলছিল।

৮৬

●

ওয়াইয়ান নুরিইয়াশি কেটুট লিয়ারের মতোই একজন বালিনিজ কবিরাজ। তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। একজন বয়স্ক পুরুষ আর একজন ত্রিশ পার করা নারী। কেটুট অনেকটা ধর্মীয় যাজকদের মতো রহস্যময় আর ওয়াইয়ান একজন কার্যকর চিকিৎসক, যে নানান ওষধি গাছ মিশিয়ে ঔষধ তৈরি করে তার দোকানেই ধ্যানের ব্যবস্থা করে এবং সেই স্থানেই রোগীর যত্ন নেয়।

উবুদের একেবারে মাঝে ওয়াইয়ানের একটা দোকান ছিল যার নাম 'বালিনিজ প্রচলিত পদ্ধতিতে নিরাময়।' কেটুটের বাসায় সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় হয়ত টবে রাখা অনেক ধরনের গাছের জন্য অথবা টাঙ্গানো সাইনবোর্ড যাতে লেখা 'মাল্টি ভিটামিন সমৃদ্ধ দুপুরের খাবার' সেটার জন্য তা অনেকবার আমার চোখে পড়েছিল। কিন্তু আমার হাঁটুর দুরবস্থা হওয়ার আগে আমি কখনো সেখানে যাইনি। যেহেতু কেটুট আমাকে চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়েছিল তাই আমার তা মনে পড়ে গিয়েছিল। তখন আমি সাইকেল চালিয়ে দোকানটাতে এই ভেবে চলে গিয়েছিলাম যে সেখানে কেউ হয়ত আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

ওয়াইয়ানের জায়গাটা ছিল খুবই ছোট। সেটা একই সাথে চিকিৎসালয়, বাসা এবং রেস্তোরাঁ। নিচতলায় ছিল একটা ছোট রান্নাঘর এবং তিনটি টেবিল এবং কিছু

www.pathagar.org

চেয়ার নিয়ে একটা ছোট খাট সুন্দর দেখতে খাবারের জায়গা। উপরের তলায় ছিল একটা ব্যক্তিগত জায়গা যেখানে ওয়াইয়ান মেসেজ পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেয়। পেছনে একটা অন্ধকার শোবার ঘরও ছিল।

আমি দোকানটাতে লাফিয়ে নেমে চিকিৎসক ওয়াইয়ানকে আমার পরিচয় দিয়েছিলাম। কোমর পর্যন্ত লম্বা চুলের এবং বিস্তৃত হাসির একটা আকর্ষণীয় বালিনিজ মহিলা সে। রান্নাঘরে আরও দুটো লাজুক মেয়েকে দেখেছিলাম। আমি তাদের দেখে হাত নাড়াতে তারাও হেসেছিল। আমি আমার হাঁটুর ক্ষত ওয়াইয়ানকে দেখিয়ে বলেছিলাম সে কোনো সাহায্য করতে পারে কিনা। দ্রুত কিছু লতা পাতা পানিতে ফুটিয়ে সে আমাকে খেতে দিয়েছিল। সেটাকে বলে জামু। সেটা বালির ঐতিহ্যবাহী হাতের তৈরি ঔষধি নির্যাস। সে সেই ক্ষতস্থানে এক ধরনের সবুজ পাতা বাটা লাগিয়ে দিয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে সেটা আমাকে বেশ স্বস্তি দিয়েছিল।

আমরা কথা বলছিলাম। তার ইংরেজিও চমৎকার। যেহেতু সে একজন বালিবাসী তাই সেও তাদের তিনটি আদর্শ প্রশ্ন আমাকে করেছিল,

তুমি আজ কোথায় যাবে? তুমি কোথা থেকে এসেছ? তুমি কি বিবাহিত?

আমি যখন তাকে বলেছিলাম আমার বিয়ে এখনো হয়নি সে আর একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল,

কখনোই বিয়ে করনি?

আমি মিথ্যা করে বলেছিলাম,

না।

এমনিতে আমি মিথ্যা বলি না। কিন্তু আমি দেখেছি ডিভোর্সের কথা উল্লেখ করার চেয়ে এটা বলা ভালো। কেননা এতে তারা দুঃখ পায়। সে আবার জিজ্ঞেস করেছিল,

আসলেই কখনো বিয়ে হয়নি তোমার?

সে আমার দিকে চরম কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে ছিল তখন।

আমি মিথ্যা করে বলেছিলাম,

না আসলেই আমি কখনো বিয়ে করিনি।

তুমি নিশ্চিত?

হ্যাঁ আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।

একবারও বিয়ে হয়নি?

বুঝতে পেরেছিলাম মহিলাটি আমার মন পড়তে পারছিল। আমি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বলেছিলাম,

হ্যাঁ। একবার বিয়ে হয়েছিল।

হ্যাঁ। তখন তার মুখ এভাবে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যেন সে মনে মনে বলছে, 'হ্যাঁ আমি জানতাম।'

সে জিজ্ঞেস করেছিল,

ডিভোর্স হয়েছে?

আমি লজ্জিতভাবে বলেছিলাম,

হ্যাঁ। হয়েছে।

আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ডিভোর্স হয়েছে।

www.pathagar.org

হুম। কিন্তু এখানে এটা স্বাভাবিক না। তাই না?

ওয়াইয়ান আমাকে পুরোপুরি অবাক করে দিয়ে বলেছিল,

কিন্তু আমারও একই অবস্থা। আমারও ডিভোর্স হয়েছে।

বল কি!

যা যা করার আমি সব করেছিলাম। যাতে তা না হয় তার জন্য যা যা করার আমি করেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে।

তার চোখে পানি চলে এসেছিল এবং এরপর কি হয়েছিল জানেন? বালিতে প্রথম ডিভোর্সির সাথে পরিচিত হয়ে আমি তার হাত ধরে বলেছিলাম,

আমি জানি তুমি সব চেষ্টাই করেছ সোনা?

ডিভোর্স জিনিসটা দুঃখের।

আমি একমত। এরপর আমি পাঁচ ঘণ্টা আমার সেই বন্ধুর দোকানে ছিলাম। সে আমার হাঁটুর ক্ষতটা পরিষ্কার করে দিচ্ছিল আর তার গল্প বলছিল। ওয়াইয়ান বলেছিল 'আমার স্বামী সব সময় মাতাল অবস্থায় থাকত। জুয়া খেলে সব পয়সা উড়িয়ে দিত। এবং যখন আমি মদ আর জুয়া খেলতে টাকা না দিতাম তখন সে আমাকে মারত। সে আমাকে হাসপাতালেও অনেকবার মেরেছে।'

তারপর সে তার চুলের সিঁথি খুলে তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে বলেছিল,

এখানে সে হেলমেট দিয়ে আঘাত করেছিল। টাকা দিতে না পারলে মাতাল অবস্থায় সে সব সময় আমাকে হেলমেট দিয়ে বাড়ি দিত। সে অনেক জোরে আঘাত করত। আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চোখে কিছু দেখতে পেতাম না। আমার মনে হতো আমি ভাগ্যবান কেননা আমি রোগনিরাময় জানি। আমার পরিবার রোগনিরাময় সম্পর্কে জানে। তাই আমি জানতাম নিজেকে কিভাবে সুস্থ করতে হবে। তা না হলে হয়ত আমি আমার শ্রবণশক্তি কিংবা দৃষ্টিশক্তি হারাতাম। তাকে আঘাত করার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন 'আমি আমার বাচ্চাটা হারাই। আমার দ্বিতীয় বাচ্চা যে পেটেই মারা গিয়েছে' এই ঘটনার পর তাদের প্রথম সন্তান টুটি বলেছিল, 'আমার মনে হয় তোমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া ভালো। প্রতিবার তুমি হাসপাতালে যাও আর টুটির জন্য অনেক কাজ রেখে যাও।'

টুটি যখন এই কথাগুলো বলেছিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র চার। বালিতে একটা বিবাহিত জীবনের ইতি মানে এমন একা আর নিরাপত্তাহীন একটা জীবন যা একজন পশ্চিমার পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। বালিবাসীদের পারিবারিক ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় চার পুরুষ ধরে একই সাথে থাকতে হয়। এখানে সবাই ভাই, বোন, চাচাতো ভাই-বোন বাবা, মা, দাদা-দাদি বাচ্চারা একই দেয়ালের ভেতর পারিবারিক মন্দিরে ঘেরা সারিবদ্ধ বাংলা বাড়িতে থাকে। একে অপরের দেখা শোনা করে। পারিবারিক আঙ্গিনা হচ্ছে শক্তি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, দিবা-সেবা, শিক্ষার উৎস, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আত্মিক সংযোগ।

পারিবারিক আঙ্গিনা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে একে একটা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বালিতে গ্রামের লোকসংখ্যা, ব্যক্তি দিয়ে নয় বরং আঙ্গিনা দিয়ে বিবেচনা করা হয়। সেখানে প্রতিটি পারিবারিক আঙ্গিনা একটা স্বনির্ভর মহাবিশ্ব। তাই কেউ তা ছেড়ে যেতে পারে না আর যদি সে মেয়ে হয় আর তাকে যেতেই

www.pathagar.org

হয় তাহলে বাবার বাড়ির আঙ্গিনা রেখে স্বামীর বাড়ীর আঙ্গিনা পর্যন্ত। যখন এই পদ্ধতিটি কারো সাথে মানিয়ে যায় তাহলেই সে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুস্থ, সুন্দর, শান্ত, নিরাপদ, সুখি এবং ভারসাম্যযুক্ত জীবন যাপন করতে পারে। আর যদি পদ্ধতিটি কোনোভাবে কাজ না করে? যেমনটা আমার নতুন বন্ধু ওয়াইয়ানের জীবনে হয়েছে। সে সমাজ থেকে পতিত হয়ে বায়ুশূন্য কক্ষপথে ঘুরপাক খাবে। ওয়াইয়ানের দুটি পথই খোলা ছিল। এক, পারিবারিক আঙ্গিনায় থেকে তার স্বামীর মার-ধোর খেয়ে বার বার হাসপাতালে যাওয়া আর না হয় নিজের জীবন বাঁচানো আর সেই আঙ্গিনা থেকে বের হয়ে আসা। যার ফলে শূন্য হাতেই বের হয়ে আসতে হয়েছিল তাকে।

তবে একবারে খালি হাতে নয়। সে তার সাথে নিরাময় জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে এসেছে। তার মহত্ব তার কাজের নীতি এবং তার মেয়ে টুটি। টুটিকে রক্ষা করতে তার অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। বালি একেবারে পুরোপুরি পিতৃতান্ত্রিক। সাধারণত বিবাহবিচ্ছেদের পর একজন সন্তান তার বাবার কাছে যাওয়ার অনুমতিই পায়। টুটিকে ফিরে পেতে ওয়াইয়ানকে একজন উকিল ধরতে হয়েছিল। তাকে তার প্রতিটা জিনিস দিয়ে দিতে হয়েছিল। মানে সবকিছু। সে শুধু তার আসবাব আর সোনা দানাই বিক্রি করেনি তাকে প্রতিটা চামচ, কাঁটা চামচ, জুতা, মোজা তার ধোয়া জামা কাপড় অর্ধেক ব্যবহৃত মোম এইসব কিছু বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। সব কিছু সেই উকিলকে দিতে হয়েছিল। দুই বছর যুদ্ধের পর সে তার মেয়েকে ফিরে পেয়েছিল। ভাগ্য ভাল টুটি একজন মেয়ে। ছেলে হলে তার চেহারাও আর দেখতে হতো না। সেখানে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

তাই কয়েক বছর ধরে ওয়াইয়ান আর টুটি নিজের মতো করে বালির মৌচাকে থাকছিল। যেভাবে টাকা আসে যায় সেভাবে তারাও কয়েক মাস পর পর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা বদলাচ্ছিল। প্রায়ই নির্ঘুম রাত কাটাত এরপর কোথায় যাবে ভেবে। এটা একটা সমস্যা কেননা প্রতিবার জায়গা বদলালে হাতের রুগীগুলোও হারিয়ে যেতে থাকে। ওয়াইয়ানকে খুঁজে পেতে তাদের কষ্ট হয়। এর পাশাপাশি ছোট মেয়েটাকেও এক স্কুল থেকে আর স্কুলে টানা হেঁচড়া করা হচ্ছিল। যে মেয়েটা সব সময় প্রথম স্থান অর্জন করত, তখন সে পঁচিশ জনের মধ্যে বিশতম।

ওয়াইয়ানের গল্প বলার মাঝে টুটি স্কুলে থেকে ফিরে দোকানে এসেছিল। তার বয়স তখন আট। চোখে মুখে প্রতিভার অগ্ন্যুৎসব আর তার ঝলকানি। লম্বা বিনুনি, রোগা এবং দুরন্ত। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি দুপুরের খাবার খেয়েছি কিনা। সাথে সাথে তার মা লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'আহ! আমি ভুলে গেছি তোমার তো এখন দুপুরের খাবার খাওয়ার কথা।' তারপর সে দ্রুত রান্নাঘরে দুই মেয়ের সাহায্যে আমাকে যা খাইয়েছিল তা ছিল বালিতে খাওয়া আমার সেরা খাবার।

ছোট টুটি পরিষ্কার কণ্ঠে থালাতে পরিবেশন করা খাবারগুলোর সবিস্তার বর্ণনা করছিল। তাও হাতে একটা লাঠি নিয়ে দেঁতো হাসি হেসে।

www.pathagar.org

সে ঘোষণা করছিল, এই যে এটা হলুদের রস যা কিডনি পরিষ্কার করে।

এই যে টম্যাটো সালাদ ভিটামিন ডি'র জন্য দরকার।

এটা গাছ গাছালির মিশ্রণ ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচার জন্য।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, টুটি, তুমি কোথা থেকে এমন ইংরেজি শিখেছ?

তিনি বলেছিলেন, একটা বই থেকে।

আমি তাকে জানিয়েছিলাম, তুমি খুব বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। সে খুব খুশি হয়ে নেচে নেচে বলেছিল, ধন্যবাদ। তুমিও একটা বুদ্ধিমতী মেয়ে।

বালির বাচ্চারা কখনো এমন হয় না। তারা শান্ত ও লাজুক। মায়ের আঁচলের পেছনে লুকাতে চাওয়া বাচ্চা। টুটির মতো এত বহির্গামী স্বভাবের এবং চঞ্চল নয়।

টুটি গান গেয়ে গেয়ে জানিয়েছিল, আমি তোমাকে আমার বই দেখাব।

ওয়াইয়ান বলেছিল, সে বড় হয়ে পশু ডাক্তার হতে চায়। ইংরেজিতে কি যেন বলে?

ভেটেরিনারিয়ান?

হ্যাঁ তাই। কিন্তু তার এত এত প্রশ্নের উত্তর আমিও জানি না। সে বলছিল, মা আমি যদি একটা অসুস্থ বাঘের চিকিৎসা করি তাহলে প্রথমে তার দাঁত বেঁধে দেব যাতে সে আমাকে কামড়াতে না পারে। মা আমি যদি একটা সাপের চিকিৎসা করি তাহলে কোথা থেকে কাজ শুরু করব।

আমি জানি না সে কোথায় এই বুদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু আশা রাখি সে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারবে।

টুটি তার বইগুলো বুকে চেপে সিঁড়ি থেকে নেমে এসে মায়ের কোলে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ওয়াইয়ান তার মেয়ের মুখে চুমু খাচ্ছিল। বিবাহবিচ্ছেদের দুঃখ হঠাৎ তার মুখ থেকে উবে গিয়েছিল। আমি সেই ছোট মেয়েটিকে দেখছিলাম। সেই ছোট মেয়েটিই তার মাকে এত শক্তিশালী হিসেবে তৈরি করেছে। এই সন্ধ্যার মধ্যে আমিও এই মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। দোয়া করেছিলাম, 'হে ঈশ্বর এক সময় টুটি নুরাইয়াশিষ যেন শত শত সাদা বাঘের চিকিৎসা করতে পারে।'

আমি টুটির মাকেও ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ হয় আমি তাদের দোকানে ছিলাম তাই মনে হয়েছিল তখন আমার চলে যাওয়া উচিত অন্য পর্যটকরা ঘোরাফেরা করছে তারাও হয়ত খাবার খেতে এসেছে। একজন বিশাল দেহী অস্ট্রেলিয়ান লোক এসে চেঁচিয়ে ওয়াইয়ান কে বলছিল,

আমার কোষ্ঠকাঠিন্যের কিছু কর। আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'আরও জোরে গান গেয়ে বল আর আমরা নাচি।'

আমি তাদের কথা দিয়েছিলাম তারপর দিন আবার যাবো এবং কালকের জন্য এমন আর একটা মাল্টি ভিটামিনযুক্ত দুপুরের খাবারের ফরমায়েশ দিয়ে রেখেছিলাম।

ওয়াইয়ান বলেছিল, তোমার হাঁটুর অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো। ইনফেকশন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।

www.pathagar.org

সে আর একটা সবুজ পাতা বেটে হাঁটুর আশেপাশেও লেপে দিয়েছিল যাতে ভাল বোধ করি। তারপর সে চোখ বুজে অন্য হাঁটুর অবস্থা অনুভব করে চোখ খুলে বলেছিল, তোমার হাঁটুর অবস্থা অনুভব করে আমি বুঝতে পারছি তুমি অনেকদিন কারো সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হওনি।

কেন এমন মনে হলো। পা জোড়া অনেক চেপে আছে বলে?

সে হেসে বলেছিল, না। তোমার কার্টিলেজ অনেক শুকনো। যৌনতার পর একটা হরমোন নিঃসৃত হয়ে জয়েন্টটাকে ভিজিয়ে রাখে। কতদিন হয় কারো সাথে মিলিত হও না।

এই এক থেকে দেড় বছর।

তোমার একটা ভাল পুরুষ মানুষ দরকার। আমি তোমার জন্য তা খুঁজে দেব। আমি মন্দিরে তোমার জন্য প্রার্থনা করব। কারণ আমি এখন তোমার বোন। কাল তুমি যদি আবার এখানে আস আমি তোমার কিডনি পরিষ্কার করে দেব।

বল কি! একটি ভাল মানুষ আর পরিষ্কার কিডনি দুটোই ব্যবস্থা করে দেবে। এ-তো বিরাট ব্যাপার।

সে আমাকে বলেছিল, আমি আমার বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে কাউকে বলিনি। কিন্তু জীবন কেমন গোলমেলে হয়ে গেছে এখন। আমি জানি না এমন গোলমেলে কিভাবে হয়ে গেল।

আমি তারপর একটা অদ্ভুত আচরণ করেছিলাম। আমি সেই নিরাময়কারীর দুই হাত আমার নিজের হাতে নিয়ে বলেছিলাম, ওয়াইয়ান তোমার কঠিন সময় তো তুমি পেছনে ফেলে এসেছ।

তারপর আমি দোকান থেকে বের হয়ে এসে অদ্ভুত রকম কাঁপছিলাম।

৮৭

●

একসময় আমার দিনের রুটিন তিন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সকালটা আমি ওয়াইয়ানের দোকানে খাওয়া দাওয়া আর হাসি ঠাট্টা করে কাটাতাম। বিকেলটা আমি কেটুটের বাসায় গল্পগুজব আর কফি খেয়ে কাটাতাম। আর সন্ধ্যাটা হয় আমি আমার সুন্দর বাগানে বই পড়ে কাটাতাম না হয় ইউধির সাথে গিটার শুনতাম। যখন ধান ক্ষেতে সূর্যের আলো পৌঁছাতো তখন আমি ধ্যান করতাম আবার ঘুমানোর আগে আমার চার ভাইয়ের ভূতকে বলতাম ঘুমানোর সময় যাতে আমাকে তারা দেখে শুনে রাখে।

সেখানে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমার পুরো অভিযান সফল হওয়ার মতো অনুভূতি হচ্ছিল। ইন্দোনেশিয়াতে আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া। কিন্তু তখন আমার মনে হচ্ছিল না আমি কোনো কিছু খুঁজছি না কারণ কেমন করে যেন ভারসাম্য তখনই আমার ভেতর বিরাজ করা শুরু

www.pathagar.org

করেছিল। এমন নয় যে আমি বালির অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলাম, এও নয় যে আমি কখনো ভারতীয় এবং কখনো ইটালিয়ান হয়ে উঠেছিলাম। আসলে আমি নিজের ভেতর শান্তি অনুভব করতে পারছিলাম, সহজাত ঐশ্বরিক অনুশীলন, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে, ভাল ভাল খাবার আর ভাল বন্ধুদের সাথে সময় কাটিয়ে। তখন আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে আনন্দের সাথে প্রার্থনা করতাম। বেশির ভাগ সময় দেখা যেত আমি প্রার্থনা করতে চাইতাম বিষণ্ন সন্ধ্যায়। যখন কেটুটের বাড়ি থেকে মাংকি ফরেস্ট আর ধানের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে যেতাম। এমন নয় যে আমি মূলত আর একটা বাসের ধাক্কা থেকে বাঁচতে, কুকুরের কামড় বা বানরের হঠাৎ উপদ্রব থেকে বাচতে প্রার্থনা করতাম। আসলে সেগুলো কিছু না। পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির বিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতা থেকে আমার বেশির ভাগ প্রার্থনা উৎসারিত হতো। নিজেকে পৃথিবীর বুকে ভারী কিছু তখন আর মনে হতো না।

আমার মনে পড়ত সুখের ব্যাপারে আমার এক গুরু কি উপদেশ দিয়েছিলেন। মানুষের একটা সহজাত ধারণা হচ্ছে সুখ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। যেন ভাগ্য ভাল হলেই চমৎকার আবহাওয়ার মতো সুখ হঠাৎ আপনার জীবনে আবির্ভূত হবে। না সুখ জিনিসটা এভাবে আসবে না আপনার জীবনে। সুখ ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ধারাবাহিকতা। আপনাকে এর জন্য যুদ্ধ করতে হবে, জেদ করতে হবে এবং মাঝে মাঝে সারা বিশ্ব ঘুরে তা খুঁজে নিতে হবে। নিজস্ব মঙ্গলালোকের উৎসবে স্থির অংশগ্রহণ করতে হবে এবং একবার যদি আপনি কোনো সুখের অবস্থান খুঁজে পান এ-নিয়ে গাফলতি করতে পারবেন না। সুখের দিকে সাঁতরে ওঠার ব্যাপক সামর্থ্য আপনাকে সবসময় ধরে রাখতে হবে এবং এর চূড়ায় উপরে ভেসে থাকতে হবে। যদি তা না পারেন তাহলে ধরে নেবেন আপনার ভেতরে সন্তুষ্টির অভাব আছে। হতাশার সময় প্রার্থনা করা সহজ কিন্তু সমস্যা চলে যাওয়ার পর তা ধরে রাখার অভ্যাসই হচ্ছে সন্তুষ্টি ধরে রাখার প্রক্রিয়া। একটা শুভ সক্ষমতাতে নিজের আত্মাকে শক্তভাবে ধরে রাখা।

যখন বালির সূর্যাস্তে আমি সাইকেলে করে ঘুরে বেড়াতাম আমি সেই শিক্ষাগুলো ঝালিয়ে নিতাম। ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য রেখে আমি প্রার্থনায় নত হয়ে বলতাম, 'হে ঈশ্বর আমি এই জিনিসটাই ধরে রাখতে চাই। আমার ওপর করুণা করুন। যাতে আমি এই সন্তুষ্টি ধরে রাখতে পারি, চর্চা করতে পারি।' আমি এই সুখ কোথাও জমা রাখছিলাম না, এফডিসিআই-এর নিরাপত্তায় নয় বা চার ভাইয়ের ভূতের সংরক্ষণে কিংবা এর ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য কোনো বীমা প্রতিষ্ঠানেও রাখিনি। সেটা আসলে একটা অনুশীলন। আমি যাকে বলি নিরলস আনন্দ। নিরলস আনন্দে মনোযোগ দিতে গিয়ে আমাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হয়, যা আমার বন্ধু ডারসে একবার বলেছিল, 'পৃথিবীর সকল সমস্যা আর দুঃখের মূল হলো অসুখি মানুষ। এতে কেবল আন্তর্জাতিক ব্যক্তির ছবি হিটলার আর স্ট্যালিনই ফুটে ওঠে না। প্রতিটি স্বতন্ত্র মানুষ এতে অন্তর্ভুক্ত। এমনকি আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি আমার অসুখি থাকার সময়টা কত ভোগান্তি, হতাশা আর ঝামেলা এনেছে। সন্তুষ্টির খোঁজ মানে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ বা নিজের সুবিধা দেখার কর্মকাণ্ডই না বরং এটা পৃথিবীর প্রতি একটা উদার দানও। নিজের ভেতর থেকে দুঃখ কষ্ট বের করে দেওয়া আপনাকে সেই পথে বের

www.pathagar.org

করে নেবে। আপনি যদি কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হলেন তাতে কেবল নিজেই মুক্ত হলেন এমন না আপনি অন্যকেও মুক্ত করলেন। আর তখনই আপনি অন্যকেও সেবা এবং অন্যের সঙ্গ উপভোগ করতে সমর্থ হবেন।'

সেই মুহূর্তে আমি যার সঙ্গ সবচেয়ে বেশি উপভোগ করছিলাম সে হলো কেটুট। একজন বৃদ্ধ মানুষ। সে আমার দেখা সেরা সুখি মানুষ। সে আমাকে ঐশ্বরিকতা বা মানব চরিত্র সম্পর্কে যে কোনো দীর্ঘ প্রশ্ন করতে অনুমতি দিত। সে আমাকে যে ধ্যান শিখিয়েছিল। তা আমি পছন্দ করি। তার বিখ্যাত সেই বাক্যটার কৌতুকও আমি উপভোগ করতাম 'কলিজা দিয়ে হাসবে' এবং চার ভাইয়ের ভূতের নিশ্চয়তার উপস্থিতিটাও। আর এক দিন সেই কবিরাজ আমাকে বলেছিলেন তিনি আরও ষোল ধরনের ধ্যান জানেন এবং নানান প্রয়োজনীয় মন্ত্রও জানেন। তাদের কিছু কিছু সুখের জন্য কিছু কিছু স্বাস্থ্যের জন্য আর কিছু কিছু সম্পূর্ণ রহস্যজনক যা অন্য জগতের চেতনায় বহন করে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একটা ধ্যান জানেন যা তাকে উপরে নিয়ে যায়।

উপরে? উপরে কি?

সাত স্তর উপরে। বেহেশতে।

সাত স্তর এই পরিচিত ধারণাটা শুনে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই সাত স্তর বলতে কি শরীরের সাতটি চক্রকে বোঝানো হয় যা যোগে আলোচিত হয়।

না চক্র না। স্থান। এই ধ্যান আমাকে মহাবিশ্বের সাতটি স্থানে নিয়ে যায়। ওপর থেকে উপরে। শেষ জায়গাটা হচ্ছে বেহেশত।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কখনো বেহেশতে গিয়েছিলেন কেটুট।

তিনি হেসে বলেলিন, অবশ্যই। স্বর্গে যাওয়া সহজ।

এটা কেমন?

সুন্দর। সেখানে সবকিছু সুন্দর। সকল মানুষ সুন্দর। সবকিছু খেতেও ভালো। সর্বত্র ভালোবাসা। স্বর্গ হচ্ছে ভালোবাসা।

তারপর কেটুট বলেছিলেন, তিনি আর একটা ধ্যান জানেন যা নিচে নিয়ে যায়। নিম্নগামী ধ্যান পৃথিবী থেকে সাত স্তর নিচে নিয়ে যায়। এটা একটা বিপজ্জনক ধ্যান। নতুনদের জন্য নয়, এটা শুধু গুরুদের জন্য।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রথম ধ্যানটা যদি আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যায় তবে দ্বিতীয় ধ্যানটা নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে যায়...

তিনি বাক্যটি শেষ করেছিলেন, নরকে।

ব্যাপারটা মজার। আমি যখন ভারতে ছিলাম হিন্দুধর্মে স্বর্গ ও নরক নিয়ে বেশি কিছু শুনিনি। হিন্দুরা পৃথিবীকে কর্মের চোখে দেখে। একটা স্থির আবর্তনের প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় আপনি আপনার জীবনকে অন্তর্ধানের পরও স্বর্গ বা নরকে গিয়ে সমাপ্ত করতে পারবেন না। বরং বারবার ঘুরে ফিরে নানান রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিতে থাকবেন। গত জন্মের ভুল শোধরাতে বা অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে আপনি জন্মাতেই থাকবেন। যখন পরিপূর্ণতা পাবেন তখনই কেবল আপনি পরিণত হয়ে এই চক্র থেকে মুক্তি পাবেন শূন্যে মিশে যাবেন। কর্মের ফল অনুযায়ী স্বর্গ এবং নরক দুটিই এই পৃথিবীতে অবস্থিত। যেখানে আমরা নিজেরাই তা পৃথিবীতে তৈরি করার ক্ষমতা

www.pathagar.org

রাখি। আমাদের নির্ধারিত গন্তব্য এবং চরিত্রের ওপর নির্ভর করে আপনি কিছু তৈরি করছেন, সেটা ভাল কিংবা খারাপ।

কর্ম ধারণাটা আমার সবসময়ই ভাল লাগে। তবে বাস্তব অর্থে না। এমন নয় যে আমি বিশ্বাস করি এক সময় আমি ক্লিওপেট্রার মদ পরিবেশনকারী ছিলাম। এর রূপক অর্থটা আমার কাছে ভাল লাগে। কর্মার ধারণাটা রূপক স্তরে আমাকে মুগ্ধ করে, এই যেমন আমরা এক জীবনে কতবার যে একই ভুল করে যাই, একই পুরোনো নেশা এবং বাধ্যবাধকতায় মাথা ঠুকে যাই, একই পুরোনো দুঃখ তৈরি করে যাই আর সর্বনাশা পরিণাম ভোগ করে যাই। যে পর্যন্ত না এই একই কাজ বন্ধ করি বা সংশোধন করি সেই আবর্তে আমরা ঘুর পাক খেতে থাকি। এটা কর্মার বিস্তৃত জ্ঞান এবং এটা পশ্চিমা দর্শন মতেও ঠিক। সমস্যাকে গুরুত্ব নিয়ে দেখো তা না হলে পরবর্তীকালে একই পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তুমি ভুগবে। এবং সেই ভোগান্তির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে নরক। সেই অশেষ পুনরাবৃত্তি থেকে বোধের একটা নতুন স্তরে যেতে পারলেই পাওয়া যাবে স্বর্গ।

কিন্তু কেটুট কিনা তখন বলছিলেন, স্বর্গ ও নরক দুটো আলাদা জায়গা। যেন মহাবিশ্বে আসলেই এর অস্তিত্ব আছে। আর তিনি সেখান থেকে ঘুরে এসেছেন। অন্তত আমার কাছে মনে হচ্ছিল তিনি এটাই বুঝিয়েছেন।

ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে আমি কেটুট কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নরকে গিয়েছিলেন কেটুট?

তিনি এভাবে হেসেছিলেন যে অবশ্যই সেখান থেকে ঘুরে এসেছেন।

স্বর্গের মতোই।

তিনি আমার দ্বিধাগ্রস্ত মুখ দেখে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, মহাবিশ্ব একটা চক্র, লিজ।

আমি তখনো নিশ্চিতভাবে কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তিনি বলেছিলেন, ওপর থেকে নিচে শেষ পর্যন্ত একই জিনিস।

আমার একটা প্রাচীন খ্রিস্টান ধারণার কথা মনে পড়েছিল, উপরে যা নিচেও তাই। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

তাহলে কিভাবে এ দুটোর পার্থক্য বুঝলেন?

এটা কিভাবে যাচ্ছি তার ওপর নির্ভর করে। সাতটা সুখি স্তরের পর স্বর্গ এবং সাতটি দুঃখী স্তরের পর নরক। আর এজন্যই স্বর্গে যাওয়াটাই বেশি ভালো। বুঝলে লিজ।

তিনি হাসছিলেন।

আপনি তাহলে বলতে চাচ্ছন ব্যাপারটা এরকম যে, আপনি আপনার জীবনে সাতটা সুখি স্তর পার করে স্বর্গে তারপর সাতটা দুঃখী স্তর পার করে নরকে গিয়েছিলেন আর যার গন্তব্য একইরকম।

একইরকম। শেষে একইরকম। তাই ভ্রমণটা সুখের মধ্যে পার করাটাই উত্তম।

তার মানে যদি স্বর্গ ভালোবাসা হয় তাহলে নরকও।

ভালোবাসাই।

আমি কিছুক্ষণের জন্য ব্যাপারটা নিয়ে অংক কষতে বসে পড়েছিলাম।

www.pathagar.org

কেটুট হেসে আমার হাঁটুতে স্নেহের পরশে মৃদু চড় মেরে বলেছিলেন, যুবক-যুবতীরা এ ব্যাপারটা কমই বুঝতে পারে।

৮৮

একদিন আমি ওয়াইয়ানের দোকানে আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম এবং সে খুঁজে বের করতে চাচ্ছিল কি করলে আমার চুল ঘন এবং দ্রুত লম্বা হবে। সে চায় আমার চুল তার মতো ঘন কালো হোক। যাতে তার মতো কোমরের নিচে গিয়ে তা দোল খায়। আমার ঝাড়ুর শলার মতো সোনালি ফিনফিনে পাতলা চুলের জন্য তার খুব দুঃখ হতো। একজন নিরাময়কারী হিসেবে আমার চুল ঘন করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করা তার কর্তব্য, কিন্তু তা এত সহজ কিছু ছিল না। আমার একটা কলাগাছ খুঁজে নিজেই এটা কেটে নিতে হতো। গাছের আগাটা কেটে ফেলে তারপর তার শেকড় আর থোড় একটা বড়, গভীর পাত্রে স্থাপন করতে হতো 'অনেকটা সুইমিং পুলের মতো।' তারপর আমাকে সেই পাত্রের মুখে এক টুকরা কাঠ রাখতে হতো যাতে বৃষ্টির পানি এবং কুয়াশা প্রবেশ করতে না পারে। কিছুদিন পর আমাকে সেখানে গিয়ে সেই সুইমিং পুলটা খুঁজে নিতে হতো। যেখানে ততদিনে কলা গাছের শিকড়ের পুষ্টি সমৃদ্ধ কষে ভরে যেত। সেগুলো আমাকে বোতলে সংগ্রহ করে ওয়াইয়ানের কাছে নিয়ে আসতে হতো। ওয়াইয়ান সেগুলো মন্দিরে পূজা পাঠ করে নিয়ে আসত আর তারপর আমি তা মাথার ত্বকে ঘঁষে নিতাম। কিছু দিনের মধ্যে আমি ওয়াইয়ানের মতো ঝলমলে ঘন চুলের অধিকারী হতে পারতাম যা আমার কোমরের নিচে দোল খেত।

সে বলেছিল, তুমি যদি টাকলুও হও তবুও এই পদ্ধতিতে তোমার চুল গজাবে।

আমরা যখন কথা বলছিলাম ছোট টুটি সবে স্কুল থেকে ফিরে মেঝেতে বসে একটা ঘরের ছবি আঁকছিল। তখন টুটি কেবল ঘরের ছবিই আঁকত। একটা ঘরের জন্য সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ছবির পেছনের দৃশ্যে সবসময় একটা রংধনু থাকত আর থাকত বাবাসহ একটা হাস্যরত পরিবার।

ওয়াইয়ানের দোকানে আমরা এই করতাম, বসে বসে গল্প আর টুটি ছবি আঁকত। আমি আর ওয়াইয়ান একে অপরকে খ্যাপাতাম, একা থাকা নিয়ে, দোকানের বাইরে দিয়ে যেসব পুরুষ হেঁটে যায় তাদের শারীরিক গঠন প্রত্যক্ষ করে। সে আমাকে বলত, সে প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করে যাতে আমি আমার জীবনে একটা ভাল প্রেমিকের দেখা পাই।

আমি তাকে সেই সকালে আবার বলেছিলাম, না ওয়াইয়ান আমি তা চাই না। এমনিতেই অনেকবার আমার মন ভেঙেছে।

সে প্রাতিষ্ঠানিক এবং চিকিৎসকের ভঙ্গিতে বলেছিল, আমি ভাঙা হৃদয়ের চিকিৎসা জানি।

www.pathagar.org

ওয়াইয়ান তার আঙুল দিয়ে তার ভাঙা হৃদয়ের অব্যর্থ চিকিৎসার পদ্ধতি গুনছিল, ভিটামিন ই, পর্যাপ্ত ঘুম, প্রচুর পানি খাওয়া, ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে ঘুরতে যাওয়া, ধ্যান এবং হৃদয়কে বোঝানো এটাই ভাগ্য।

ভিটামিন ই ছাড়া সব চিকিৎসাই করে যাচ্ছি আমি।

তাহলে এতদিনে তুমি সেরে উঠেছ। তোমার জীবনে এখন একটা পুরুষ দরকার। আমি প্রার্থনা করে তা এনে দেব।

আমি কিন্তু কোনো পুরুষের জন্য প্রার্থনা করছি না ওয়াইয়ান। এখন আমি যে প্রার্থনা করি যাতে নিজের ভেতরের শান্তিতে নিজে বিরাজ করতে পারি।

ওয়াইয়ান এভাবে চোখ পাকিয়েছিল যেন সে বলছিল,

তুমি মুখে যাই বল না কেন তুমি একটা বড় সাদা পাগল এবং বাস্তবে সে বলেছিল,

এর কারণ হচ্ছে স্মৃতিশক্তি লোপ। তোমার মনেই নেই মিলন কত সুখের। আমারও স্মৃতিশক্তির সমস্যা হয়েছিল। আমি যখন বিবাহিত ছিলাম যখনই আমার দোকানের সামনে দিয়ে কোনো সুদর্শন পুরুষ হেঁটে যেত তখন আমার মনেই থাকত না আমি যে বিবাহিত আর আমার বাড়িতে একটা স্বামী আছে।

সে এটা মনে করে হাসছিল। তারপর সে নিজেকে সংযত করে উপসংহার দিয়েছিল 'যৌনতা সবার জন্য অপরিহার্য।'

সেই মুহূর্তে দোকানে একজন চমৎকার মহিলা এসে বাতিঘরের আলোর মতো হাসি দিয়েছিল। টুটি লাফ দিয়ে তার কোলে উঠে চিৎকার করছিল, 'আর্মেনিয়া! আর্মেনিয়া! আর্মেনিয়া!' একটু পর বুঝতে পেরেছিলাম টুটির চিৎকার জাতীয়তাবাদী দলের যুদ্ধের কান্না নয় এটা সেই মহিলাটির নাম। আমি আর্মেনিয়ার কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম। সে আমাকে বলেছিল, সে ব্রাজিল থেকে এসেছে। খুব প্রগতিশীল একটা মহিলা আর্মেনিয়া। যে একই সাথে, জাঁকজমক, অভিজাত পোশাক পরিহিতা, আকর্ষণীয়, মনোরম এবং যার বয়স আঁচ করা অসম্ভব মানে সে ছিল মারাত্মক আবেদনময়ী।

আর্মেনিয়াও প্রায়ই ওয়াইয়ানের দোকানে খাবার খেতে, প্রচলিত পদ্ধতির চিকিৎসা আর রূপচর্চার জন্য আসত। সে আমাদের সাথে বসে আমাদের আড্ডায় প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সময় দিয়েছিল। একটা মেয়েলি ছোট পরিসর হয়ে উঠছিল। তিনি বলেছিলেন, বালিতে আর এক সপ্তাহ আছে এরপর সে আফ্রিকা কিংবা থাইল্যান্ডে তার ব্যবসার কাজে ফিরে যাবে। কথা শুনে বোঝা গিয়েছিল মহিলাটির জীবন বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে গেছে, সে ইউনাইটেড নেশন হাই কমিশনারের রেফুজি বিভাগে কাজ করত, ১৯৮০ সালের দিকে তাকে সালবাদর আর নিকারাগুয়ার জঙ্গলে পাঠানো হয়েছিল শান্তির দূত হিসেবে। নিজের সৌন্দর্য আর মোহময়তা দিয়ে যাতে সে সাধারণ জনগণ এবং বিপ্লবীদের শান্ত করতে পারে, তাদের কথা শুনতে পারে। আহ সৌন্দর্য! তখন সে নোভিকা নামে একটা বহুজাতিক বাজারজাতকরণ ব্যবসা পরিচালনা করত। যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তাদের পণ্য বিক্রি করে দুস্থ শিল্পীদের সহায়তা করা হয়। সে প্রায় সাত থেকে আটটি ভাষায় কথা বলতে পারে। তার পায়ে আমি খুব চমৎকার একজোড়া জুতা দেখতে পেয়েছিলাম। তার আগে ইটালিতে দেখেছিলাম এমনটা।

www.pathagar.org

আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ওয়াইয়ান বলেছিল, লিজ তুমি কেন কখনো আর্মেনিয়ার মতো আবেদনময়ী হতে চেষ্টা কর না। তুমি এত সুন্দর একটা মেয়ে, কী সুন্দর চেহারা তোমার, কী চমৎকার দেহের গড়ন আর হাসি। কিন্তু সবসময় তুমি একটা পুরোনো টি শার্ট আর ফাটা জিন্সটাই পড়। তুমি কি নিজেকে আর্মেনিয়ার মতো সুন্দর দেখাতে চাও না।

আমি বলেছিলাম, আর্মেনিয়া একজন ব্রাজিলিয়ান। পরিস্থিতি একেবারে আলাদা।

কি আলাদা?

আমি নতুন বন্ধুটির দিকে ঘুরে বলেছিলাম, আর্মেনিয়া তুমি কি ওয়াইয়ানকে একটু বুঝিয়ে বলবে একজন ব্রাজিলিয়ান মহিলার মানে কি?

আর্মেনিয়া হেসে উঠেছিল কিন্তু একটু পর প্রশ্নটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে উত্তর দিয়েছিল, আসলে আমি সব সময় চেষ্টা করি যাতে আমাকে সুন্দর ও নারী সুলভ দেখায়। মধ্য আমেরিকার যুদ্ধ ক্ষেত্রে, রিফুজি ক্যাম্পেও আমি সেই চেষ্টা করে গেছি। সবচেয়ে খারাপ সময় এবং সমস্যাতেও আমার মনে হয় নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ দিয়ে নিজেকে বিধ্বস্ত দেখানো কোনো কাজের কথা নয়। এটা আমার দর্শন। এই কারণে আমি সব সময় মেকআপ আর অলংকার পরে থাকি। আহামরি কিছু না, হয়ত চুড়ি, ছোট কানের দুল ঠোঁটে একটু লিপস্টিক একটু সুগন্ধি। আমার নিজের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তা যথেষ্ট।

একভাবে আর্মেনিয়া আমাকে ভিক্টোরিয়ান যুগের সেই ব্রিটিশ নারী পর্যটকদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। আফ্রিকাতে জামা কাপড় পরার কোনো দরকার নেই কিন্তু তা ইংরেজ বৈঠকখানায় বেমানান। আর্মেনিয়া একটা প্রজাপতির মতো, বেশিক্ষণ সে ওয়াইয়ানের দোকানে বসতে পারবে না কিন্তু যাওয়ার সময় সেদিন রাতের একটা দাওয়াতে আমাকে ডাকতে সে ভোলেনি। সে বলেছিল, উবুদে আর একজন ব্রাজিলিয়ান পর্যটককে সে চেনে। সেই লোকটা নাকি একটা খাবারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। লোকটা নাকি ফেইজোয়াদা রান্না করবে, ব্রাজিলের একটা ঐতিহাসিক উৎসবমূলক পদ, যা এত্ত এত্ত শূকরের মাংস আর কালো রাজমা দিয়ে রান্না করা হয়। ব্রাজিলিয়ান মদও থাকবে সেখানে। বালিতে অবস্থিত সারা পৃথিবী থেকে আগত অনেক ভিনদেশীরা থাকবে সেখানে। সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি সেখানে যেতে চাই কি না? তারা সেখানে রাতভর নাচবেও।

ককটেল? নাচ? শূকরের মাংসের স্তূপ এসব শুনে মনে হয়েছিল, অবশ্যই আমি যাব।

৮৯

●

শেষবার কবে আমি একটা ভাল জামা গায়ে দিয়েছি মনে করতে পারছিলাম না কিন্তু সেই সন্ধ্যায় আমি আমার ব্যাগ ঘেঁটে একটা স্পেগেটি ডোরা দেওয়া জামা বের করে গায়ে গলিয়েছিলাম। লিপস্টিক পর্যন্ত দিয়েছিলাম। আমার মনে পড়েনি তার আগে

www.pathagar.org

শেষ কবে আমি লিপস্টিক দিয়েছিলাম। তবে এটা জানতাম ভারতে যাওয়ার পর থেকে তো অবশ্যই না। অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে আমি আর্মেনিয়ার বাড়িতে থেমেছিলাম এবং সে আমাকে কিছু অলংকার ও সুগন্ধি দিয়েছিল এবং আমি তার পেছন বারান্দায় আমার সাইকেলটা রেখেছিলাম। যাতে একটা সুন্দর গাড়ি চড়ে একজন ভদ্র প্রাপ্তবয়স্কের মতো সেখানে যেতে পারি।

বহিরাগতদের রাতের আহারের অনুষ্ঠানটা অনেক মজার ছিল। আমি আমার ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ অবহেলিত চেহারাটা সেদিন আবার দেখতে পেয়েছিলাম। আমি কিছুটা মদও খেয়েছিলাম। ব্যাপারটা লক্ষণীয় কেননা তার আগে অনেকদিন আমি সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে আশ্রমে প্রার্থনা করেছি আর বালিনিজ ফুলের বাগানে বসে বসে সবুজ চায়ে চুমুক দিয়েছি।

আমি সেদিন ছেলেদের সাথে ইয়ার্কিও করেছিলাম। বহুদিন পর আমার পুরোনো যৌনানুভূতির ওপর থেকে যেন ধুলাবালি সরে যাচ্ছিল। যদিও আমি ঠিক বলতে পারব না আমি কার সাথে এসব করছিলাম। যেন আমি সর্বত্র অন্যরকম ইশারার আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম। আমি কী আমার পাশে বসা সেই বিদগ্ধ অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকের কাছে আকর্ষণীয় লাগছিলাম কিংবা টেবিলের নিচে বসা সেই জার্মান বুদ্ধিজীবীটার? যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে আমাকে বই ধার দেবে কিংবা সেটা কি ছিল বয়স্ক সুদর্শন ব্রাজিলিয়ান লোকটা? যে কিনা সেই পুরো অনুষ্ঠানের রান্নার দায়িত্ব নিয়েছিল। আমি তার বাদামি চোখ জোড়া আর উচ্চারণ পছন্দ করেছিলাম। এবং অবশ্যই তার রান্নাও। তাকে বেশ আহবানমূলক একটা কথাও বলেছিলাম আমি। সে যখন তার পারদর্শিতা নিয়ে কথা বলছিল। সে কোনো এক প্রসঙ্গে বলেছিল যে, 'আমি একজন ব্রাজিলিয়ান পুরুষ নামের কলঙ্ক। আমি নাচতে পারি না, আমি ফুটবল খেলতে পারি না এবং এমনকি কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারি না।' কেন জানি আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি প্রেমিকগিরি ভাল করতে পারবে,' কিছু নিখাদ সময় একেবারে থেমে ছিল। বেশ কিছু মুহূর্ত আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। যেন সে বলছিল, 'বুদ্ধিটা ভালোই দিয়েছ।' আমার বলা বাক্যটা বাতাসে শক্তিশালী সুগন্ধির মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে অস্বীকার করেনি কথাটা। আমি লজ্জা পেয়ে প্রথমে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

যাই হোক, তার রান্না করা ফেইজোয়াদা কিন্তু অনেক মজাদার ছিল। এমন মশলা, রস এবং ঘনত্ব এই সবকিছু যা আপনি বালির খাবারে সাধারণত খুঁজে পাবেন না। আমি প্লেটের পর প্লেট শূকরের মাংস সাবাড় করার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, 'নাহ! সিদ্ধান্ত নেওয়া শেষ, পৃথিবীতে এমন খাবার থাকার পর আমি আর নিরামিষাশী থাকতে চাই না।' যদি তাকে নাইট ক্লাব বলে থাকেন তাহলে হ্যাঁ আমরা সেই নাইটক্লাবে নাচতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা অনেকটা সমুদ্রতীরে ছোট কুঁড়েঘরের সারির মতো। কেবল সমুদ্রতট ছিল না। বালিনিজ ছেলে মেয়েরা একটা রাগ সুর বাজাচ্ছিল। জায়গাটাতে সকল ধরনের উৎসবমুখর মানুষের ভিড় ছিল। জাতীয়তাবাদী, বহিরাগত, পর্যটক এবং স্থানীয়, ভদ্র ছেহারারও ছেলে-মেয়েরা। সবাই খোলাখুলি অসচেতনভাবে নাচছিল। আর্মেনিয়া আমার সাথে

www.pathagar.org

যায়নি তার নাকি কি কাজ ছিল। সেখানে আমার আপ্যায়নকারী ছিল সেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাজিলিয়ান লোকটা। সে এমন কোনো খারাপ নাচে না। আমার ধারণা হয়ত ভাল ফুটবল খেলতেও পারে সে। তাকে আশেপাশে পেয়ে আমার ভাল লাগছিল। প্রশংসা করে প্রিয়তম বলে ডেকে সে আমার জন্য কেমন যেন একটা দরজা খুলে দিচ্ছিল। খেয়াল করেছিলাম সে সবাইকেই প্রিয়তম বলে ডাকছিল, এমনকি রোমশ পুরুষ মদ পরিবেশনকারীটাকেও। সবার ক্ষেত্রেই তার খাতির যত্ন ছিল উদাত্ত।

তখন বহুদিন হয়, আমি কোনো বারে যাইনি। এমনকি ইটালিতেও আমি কোনো বারে যাইনি। ডেভিডের সাথে থাকাকালীন সময়েও না। আমার মনে হয় শেষবার আমি নেচেছিলাম তখন আমি বিবাহিতা ছিলাম। হ্যাঁ যখন সুখি বিবাহিতা ছিলাম। হা ঈশ্বর! কত যুগ পর! নাচের সময় আমি আমার বন্ধু স্টেফেনিয়ার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। সেই ইটালিয়ান মেয়েটার সাথে আমার উবুদের ধ্যানের ক্লাসে পরিচয় হয়েছিল। আমরা এক সঙ্গে নাচছিলাম সোনালি, কালো সব ধরনের চুল ঘূর্ণির মতো উড়ছিল চারপাশে। মধ্যরাতের কিছু আগে গান থেমে গিয়েছিল এবং লোকজন গল্পগুজব করছিল।

ঠিক তখন আমি ইয়ান নামের সেই লোকটার সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। আহ আমার লোকটাকে খুবই ভাল লেগেছিল। সে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। অনেকটা স্টিং-মিটস-রালফ-ফিয়েনেসের ছোট ভাইয়ের মতো দেখতে ছিল সে। ওয়েলেশবাসী বলে হয়ত তার কণ্ঠ এত সুন্দর ছিল। সে স্পষ্টভাবে আধো-আধো বাচ্চাদের মতো ইটালিয়ান ভাষায় স্টেফিয়ানাকে প্রশ্ন করছিল। দেখা গিয়েছিল রাগা ব্যান্ডে সে ড্রাম এবং ব্যাংগস বাজাতো। আমি তাতে মজা করে তাকে বলেছিলাম 'বঙ্গা-লিয়ার।' ঐ যে ভেনিসের লোকদের যা বলে, আর তাতে তার নৌকার সাথে আমার নৌকার একটা ঠোকাঠুকি বেঁধে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে হাসি ঠাট্টা গল্প ইত্যাদি হয়েছিল।

ফিলিপও তখন সেখানে গিয়েছিল। ব্রাজিলবাসীদের খাঁটি নাম এটা 'ফিলিপ।' সে আমাদের এক ইউরোপিয়ান বহিরাগত অভিবাসীর মালিকানাধীনে থাকা সেই রেস্তোরাঁয় নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেটা বিশেষ অনুমতি ক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। সে প্রতিজ্ঞা করে বলছিল, সেখানে সারাক্ষণ বিয়ার এবং আরও যতকিছু আছে সব পাওয়া যায়। আমি আবিষ্কার করেছিলাম, আমি ইয়ানের দিকে খেয়াল করছি। সে যখন যেতে সম্মতি জানিয়েছে, তখন আমিও সম্মতি জানিয়েছি। আমরা সবাই সেই রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম। সারারাত আমি ইয়ানের সাথে গল্প আর হাসি-ঠাট্টা করেছিলাম। ঈশ! লোকটাকে আমার আসলেই ভাল লেগেছিল। সে এমন একজন পুরুষ অনেক দিন পর যাকে আমার অন্যরকম ভাল লেগেছিল। আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় হবে তবে সে তার সারাজীবন মজার সব কাজকর্ম করে পার করেছে। আরও কিছু কারণ ছিল যেমন সেও সিম্পসন পছন্দ করে, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছে, একবার আশ্রমে থেকেছে, টলস্টয়ের কথাও উল্লেখ করেছে, মনে হচ্ছিল চাকরি করে, ইত্যাদি। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বোমা পারদর্শী সংস্থায় কাজ করে সে তার কর্মজীবন শুরু করে। তারপর একজন আন্তর্জাতিক মাইন ক্ষেত্র

www.pathagar.org

বিস্ফোরণ বিভাগে কাজ করেছে। বসনিয়ায় রিফুজি ক্যাম্প চালু করে, তখন বালিতে একটু জিরিয়ে নিতে সঙ্গীতের দলে কাজ করতে এসেছিল। সবগুলোই খুব লোভনীয় কাজ।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, রাত সাড়ে তিনটা বাজে আর আমি ধ্যান করতে বসিনি বরং সেই মধ্যরাতে আমি একটা সুন্দর পোশাক পরে এক সুদর্শন পুরুষের সাথে কথা বলছিলাম। কী মারাত্মক উল্টো কাজ! রাত শেষে আমি আর ইয়ান দুজনেই স্বীকার করেছিলাম আমাদের পরিচয় হওয়াটা অনেক সুখকর কিছু। ইয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার কোনো ফোন নাম্বার আছে কিনা। আমি বলেছিলাম যে আমার কোনো ফোন নাম্বার নেই তবে একটা ই-মেইল নাম্বার আছে। সে বলেছিল,

আচ্ছা। কিন্তু না থাক। লাগবে না। ইমেইল নাম্বার একটা জ্বালা।

তাই সেই রাতে আমি আর ইয়ান একটা আলিঙ্গন ছাড়া আর কিছুই বিনিময় করিনি। সে বলেছিল,

ঠিক আছে তাহলে আমাদের আবার দেখা হবে যখন তারা চাইবে। আকাশের দিকে ইশারা করে বাকি কথাটা শেষ করেছিল মানে ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

ভোরের কিছু আগে সেই বয়স্ক সুদর্শন লোকটা আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমরা যখন একটা রাস্তার বাঁক ঘুরছিলাম সে বলেছিল,

প্রিয়তমা! তুমি সারারাত ধরে উবুদের একজন ঠকবাজের সাথে কথা বলেছ।

আমার হৃদয় ডুবে যাচ্ছিল, জিজ্ঞেস করেছিলাম,

আসলেই কী ইয়ান একজন ভণ্ড? আমাকে এখনই বলে দাও তাহলে আমি আর ঝামেলায় জড়াব না।

ফিলিপ হেসে বলেছিল,

ইয়ান। আরে না ও খুব বিচক্ষণ মানুষ। ভাল মানুষ। আমি আমার কথা বলছি। আমি উবুদের একটা বড় ভণ্ড।

আমরা কিছুক্ষণ নীরব ছিলাম। তারপর সে বলেছিল,

তুমি আমার কথা বিশেষভাবে নিও না। আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম।

তারপর আরও লম্বা একটা নীরবতার পর সে জিজ্ঞেস করেছিল,

তুমি ইয়ানকে পছন্দ কর, তাই না?

আমি জানি না। আমার মাথাটা পরিষ্কার না। আমি অনেকটা ব্রাজিলিয়ান ককটেল খেয়ে ফেলেছি। সে আকর্ষণীয় এবং বুদ্ধিমান মানছি। কিন্তু বহুদিন হয়ে গেছে আমি কাউকে পছন্দের কথা ভেবেছি।

আরে ভেবো না তো। বালিতে তোমার বাকি মাসগুলো চমৎকার যাবে। অপেক্ষা কর আর দেখো কি হয়।

কিন্তু জানি না আমি এখানে কতটা সামাজিক হতে পারব ফিলিপ। আমার কেবল একটাই জামা। কয়েকদিনের মধ্যেই মানুষ খেয়াল করতে শুরু করে দেবে যে একটা জামা পরেই আমি সব জায়গায় যাই।

www.pathagar.org

সোনামণি, তুমি যুবতী এবং সুন্দরী। তোমার একটা জামাই যথেষ্ট।

৯০

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, আমি কি আসলেই সুন্দরী ও যুবতী?

আমার মনে হতো আমি ডিভোর্সি এবং বুড়ি। বাকি রাত এক ফোটাও ঘুমাতে পারিনি। সেই অসময়ে জেগে থাকাতে খুব অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। নাচের গানগুলো তখনো আমার মাথায় বাড়ি দিচ্ছিল, আমার চুলে সিগারেটের গন্ধ ছিল, আমার পেট এলকোহলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল। আমি কিছুটা ঝিমিয়ে সূর্য উঠতেই জেগে উঠেছিলাম আর তাতেই আমি অভ্যস্ত ছিলাম। শুধু সেই সকালটাতে আমি স্থির ছিলাম না শান্তিতে ছিলাম না, ধ্যান করার মতো অবস্থানে ছিলাম না। ভাবছিলাম, আমি এত বিচলিত কেন? আমি একটা চমৎকার রাত কাটিয়েছি তাই নয় কি? আমি কিছু মজার মানুষের সাথে মিশেছি, ভাল পোশাক পরেছি, নেচেছি কিছু পুরুষদের সাথে ইয়ার্কি করেছি– 'হা ঈশ্বর পুরুষদের!'

যখন আমি সেই কথাটা ভেবেছিলাম যে, আমি এমনটা আবার কিভাবে করব? আমার অস্থিরতা আরও গতি পেয়েছিল, আর তা ছোট খাট ভয়ে পরিণত হয়েছিল, আমি যখন কিশোরী বা বিশ বছর বয়সী ছিলাম তখন খুব বেহায়া আর সাহসী গোছের রঙ তামাশা করতাম। আমার মনে আছে, আমার কাছে মজার কিছু ছিল কাউকে নিজের দিকে টেনে আনা, তাকে অন্যরকম আমন্ত্রণ জানানো এবং উসকে দেওয়া। হ্যাঁ সব মনোযোগ দিয়ে তাকে নিজের দিকে টানা তার পরিণাম যাই হোক।

কিন্তু তখন আমি কেবল ভয় আর অনিশ্চয়তায় ভুগেছিলাম। সারা সন্ধ্যার কথা ভেবে তখন আরও খারাপ লাগতে শুরু করেছিল যে আমি এমন একজন ওয়েরিশ বাসী লোকের সাথে সারা সন্ধ্যা সেঁটে ছিলাম যে কিনা আমাকে তার ইমেইল- আইডি পর্যন্ত দেয়নি। আমি ইতোমধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ চিত্র দেখতে পাচ্ছিলাম, আমি তার সিগারেট খাওয়া নিয়ে তর্ক করছি। আমার ভয় হচ্ছিল আমি যদি আবার একজন পুরুষের দিকে মনোযোগ দেই তাহলে তা আমার লেখালেখি, জীবন, ভ্রমণ সব কিছুর বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। আর এক দিকে মনে হচ্ছিল 'কিছু প্রেম হলে মন্দ হতো না। অনেক দিন তো মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত কাটালাম।' আমার মনে আছে টেক্সাসের রিচার্ড প্রেমের ক্ষেত্রে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, 'তোমার খরা দূর করার একজন দরকার, যাও নিজে একটা বৃষ্টি তৈরির মেশিন খুঁজে নাও।' তখন আমি কল্পনার ছবিটা আরও নিকটে নিয়ে এসেছিলাম, ইয়ান আমার বাগানে তার মোটরবাইকে নিজের বোম স্কোয়াডে কাজ করা সুদর্শন শরীরটা নিয়ে এসেছে। আমার সাথে প্রেম করছে। ভাবছিলাম, আহ! কি দারুণই না হতো। এটা কোনোমতেই একটা দুখের ভাবনা নয় কিন্তু কেন জানি তা তীক্ষ্ণ ধ্বনি দিয়ে চিৎকার করে আমাকে ভয়

www.pathagar.org

দেখাচ্ছিল। ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগছিল। হয়ত আমি আর কোনো হৃদয় ভাঙার মধ্যে দিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম না বলে এমন লাগছিল। তারপর আমি ডেভিডকে অনুভব করছিলাম। কয়েক মাসেও তেমন লাগেনি। মনে হচ্ছিল আমার ডেভিডকে ফোন করা উচিত এবং আবার এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তারপর কিভাবে যেন আমার বন্ধু রিচার্ডের সাথে একটা অদৃশ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং সে বলছিল, 'আহ কাল রাতে প্রেম রোগ লেগেছে তাই না? এখন কি তার জন্য পাগল হয়ে যাবে।' এ আর নতুন কি ডেভিডের ভাবনা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আমার ডিভোর্সের ভাবনায় চলে যাওয়া। তারপর আমি স্বভাবসুলভ দুশ্চিন্তায় তা দিতে শুরু করেছিলাম, আমার সাবেক স্বামী, আমার বিবাহবিচ্ছেদ...

ঐদিকে রিচার্ড যেন কানে কানে বলছিল,

আমাদের কিন্তু এ ব্যাপারে সব কথা শেষ মুদি দোকান।

এবং তারপর আমি ফিলিপের কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম- কেন জানি সেই সুদর্শন ব্রাজিলিয়ানকে। সে চমৎকার একটা পুরুষ। সে বলেছিল আমি সুন্দরী এবং যুবতী আর আমি সেখানে বাকি সময়টা চমৎকারভাবে কাটাবো। নিজেকে বলছিলাম, সে ঠিক বলেছে, তাই না? আমার চিন্তা ভাবনা ছেড়ে কিছু আনন্দ করা উচিত, তাই না?

কিন্তু সেই সকালটাতে কোনো আনন্দ হচ্ছিল না। কেবল ভাবছিলাম, আমি জানি না। আমি কিভাবে তেমনটা আবার করব।

৯১

তুমি কি জানো জীবনটা কি? আমি জানি না।

এটা ওয়াইয়ানের কথা। আমি তার রেস্তোরাঁর পেছনের দিকে বসে মজাদার আর পুষ্টিকর মাল্টি ভিটামিন সমৃদ্ধ দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম এতে হয়ত আমার দুশ্চিন্তা আর হাংওভারটা কেটে যাবে। আর্মেনিয়াও সেখানে ছিল। তাকে দেখে সেদিনও মনে হচ্ছিল সে এই মাত্র বিউটি পার্লার থেকে স্পা করে যাওয়ার পথে সেখানে নেমেছে। সব সময়ের মতো ছোট টুটি মেঝেতে বসে ঘরের ছবি আঁকছিল।

ওয়াইয়ান তখন মাত্র জানতে পেরেছিল যে তার দোকানটা লিজ নেওয়ার সময়সীমা আগস্টে শেষ হয়ে যাবে আর মাত্র তিন মাসের মধ্যে সেটাকে নবায়ন করতে হবে। তাদের ভাড়াও বাড়ানো হয়েছে। তাকে হয়ত সেখান থেকে চলে যেতে হবে কেননা এত ভাড়া দেওয়ার মতো সামর্থ্য তার নেই। এছাড়াও তার ব্যাংকে মাত্র পঞ্চাশ ডলার ছিল। সে জানে না সে কি করবে। তখন সেখান থেকে চলে গেলে টুটিকেও স্কুলটা ছেড়ে দিতে হতো। তাদের আসলে একটা বাড়ি দরকার ছিল। একটা সত্যিকারের বাড়ি। এছাড়া একজন বালিনিজ মানুষের কোনো গতি নেই।

ওয়াইয়ান জিজ্ঞেস করেছিল,

www.pathagar.org

কেন ভোগান্তির শেষ নেই?

সে কাঁদছিল না। আমাদের দিকে একটা সহজ, উত্তরহীন এবং দুশ্চিন্তাজনক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল কেবল।

কেন সব কিছু ফিরে ফিরে আসে? একই ঘটনা বারবার ঘটে। কখনো শেষ হয় না, থামে না। তুমি অনেক কঠোর কাজ করলে আর এর পরদিনও তোমাকে কঠোর কাজ করতে হবে। খাবার খেলেও এর পরদিন আবার ক্ষুধার্ত হয়ে যাবে। ভালোবাসা খুঁজে নেবে তো পরদিন সেই ভালোবাসাও চলে যাবে। তুমি জন্মগ্রহণ করার সময় কিছু নিয়ে আসোনি। কঠোর কাজ কর আর যাই কর পৃথিবী থেকে খালি হাতে যাবে। যুবক ছিলে হয়ে যাবে বুড়ো। যত কঠোর কাজই তুমি কর না কেন তুমি বুড়ো হবেই।

আমি মজা করে বলেছিলাম,

আর্মেনিয়া ছাড়া। সে বুড়ো হবে না।

ওয়াইয়ান বলেছিল,

কারণ আর্মেনিয়া ব্রাজিলিয়ান।

পৃথিবীর কার্যপ্রণালী খেয়াল করে আমরা হেসে উঠেছিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা অমানবিক কেননা ওয়াইয়ানের তখনকার অবস্থায় হাসির কিছু ছিল না। বিষয়গুলো হচ্ছে, সে তখন স্বামীহীন মা, যার একটা পাকা মেয়ে আছে, দিন আনা দিন খাওয়া আর্থিক অবস্থা, তার ওপর চরম দারিদ্র, গৃহহীন সে কোথায় যাবে সে তো তার সাবেক স্বামীর পরিবারের সাথে থাকতে পারবে না। ওয়াইয়ানের নিজস্ব পরিবার গ্রামের এক কোণায় গরীব ধান চাষি। যদি সে এখান থেকে চলে যায় তাহলে সে তার সকল রুগী হারাবে, আর টুটিকে ভুলে যেতে হবে পশু ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন।

আরও একটা তথ্য সেদিন বের হয়ে এসেছিল। প্রথম দিন রান্নাঘরে যে দুটি মেয়েকে আমি খেয়াল করেছিলাম তারা আসলে একজোড়া এতিম মেয়ে। ওয়াইয়ান এদের পালক নিয়েছে। তাদের দুজনের নামই কেটুট। পাঠকদের দ্বিধায় না ফেলে এই বইয়ে বরং তাদের বড় কেটুট আর ছোট কেটুট বলে ডাকি। ডিকেন্সের উপন্যাসের চরিত্রের মতো এক মহিলা তাদের ফেলে গিয়েছিল। খুব সম্ভবত সে তাদের আত্মীয়া যে শিশুদের ভিক্ষা করায়, বালির নানান বাজার বা দোকানে শিশু ভিক্ষুক চালান দেয়। তারপর প্রতি রাতে একটা ট্রাকে তাদের সংগৃহিত টাকা তুলে নিয়ে একটা কুঁড়েঘরে শুতে দেয়। যখন ওয়াইয়ান বড় এবং ছোট কেটুটকে খুঁজে পেয়েছিল তখন তারা অনেক দিনের অভুক্ত ছিল। তাদের শরীরে কৃমি এবং মাথায় উকুন ছিল। তার ধারণা হয়েছিল প্রথমটার বয়স তেরো আর ছোটটার দশ কিন্তু তারা তাদের নিজের বয়সই নিশ্চিতভাবে জানে না। এমনকি তাদের নামের শেষের অংশও জানে না। ছোট কেটুট শুধু এটুকু জানে যে বছর তাদের গ্রামে বড় শূকরটার জন্ম হয়েছিল সেও একই বছরে জন্ম নিয়েছিল কিন্তু এই তথ্য দিয়ে আমরা কেউই ওর বয়স বের করতে পারিনি। ওয়াইয়ান সেই মেয়ে দুটোকে তার মেয়ে টুটির মতোই ভালবেসে কাছে টেনে নিয়েছিল। রান্নাঘরের পেছনে একই বিছানায় ওয়াইয়ান টুটি আর এই মেয়ে দুটো ঘুমাত।

www.pathagar.org

কিভাবে একজন স্বামীহীন মা আরও দুটো মেয়ের জন্য তার হৃদয়ে জায়গা করে দিতে পারে। সমবেদনার অর্থ বলতে আমি যা বুঝি সেটা তাও ছাড়িয়ে গেছে।

আমি তাদের সাহায্য করতে চাইছিলাম। একদিন তার দোকান থেকে বের হওয়ার সময়ের সেই শিহরণ জাগানো অনুভূতিটা হয়েছিল আসলে, ওয়াইয়ানকে প্রথম দেখার পরই আমি এই একা মা আর মেয়ে এবং বাকি দুই পালক বাচ্চাকে সাহায্য করতে চাইচ্ছিলাম। আমি তাদের আরও একটু উন্নতর জীবনে উন্নীত করতে চাচ্ছিলাম। কেবল বুঝতে পারছিলাম না আমি তা কিভাবে করব। কিন্তু সেদিন যখন আমি আর্মেনিয়া আর ওয়াইয়ানের সাথে খাবার খাচ্ছিলাম আর আমাদের সহজাত কথোপকথনে আফসোস ঝাড়ছিলাম, টুটি অন্যরকম কিছু করছিল। সে দোকানের চারপাশে একটা ছোট কোবাল নীল রঙের টালি হাতের তালুতে উঁচু করে ধরে হাঁটছিল আর গুন গুন করে ভজন গাইছিল। আমি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। দেখতে চাচ্ছিলাম এরপর সে কি করে। টুটি অনেকক্ষণ ধরে সেই টালিটা নিয়ে খেলছিল আর ফিসফিস করছিল, গান গাচ্ছিল, তারপর মেঝেতে সেটা ম্যাচ বক্স গাড়ির মতো ঠেসে দিচ্ছিল। শেষে সে এটা একটা কোণায় রেখে তার ওপর বসে চোখ বুঁজে গান গাইছিল। যেন সে তার নিজের ঘরে কোনো অদৃশ্য রহস্যময় কিছু একটা গেঁথে দিচ্ছে।

আমি ওয়াইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে এসব কি করছে? সে বলেছিল, সেখানে রাস্তার পারে একটা সুন্দর হোটেলের সংস্থাপন কাজ চলছে। টুটি সেখান থেকে টালিটা কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। যখনই টুটি কোনো টালি পায় সে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে তার মাকে বলে, 'আমাদের কোনো দিন কোনো বাড়ি হলে এটা দিয়ে একটা সুন্দর নীল মেঝে হবে। সেদিন যেভাবে বসে ছিল ঠিক সেভাবে প্রায়ই সে এই ছোট টালিটার ওপর চোখ বুঁজে বসে থেকে কল্পনা করে যেন সে তার ঘরের মাঝে আছে।

আমি কী বলতে পারতাম তখন?

আমি যখন এই কাহিনি শুনেছিলাম আর সেই ছোট মেয়েটার ছোট টালিটার ওপর বসে থেকে ধ্যান করা দেখছিলাম, মনে মনে বলছিলাম,

আচ্ছা তাই হবে।

তারপর দোকান থেকে বের হয়ে এসে ভেবেছিলাম,

এই মানুষগুলোর এমন অবস্থার কোনো একটা গতি করতেই হবে আমাকে।

৯২

ওয়াইয়ান একবার আমাকে বলেছিল সে যখন তার রুগীদের সেবা করে তখন সে ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যকার ভালোবাসার একটা খোলা উৎস হয়ে ওঠে। কি করতে হবে না হবে তা তার আওতায় থাকে না। সকল যুক্তি থেমে যায়, অনুমান জেগে

www.pathagar.org

ওঠে। সে যাই করে তা আসলে তার ভেতরের ঈশ্বরের অনুসরণ মাত্র। সে বলেছিল, 'এমন লাগে যেন একটা বাতাস এসে আমার হৃদয় এবং আমার হাত নিয়ে নেয়।'

সেই একই বাতাস হয়ত সেদিন আমাকে ওয়াইয়ানের দোকান থেকে বের করেছিল এবং আমার মাথা থেকে ভবিতব্য প্রেমের ভূত ঝেটিয়ে বিদায় করেছিল। সেই বাতাস আমাকে উবুদের স্থানীয় একটা ইন্টারনেট ক্যাফেতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমি একটা ফাণ্ড তৈরি করে দেশ বিদেশে অবস্থিত আমার সকল বন্ধুদের বার্তা পাঠিয়েছিলাম।

সবাইকে জানিয়েছিলাম, সামনে আমার জন্মদিন আসছে। তখন আমার বয়স হবে পঁয়ত্রিশ। যদি নিউইয়র্কে থাকতাম তাহলে আমি হয়ত একটা বোকাটে জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করতাম। তারা সবাই হয়ত আমাকে নানান কিছু উপহার দিত, বোতল বোতল মদ নিয়ে আসত। পুরো অনুষ্ঠানটায় অনেক খরচ পড়ত। তাই আমি আরও সুন্দর এবং সস্তা জন্মদিন অনুষ্ঠান পালনের চিন্তা করেছি। যেখানে আমার আত্মীয় এবং বন্ধুরা যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দান প্রদান করে তাহলে ওয়াইয়ান নুরিয়াশিষ নামের এক মহিলা এবং তার বাচ্চাদের অনেক উপকার হবে।

তারপর আমি ওয়াইয়ান এবং টুটি আর তাদের পালিত বাকি দু মেয়ের পুরো কাহিনি খুলে বলেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দানের অর্থটা যতই হোক না কেন বাকিটা আমি আমার জমানো টাকা থেকে পূর্ণ করে দেব। আরও বলেছিলাম, এই তৃতীয় বিশ্বে অবর্ণনীয় দুঃখ বেদনা এবং জীবন সংগ্রাম চলে। এখানে সবাই খুব গরিব কিন্তু আমাদের কি কিছুই করার নেই। বালির এই ছোট দলটা আমার কাছে পরিবারের মতো হয়ে উঠেছে এবং আমাদের অবশ্যই পরিবারের মানুষের বিপদে এগিয়ে আসা উচিত। মেইলটা পাঠানোর সময় আমার বন্ধু সুজানের কথা মনে পড়েছিল। নয় মাস আগে যখন আমি দেশ ছাড়ছিলাম তখন সে আমাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিল তার ধারণা ছিল আমি আর কখনো ফিরব না। সে বলেছিল, 'আমি তোমাকে চিনি লিজ। তুমি কারো সাথে পরিচিত হবে তার প্রেমে পড়বে এবং শেষে সেখানে একটা বাড়ি কিনে কাহিনি শেষ করবে।'

আহ কী ভবিষ্যৎ বক্তা এই সুজান! পরের দিন সকালে দেখেছিলাম ইতোমধ্যে সাতশ ডলার জমা হয়েছে এবং এরপর দিন তা বেড়ে এমন একটা পরিমাণে চলে গেল যে বাকিটা আমি মিলিয়ে দিতে পারব।

আমি সপ্তাহ জুড়ে চলা নাটকটা এখানে আর সবিস্তারে বলছি না। মেইল খুললেই কেবল পড়তাম আমাকেও দলে নাও। সবাই দিয়েছে যারা যারা সমস্যায় এবং ঋণের মধ্যে ছিল তারাও। প্রথম সাড়া পেয়েছিলাম আমার হেয়ার ড্রেসার ছেলেটার প্রেমিকার কাছ থেকে। সে দিয়েছিল পনেরো ডলার। আমার খুব বুদ্ধিমান এক বন্ধু এই দীর্ঘ আবেগের কান্নায় ভেজা চিঠি নিয়ে সবচেয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিল। সে বলেছিল, 'শোনো এর পরের বার তোমাকে যদি এমন দুধ ঝরিয়ে কান্না করে করতে হয় তাহলে এটা খেয়াল রেখো যাতে তা ঘন হয়।' যাই হোক এর পরে সেও কিছু দিয়েছিল। এরপর আমার বন্ধু এনির প্রেমিক, একজন অয়াল স্ট্রিট ব্যাংকার যার সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি, বলেছিল শেষ জনের টাকার পরিমাণ তা যাই হবে তার দ্বিগুণ সে দেবে। ইমেইলটা বিশ্ব জুড়ে ঘুরছিল আর একেবারে অপরিচিত মানুষজনের কাছ

www.pathagar.org

থেকে আমি অনুদান পাচ্ছিলাম। বিশ্বব্যাপী উদারতার ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছিল। এই বলে শেষ করছি যে, আমার কেবল সাত দিন লেগেছিল আত্মীয়, বন্ধু এবং নানান অপরিচিতদের কাছ থেকে ১৮০০ ডলার সংগ্রহ করতে।

আমি জানি এ সবকিছু আসলে ছোট টুটির প্রার্থনার জাদু। তার স্থির প্রার্থনা, তার ইচ্ছা, নীল টালির আসনে বসে এভাবে ধ্যান করা যেন তার পাশে জ্যাকের জাদুর শিম গাছের মতো একটা সত্যিকারের বাড়ি গজিয়ে উঠে মা ও দুই অনাথ বোনের নিরাপত্তা আর আশ্রয় দেবে।

একটা শেষ কথা, আমার স্বীকার করতে অস্বস্তি হচ্ছে। আমি খেয়াল করিনি কিন্তু আমার বন্ধু বব ঠিকই খেয়াল করেছে টুটি শব্দটার ইটালি অনুবাদ হচ্ছে 'আমরা।' আচ্ছা! আমি কিভাবে এত মাস ইটালি থেকেও এটা খেয়াল করিনি। উটাহতে থাকা বব এখানে আমাকে ব্যাপারটা ধরিয়ে দিয়েছিল। সে একটা ইমেইল করেছিল আর তাতে সেই নতুন বাড়িটার জন্য দানের প্রসঙ্গে সে বলেছিল, এটাই তো চূড়ান্ত শিক্ষা তাই না? যেখানে তুমি নিজেকে সাহায্য করার অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলে, সেখানে তুমি টুটি বা সবাইকে সাহায্য করে তোমার অভিযান শেষ করলে।

৯৩

পুরো টাকাটা জমে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ওয়াইয়ানকে কিছু জানাতে চাইনি। যেখানে সে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমাগত দুশ্চিন্তা করেই যাচ্ছে সেখানে এমন একটা ব্যাপার লুকিয়ে রাখা সহজ ছিল না। আমি পুরো ব্যবস্থা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওয়াইয়ানকে কোনো আশা দিতে চাইনি তাই পুরো কাজটা শেষ করার আগ পর্যন্ত এই ব্যাপারে মুখ বন্ধ রেখেছিলাম। পুরো সপ্তাহ ধরে আমি ফিলিপের সাথে রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। আমার একটা মাত্র পোশাক নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না।

আমার তখন ধারণা হয়েছিল, আমি তার প্রেমে পড়েছি। কয়েকদিন রাতের আহার এক সাথে খাওয়ার পর আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, আমি আসলেই তার প্রেমে পড়েছি। ফিলিপ নিজেকে যতটুকু প্রকাশ করে তার চেয়েও বেশি কিছু। সে যদিও দাবি করে সে উবুদের সেরা ভণ্ড কিন্তু আসলে সকল অনুষ্ঠানের মধ্যমণি থাকে। আমি আর্মেনিয়াকে ফিলিপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাদের কিছুদিনের বন্ধুত্ব ছিল শুনেছি। আমি বলেছিলাম, 'ফিলিপের মনের গভীরতা বেশী তাই না? সে যতটুকু প্রকাশ করে তার চেয়েও বেশি ধারণ করে। ঠিক বলেছি না?'

আর্মেনিয়া বলেছিল,

খুব উদার মনের মানুষ কিন্তু সে বিবাহবিচ্ছেদের বড় ধরনের ঝামেলার ভেতর দিয়ে গিয়েছে। আমার ধারণা সে বালিতে মানসিকভাবে সেরে উঠতে এসেছে।

আচ্ছা!। এই হলো গিয়ে ব্যাপার। কিন্তু আমি তো এর কিছুই জানি না। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে এখানে, তার বয়স বাহান্ন। আমার বয়স কি এতই বেশি হয়ে

www.pathagar.org

গেছে যে একজন বাহান্ন বছরের পুরুষের প্রেমে পড়তে হবে। তবুও আমি তাকে পছন্দ করি। তার রুপালি রঙের চুল পিকাসোর মতো নেড়া করে রাখে। তার চোখ আর্দ্র এবং বাদামি, চেহারা ভদ্রোচিত আর তার শরীরের সুঘ্রাণ। সে একজন সত্যিকারের পরিণত মানুষ। মানবজাতির মধ্যে এমন একজন প্রাপ্তবয়স্ক, পরিণত পুরুষ! আমার অভিজ্ঞতায় নতুন।

বালিতে সে পাঁচ বছর ধরে সেখানকার স্থানীয় রূপার কর্মকারদের সাথে কাজ করে। ব্রাজিলের জেমস্টোনের হয়ে কাজ করে ফিলিপ। এখান থেকে অলংকার তৈরি করে জেমস্টন সেগুলো আমেরিকায় রপ্তানি করে। একটা ব্যাপার আমার খুব ভাল লেগেছে যে তার বিবাহিত জীবন ভেঙে যাওয়ার আগের বিশ বছর সে তার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্তই থেকে ছিল। আরও ভাল লেগেছিল সে তার সন্তানদের শুধু নিজ হাতে বড় করেনি, যত্নের সাথে করেছে। তাই তো তারা ফিলিপকে খুব ভালোবাসে। আমার সেটাও ভাল লেগেছিল তার অস্ট্রেলিয় বউ নিজের ক্যারিয়ার গোছাতে ব্যস্ত থাকাতে সে নিজে বাড়িতে থেকে প্রয়োজনে বাচ্চাদের দেখাশোনা করেছে। একে বলে একজন ভাল নারীবাদী স্বামী। সে বলেছিল, আমি এক্ষেত্রে ইতিহাসের সঠিক স্থানে থাকতে চাই। আমি স্নেহ প্রকাশের তার চরম ব্রাজিলিয়ান ভঙ্গিটাও পছন্দ করেছিলাম। তার অস্ট্রেলিয়ান ছেলেটার বয়স তখন চৌদ্দ। ছেলেটি নাকি একদিন না পেরে বলেছিল, 'বাবা স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার সময় আমার ঠোঁটে আর চুমু খেও না তো।' আমার ভাল লাগে ফিলিপ চারটি ভাষা একাধারে বলতে পারে। সে তখনো দাবি করেছিল, ইন্দোনেশিয়ান ভাষা সে জানে না কিন্তু একদিন আমি তাকে তা বলতে শুনেছিলাম। আমার ভাল লেগেছিল সারা জীবনে সে প্রায় পঞ্চাশটি দেশ ঘুরেছে এবং আবিষ্কার করেছে পৃথিবী ছোট এবং সহজেই মানানসই একটা জায়গা। আমার ভাল লেগেছিল যেভাবে সে চুপচাপ হেলান দিয়ে আমার কথা শুনে যেত। কেবল তখনই বাধা দিত যখন আমি নিজেকে বাধা দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতাম, সে বিরক্ত হচ্ছে কিনা। এর উত্তরে সে শুধু বলত, 'ছোট্ট সোনামণি আমার পৃথিবীর সমস্ত সময় তোমার জন্য।' সে একজন পরিবেশনকারীর বেলায়ও এটাই বলত।

আর একদিন রাতে সে আমাকে বলেছিল,

যে কদিন বালিতে আছ একজন প্রেমিক জুটিয়ে নিচ্ছ না কেন লিজ?

তার পক্ষে বলি, সে নিজের জন্যই এটা বলছিল না কেবল সে ব্যাপারটা দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছিল। সে আমাকে আশ্বস্ত করেছিল, ইয়ান নামের সেই পুরুষটার সাথে আমাকে খুব মানাবে কিন্তু তার সাথে আর একজন প্রতিযোগীও ছিল। নিউইয়র্কে শহরের একজন সেফ। বিশাল দেহী, পৌরুষে জ্বলজ্বল আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি। ফিলিপ অনুমান করেছিল আমি হয়ত সেফটাকে পছন্দ করব। সে বলেছিল, 'পৃথিবীর নানান স্থান থেকে নানান কাজে উবুদে ভাসমান অবস্থায় আসলেই নানান ধরনের পুরুষ আছে। গৃহহীন সম্পত্তিহীন এক যাযাবর গোষ্ঠীর অনেকেই জানলে খুশি হবে যে গ্রীষ্মকালটা তুমি এখানে কাটাচ্ছ সোনামণি।'

নাহ! আমার মনে হয় না এর জন্য আমি তৈরি। আমার মনে হয় না অনেক চেষ্টা করেও আমি প্রেম ট্রেম আর ঠিক মতো করতে পারব কারো জন্য রোজ রোজ পায়ের পশম কাটাতে পারব কিংবা আমার নতুন প্রেমিককে কোনোভাবে শরীর দেখাতে

www.pathagar.org

পারব। এবং আমি আবার নিজের জীবন কাহিনি কাউকে বলতে চাই না জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে চাই না। আমি জানি না এসব আবার কিভাবে আমি করব। যাই হোক, তবে মনে হয় ষোল সতের বছর বয়সে আমি যৌনতা এবং প্রেমের ব্যাপারে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।

অবশ্যই তুমি তখন আত্মবিশ্বাসী ছিলে কারণ তখন তুমি কম বয়সী এবং বোকা ছিলে। কম বয়সী আর বোকারাই প্রেম আর যৌনতা নিয়ে আত্ম বিশ্বাসী থাকে। তোমার কি মনে হয় আমাদের মধ্যে কেউ জানি আমরা আসলে কি করছি? তোমার কি মনে হয় কোনো জটিলতা ছাড়া আমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারি? তোমার জানতে হবে বালিতে কি কি হয় সোনা। পশ্চিমা পুরুষগুলো এখানে তাদের জীবনে গণ্ডগোল বাধিয়ে তবে আসে। আসার পর ভাবতে শুরু করে পশ্চিমা নারীই যত নষ্টের গোড়া তারপর একসময় ছোটখাটো বাধ্যগত মিষ্টি বালিনিজ মেয়েদের বিয়ে করে ফেলে, জানি তারা কি ভেবে এই কাজটা করে। তাদের বিশ্বাস করতে চায় এই সুন্দরী ছোট মেয়েগুলো তাদের সুখ দেবে, তাদের জীবন সহজ করে দেবে। কেউ যদি এমন কাজ করে তাহলে আমি কেবল মুখে মুখেই শুভ কামনা জানাই। কিন্তু মনে মনে ঠিক জানি তার সামনে তখনও একজন নারী দাঁড়িয়ে এবং সে তখনও একজন পুরুষ। তখনও নারী পুরুষের এক সাথে মানিয়ে নেওয়ার খেলা তাই ব্যাপারটা সেক্ষেত্রেও জটিল কিছু এবং ভালোবাসা সবসময় জটিল। কিন্তু এখনো মানুষের একে অপরকে ভালোবাসার চেষ্টা করা উচিত সোনা। আমাদের মন অবশ্যই মাঝে মাঝে ভাঙা উচিত। ভাঙা হৃদয় একটা ভাল লক্ষণ। এর মানে আমরা কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করেছি।

আমি বলেছিলাম,

শেষবার আমার হৃদয় যেভাবে ভেঙেছে এখনো কষ্ট পাই তাতে। কি বিচ্ছিরি ব্যাপার না? একটা প্রেমের কাহিনি শেষ হয়ে যাওয়ার দুই বছর হয়ে গেছে এখনো আমার হৃদয় জোড়া লাগেনি।

সোনামণি, আমি দক্ষিণ ব্রাজিলের। আমি দশ বছর এমন একজন মহিলার প্রতি ভাঙা মন জিইয়ে রাখতে পারি যাকে আমি কখনো চুমুই খাইনি। এটা কোনো বড় বিষয় না।

আমরা আমাদের বিয়ে নিয়ে কথা বলেছিলাম আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে কথা বলেছিলাম। তাচ্ছিল্য করে নয় সমবেদনায়। আমরা একে অপরের বিবাহবিচ্ছেদ পরবর্তী সীমাহীন বিষণ্ণতার সুরে সুর মিলিয়েছিলাম। একসাথে মদ ও খাদ্য খেয়েছিলাম এবং মাঝে মাঝে কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতির আবহাওয়া থেকে বের হতে একে অপরকে আমাদের বিগত সঙ্গী নিয়ে সুন্দর কিছু গল্প বলেছিলাম।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল,

তুমি এই সপ্তাহের শেষে আমার সাথে কোথাও ঘুরতে যেতে চাও।

আবিষ্কার করেছিলাম তাকে হ্যাঁ বলছি। আর একদিন আমার বাড়ির দরজায় আমাকে নামিয়ে দেওয়ার সময় ফিলিপ গাড়ির অপর পাশে পৌঁছে আমাকে বিদায়ী চুমু খেয়েছিল আর একবার আমি নিজেকে তার কাছে টেনে নিতে দিয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তে আমার মাথা নুইয়ে আমার গাল তার বুকে ছুঁইয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ!

www.pathagar.org

আমি তাকে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ধরে রাখতে দিয়েছিলাম। বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী সময় ছিল সেই ধরে রাখাটা। আমি অনুভব করছিলাম, আমার চুলে তার মুখ যেভাবে চেপে ছিল সেভাবে আমার মুখও তার বুকে চেপে ছিল। আমি তার নরম লিনেনের শার্টের কোমলতা অনুভব করতে পারছিলাম। তার শরীরের গন্ধ আমার আসলেই খুব ভাল লেগেছিল। তার সুগঠিত বাহু ও চওড়া ছাতি। সে একসময় ব্রাজিলের পুরস্কার বিজয়ী জিমনাস্টিক ছিল। অবশ্যই সেটা ১৯৬৯ সালের দিকে। যে বছরে আমি জন্মেছিলাম। কিন্তু তখনো তার শরীর শক্তিশালী এটা বোঝা গিয়েছিল।

সেদিন তার বুকে আমার মাথা নোয়ানোটা এক ধরনের লুকোচুরি ছিল। আমি একটা সাধারণ শুভ রাত্রি জানানোর চুমু এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। আবার একদিকে সেটা একধরনের এড়িয়ে যাওয়া নয়, অন্যরকম কিছুর প্রকাশও ছিল। সন্ধ্যা শেষের সেই সময়টায় অনেকটা নীরব মুহূর্ত আমি নিজেকে তার বুকে সঁপে দিয়েছিলাম, নিজেকে ধরে রাখতে দিয়েছিলাম। যেটা বহুদিন হয়নি।

৯৪

আমি আমার বৃদ্ধ কবিরাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

রোমান্স সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

তিনি বলেছিলেন,

রোমান্স জিনিসটা কি?

থাক।

না বল এটা কি? এই শব্দের অর্থ কি?

আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম,

রোমান্স অর্থ হচ্ছে যখন পুরুষ-নারীর প্রেম হয়, মাঝে মাঝে পুরুষ-পুরুষের প্রেম, নারী-নারীর প্রেম হয়। তখন চুমু মিলন এবং বিয়ে এইসব কিছু মিলিয়ে রোমান্স বোঝানো হয়।

আমি আমার জীবনে অনেকের সাথে মিলিত হইনি লিজ। শুধু আমার বউ ছাড়া আর কারো সাথে না।

রোমান্স মানে অনেকের সাথে বোঝায় না কিন্তু আপনি আপনার প্রথম বউ না দ্বিতীয় বউয়ের কথা বলছেন?

আমার কেবল একটাই বৌ লিজ। সে এখন মরে গেছে।

তাহলে নায়মো?

সত্যিকারের অর্থে নায়মো আমার বৌ নয়। সে আমার ভাইয়ের বৌ।

আমার দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা দেখে তিনি আরও বলেছিলেন,

এটা বালির ঐতিহ্য।

www.pathagar.org

তিনি ভেঙে বলেছিলেন, কেটুটের বড় ভাই একজন কৃষক ছিলেন। তিনি কেটুটের পাশের ঘরেই থাকতেন। নায়মোকে সেই বিয়ে করেছিল। তাদের তিনটা সন্তানও আছে। কেটুট আর তার বৌয়ের কোনো সন্তান হয়নি। উত্তরাধিকারের জন্য সে তার ভাইয়ের একটা ছেলে পালক নিয়েছিল। যখন কেটুটের বউ মরে গিয়েছিল। নায়মো দুই পরিবারেরই সময় দিচ্ছিল, তার ভাই এবং কেটুট দুজনেরই যত্ন করছিল, যেন দুটোই তার পরিবার। বালিনিজ আচারে সে এখন সব দিক দিয়েই কেটুটের স্ত্রী। রান্না, পরিষ্কার, যত্ন নেওয়া ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সব দিক দিয়েই। শুধু তারা একসাথে মিলিত হয় না।'

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

কেন মিলিত হন না?

আমি অনেক বুড়ো।

তারপর তিনি নায়মোকে ডেকে এনে তাকে জানিয়েছিলেন যে, 'এই আমেরিকান মহিলা জানতে চায় কেন আমরা একসাথে মিলিত হই না।' নায়মো এই কথা শুনে হাসতে হাসতে প্রায় মরে যাচ্ছিল। সে আমার কাছে এসে আমার বাহুতে একটা চিমটি কেটেছিল।

কেটুট বলে চলছিলেন,

আমার কেবল একটাই স্ত্রী ছিল আর সে মারা গেছে।

আপনি কি অভাব বোধ করেন?

একটি দুঃখী হাসি দিয়ে তিনি বলেছিলেন,

তার চলে যাওয়ার সময় হয়েছিল চলে গেছে। এখন আমি তোমাকে বলব কিভাবে আমি আমার স্ত্রীকে খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার যখন সাতাশ বছর তখন আমি একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। আমি তার বয়স জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে জানতে চেয়েছিলাম।

সেটা কত সালে?

হয়ত ১৮২০।

তাতে তার বয়স দাঁড়ায় একশো বিশ বছর। আমার মনে হয় আমরা ধাঁধাটা সমাধান করার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি এবার।

আমি সেই মেয়েকে ভালোবাসতাম। কিন্তু সে ভাল স্বভাবের ছিল না। সে কেবল টাকার পেছনে ছুটত এবং অন্য ছেলেদের পেছনেও ঘুরত। কখনো সত্যি কথা বলত না। আমি ভাবতাম তার এই মনের পেছনে আর একটা গোপন মন আছে, যেখানে কেউ চোখ রাখতে পারেনি। আমি পারব। কিন্তু সে আমাকে আর ভালোবাসল না অন্য একটা ছেলের সাথে চলে গেল। আমি খুব দুঃখ পেলাম, ভেঙে পড়লাম। আমি আমার চার ভাইয়ের কাছে প্রার্থনা করে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, 'কেন সে আমাকে আর ভালোবাসে না?' তারপর আমার এক ভূত ভাই আমাকে সত্যটা বলেছিল। সে বলেছিল, ও তোমার আসল জোড়া না। ধৈর্য ধর।

তারপর আমি ধৈর্য ধরেছিলাম এবং আমার স্ত্রীকে খুঁজে পেয়েছিলাম। সুন্দরী, ভাল মহিলা। আমার সাথে সব সময় মিষ্টি ব্যবহার করেছে, কখনো তর্ক করেনি। মনোযোগ দিয়ে ঘরের কাজ করেছে। সবসময় মুখে হাসি থেকেছে। যখন ঘরে

www.pathagar.org

তখনো সে হেসেছে আর বলেছে আমাকে পেয়ে সে কতটা সুখি। সে যখন মরে গেছে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি।

আপনি কী কেঁদেছিলেন?

চোখে অল্প একটু পানি এসেছিল। কিন্তু আমি ধ্যান করেছিলাম যাতে শরীরটা পরিষ্কার হয়, আত্মা শান্তি পায়। এত দুঃখের মধ্যেও আমি সুখি। ধ্যানের মধ্যে প্রতিদিন আমি তাকে দেখি, চুমু খাই। সেই একমাত্র মহিলা যার সাথে আমি মিলিত হয়েছি। তাই আমি জানি না আজকে যে নতুন শব্দটা বললে তার মানে কি? কি যেন শব্দটা?

রোমান্স?

হ্যাঁ রোমান্স। আমি রোমান্স কি জিনিস জানি না লিজ।

বুঝেছি আপনি এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নন।

৯৫

অবশেষে আমি ওয়াইয়ানের সাথে বসে তার বাড়ির জন্য কত টাকা উঠেছে তা বলেছিলাম। আমি তাকে আমার জন্মদিনের উপহারের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিলাম। কত টাকা জড়ো হয়েছে, কারা কারা টাকাটা দিয়েছে তাদের নামের তালিকা ইত্যাদি দেখিয়েছিলাম। আঠারো হাজার আমেরিকান ডলার! প্রথমে সে এতটাই আশ্চর্য হয়েছিল যে তার মুখ দুখের চাদরে ঢেকে গিয়েছিল। এটা খুবই অদ্ভুত এবং যে কোনো অপ্রত্যাশিত সত্য খবরের তাৎক্ষণিক আবেগীয় প্রকাশ একেবারে উল্টো রকম হয়। এটা মানুষের আসল আবেগের দিক। আনন্দের ঘটনা মাঝে মাঝে রিখটার স্কেলে শোক হিসেবে ধরা পড়ে এবং ভয়াবহ শোক অনুতাপেও আমরা হেসে ভেঙে পড়ি। আমি ওয়াইয়ানকে যে খবরটা দিয়েছিলাম সেটা তার জন্য বেশি হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে খবরটা তাকে গভীর দুঃখের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তাই আমি তখন তার সাথে কয়েক ঘন্টা বসে বার বার ঘটনাটা সবিস্তারে বলছিলাম, নাম্বারগুলো বার বার দেখাচ্ছিলাম, যাতে ধীরে ধীরে সত্যটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খবরটা শোনার পর প্রথম স্বাভাবিক কথাটা সে বলছিল 'লিজ দয়া করে যারা যারা এই বাড়িটা বানাতে সহায়তা করেছে তাদের সবাইকে জানিয়ে দিও তারা যেন না ভাবে এটা ওয়াইয়ানের বাসা। ওয়াইয়ানকে যারা সাহায্য করেছে এটা তাদের সবার বাড়ি। এদের কেউ যদি বালিতে আসে তাদের অবশ্যই হোটেলে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে? তুমি তাদের বলবে তখন তারা আমার বাড়িতে এসে থাকবে। ঠিক আছে? কথা দাও এটা বলবে। এই বাড়িটা সম্মিলিত বাড়ি হবে। সবার জন্য একটা বাড়ি।

তারপর যখন সে শুনেছিল সে একটা বাগান করতে পারবে সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

www.pathagar.org

কান্নার পর আস্তে আস্তে তার সুখানুভূতি হচ্ছিল। এটা এমন যেন সে তার মানিব্যাগ নিজের দিকে ঝাঁকাচ্ছে আর সুখ খুচরো পয়সার মতো পুরো জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়ছে। তার যদি একটা বাড়ি হয় তাহলে তার নিজস্ব একটা লাইব্রেরি হবে আর হবে তার ঐতিহ্যবাহী হারবাল ঔষধের একটা ফার্মেসিও হবে আর সত্যিকারের চেয়ার টেবিলসহ একটা সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্ট! কারণ পুরোনো চেয়ার টেবিলগুলো বিক্রি করে তার বিবাহবিচ্ছেদের উকিলের খরচ দিতে হয়েছিল। তার যদি একটা বাড়ি হয় তাহলে সে লোনলি প্ল্যানেট সংস্থার তালিকাভুক্ত হবে, যারা তার কার্যক্রম তালিকাভুক্ত করতে চেয়েছে আগে থেকেই কিন্তু ভাসমান ঠিকানার কারণে এতদিন তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার যদি একটা বাড়ি হয় তাহলে কোনো একদিন হয়ত টুটি একটা জন্মদিনের অনুষ্ঠান করতে পারবে। এইসব ভেবে সে কূল পাচ্ছিল না।

তারপর হঠাৎ সে খুব ভদ্রতা করে বলছিল,

আমি তোমাকে কিভাবে ধন্যবাদ দেব লিজ? আমার কাছে কিছু থাকলে আমি সবই দিয়ে দিতাম। আমার যদি স্বামী থাকত আর তোমার যদি পুরুষের দরকার হতো আমি তোমাকে আমার স্বামীও দিয়ে দিতাম।

তোমার স্বামী তোমার কাছেই রেখো। শুধু খেয়াল রেখো টুটি যেন ইউনিভার্সিটি যেতে পারে।

তুমি যদি কখনো আর না আস তাহলেও আমি করব?

কিন্তু আমি সেখানে সব সময়ই এসেছি, আসব। এই ধারণাটা আমার একটা প্রিয় সুফি কবিতা থেকে পেয়েছি, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি তার চারপাশে ঈশ্বর আগেই একটা বৃত্ত এঁকে রেখেছেন। আমি সেখানে যাব না এমন কখনো হতেই পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

তুমি তোমার নতুন বাড়ি কোথায় বানাবে ওয়াইয়ান?

ছোটখাটো লীগ খেলোয়াড়ের চোখ অনেক দিন ধরে একটা দোকানের একটা বেসবলের ওপর নিবদ্ধ থাকার মতো কিংবা একটা রোমান্টিক মেয়ের তেরো বছর থেকে তার জামা সেলাই করে যাওয়ার মতো একটা ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল। অনেক দিন ধরেই একটা জমি তার মনে মনে পছন্দ ছিল। সেটা পাশের একটা গ্রামের একেবারে মধ্যখানে অবস্থিত। সেখানে পল্লী বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা আছে। টুটির জন্য ভাল স্কুল ছিল। সেটা এমন একটা অবস্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে তার রুগীরা তাকে হাতের কাছেই পেত। তার ভাইরা তাকে বাড়িটা বানানোর কাজে সাহায্য করতে পারত। মূল শোবার রুমের সব নকশা সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল।

তাই আমরা দুজন মিলে একজন ভাল ফ্রেঞ্চ ফাইনান্স এবং রিয়েল এস্টেট উপদেষ্টার কাছে গিয়েছিলাম। তার উপদেশ ছিল আমি ব্যাপারটা যাতে সহজ রাখি। আমি যাতে সরাসরি আমার একাউন্ট থেকে ওয়াইয়ানের একাউন্টে টাকাটা পাঠিয়ে দেই এবং যাতে ওয়াইয়ানের যেটা খুশি সে নিজেই কিনে নিতে পারে। যাতে আমাকে ইন্দোনেশিয়ার সম্পত্তি ক্রয়ের ঝামেলার না জড়াতে হয় এবং আমি যেন একসাথে দশ হাজার ডলারের বেশি না পাঠাই। আমাকে যেন আই আর অ্যাক্ট এবং সি আই-এর গোয়েন্দারা মাদক অর্থায়ন ভেবে সন্দেহ করতে না পারে।

www.pathagar.org

তারপর আমরা ওয়াইয়ানের ছোট ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছিলাম। কিভাবে এটা করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে। সব শেষে ম্যানেজার আমাদের জানিয়েছিল, 'তাহলে সব কাজ শেষ হলে কয়েকদিনের মধ্যে আপনার একাউন্টে একশো আশি লাখ মিলিয়ন টাকা চলে আসবে।'

ওয়াইয়ান আর আমি একে অপরের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছিলাম। ইন্দোনেশিয়ান ব্যাঙ্কে অঙ্কটা কি অস্বাভাবিক পরিমাণ শোনাচ্ছিল! যেহেতু আমরা কিছু নান্দনিক ব্যাংক অফিসারের সামনে ছিলাম, আমরা দুজনে নিজেদের কোনো মতে সামলে নিতে চাইছিলাম কিন্তু হাসি যেন থামছিলই না। আমরা একে অপরকে এভাবে ধরে রেখেছিলাম যাতে পড়ে না যাই।

সে বলেছিল,

এবারের মতো এত দ্রুত কোনো অলৌকিক ঘটনা আমি ঘটতে দেখিনি। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম যাতে সে আমাকে সাহায্য করে আর ঈশ্বর চাইছিলেন যাতে লিজ আমাকে সাহায্য করে।

আমি বলছিলাম,

লিজ চাইছিল যাতে তার সকল বন্ধুরা ওয়াইআনকে সাহায্য করে।

আমরা দোকানে ফিরে দেখেছিলাম টুটি স্কুল থেকে সবে ফিরেছে। ওয়াইয়ান হাঁটু গেড়ে বসে তার মেয়েকে কাছে টেনে বলেছিল, একটা বাড়ি! একটা বাড়ি! আমাদের একটা বাড়ি হবে! একেবারে কার্টুনের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে টুটি চমৎকারভাবে মূর্ছা যাওয়ার ভান করেছিল।

আমরা সবাই যখন হাসছিলাম খেয়াল করেছিলাম রান্নাঘরের পিছন থেকে এতিম মেয়ে দুটো আমাদের দেখছিল। তাদের দুজনের চেহারায় প্রায় একই জিনিস ছিল আর তা হলো ভয়। যেভাবে ওয়াইয়ান আর টুটি আত্মহারা হচ্ছিল আমার ভয় হচ্ছিল এতিম বাচ্চা দুটি কি ভাবছে। তারা কেন ভয় পাচ্ছিল। তারা কি ভাবছিল যে ওয়াইয়ান তাদের আর রাখবে না। তখন আমি তাদের কাছে একজন ভীতিকর মানুষ কারণ হঠাৎ এতগুলো টাকা আমি শূন্য থেকে নিয়ে এসেছি। এমন একটা অবিশ্বাস্য পরিমাণ টাকা! আমাকে হয়ত তারা কালো জাদুকর ভাবছিল। কিংবা এই বাচ্চাদের মতো এমন এলোমেলো জীবনে হয়ত যে কোনো পরিবর্তনে একটা ভয়ের বিষয়।

তাদের আনন্দ উৎসবে একটু বিরতি পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

বড় কেটুট আর ছোট কেটুটের কি হবে? এটা কি তাদের জন্যও খুশির সংবাদ?

ওয়াইআন মেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল আসলেই তারা অস্বস্তি বোধ করছে। তারপর সে মেয়ে দুটোর কাছে গিয়ে তাদের হাত ধরে টেনে ফিসফিস করে কি যেন নিশ্চয়তা দিয়েছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা তখন স্বস্তি বোধ করছে। তখন ফোন বাজছিল। ওয়াইয়ান মেয়ে-দুটোকে সরিয়ে ফোনটা ধরতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দুই কেটুটের রোগা দুই হাত তাদের পালিত মায়ের শরীর নির্ভরতায় জড়িয়ে ধরে তাদের মাথা আর পেট ও বগলে গুঁজে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরেও তারা ছাড়তে চাচ্ছিল না। এরকম প্রচণ্ড আবেগে ওয়াইয়ানকে ছাড়তে না চাওয়া এমন ভাবালুতা আমি তাদের মধ্যে এর আগে দেখিনি।

www.pathagar.org

তাই আমি নিজে ফোনটা উঠিয়েছিলাম,

হ্যাঁ। বালিনিজ ঐতিহ্যবাহী নিরাময় থেকে বলছি। আমরা প্রতিষ্ঠানটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটা লম্বা ছুটিতে যাচ্ছি। এটা কদিন বন্ধ থাকবে।

৯৬

সপ্তাহ শেষে দুবার আমি ফিলিপের সাথে বের হয়েছিলাম। শনিবার আমি তাকে ওয়াইয়ান ও তার বাচ্চার সাথে পরিচয় করাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। টুটি যখন ফিলিপের জন্য একটা ঘরের ছবি এঁকে দিচ্ছিল, তখন ওয়াইয়ান তার পিছন থেকে মুকানিভয় করে বলছিল,

নতুন প্রেমিক?

আমি মাথা নেড়ে বলছিলাম না না না। যদিও আপনাদের বলে রাখি আমি কিন্তু তখন সেই ওয়েলসবাসী মানুষটার কথা আর ভাবছিলাম না। আমি ফিলিপকে কেটুটের সাথেও দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কেটুট তার হাত দেখে দিয়েছিল এবং আমার দিকে একটা অন্তর্গত দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে, কমপক্ষে সাত বার বলেছিল, 'একজন ভাল মানুষ, একজন খুব ভাল মানুষ, একজন খুব খুব খুব ভাল মানুষ। খারাপ মানুষ না লিজ–একজন ভাল মানুষ।'

তারপর রবিবার ফিলিপ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি কি তার সাথে একটা দিন সমুদ্র সৈকতে কাটাতে চাই। আমার যাওয়া উচিত ছিল কেননা বালিতে তখন আমার দুই মাস হতে চলছিল তখনো সেখানকার সমুদ্র সৈকত দেখিনি। ব্যাপারটা একরকম বোকামি। সে আমাকে আমার বাড়ি থেকে জিপে উঠিয়ে নিয়েছিল তারপর এক ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে আমরা প্যাদাংবাইয়ের সেই লুকানো সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিলাম। পর্যটকরা সেখানে খুব কমই যায়। যে জায়গাটায় ফিলিপ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তা স্বর্গের মতোই। নীল পানি, সাদা বালি এবং তাল গাছের ছায়া। এমনটা আমি কখনো দেখিনি। আমরা সারাদিন কথা বলেছিলাম, থেমেছিলাম কেবল সাঁতার কাটা, ঘুম এবং বই পড়ার সময়। সেই কুঁড়েঘরগুলোর পেছনে মহিলাগুলো সদ্য পানি থেকে তোলা মাছ ভাজছিল সেগুলোর সাথে আমরা ঠাণ্ডা বিয়ার এবং ঠাণ্ডা ফল কিনে খেয়েছিলাম। ঢেউয়ে দুলে দুলে আমরা একে অপরকে আমাদের জীবনের সেই কথাগুলো বলেছিলাম যেগুলো উবুদের নিঃশব্দ রেস্তোরাঁগুলোতে বোতল বোতল মদ গিলেও বলতে পারিনি।

সৈকতে আমার শরীরের প্রাথমিক দর্শনের পর সে আমাকে বলেছিল, আমার শরীরের গঠন তার ভাল লেগেছে। সে আমাকে বলেছিল ব্রাজিলিয়ানরা এবং সে নিজেও ঠিক এই রকম শরীর পছন্দ করে। যাকে সে দেশের ভাষায় বলে 'মাগরা ফালছা' মানে 'মিথ্যা রকম চিকন।' যার মানে হচ্ছে যে মহিলাকে বাস্তবের চেয়ে কম মোটা দেখায়। মানে একটু দূর থেকে বেশি চিকন দেখায় সামনে এলে বোঝা যায় সে

www.pathagar.org

গোল-গাল এবং মাংসল। যেটাকে ব্রাজিলিয়ানরা একটা ভাল ব্যাপার বলে নেয়। ধন্য ব্রাজিলিয়ান।

আমরা যখন তোয়ালেতে ঢেউয়ের মাঝে শুয়ে ছিলাম তখন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিলাম সে আমার নাক থেকে বালি ঝেড়ে দিচ্ছিল আমার মুখে এসে পড়া বিদ্রোহী চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছিল। পাক্কা দশ ঘণ্টা আমরা কথা বলেছিলাম। অন্ধকার নেমে আসাতে আমরা সেই বালিনিজ মচ্ছব গ্রামের অনুন্নত ময়লা কাদার রাস্তার ভেতর দিয়ে, তারা ভরা আকাশের নিচে হাঁটছিলাম। ঠিক তখন ব্রাজিলের ফিলিপ খুব সহজ ও সাবলীলভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল,

আমরা কি এখন এই সম্পর্কটার নাম দিতে পারি, লিজ? তুমি কি বল?

যেভাবে ব্যাপারটা ঘটছিল তা আমার খুব ভাল লাগছিল। চুমু বা অন্য কোনো সাহসী পদক্ষেপ নয় বরং একটা প্রশ্ন দিয়ে একটা বিষয় উত্থাপন। একটা সঠিক প্রশ্ন। আমার মনে পড়েছিল এই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার আগে আমার চিকিৎসক আমাকে যা বলেছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ভ্রমণের পুরোটা বছর আমি কুমারি থাকতে চাই। কিন্তু ভয় পাচ্ছি কি হবে যদি সত্যিকারের কাউকে ভালোবেসে ফেলি। আমার তখন কি করা উচিত হবে? আমি কি তার পাশে থাকব? আমি নিজেকে প্রতিজ্ঞায় স্থির রাখব? নাকি নিজেকে প্রেমে জড়াতে দেব।

আমার চিকিৎসক তখন একটা প্রশ্রয়সূচক হাসি দিয়ে উত্তরে বলেছিল, শোনো লিজ। যদি এই সমস্যাটা পুনরায় দেখা দেয় তাহলে সেই মানুষটার সাথে সে ব্যাপারে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তার সমাধান হবে।

তখন তাই হচ্ছিল। তেমন একটা সময় তেমন একটা স্থান এবং সেই বিষয় এবং সেই মানুষ এবং তার সাথে একটা প্রশ্ন। আমাদের সহজ বন্ধুত্বের কারণে বিষয়টা নিয়ে সহজেই একটা আলাপ আলোচনা করতে পেরেছিলাম আমরা। হাতে হাত রেখে সমুদ্রের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি বলেছিলাম, 'সাধারণ পরিস্থিতি হলে আমি হ্যাঁ বলতাম। সাধারণ পরিস্থিতিটা যেমনই হতো...'

আমরা দুজনই হেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু এরপর আমি তাকে আমার দ্বিধার কারণ জানাই,

একজন প্রেমিকের দক্ষ হাতে আমার শরীর-মনের ভাঁজ খোলার সময় আমি হয়ত কিছুটা উপভোগ করতাম। কিন্তু এর চেয়েও জোরালো কিছু ভেতর থেকে আমাকে চাপ দেয় যাতে এই পুরো ভ্রমণটা আমি একা কাটাই। আমার জীবন এখন কিছু গুরত্বপূর্ণ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রক্রিয়াটা যাতে কোনো বাধা না পায় তার জন্য কিছু আলাদা স্থান, কাল দরকার। আমি আসলে এখন সেই কেকের মতো যাকে এই মাত্র ওভেন থেকে বের করা হয়েছে এবং যাকে ফ্রিজে রাখার আগে একটু ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। এই মূল্যবান সময়ে আমি নিজেকে ধোঁকা দিতে পারব না। আমি জীবনের নিয়ন্ত্রণ আর হারাতে চাই না।

ফিলিপ বলেছিল,

সে অবশ্যই বুঝতে পারছে আমি কি বলতে চাচ্ছি, আমার তাই করা উচিত যা আমার জন্য ভাল হয় এবং সে আমার কাছে মাফ চেয়েছিল এই প্রসঙ্গটা উঠিয়েছে বলে। আগে বা পরে এই প্রশ্ন তো আসতোই সোনা। সে আমাকে

www.pathagar.org

নিশ্চিত করেছিল আমি যে সিদ্ধান্তই নেই না কেন সে আমার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখবে। এতটা সময় কাটিয়ে এটাই এখন সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত বলে মনে হচ্ছে। তারপর হঠাৎ বলেছিল,

যদিও এ-বিষয়ে আমাকে এবার কিছু বলতে দাও তাহলে ভাল হতো।

অবশ্যই। বল।

যতটা বুঝেছি তুমি এ বছরটা ত্যাগ আর আনন্দের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজতে বের হয়েছ। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি অনেক ত্যাগের, উৎসর্গের অনুশীলন করছ। কিন্তু আনন্দ? সেটা কোথায় বা কিভাবে পেয়েছ বা পাচ্ছ? বুঝতে পারছি না।

আমি অনেক অনেক পাস্তা খেয়েছি ইটালিতে?

পাস্তা লিজ? পাস্তা! কেবল পাস্তা খেয়ে আনন্দ হয়?

যুক্তিটা ভালো।

আর একটা বিষয়, আমি জানি তুমি কি নিয়ে দুশ্চিন্তা কর। কিছু পুরুষ তোমার জীবনে আসবে আর তোমার কাছ থেকে সব নিয়ে নেবে। আমি তোমার সাথে তেমন কিছু করব না সোনা। আমি নিজেও অনেক অনেক দিন একা থেকেছি। ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমার সঙ্গ আমার কাছে অনেক ভাল লাগে। এমনটা আগে কখনো কারো ক্ষেত্রে হয়নি। ভেবো না সেপ্টেম্বরে তুমি যখন এখান থেকে চলে যাবে আমি তোমার পিছু পিছু নিউইয়র্ক পর্যন্ত চলে যাব। এখন বুঝতে পারছি এইসব কারণেই কয়েক সপ্তাহ আগে তুমি আমাকে বলেছিলে, তুমি কোনো প্রেমিক চাও না। আচ্ছা এটা মাথায় রেখো, তুমি যদি প্রতিদিন তোমার পা রোম মুক্ত না কর আমি কিছু মনে করব না। আমি ইতোমধ্যে তোমার শরীর-মনের প্রেমে পড়েই গেছি, ইতোমধ্যে তুমি আমাকে তোমার জীবন কাহিনি বলে ফেলেছ এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নিয়েও তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার ভেসেকটমি করা আছে।

ফিলিপ তোমার প্রস্তাবটা খুবই প্রেমময় এবং মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এখনো আমার উত্তর না।

সে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমার বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়েছিল। আমরা কিছু মিষ্টি, নোনা বালুময় চুমু খেয়েছিলাম। চমৎকার আসলেই চমৎকার ছিল সেগুলো। কিন্তু তারপরও আমার উত্তর ছিল, 'না।'

ঠিক আছে। কাল আমার বাসায় চলে এসো আমি তোমাকে স্টেক বানিয়ে খাওয়াব।

তারপর সে গাড়ি চালিয়ে চলে গিয়েছিল এবং আমি গিয়েছিলাম বিছানায়, একা।

এত দ্রুত কোনো পুরুষকে না করে দেওয়া আমার জন্য ইতিহাস। পরিণাম না ভেবে প্রথমে সব সময় আমিই প্রেমে পড়ে গেছি। আমার শুধু সবার মধ্যে ভাল দেখার বাতিকই নেই আমি এও ধরে নেই সবাই তার সামর্থ্যের সবচেয়ে উচ্চ স্থানে পৌঁছুতে পারবে। আমি সবসময় একজন মানুষের সর্বোচ্চ সম্ভাবনাকে এভাবে বিবেচনা করে তার প্রেমে পড়েছি যতটা সেই পুরুষ তার নিজের ক্ষেত্রেও বিবেচনা করে না। তারপর আমি দীর্ঘদিন সেই সম্পর্কে ঝুলে থেকেছি, মাঝে মাঝে অনেক লম্বা সময় অপেক্ষা করেছি যাতে সেই লোকটা তার সর্বোচ্চ মহান অবস্থানে উন্নীত হতে পারে। বেশির ভাগ প্রেমের ক্ষেত্রেই আমি আমার নিজের মন গড়া বিশ্বাসের জন্য অপরাধী।

www.pathagar.org

বিয়ে ব্যাপারটার মানে কি এই ব্যাপারে বেশি আলোচনা না করেই খুব কম বয়সে বিয়ে করে ফেলছি। আমার বিয়ে নিয়ে কেউ আমাকে উপদেশ দেয়নি। আমি এমন এক পিতা মাতার অধীনে বড় হয়েছি যারা আমাদের স্বাধীন ও আত্ম-নির্ভরশীল রেখেছেন এবং নিজের সিদ্ধান্তে চলতে দিয়েছেন। আমার যখন চব্বিশ বছর তখনই সবাই ধরে নিয়েছে আমি আমার নিজের জীবনের সকল সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারব। অবশ্যই পৃথিবী সবসময় এমন ছিল না। আমি যদি অন্য কোনো শতকে পিতৃতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বড় হতাম তবে আমি একটা বৈবাহিক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হতাম। আমার স্বামীর কাছে হস্তান্তর করার আগ পর্যন্ত বিবেচিত হতাম বাবার সম্পত্তি হিসেবে। আমার নিজের জীবনের সিদ্ধান্তে আমার নিজের মতামতকে হয়ত মূল্য দেওয়া হতো না। কেউ যদি আমার পাণিপ্রার্থি হতো তাহলে তাকে হয়ত আমার বাবার কাছে বসে যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য অনেক লম্বা প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে যেতে হতো। সে হয়ত জানতে চাইত, তুমি কিভাবে আমার মেয়ের ভরণ-পোষণ করবে? তোমার সমাজে তোমার মর্যাদা কেমন? তোমার স্বাস্থ্য কেমন? তোমার কি দায় দেনা আছে? তোমার সম্পত্তি কেমন? তোমার চরিত্রের শক্তি কেমন? সে ক্ষেত্রে আমি যার প্রেমেই পড়তাম আমার বাবা মা তার সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন না। কিন্তু এই আধুনিক যুগে আমি যখন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমার আধুনিক বাবা মা তাতে নাক গলাননি। তারা আমার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেননি বরং আমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন বিয়ের দিন আমি কিভাবে চুল বাঁধতে পারি।

বিশ্বাস করুন আমার পিতৃতন্ত্রের কোনো স্মৃতি নেই। পিতৃতন্ত্রের এই বিলোপের পর নিজের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্য কোনো মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে বলেও জরুরি মনে করিনি। যার মানে হলো, আর একটা যুগে আমার বাবা হয়ত যা যা জিজ্ঞেস করতেন আমি নিজে তা জিজ্ঞেস করার কথা কখনো ভাবিনি। আমি বহুবার শুধু ভালোবাসার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। নিজের ওপর যদি আমার শাসন থাকত তাহলে আমি হয়ত আমার নিজের অভিভাবকের ভূমিকায় থাকতে পারতাম। গ্লোরিয়া স্টাইনাম মেয়েদের একবার উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন,

মেয়েদের তার নিজের স্বামীর মতো হতে সংগ্রাম করা উচিত। কিন্তু খুব সম্প্রতি আমি যা বুঝতে পেরেছিলাম তা হলো আমাকে কেবল আমার স্বামীর মতোই হতে হবে না আমাকে আমার নিজের বাবা হতে হবে। তাই সে রাতে আমি নিজেকে বিছানায় পাঠিয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল একজন পাণিপ্রার্থি গ্রহণের মতো সময় তখনো হয়নি।

তারপর রাত দুটোয় আমি খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস আর জৈবিক ক্ষুধা দিয়ে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। দেহের ক্ষুধাটা এত তীব্র ছিল যে আমি বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে তা আমি দূর করব। তার সাথে তাল মিলিয়ে আমার বাড়ির পাগল বিড়ালটাও বিলাপ করছিল। আমি বিড়ালটাকে বলেছিলাম,

আমি জানি তোমার কেমন লাগছে। আমার এই কামনার একটা দফা রফা করতে হবে ভেবে বিছানা ছেড়ে উঠে নাইট গাউন পরেই রান্নাঘরে গিয়েছিলাম। তারপর একটা আলুর খোসা ছাড়িয়ে, চাক চাক করে কেটে সেদ্ধ করেছিলাম। তারপর মাখন

www.pathagar.org

দিয়ে ভেজে হাল্কা লবণ দিয়ে প্রতিটা কামড় অনুভব করে খেয়ে শরীরকে বলেছিলাম, 'ভালোবাসাবাসির পরিবর্তে তুমি এই এক পাউন্ড আলু ভাজার মজাটা গ্রহণ কর।

আমার শরীর পুরোটা খাবার খাওয়ার পর জবাব দিয়েছিল,

সম্ভব না। সোনা।

তাই বিছানায় ফিরে এসে এক ঘেয়েমিতে সে জিনিসটা করতে চাচ্ছিলাম...

শব্দটা হচ্ছে স্বমেহন। মাঝে মাঝে ব্যাপারটা খুব উপভোগ্য হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা বাজে ব্যপারে দাঁড়িয়ে যায় এটা। প্রায় দেড় বছর কুমারি থেকে এই ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগেনি কিন্তু তেমন একটা অস্থির রাতে আমি কি করতে পারতাম। আলু চিকিৎসা কাজ করেনি। তাই আমি আমার সেই পুরোনো পদ্ধতিটা চালু করতে চেয়েছিলাম, উত্তেজিত জিনিসগুলো মনে করা, কিছু উপযোগী কল্পনা যাতে সেই শরীরী অনুভবটা আরও গাঢ় হয়। কিন্তু কোনো কিছুই ভাল লাগছিল না। ভাল লেগেছিলে কেবল যখন আমি আমার সেই ব্রাজিলিয়ান বন্ধুকে আমার বিছানায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে কল্পনা করছিলাম...

তারপর একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে উঠে দেখলাম আকাশ খুব নীল। আমার ঘর আগের চেয়েও নীরব। তারপর আমি সেই সকালে অতিরিক্ত সময় নিয়ে গুরু গীতার পুরো ১৮২ শ্লোক ভজন করেছিলাম– ভারতের মহান শুদ্ধিকরণ মন্ত্র। যে পর্যন্ত না হাড্ডি জ্বালা করে উঠছিল আমি ধ্যান করেছিলাম, যে পর্যন্ত না আমি আমার সুখের নির্দিষ্ট, স্থির, পরিষ্কার আকাশের, অবিচ্ছিন্ন, অনড়, বেনামি, অপরিবর্তনীয় অবস্থান অনুভব করতে পারছিলাম আমি ধ্যান করছিলাম। যে সুখ পৃথিবীতে অনুভব করা সকল কিছুর উর্ধ্বে। এমনকি যা লবণাক্ত তৈলাক্ত চুমুর চেয়েও এবং তার চেয়েও লবণাক্ত এবং তৈলাক্ত আলু ভাজা খাওয়ার সুখের চেয়েও বড় কিছু।

আমার তখন মনে হয়েছিল, একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাল করেছি।

৯৭

ফিলিপ আমার জন্য রাতের আহার তৈরি করার পর আমরা কিছুক্ষণ তার সোফায় শুয়ে বসে গল্প করেছিলাম। নানান বিষয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার বগলে মুখ রেখে বলেছিল, তুমি কী জানো? তোমার ঘামের এই সুন্দর দুর্গন্ধটাও আমি কত পছন্দ করি। তারপর আমার গালে হাত রেখে বলেছিল, 'অনেক হয়েছে প্রিয়, এবার আমার বিছানায় আসো।' অবাক ব্যাপার আমি তাই করেছিলাম।

হ্যাঁ আমি তার সাথে তার শোবার রুমে গিয়ে বিশাল বড় জানালার বাইরে রাতের আঁধার আর নীরব বালিনিজ ধান ক্ষেত দেখছিলাম। তার বিছানায় সাদা নেটের মশারি টাঙানো ছিল। সে আমাকে সেখানে নিয়ে খুব যত্নে বিবসনা করেছিল। বোঝাই গেছে সেই লোকটা দীর্ঘদিন তার বাচ্চাদের স্নানের জন্য প্রস্তুত করেছে। সে এও

www.pathagar.org

বলেছিল, আমি যতক্ষণ চাইব না সে আমাকে আদর করুক সে কিছুই করবে না। আমার কি তাতে মত আছে?

আমি সোফা থেকে বিছানায় আসার সময় কোথাও আমার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তার প্রশ্নের উত্তরে আমি কেবল মাথা নাড়তে পারছিলাম। কিছুই বলার বাকি ছিল না অনেক লম্বা একটা সময় আমি একা একা পার করে এসেছি, নিজের জন্য অনেকরকম ত্যাগের অনুশীলন করেছি কিন্তু ফিলিপ ঠিক বলেছিল,

যথেষ্ট হয়েছে।

সে মাঝের বালিশ সরিয়ে আমাকে আরও কাছে টেনে নিয়েছিল তারপর পরিচয়ের প্রথম রাতে আমাকে তার কেমন লেগেছিল সে সম্পর্কে বলেছিল। আমাকে নাকি সে রাতে প্রচণ্ড রকম উচ্ছল এক যুবতী মনে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দিনের আলোয় দেখা মানুষটির সাথে যার কোনো মিল পায়নি সে। সে রাতে আমাকে নাকি কেবল সতেজ না একই সাথে উদার, উচ্ছল মুক্ত এবং অতিমাত্রায় সাহসী দেখাচ্ছিল।

সে বলেছিল আমাকে অনেক দিন কেউ স্পর্শ করেনি তা নাকি বোঝাই যাচ্ছিল। আমি প্রয়োজনে কাঁপছিলাম এবং সেই প্রয়োজনটা অল্প করে প্রকাশও করছিলাম। তবে আমি বলব না আমার সব কিছু মনে আছে। যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি মনে আছে তা হলো সাদা মশারি। যেটা আমাকে ঘিরে ছিল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল সেটা একটা প্যারাসুট। আমি যেন অনেক দিন ধরে একটি নিয়মতান্ত্রিক উড়োজাহাজে থাকছিলাম। যে উড়োজাহাজটি আমাকে আমার জীবনের কঠিন কিছু সময় থেকে মুক্তি দিয়েছিল কিন্তু যখন এই উড়ন্ত বস্তুটি একেবারে সঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে এসেছিল আমি সেই সাদা প্যারাসুটে করে আমার এক তান্ত্রিক মন থেকে, একতন্ত্রী যন্ত্র থেকে আমার অতীত এবং আমার ভবিষ্যৎ এর খালি স্থানে ভেসে ভেসে সেই ছোট বিছানার মতো দ্বীপে নেমে এসেছিলাম। দ্বীপটির বাসিন্দা কেবল ছিল সেই ব্রাজিলিয়ান সুদর্শন নাবিকটি যে নিজেও বহুদিন একা ছিল। যে আমাকে দেখে সে এত খুশি হয়েছিল যে, সে তার ব্রাজিল দেশিয় ভাষা ভুলে গিয়েছিল। যতবার আমার মুখ দেখছিল কেবল এই পাঁচটি শব্দই বলতে পারছিল,

সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর এবং সুন্দর।

৯৮

সে রাতে আমরা মোটেও ঘুমাইনি। আর সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে খুব ভোরেই আমাকে আমার বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছিল। কেননা ইউধির সাথে আমাকে দেখা করতে হতো। অনেক আগেই আমি ও ইউধি পরিকল্পনা করেছিলাম সেই সপ্তাহে আমরা বালিনিজ রাস্তা ভ্রমণে বের হব। এক সন্ধ্যায় ইউধি যখন আমাকে বলেছিল সে ম্যানহাটন এবং তার স্ত্রীর পাশাপাশি আমেরিকানদের মতো গাড়ি দিয়ে দূরে ঘুরতে যাওয়ার অভাব বোধ করে। সেইরকম শুধু একটা গাড়ি নেওয়া এবং

www.pathagar.org

কয়েকজন বন্ধু নিয়ে দূরবর্তী পথের হাইওয়েতে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়া। আমি তখন তাকে বলেছিলাম, 'ঠিক আছে তুমি আর আমি একদিন সেরকম রাস্তা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ব। একেবারে আমেরিকান নিয়মে।'

ব্যাপারটা আমাদের দুজনকেই একটা কৌতুক বানিয়ে ছেড়েছিল– আমেরিকান পদ্ধতিতে বালিতে রাস্তা ভ্রমণে যাওয়ার কোনো উপায়ই নেই আসলে। প্রথমত দেলাওয়ের আকৃতির একটা দ্বীপে তেমন বিশাল দূরত্ব বলতে কিছু নেই আর হাইওয়ের অবস্থা ভয়াবহ চাপা তার ওপর আমেরিকান পারিবারিক মিনি ভ্যানের বালিনিজ সংস্করণের প্রাদুর্ভাব।

একটি ছোট মোটর সাইকেল দেখেছিলাম যেখানে পাঁচ জন একসাথে বসেছিল। বাবাটা এক হাত দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল এবং আর এক হাতে ফুটবলের মতো বাচ্চা ধরে ছিল, তার পেছনে স্ত্রীটি আঁটসাঁট সেরং পড়ে মাথায় একটা ঝুড়ির ভারসাম্য রক্ষা করছিল আর তার বাকি ছোট দু-বাচ্চা দুটো যাতে পড়ে না যায় সেই ব্যাপারে ভর্ৎসনা করছিল। মোটর সাইকেলটি ভুল দিকে চালাচ্ছিল এবং গাড়িতে কোনো হেড লাইট ছিল না। আমরা এও বুঝতে পারিনি কেউই কেন হেলমেট পরে না কিন্তু বয়ে বেড়ায়। অসম্ভব পরিমাণ এমন দ্রুত গতিতে চলা মোটর সাইকেল একে ওপরকে পাগলের মতো অতিক্রম করছিল হাত নাড়ছিল যেন মোটর বাইকের তাণ্ডব নৃত্য লেগেছিল মনে হচ্ছিল বেঁচে আছি সেটাই বেশি। আমি বুঝতে পারি না প্রতিটা বালিনিজ কেন ইতোমধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়নি।

কিন্তু আমি আর ইউধি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কোনোভাবেই হোক আমরা কাজটা করব। ছোট দ্বীপটা এই ব্যাপারটা মাথায় নিয়ে পুরো ঘুরে দেখব যে আমরা দুজনই একসময় আমেরিকায় ছিলাম এবং আমরা দুজনই স্বাধীন। গত মাসে যখন এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম তখন আমার কাছে তা খুব মজার মনে হয়েছিল, কিন্তু তখন, যখন আমি ফিলিপের সাথে রাত্রি যাপন করেছি, এরপর মনে হচ্ছে পরিকল্পনাটা দুর্ভাগ্যের। কিন্তু আমাকে যেতে হয়েছিল। এবং এটাও ঠিক এক দিক দিয়ে আমি যেতে চাইছিলাম। শুধু আমার বন্ধু ইউধির সাথে এক সপ্তাহ কাটাতে নয় বরং ফিলিপের সাথে একটা বড় রাত কাটানোর পর এই সত্যটা মাথায় ভালোভাবে ঢুকাতে যে, 'আমি একজন প্রেমিক বেছে নিয়েছি।'

তাই ফিলিপ আমাকে আমার বাড়িতে একটা আবেগঘন আলিঙ্গন দিয়ে চলে গিয়েছিল। ইউধি ভাড়ার গাড়ি নিয়ে আসায় আমি গোসল করে নিজেকে কোনো মতে টেনে তুলে ছিলাম। ইউধি এক পলক তাকিয়ে থেকে বলেছিল,

ডুড, গত রাতে কয়টায় বাড়ি ফিরেছ?

আমি বলেছিলাম,

ডুড গত রাতে আমি বাড়ি ফিরিনি।

সে বলেছিল,

ডুউউউউউড।

সে হাসতে শুরু করেছিল। হয়ত তার মনে পড়ে গিয়েছিল দু সপ্তাহ আগেই আমি জোর গলায় বলেছিলাম যে বাকি জীবনে আমি হয়ত আর কারো সাথে মিলিত হব না। সে বলেছিল,

www.pathagar.org

আচ্ছা তা হলে কাজে নেমে গেছ। না?

ইউধি! একটা গল্প শোন। গত গ্রীষ্মে আমেরিকা থেকে বেরিয়ে পড়ার আগে আমি উত্তর আমেরিকায় আমার দাদা-দাদির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার এই দাদার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম 'গেল।' তার বয়স এখন আশি। সেদিন সে ১৯৩০ সাল থেকে শুরু করে আগের ছবিগুলো বের করে আমাকে দেখাচ্ছিল। আঠারো বছর বয়সে সে একজন অভিভাবক এবং দুই প্রিয় বন্ধুর সাথে ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিল। যখন পাতার পর পাতা উল্টিয়ে আমাকে ইটালির ছবিগুলো দেখাচ্ছিল তখন ভেনিসের খুব সুন্দর দেখতে একটা ইটালিয়ান ছেলের ছবি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। গেল এই সুদর্শনটা কে? আমরা ভেনিসে যে হোটেলে ছিলাম সে ছিল তার মালিকের ছেলে। সে ছিল আমার প্রেমিক। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তোমার প্রেমিক! তারপর আমার দাদার মিষ্টি বউটি আমার দিকে চতুর চাহনি আর, বেটি ডেভিসের মতো কামময়ী দৃষ্টি দিয়ে বলেছিল, 'আমি চার্চের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম।'

ইউধি বলেছিল,

দারুণ ডুড।

তারপর আমরা বালিতে আমাদের নকল রাস্তা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমি আর আমার নির্বাসিত ইন্দোনেশিয়ান সংগীত প্রতিভা। গাড়ির পেছনটা বোঝাই ছিল গিটার, বিয়ার আর রাস্তা ভ্রমণের জন্য বালিনিজ পদ্ধতির জল খাবার। মুড়ির মোয়া এবং মারাত্মক ফ্লেভার দেওয়া দেশিয় ক্যান্ডি। আমাদের ভ্রমণের সবিস্তার বর্ণনা এখন আমার কাছে ধোঁয়াটে। ফিলিপের চিন্তার অন্যমনস্কতার জন্য হয়ত এবং পাশাপাশি পৃথিবীর সকল রাস্তা ভ্রমণের একটা সহজাত অস্পষ্টতায়। আমার কেবল মনে আছে আমি আর ইউধি সারাক্ষণ আমেরিকান ভাষা বলেছিলাম। সারাটা ভ্রমণে আমি ইংরেজি বলেছি ঠিক কিন্তু আমেরিকান হিপ হপ ভাষাটা বলিনি বহুদিন। তাই আমরা আমাদের সে ইচ্ছা পূরণ করেছিলাম। আমরা নিজেদের এম টিভি দেখা তরুণ তরুণী বানিয়ে ফেলেছিলাম এবং হবকনের কিশোরীদের মতো চেঁচাচ্ছিলাম একে অপরকে ডুড ম্যান হোমো এসব বলছিলাম। আমাদের অনেক স্নেহাস্পদ কথাবার্তা একে অপরের মাকে নিয়ে দুষ্টামির মধ্যে ছিল। যেমন,

ডুড তুমি মানচিত্র দিয়ে কি করছ?

তোমার মাকে জিজ্ঞেস কর না কেন আমি মানচিত্র দিয়ে কি করি?

আমি জিজ্ঞেস করতাম ম্যান কিন্তু সে খুব মোটা।

হ্যাঁ।

এভাবেই চলছিল। আমরা বালির ভেতর দিকে প্রবেশ করছিলাম না, পুরো সপ্তাহ জুড়ে কেবল সমুদ্রের তীর ধরে সৈকতে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ছোট নৌকা নিয়ে অন্য দ্বীপ কেমন তা দেখতে চলে যেতাম। বালিতে অনেক ধরনের সৈকত আছে। একদিন আমরা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মতো সাদা বালিতে ফেনাদার ঢেউয়ের আছড়ে পড়া দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর আমরা উত্তরের অশুভ পাথুরে সৈকতে, তারপর বালিনিজ অদৃশ্য সীমারেখা পার করেছিলাম। সাধারণ পর্যটকরা যেখানে যায় না সেখানে কেবল সার্ফাররা যেতে সাহস পায় আর সাহস পায় পাগলরা।

www.pathagar.org

সেখানে সৈকতে বসে দেখেছিলাম, পাতলা শ্যামলা, সাদা ইন্দোনেশিয়ানও আর পশ্চিমা সার্ফ-ক্যাটরা এভাবে সাঁতার কাটছে যেন সমুদ্রের নীল পোশাকের পিঠের দিকে কেউ চেইন খুলছে। আমরা দেখছিলাম সার্ফাররা আর পাথরের ওপর দিয়ে এক ঢেউ থেকে আর এক ঢেউয়ে যায় আমরা শ্বাস টেনে বলেছিলাম,

ভয়াবহ অবস্থা।

কিছু সময়ের জন্য আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা ইন্দোনেশিয়ায় আছি। বিশেষ করে এই ভাড়ার গাড়ির ভেতর থেকে, জাঙ্ক ফুড, আমেরিকান গান আর যেখানে সেখানে পিজ্জা খেয়ে খেয়ে। যখন আমরা আমাদের চারপাশে বালিনিজ অস্তিত্ব আবিষ্কার করতাম তা এড়িয়ে যেতে চাইতাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম এই আগ্নেয়গিরিটা পার হওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে তখন সে বলত, আমার ধারণা আমাদের আই ৯৫ নিতে হবে। তারপর আমি বলতাম, কিন্তু আমি বোস্টনের কড়া জ্যাম ঠেলে যেতে চাচ্ছি। হাহা। একটা মজার খেলা কিন্তু তা কাজে দিচ্ছিল।

মাঝে মাঝে শান্ত সৈকত খুঁজে পেতাম আমরা তখন সারা দিন সাঁতার কাটতাম। একে অপরকে সকাল দশটায় বিয়ার খাওয়ার অনুমতি দিতাম এই বলে যে, ডুড এটা তো ঔষধ। ইউধি এমন একজন মানুষ যে, যদি সে কাউকে নৌকা বানাতে দেখত তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করত, ওয়াও তুমি কি নৌকা বানাচ্ছ? তার কৌতূহল এতটাই সঠিক এবং কঠিন যে পরবর্তী সময়ে আমরা সেইরকম এক নৌকা নির্মাতার সাথে এক বছর থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম।

সন্ধ্যায় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আমরা এক মন্দিরের রহস্যজনক আচার অনুষ্ঠানে থমকে গিয়েছিলাম। নিজেদের সেই সম্মিলিত ভজন, স্তুতি গীতে নিজেকে সম্মোহিত হতে দিয়েছিলাম। একটা ছোট সাগরের পারের শহর, সেখানে একটা অন্ধকার রাস্তায় একটা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অনেক লোকজন জড়ো হয়েছিল। ইউধি এবং আমাকেও সেই ভিড় থেকে টেনে তোলা হয়েছিল গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের সাথে নাচার জন্য। মেয়েটা সোনা-রত্ন দিয়ে অনেকটা মিশরিদের মতো সেজে ছিল। তার বয়স মাত্র তেরো কিন্তু এমনভাবে সে তার কোমর দোলাতে পারে যেন সে জানে সে যেকোনো দেবতাকে বশে আনতে পারে, পরদিন সেই একই গ্রামে আমরা একটা অদ্ভুত পারিবারিক রেস্তোরাঁ পেয়েছিলাম যেখানে সেই বালিবাসী ব্যক্তি ঘোষণা দিয়েছিল তিনি থাই রান্নায় পারদর্শী। যদিও আমরা তাতে সম্মত হইনি তবু আমরা সেখানে সারাদিন ছিলাম, বরফ দেওয়া কোক আর গ্রিজি পাদ থাই খেয়েছিলাম আর মালিকের অভিজাত মেয়েলি ধরনের ছেলেটির সাথে মিল্টন ব্রাডলি বোর্ড গেমস খেলেছিলাম। এর পরে বুঝতে পেরেছিলাম এই ছেলেটি সেই সুন্দরী নর্তকী চেয়ে কম যায় না। বালিনিজরা আচার অনুষ্ঠানে অপর লিঙ্গের ভেশ ভুষা ধরার মধ্যে সেরা।

বাইরে যেখানেই আমি ফোন বুথ পেতাম সেখান থেকেই ফিলিপকে ফোন করতাম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করত, 'আর কত রাত একা ঘুমানোর পর তুমি ফিরে আসবে। আমি তোমার প্রেমে পড়াকে উপভোগ করছি। মনে হচ্ছে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার মনে হচ্ছে এক সপ্তাহ পর পরই এমন ঘটনা ঘটেছে কিন্তু আসলে গত ত্রিশ বছরেও আমার এমন লাগেনি।'

www.pathagar.org

নাহ এমন না। ব্যাপারটা এমন না যে এভাবে প্রেম চালিয়ে যাওয়ার মতো এত অনুকূল পরিবেশে আছি। তাই আমি দ্বিধার একটা সুর তুলে বলেছিলাম, ফিলিপ কি ভুলে গেছে আমি কয়েক মাস পরই এখান থেকে চলে যাব। সে বলেছিল, 'এটা একটা বোকাটে দক্ষিণ আমেরিকান ভাবনা। শোন মেয়ে আমি ভুগতেও রাজি আছি। ভবিষ্যতে যত কষ্টই হোক শুধু তোমার সঙ্গ পাওয়ার লোভে আমি সেসব মেনে নিতে রাজি আছি। আসো এই সময়টাকে উপভোগ করি।'

আমি তাকে বলেছিলাম,

তুমি জানো হাস্যকর হলেও সত্য হচ্ছে তোমার সাথে দেখা হওয়ার আগে আমি আসলেই ভাবতাম আমি হয়ত চিরকাল একা আর কুমারী থাকব। আমি ভাবতাম আমি হয়ত আত্মিক সাধনা করে এই জীবনটা পার করে দেব।

প্রেমের সাধনা কর।

এটা বলে সে আমাকে আবার পেলে কি কি করবে তা এক এক করে বলে চলছিল...

রাস্তা ভ্রমণের শেষ দিন ইউধি এবং আমি একটা বিচে কয়েক ঘন্টা থেমেছিলাম। তারপর রোজকারের মতো আমাদের নিউইয়র্কের কথা শুরু করে দিয়েছিলাম। কি অদ্ভুত! কতই না ভালোবাসি আমরা এই শহরটাকে। যতটা সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে ততটা নিউইয়র্ক শহরকেও। যেন শহরটা একটা ব্যক্তি, একটা আত্মীয়, দেশ ছাড়ার সময় যাকে সে হারিয়ে ফেলেছে। আমরা যখন কথা বলছিলাম ইউধি আমাদের তোয়ালের মাঝখানে সাদা বালিতে মানহাঁটানের ম্যাপ এঁকেছিল। সে বলেছিল, চল আমাদের যা যা মনে আছে তা দিয়ে জায়গাটা ভরে ফেলি। আমরা আমাদের আঙুল দিয়ে সকল অ্যাভিনিউ এবং চৌরাস্তা দ্বীপের পাশে ব্রডওয়েয়ের ভীড়-বাট্টা, নদী, গ্রাম, সেন্ট্রাল পার্ক এসব আঁকছিলাম। আমরা একটা পাতলা সুন্দর ঝিনুকের খোসা দিয়ে এম্পায়ার স্টেটের মূর্তি বানিয়েছিলাম। আর একটা ঝিনুকের খোসা দিয়ে ক্রাইস লারের দালান বানিয়েছিলাম। আমরা সম্মানের সাথে দুটো লাঠি দিয়ে দ্বীপের মাঝখানে টুইন টাওয়ার বানাই, আগে যেখানে তারা ছিল।

আমরা বালি দিয়ে মানচিত্র বানিয়ে একে অপরকে আমাদের প্রিয় জায়গা দেখিয়েছিলাম। এভাবে সেই জায়গা যেখানে ইউধির চোখের সানগ্লাসটা কিনেছিল। এটা সেই জায়গা যেখানে আমি আমার প্রথম স্বামীর সাথে প্রথম রাতের খাবার খেয়েছিলাম। আর ওটা সেই জায়গা যেখানে ইউধি তার স্ত্রীর সাথে পরিচিত হয়েছিল। এটা সেরা ভিয়েতনামিজ খাবারের দোকান এবং এটা সেরা বাগেল এবং এটা সেরা নুডলসের দোকান। আমি আমার আগের বাড়ির পাশের একটা রেস্তোরাঁর ছবি এঁকেছিলাম এবং ইউধি বলেছিল আমি সেখানে একটা খাবারের দোকান চিনি।

টিক টক, চেয়েন্না নাকি স্টার লাইট, ডুড?

টিক-টক ডুড।

কখনো টিক টকের এগ ক্রিমস খেয়েছ?

সে বিলাপ করে উঠেছিল,

www.pathagar.org

হায় ঈশ্বর! আমি জানি। আমি খেয়েছি।

কয়েক মুহূর্ত আমি তার নিউইউর্কের জন্য আক্ষেপ গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলাম। আমি সেই আক্ষেপ নিজের সাথে গুলিয়ে ফেলে ভুলে গিয়েছিলাম আমি চাইলেই ম্যানহাঁটানে যেতে পারি কিন্তু সে তা পারবে না। সে টুইন টাওয়ারের লাঠি দুটো আরও শক্তভাবে বালিতে পুতে দিয়ে সেই নিশ্চুপ নীল সাগরের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমি জানি এখানটা খুব সুন্দর। কিন্তু তোমার কি মনে হয় আমি আর কখনো আমেরিকা দেখতে পাব?'

'আমি তখন তাকে কি বলি বলুন তো?'

আমরা কিছুক্ষণ নীরবতায় ডুবে গিয়েছিলাম। তারপর সে তার মুখ থেকে ইন্দোনেশিয়ান শক্ত ক্যান্ডি উগরে বের করে বলেছিল,

ডুড এগুলো খেতে জঘন্য। তুমি এগুলো কোথায় পেয়েছ?

তোমার মায়ের কাছ থেকে ডুড। তোমার মায়ের কাছ থেকে।

৯৯

উবুদে ফেরার পর আমি সরাসরি ফিলিপের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম এবং প্রায় এক মাসের জন্য তার শোবার ঘর ছাড়িনি। ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িই। আমাকে এর আগে এভাবে কেউ ভালোবাসেনি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমি কখনো এমন নিরাভরণ, প্রকাশিত, খোলা জবরদস্ত কিছু পাইনি।

একটা ব্যাপার, আমি জানি দুজন মানুষের শারীরিক সান্নিধ্যের কিছু নিয়ম দুজন মানুষের যৌনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু এসব নিয়মও যা করতে পারে না তা মাধ্যাকর্ষণ করতে পারে। আপনি ইচ্ছা করলেই কারো শরীরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারবেন না। একজন মানুষ কি করে কিভাবে কথা বলে দেখতে কেমন এসবও এক্ষেত্রে খুব কম ভূমিকা রাখে। রহস্যময় চুম্বক হয়ত বুকের অস্থির কোথায় প্রোথিত থাকে কিংবা থাকে না। কিন্তু যদি সেই চুম্বক না থাকে একজন সার্জন একটা ভুল দাতার কিডনি কোনো শরীরে জোর করে ঢুকাতে পারলেও আপনি একজনের শরীরের সাথে জোর করে স্বস্তিবোধ করতে পারবেন না। আমার বন্ধু এনি বলে, এইসব কিছু একটা সহজ প্রশ্ন থেকে আসে, তুমি কি এই লোকটির পেটের চাপ তোমার পেটে চিরদিনের জন্য নিতে চাও, না চাও না?

আমি এবং ফিলিপ আবিষ্কার করেছিলাম যে আমরা একেবারে পেটের সাথে পেট মিলাতে সফল, যেন আমাদের শরীর জেনিটিক্যালভাবে নকশা করা। আমাদের শরীরের কোনো অংশই আর একজনের কোনো অংশের সাথে প্রতিক্রিয়াশীল না। কোনো কিছু ভয়াবহ না, কোনো কিছু আলাদা না, একজনের দেহের কোনো অংশ আর এক জনের দেহের অংশ ফিরিয়ে দেয় না। আমাদের কামনার জগত সহজ, গতিশীল, পরিপূরক এবং প্রশংসনীয়।

www.pathagar.org

আমাদের আবার এক দফা ভালোবাসাবাসি হয়ে যাওয়ার পর ফিলিপ আমাকে আমার আয়নার সামনে নিয়ে গিয়ে আমার দেহ এবং আমার চুল দেখিয়ে বলেছিল, যা দেখে মনে হচ্ছিল আমি নাসার স্পেস ট্রেনিং নিয়ে এইমাত্র ফিরেছি,

'তোমাকে দেখ। কি সুন্দর দেখতে তুমি। তোমার প্রতিটা রেখা ঢেউয়ের মতো তুমি দেখতে সান্ড ডিউনের মতো।'

ছয় মাস বয়সে আমার মা রান্নাঘরের সিংকে আমাকে গোসল করিয়ে তোয়ালে পেঁচিয়ে যে ছবিটা তুলেছিলেন। ফিলিপের কাছে আমার শরীর তেমনটা দেখায় বা আমি তেমনটা বোধ করি। সে আমাকে আবার বিছানায় শুইয়ে পর্তুগিজ ভাষায় বলেছিল,

ভেমো গসতোশা।

যার মানে, কাছে এস আদুরে সোনা।

ফিলিপ সোহাগ করার ওস্তাদ। বিছানায় সে আদর করার সময় পর্তুগিজ ভাষায় চলে যায় তাই আমি সুন্দরী ছোট্ট সোনা থেকে উন্নীত হয়ে কোয়েরিডিনহা হয়েছিলাম, যার মানে একই দাঁড়ায়। আমি সেখানে বালিনিজ এবং ইন্দোনেশিয় ভাষা শিখতে কোনো উৎসাহ পাইনি কিন্তু পর্তুগিজ ভাষা আমার কাছে সহজ লেগেছে। অবশ্য আমি শুধু বালিশ কথোপকথন শিখি। সেখানে পর্তুগিজ সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়। সে বলে, 'আমি তোমাকে এতবার ছুঁয়ে দেব এতবার বলব তুমি খুব সুন্দর যে তুমি বিরক্ত হয়ে পড়বে।'

কর না জনাব।

আমি সেখানে সারা দিনের কাজ ভুলে যেতাম। তার ভেতরে হারিয়ে যেতাম তার হাতের নিচে হারিয়ে যেতাম। দিন তারিখ কিছুই ঠিক জানি না। এই ব্যাপারটা ভেবে ভালোই লাগত। আমার সুসংগঠিত রুটিন বাতাসে উড়ে যেত। শেষমেশ একটা লম্বা বিচ্ছেদের পর আমি কেটুটকে দেখতে গিয়ে একটু থেমেছিলাম। কেটুট আমার মুখ দেখেই সব বুঝে গিয়েছিল,

বালিতে তুমি প্রেমিক খুঁজে পেয়েছ?

হ্যাঁ কেটুট।

ভালো। সাবধান থেকো পেট বাধিও না আবার।

হুম।

ভাল মানুষ নাকি?

আপনি বলেছিলেন কেটুট। আপনি তার হাত দেখে বলেছিলেন, সে একজন ভাল মানুষ। আপনি সাত বার বলেছিলেন কথাটা।

আমি! কখন বলেছি?

জুন মাসের দিকে। আমি তাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে। সে একজন ব্রাজিলবাসী। আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। আপনি বলেছিলেন আপনার তাকে পছন্দ হয়েছে।

সে জোর গলায় বলেছিল,

কখনো না।

এবং আমি কোনোভাবেই তাকে বোঝাতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে কেটুট স্মৃতি গুলিয়ে ফেলেন। আপনার বয়স যদি পঁয়ষট্টি থেকে একশ বিশ বছরের মতো

www.pathagar.org

হয় তাহলে আপনারও একই দশা হবে। মাঝে মাঝে তিনি খুব সতেজ এবং ঝকঝক মেজাজের থাকেন আর মাঝে মাঝে মনে হয় আমি তাকে অন্য কোনো চেতনা থেকে অন্য কোনো মহাবিশ্ব থেকে ডেকে এনে বিরক্ত করছি। তার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি আমাকে অন্য কোনো জগত থেকে যেন বলেছিলেন, 'তুমি আমার খুব ভাল বন্ধু বিশ্বস্ত বন্ধু স্নেহের বন্ধু' তারপর তিনি শূন্যের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন 'শেরনের মতো না?' এই শেরন কোন নচ্ছার সে কেটুটের সাথে কি করেছে? আমি যখন তাকে এই প্রশ্নগুলো করতে গিয়েছি তিনি আমাকে কোনো উত্তর দেননি। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল আমি যার কথা বলছি তাকে তিনি চেনেন না। যেন সেই বেহায়া বাজে শেরনের কথা আমিই তুলেছি।

তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন,

তুমি তোমার প্রেমিককে আমার সাথে দেখা করতে কেন নিয়ে আসোনি?

আমি এনেছিলাম সত্যি এনেছিলাম আর আপনি বলেছিলেন তাকে আপনার পছন্দ হয়েছে।

মনে নেই। তোমার প্রেমিক কি বড়লোক?

না কেটুট। সে ধনী না। কিন্তু সে সচ্ছল।

মোটামুটি ধনী?

কবিরাজ সবিস্তারে জানতে চান।

তার যা আছে যথেষ্ট।

আমার উত্তরে কেটুট রেগে যান,

তুমি লোকটার কাছে টাকা চেয়েছ? হ্যাঁ নাকি না?

কেটুট আমি তার কাছে টাকা চাইনি। আমি কখনো কোনো পুরুষের কাছ থেকে টাকা নেইনি।

তুমি প্রতি রাত তার সাথে কাটাও?

হ্যাঁ।

সে তোমাকে নষ্ট করেছে?

ভাল ভাবেই।

ভালো। তুমি এখনো ধ্যান কর?

হ্যাঁ। আমি সপ্তাহের প্রতিটা দিন ধ্যান করি।

ফিলিপের খাট থেকে তার সোফায় গিয়ে আমি একা নিরিবিলি বসতে পারি এবং প্রার্থনা করতে পারি। তার উঠানের বাইরে হাঁসেরা প্যাক প্যাক গল্প করতে করতে ধান ক্ষেতে যায়। ফিলিপ বলেছিল, এই হাঁসের পাল দেখলে তার সবসময় রিও সৈকত থেকে মহনীয় ভঙ্গিতে উঠে আসা ব্রাজিলিয়ো মহিলাদের কথা মনে হয়। তাদের অনবরত কথা বলা একে অপরের মুখের কথা টেনে নেওয়া আর তার সাথে বক্ষদেশ গর্বিত ভঙ্গিতে দোলানো। আমি তখন অনেক আরামে ছিলাম, নিরাভরণ শরীরে সকালের সূর্যের আলোয় মুড়ে এভাবে ধ্যান করতাম যেন আমার প্রেমিক গোসলের ব্যবস্থা করেছে। আমি করুণায় অদৃশ্য হয়ে শূন্যে দোল খেতাম এভাবে যেন আমি একটা একটা ছোট চামুচে ঝিনুকের খোসা।

আগে জীবনকে এত কঠিন মনে হতো কেন?

www.pathagar.org

একদিন আমি সুসানকে ফোন করেছিলাম। পুলিশের গাড়ির সাইরেনের শব্দের সাথে আমি তার সদ্য ভাঙা হৃদয়ের হা হুতাশ শুনতে পেয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম, যে পুরুষ যেতে চায় তাকে যেতে দিতে আর যা হয় বা হচ্ছে এই বিশ্বে সব কিছুই সঠিক আছে, সঠিক ছিল। আসলে সব কিছুতেই শান্তি এবং সুখ বিরাজ করছে। যেভাবে আমি কথাগুলো বলেছিলাম তাতে আমার কণ্ঠ গভীর রাতের জ্যাজ রেডিওর ডি জের মতো মোলায়েম শুনিয়েছিল।

আমি যেন দেখতে পেয়েছিলাম সেই সাইরেন ছাপিয়ে সুসান চোখ পাকিয়ে বলছে,

এভাবে কথা বলছ, মনে হচ্ছে তোমার দিনে চার বার অর্গাজম হয়।

১০০

কিন্তু এত মজা আর খেলা যে শরীর সইবে না তা বোঝা উচিত ছিল। কয়েক সপ্তাহ পরই সেটা আমাকে পাকড়াও করেছিল। সেই নির্ঘুম রাতগুলো আর দিনভর এত এত ভালোবাসা-বাসির ফলে আমার শরীর আমাকে উল্টো তাড়া করেছিল। ব্লাডারে বাজে রকমের প্রদাহ হয়েছিল। অতিমাত্রায় শারীরিক মিলনের ফলে সৃষ্ট একটা সাধারণ রোগ সেটা। বিশেষত তাদের এই রোগ হয় যারা অতিমাত্রায় শারীরিক মিলনে অভ্যস্ত না।

আমি যখন শহরে টুকটাক কাজ করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ তীব্র ব্যথায় আর জ্বরে আমি কুঁকড়ে যাই। এই ইনফেকশন আমার আগেও হয়েছিল এবং তা যৌবনের উদ্দাম সময়টাতে। তাই আমি জানতাম এটা কি। কয়েক মুহূর্ত খুব ভয় পেয়েছিলাম ব্যাপারটা ভয়াবহ কিছুতে গড়াতে পারে কিন্তু তারপর মনে পড়েছিল, ঈশ্বরের করুণায় আমার বন্ধু একজন চিকিৎসক এবং আমি ওয়াইয়ানের দোকানে দৌড়ে গিয়ে বলেছিলাম,

আমি অসুস্থ।

সে আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিল,

তুমি অতিরিক্ত শারীরিক মিলনের ফলে অসুস্থ হয়েছ লিজ।

আমি অস্বস্তিতে মুখ ঢেকে কঁকিয়ে উঠেছিলাম। আমার প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। যার কখনো এই ব্যথা হয়েছে সে বুঝবেন আর যাদের কখনো এই ব্যথা হয়নি তারা নিজের সর্বোচ্চ কষ্টের কোনো রূপক দিয়ে বুঝে নিন।

একজন অগ্নি নির্বাপকের মতো বা একজন এ আর সার্জনের মতো দ্রুত ওয়াইয়ান কিছু করতে পারে না। সে তার নিয়ম অনুযায়ী কিছু গাছ পালা কাটতে শুরু করেছিল, কিছু শেকড় সেদ্ধ করেছিল, রান্নাঘর থেকে আমার কাছে যাতায়াত করছিল এবং এক ধরনের বাদামি উষ্ণ বিষের মতো নির্যাস খাইয়েছিল। পরবর্তী নির্যাস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত সে আমার মুখোমুখি বসে আমার দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে খেপানোর সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল,

www.pathagar.org

তোমার সাবধান থাকতে হবে যাতে গর্ভবতী না হয়ে যাও।

না সম্ভব না। ফিলিপের ভেসেকটমি করা আছে।

ফিলিপের ভেসেকটমি করা আছে? প্রশ্নটা ওয়াইয়ান যেভাবে করেছিল মনে হচ্ছিল যে বলছে, ফিলিপের তুসকানে একটা বাড়ি আছে! যাই হোক অন্তত আমার কাছে তেমনই মনে হয়েছে। সে আরও বলেছিল,

বালিতে কোনো পুরুষের ভ্যাসেকটমি করানো এত সহজ না। জন্মনিয়ন্ত্রণ এখানে নারীর দায়িত্ব।

যদিও বালিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনেকাংশেই এখন নিম্নগামী কেননা সরকার এখানে এক ধরনের কর্মসূচী নিয়েছে যে, যদি কোনো পুরুষ ভেসেকটমি করে তাকে একটা মোটর-বাইক দেওয়া হয়। দৃশ্যটা ভাবতে আমার খুবই খারাপ লাগে, যেদিন তারা ভেসেকটমি করে, সে দিনই নিজের মোটর বাইকে বাড়ি ফিরছে।

আমার ব্যথায় দুমড়ানো মোচড়ানো মুখ দেখে ওয়াইয়ান দুষ্ট স্বরে বলেছিল,

মিলন খুবই মজার।

যাও ওয়াইয়ান। মজা করো না।

না আসলেই এটা খুব মজার। শুরুতে এটা খুবই মজার সবাই এর ভেতর দিয়েই যায়। খুব বেশি আনন্দ আর মজা করে সে পর্যন্ত তা চলতে থাকে যতক্ষণ না সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনকি আমার নিজের প্রেমের শুরুতেও এমন হয়েছিল। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা।

আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

আরে না।

তারপর সে শুদ্ধ ইংরেজিতে শুদ্ধ বালিনিজ তত্ত্ব দিয়েছিল,

ভালোবাসায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা মাঝে মাঝে একটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের অংশ।

আমি ফিলিপকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। জরুরি অবস্থায় যাতে ব্যবহার করতে পারি সেজন্য আমি আমার সাথে কিছু এন্টিবায়োটিক নিয়ে এসেছিলাম। এই ইনফেকশন আমার আগেও হয়েছিল তাই এর ভয়াবহতা আমি জানি। এটা কিডনিতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমি এর মধ্যে দিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম না আর ইন্দোনেশিয়াতে তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমি ফিলিপকে ফোন করে বলেছিলাম কি ঘটেছে এবং বলেছিলাম যাতে সে সেই ঔষধগুলো নিয়ে আসে। এর মানে এই নয় যে আমি ওয়াইয়ানের চিকিৎসায় বিশ্বাস করি না। আসলে অনেক বেশি ব্যথা ছিল আমি দ্রুত নিরাময় চাচ্ছিলাম।

সে বলেছিল,

তোমার কোনো ঔষধের দরকার নেই।

কিন্তু নিরাপদ থাকার জন্যই খেতে চাচ্ছিলাম। সেটা কি ভাল না?

দুই ঘণ্টা সময় দাও এরপর তুমি যদি ভাল বোধ না কর তাহলে খেও।

আমি গররাজী হয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উচ্চ মাত্রার এন্টিবায়োটিক নেওয়ার পরও এই ইনফেকশন সারতে কয়েকদিন লাগে। কিন্তু আমি চাইনি সে কষ্ট পাক।

www.pathagar.org

টুটি দোকানে খেলছিল এবং তার ঘরের ছবি দেখিয়ে আমাকে খুশি রাখতে এসেছিল। আট বছরের বাচ্চাটা হাত চাপড়ে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

মা এলিজাবেথ কি অসুস্থ?

যাক তাও ভাল যে তার বোঝার ক্ষমতা নেই কি কারণে আমি অসুস্থ হয়েছিলাম আমি ওয়াইআনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

তুমি কি তোমার বাড়ি কিনেছ ওয়াইয়ান?

তাড়াহুড়ায় এখনো কিনিনি?

যে জায়গাটা তোমার পছন্দ ছিল সেটার কি হলো? আমি ভেবেছিলাম তুমি তা কিনেছ?

না খুব দামি?

তোমার মাথায় কি অন্য কোনো জায়গা আছে?

এসব ভেবো না এখন লিজ। আগে তোমাকে ভাল করতে দাও।

ফিলিপ বিমর্ষ মুখে ঔষধ নিয়ে এসেছিল। এবং আমার ও ওয়াইয়ানের কাছে এই দুর্ভোগের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল।

ওয়াইয়ান বলেছিল,

খুব খারাপ কিছু না। ভেবো না আমি সুস্থ করে দেব।

তারপর সে রান্নাঘরে গিয়ে একটা বড় গামলা করে নির্যাস নিয়ে এসেছিল। কিছু পাতা, শিকড়, জাম, হলুদ আর ডাইনির চুলের মতো কিছু একটা আর কিসের যেন চোখ সব সেই বাদামি নির্যাসে ভাসছিল। এক গ্যালনের মতো ছিল এসব। সে যাই হোক তাতে মরদেহের মতো দুর্গন্ধ ছিল।

'খাও সোনা। পুরোটা খাও'

ওয়াইয়ান বলছিল। আমি খুব কষ্ট করে গিলেছিলাম। দুই ঘণ্টারও কম সময়ে আমি ভাল হয়ে গিয়েছিলাম। একেবারে সেরে উঠেছিলাম।

যেখানে পশ্চিমা চিকিৎসায় এমন একটা ইনফেকশন থেকে সেরে উঠতে কয়েক দিন লাগত সেখানে দুই ঘণ্টায়! আমি তাকে টাকা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে হেসে বলেছিল,

আমার বোনের টাকা দিতে হবে না।

তারপর সে ফিলিপের দিকে ঘুরে কপট রাগ দেখিয়ে বলেছিল,

এখন তার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। কেবল রাতে ঘুমাবে স্পর্শ করবে না।

আমি ওয়াইয়ানকে বলেছিলাম,

তোমার লোকজনের সমস্যা সমাধান করার সময় শারীরিক ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে লজ্জা লাগে না?

লিজ আমি একজন চিকিৎসক। আমি সকল ধরনের চিকিৎসা করি। মেয়েদের যোনিপথ থেকে পুরুষের পুরুষাঙ্গ। মাঝে মাঝে মেয়েদের জন্য আমি কৃত্রিম যৌন যন্ত্র তৈরি করে দেই যাতে তারা একা তা করতে পারে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি,

ডিডলস?

ভাইরে সবার তো আর ব্রাজিলিয়ান প্রেমিক নেই।

www.pathagar.org

তারপর সে ফিলিপের দিকে তাকিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছিল,

তোমার পুরুষাঙ্গ নিয়ে ঝামেলা থাকলে আমার কাছে এসো আমি ঔষধ দিয়ে দেব।

আমি ব্যস্তভাবে বলতে চাচ্ছিলাম যে ফিলিপের পুরুষাঙ্গের কর্ম ক্ষমতা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ফিলিপ বরাবরের মতো নাক গলিয়ে বলল, 'ওয়াইয়ান এই চিকিৎসা যদি আসলেই কাজে দেয় তাহলে আসো আমরা তা বোতল জাত করে বিক্রি করি। আমাদের ভবিষ্যৎ বনে যাবে।' কিন্তু ওয়াইয়ান ব্যাখ্যা করে বলল এটা সম্ভব না। তার চিকিৎসা পদ্ধতিতে সব কিছুই তাজা নতুন জিনিস থেকে সদ্য প্রস্তুত করতে হয়। তা না হলে কার্যকারিতা থাকে না এবং তাতে প্রার্থনা করেও কার্যকর করতে হয়। শুধু ঔষধই না এক্ষেত্রে মালিশও প্রয়োজনীয়।

শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে ওয়াইয়ানকে এমন দম্পতির চিকিৎসা করতে হয় যাদের কাম অনিচ্ছা আছে, বা পুরুষত্বহীনতা আছে বা যারা বাচ্চা নিতে পারছে না। সে তাদের বিছানার চাদরে জাদুর ছবি এঁকে দেয় আর বুঝিয়ে দেয় কোন আসন এক্ষেত্রে বেশী উপযোগী এবং মাসের কোন সময়টা বেশি কার্যকর। সে বলে যদি কোনো ব্যক্তি বাচ্চা চায় তাহলে তাকে অবশ্যই খুব জোরালো এবং দ্রুততায় সব শেষ করতে হবে। মাঝে মাঝে ওয়াইয়ানকে সেই কক্ষে বসে থেকে সেই দম্পতিদের পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

আমি বলেছিলাম,

ড. ওয়াইয়ানকে দেখতে হয় যে তারা সব কাজ দ্রুততা এবং জোরালোভাবে করছে কিনা।

ফিলিপ নকল ওয়াইয়ান সেজে অভিনয় করছিল যেন সে তাকিয়ে রুগি দম্পতিদের দেখছে আর মুখে বলছে,

তাড়াতাড়ি কর। জোরে কর। তোমরা বাচ্চাটা চাও কি চাও না?

ওয়াইয়ান বলেছিল সে জানে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত কিন্তু এটা একটা চিকিৎসকের কাজ। সে স্বীকার করেছিল আত্মার শুদ্ধতা বজায় রাখতে এই কাজটির আগে ও পরে শুদ্ধতার কিছু আচার পালন করার প্রয়োজন হয়। কাজটা সে প্রায়ই করতে চায় না অদ্ভুত লাগে তার কাছে। একটা বাচ্চার যদি গর্ভধারণের প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে সাহায্য করা জরুরী।

সেই দম্পতিদের বাচ্চা হয়েছে পরে?

সে গর্বের সাথে বলেছিল,

হ্যাঁ বাচ্চা হয়েছে।

কিন্তু এরপর সে আরও মজার কিছু বলেছিল। বলেছিল, কোনো দম্পতির যদি ভাগ্যে সন্তান না জোটে তাহলে প্রথমে পরীক্ষা করে নিতে হয় সমস্যাটা কার। যদি সমস্যাটা হয় নারীর তাহলে সে সেটা প্রাচীন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে সমাধান করার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি সেই সমস্যাটা থাকে পুরুষের তাহলে ওয়াইয়ানের চিকিৎসা ব্যবস্থা এক্ষেত্রে স্থবির কেননা এই পুরুষতান্ত্রিক বালিতে এটা বলার জো নেই যে একজন পুরুষ সন্তান উৎপাদনে সক্ষম না। পুরুষ তো পুরুষ তার আবার কিভাবে এই সমস্যা থাকে। যদি কারো সন্তান না হয় তাহলে সব দোষ দেওয়া হয় নারীকে। কিন্তু

www.pathagar.org

যদি সেই মহিলা দ্রুত গর্ভধারণ করতে অক্ষম হয় তাহলে সে বড় বিপদে পড়ে যায়। মারধর, লজ্জা এবং বিবাহবিচ্ছেদ।

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে মহিলা 'সিমেন্স' এর নাম জানে না সে পুরুষের বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা জানে। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম,

সেই পরিস্থিতিতে তুমি কি কর?

যদি কোনো নারীর এমন সমস্যা হয় তাহলে ওয়াইয়ান সেই নারীর স্বামীকে বলে তার বৌয়ের সমস্যা আছে সন্ধ্যায় তার কাছে একা আসতে হবে। তারপর ওয়াইয়ান গ্রামের কিছু যুবককে ডেকে আনে সেই মহিলার সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় যাতে মহিলাটি বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম হয়।

ফিলিপ মেনে না নিয়ে বলেছিল,

ওয়াইআন। না...

ওয়াইয়ান বলেছিল,

হ্যাঁ। এটাই একমাত্র উপায়। মহিলা স্বাস্থ্যবতী হলে তার বাচ্চা হবে আর সবাই তাতে খুশি হবে।

ফিলিপ এই শহরেই থাকে তাই সে তাৎক্ষণিকভাবে জানতে চেয়েছিল,

কাদের? এক্ষেত্রে কাদের তুমি ভাড়া করে নিয়ে আসো, গাড়ি চালকদের।

আমরা সবাই হেসে ফেলেছিলাম। কেননা উবুদ এইরকম তরুণ গাড়ি চালকে বোঝাই, যারা গাড়ির এক কোণে বসে পর্যটকদের অবিরত বিরক্ত করতে থাকে, যাবেন? যাবেন? তারা শহরের বাইরের মন্দির, আগ্নেয়গিরি এবং সৈকতে নিয়ে যেতে উত্ত্যক্ত করতেই থাকে। সত্যি বলতে ছেলেগুলো দেখতে ভাল তাদের সুঠাম দেহ, গাওগুইনের মতো চামড়া আর খাঁজ কাটা চুল। এদের নিয়ে আপনিও অনায়াসে আমেরিকায় একটা বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসালয় খুলতে পারবেন হা হা। ওয়াইয়ান বলেছিল, এই চিকিৎসার সবচেয়ে বিরাট ব্যাপার হচ্ছে বউগুলো যদি সুন্দর হয় তাহলে এই গাড়ি চালকগুলো টাকা নেওয়ার কথা মুখেও আনে না। ফিলিপ আর আমি একমত হয়েছিলাম কাজটাতে আসলেই উদারতা আর সমাজ সেবা আছে। নয় মাস পরে একটা ফুটফুটে বাচ্চার জন্ম হয় এবং সবাই খুশি থাকে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার বিয়েটা টিকে যায়। আমরা সবাই জানি একটা বিয়ে ভেঙে যাওয়া কি ভয়াবহ ব্যাপার বিশেষ করে বালিতে।

ফিলিপ বলেছিল,

ছি আমরা পুরুষরা কি জঘন্য।

কিন্তু ওয়াইয়ান তাতে দুঃখ প্রকাশ করেনি। এই চিকিৎসা জরুরি কারণ একজন বালিনিজ পুরুষকে এটা বলা সম্ভব না যে সে বাচ্চা উৎপাদনে অক্ষম। বাড়ি ফিরে যে বউকে মারধর করবে না তার নিশ্চয়তা কি। বালিতে পুরুষরা যদি এটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিত তাহলে সে হয়ত হারবাল পদ্ধতিতে চিকিৎসাগুলো করতে পারত। কিন্তু এখানকার সংস্কৃতি এমন আর তাই এসব করতে হয়। এই ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র খারাপ বোধ কাজ করে না তার কাছে এটা আর এক ধরনের সৃষ্টিশীল নিরাময়। যাই

www.pathagar.org

হোক সে আরও বলে, এই বালিনিজ মহিলাদের গাড়ি চালকদের সাথে শারীরিক মিলন কিন্তু সুখের কেননা বেশির ভাগ বালিনিজ পুরুষ জানেই না যৌনতা কাজটি ভালোবেসে কিভাবে করতে হয়।

সে বলেছিল,

বেশিরভাগ স্বামী হয় মোরগের মতো না হয় ছাগলের মতো।

আমি তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম,

হয়ত তোমাকে পুরুষগুলোকে যৌন শিক্ষা দেওয়া উচিত। তুমি পুরুষদের শেখাতে পারো কিভাবে একজন মহিলাকে নরমভাবে স্পর্শ করতে হয় তাহলে হয়ত তাদের শারীরিক মিলনে আগ্রহ বাড়বে। কারণ যদি একজন পুরুষ আসলেই আলতোভাবে স্পর্শ করে চামড়ার যত্ন নিয়ে মিষ্টি মধুর কথা বলে, সারা শরীরে চুমু খায় সময় নেয় মিলন আরও সুখের হয়।

হঠাৎ সে লজ্জা পায়। ওয়াইয়ান নুরওয়াইশিষ, পুরুষাঙ্গ গবেষক, ব্লাডার ইনফেকশন নিরাময়কারী, ডিডল উৎপাদনকারী, অল্প-বিস্তর ব্যভিচারে জড়িত মেয়ে আসলেই লজ্জা পেয়েছিল।

তুমি এভাবে কথা বললে আমার হাসি পাচ্ছে। আমার অন্যরকম লাগছে। এমনকি আমার আন্ডারপ্যান্টেও আমার অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে। তোমরা দুজনই এখন বাড়ি যাও। এভাবে যৌনতা নিয়ে কথা বল না। বাড়ি গিয়ে ঘুমাও। কিন্তু শুধু ঘুম বুঝলে? শুধু ঘুম।

১০১

বাসায় ফেরার সময় ফিলিপ জিজ্ঞেস করেছিল,

সে কি বাড়িটা কিনেছে?

এখনো না। তবে সে বলেছে সে খুঁজছে।

টাকা দিয়েছ এক মাসেরও বেশি হয়ে গেল তাই না?

হ্যাঁ যে জায়গাটা সে কিনতে চেয়েছিল তা নাকি বিক্রির জন্য নয়।

সাবধান লিজ, এত সময় নিতে দিও না। এই পরিস্থিতির দায় যেন সকল বালিবাসী তোমার ওপর চাপিয়ে না দেয়।

বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছ?

আমি তোমার কাজে নাক গলাতে চাই না। কিন্তু এই দেশে আমি পাঁচ বছর ধরে আছি আমি জানি আসলে ব্যাপারগুলো কি। এখানে কাহিনি জটিল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বোঝাই যায় না আসলে ভেতরে ভেতরে কি ঘটছে।

তুমি কি বলতে চাচ্ছ ফিলিপ?

সে যখন তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেয়নি আমি তার বিশেষ একটা প্রিয় লাইন তাকেই বলেছিলাম,

www.pathagar.org

তুমি যদি আমাকে ধীরে ধীরে বল তাহলে আমি ব্যাপারটা দ্রুত বুঝতে পারব।

আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, তোমার বন্ধুরা মিলে ওয়াইয়ানকে একটা বড় অংকের টাকা দিয়েছে, কিন্তু এখন টাকাগুলো এই মহিলার ব্যাংক একাউন্টে পড়ে আছে। নিশ্চিত হও সে কি আসলেই টাকাটা দিয়ে বাড়ি কিনছে কিনা।

১০২

জুলাই এর শেষ দিকে আমার পঁয়ত্রিশ তম জন্মদিন ছিল। ওয়াইয়ান তার দোকানে বালিনিজ পদ্ধতিতে জন্মদিন পালন করেছিল, যেমনটা আমি আগে কখনো দেখিনি। আমাকে বালিনিজ প্রচলিত জন্মদিনের পোশাক পরানো হয়েছিল, হালকা বেগুনি রঙের একটা হাতাকাটা সেরং তার সাথে একটা লম্বা সোনালি কাপড় আমার গলায় এত আঁটসাঁটভাবে পেঁচিয়েছিল যে আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না। এমনকি আমার জন্মদিনের কেক গিলতেও কষ্ট হচ্ছিল। ওয়াইয়ান তার ছোট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে আমাকে মমির মতো পট্টি লাগাচ্ছিল। আমার বুকের দিকে আলপিন দিয়ে নানান কিছু রঙ ঢ়ঙয়ের বাড়তি উপাদান লাগাচ্ছিল আর জিজ্ঞেস করেছিল,

তাহলে ফিলিপকে বিয়ে করার কোনো পরিকল্পনা আছে তোমার?

না। আমাদের এমন কোনো ভাবনা নেই। আমি আর কোনো স্বামী চাই না। ফিলিপ নিজেও কোনো স্ত্রী চায় না। কিন্তু আমার তার সাথে থাকতে ভাল লাগে।

বাইরের রূপ অনেকের ভাল হয় কিন্তু ভেতর বাহির দুই দিকেই সুদর্শন মানুষের অনেক অভাব। ফিলিপ সব দিক দিয়েই সুন্দর।

আমি একমত হয়েছিলাম এবং সে আরও বলছিল, কে ওকে তোমার কাছে এনে দিয়েছে? কে সেটার জন্য প্রার্থনা করেছে? এই আমি।

আমি তাকে চুমু খেয়ে বলেছিলাম,

ধন্যবাদ ওয়াইয়ান। তুমি খুব ভাল একটা কাজ করেছ।

আমরা জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম। পুরো জায়গাটা ওয়াইয়ান ও অন্যান্য বাচ্চারা বেলুন ও তাল পাতায় লেখা লম্বা চওড়া জটিল কিছু অভিবাদন দিয়ে ভরে ফেলেছিল। কথাগুলো ছিল এমন, 'শুভ জন্মদিন চমৎকার প্রিয়তমা তোমাকে, আমাদের প্রিয়তম বোন, আমাদের আদরের এলিজাবেথ, শুভ জন্মদিন, সবসময় সুখে ও শান্তিতে থেকো এবং শুভ জন্মদিন' ওয়াইয়ানের একজন ভাই আছে যার ছেলেমেয়ে দুটো মন্দিরের অনুষ্ঠানের প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী, তাই তার ভাতিজা এবং ভাতিজি আমার জন্মদিনে নাচতে এসেছিল। হরিণ শিকারের যে অসাধারণ নাচটি ধর্ম যাজকদের জন্যই কেবল বরাদ্ধ থাকে। সব শিশুরা সোনালি রঙে সেজে এবং মাথায় জবরজং নানান কিছু লাগিয়েছিল। যেন তারা ভয়ানক ড্রাগন রাণী। পায়ে ছিল শক্তিশালী কিছুর প্রতীক এবং আঙুলে মেয়েলিপনা।

www.pathagar.org

বালিনিজ অনুষ্ঠানে সাধারণত লোকেরা তাদের সবচেয়ে ভাল পোশাকটি পরে আসে তারপর একসাথে বসে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা অনেকটা নিউইয়র্কের ম্যাগাজিন উৎসবের মতো। যখন আমি বলেছিলাম যে আমার জন্মদিনে ওয়াইয়ান একটা বালিনিজ পদ্ধতিতে জন্মদিন পালন করতে যাচ্ছে ফিলিপ তখন হা হা করে উঠেছিল, 'কি বল, প্রিয়তমা। খুব একঘেয়ে হবে তাহলে?' না একঘেয়ে ছিল না ততটা। কেবল শান্ত এবং আলাদা। সবার পোশাক আশাকের পর্ব শেষ হওয়ার পর নাচের অনুষ্ঠান এবং তারপর সবাই মিলে বসে থেকে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকা। খুব খারাপ কিছু না। সবাইকে খুব সুন্দর লাগছিল। ওয়াইয়ানের পুরো পরিবার এসেছিল। চার ফিট দূর থেকে হেসে হেসে আমাকে দেখছিল আর হাত নাড়ছিল এবং আমিও হাসছিলাম আর হাত নাড়ছিলাম।

আমি ছোট কেটুটের সাথে জন্মদিনের কেকে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছিলাম। ঐ যে ছোট এতিম মেয়েটা। তার জন্মদিন এবং আমার জন্মদিন একই দিনে তাই কয়েক সপ্তাহ আগে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি আমার জন্মদিন তার সাথে ভাগাভাগি করে নেব। সে কখনো জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করেনি। মোম নিভিয়ে দেওয়ার পর ফিলিপ ছোট কেটুটকে একটা বার্বি পুতুল উপহার দিয়েছিল যেটা খুলে সে এমন থ বনে গিয়েছিল যেন তাকে জুপিটার গ্রহের টিকিট দেওয়া হয়েছে। যা সে গত সাত বিলিয়ন আলোকবর্ষে পাবে বলে কখনো ভাবেনি।

সেই অনুষ্ঠানের সব কিছুই ছিল মজার। ছিল আমার একদল আন্তর্জাতিক এবং আন্তবংশক্রমিক বন্ধুদের একটা অদ্ভুত সম্মিলন। আর তার সাথে ওয়াইয়ানের পরিবার এবং তার কিছু পশ্চিমা রুগি যাদের আমি কখনো দেখিনি। আমার বন্ধু ইউধি আমার জন্য ছয় প্যাকেট বিয়ার এনে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। এবং এসেছিল মাদকসেবীদের চলচ্চিত্র নির্মাতা। যার নাম এডাম। এক রাতে বারে গিয়ে ফিলিপ এবং আমার সাথে এডামের পরিচয় হয়েছিল এবং আমরাই তাকে দাওয়াত করেছিলাম। এডাম এবং ইউধি অনুষ্ঠানে জন নামের একটা ছেলের সাথে কথা বলে কাটিয়েছিল। বাচ্চাটার মা একজন জার্মানি পেশায় পোশাক নকশাবিদ, আর বাবা আমেরিকান যে কিনা বালিতে থাকে। জনের বয়স সাত। সে কিছুটা আমেরিকান, যদিও সে কখনো সেখানে যায়নি। বাবার ধারা পেয়েছে হয়ত। ছেলেটি তার মায়ের সাথে জার্মান ভাষা বলছিল এবং ওয়াইয়ানের বাচ্চাদের সাথে ইন্দোনেশিয়ান বলছিল এবং এডামের সাথে গা ঘেঁষে ছিল কেননা সে বুঝতে পেরেছিল ক্যালিফোর্নিয়ার এই লোকটি সার্ফিং জানে।

জন বলছিল,

তোমার প্রিয় পশু কি মিস্টার?

এডাম উত্তর দিয়েছিল,

পেলিকান।

পেলিকান কী?

ইউধি লাফ দিয়ে এসে বলেছিল, ডুড তুমি জানো না পেলিকান কি? জন তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো পেলিকান কি? দারুণ জিনিস ডুড।

www.pathagar.org

তারপর সেই জন ছোট টুটির দিকে ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় কিছু বলছিল। সম্ভবত জিজ্ঞেস করছিল পেলিকান কি। টুটি ফিলিপের কোলে বসে বসে আমার জন্মদিনের কার্ড পড়ছিল আর ফিলিপ চমৎকার ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্যারিস থেকে আগত অবসরপ্রাপ্ত এক ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছিল। ওয়াইয়ানের কাছে যে কিডনি চিকিৎসার জন্য আসে। সেসময় ওয়াইয়ান রেডিও চালিয়ে দিয়েছিল এবং কেনি রগারস গাইছিল 'কাওয়ার্ড অফ দ্য কান্ট্রি।' তখন তিনজন জাপানি মেয়ে হঠাৎ মেসেজ করানোর জন্য দোকানটাতে ঢুকেছিল। সেই মেয়ে দুটোকে আমার জন্মদিনের কেক খেতে বলতে বলতেই ছোট কেটুট এবং বড় কেটুট মিলে আমার মাথায় নানান রঙচঙা ক্লিপ লাগাচ্ছিল। তারা তাদের জমানো সব টাকা দিয়ে উপহারগুলো কিনেছিল। ওয়াইয়ানের ভাতিজা ভাতিজি, কৃষকের ছেলে মেয়ে, মন্দিরের নৃত্যশিল্পীরা মাটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল যেন তারা সোনালি রঙের ছোট খাট দেব দেবী। তারা ঘরটাকে একটা অন্য ভুবনের আমেজ দিয়েছিল। বাইরে মোরগ ডাকছিল যদিও তখনও সন্ধ্যা হয়নি। প্রচলিত ধারার পোশাক আমাকে চেপে ধরেছিল আমার খুব অদ্ভুত লাগছিল কিন্তু সেটাই সম্ভবত আমার সারা জীবনের সবচেয়ে সুখি এবং সেরা জন্মদিন।

১০৩

তখনও ওয়াইয়ানকে একটা বাড়ি কিনতে হবে কিন্তু তা হচ্ছিল না বলে আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম কেননা তার দরকার ছিল খুব। তাই আমি আর ফিলিপও সেই কাজে নেমে গিয়েছিলাম। আমরা একজন জমি কেনার দালাল ধরেছিলাম যাতে সে আমাদের আশেপাশে ঘুরিয়ে জায়গা দেখাতে পারে। কিন্তু আমাদের যাই দেখানো হচ্ছিল ওয়াইয়ানের তা পছন্দ হচ্ছিল না। আমি তাকে তাড়া দিচ্ছিলাম, ওয়াইয়ান তোমার এখন কিনে ফেলা উচিত কেননা আমি সেপ্টেম্বরে চলে যাচ্ছি। আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে আমার বন্ধুদের জানানো উচিত যে তাদের টাকা দিয়ে আসলেই কোনো জমি কেনা হয়েছে এবং তোমাকে উচ্ছেদ করার আগে তোমার মাথার ওপর একটা ছাদ দরকার।

সে বলত,

বালিতে কোনো জমি কেনা এত সহজ না। এটা এমন না যে তুমি দোকানে গিয়ে এক বোতল বিয়ার কিনবে।

আমাদের অনেক বেশি সময় নেই ওয়াইয়ান।

সে কেবল কাঁধ ঝাঁকাত। আমি আবার নতুন করে বালিনিয়ো তত্ত্ব 'রাবার সময়' বুঝতে পারলাম। এর মানে হচ্ছে সময় খুব আপেক্ষিক এবং দোদুল্যমান কিছু। আমার কাছে চার সপ্তাহ আর ওয়াইয়ানের কাছে চার সপ্তাহ এক জিনিস না। এক দিন সব সময়ই ওয়াইয়ানের কাছে চব্বিশ ঘন্টার মতো নয়। মাঝে মাঝে তার চেয়ে

www.pathagar.org

বেশি মাঝে মাঝে তার চেয়ে কম। সেই দিনের আত্মিক ও আবেগময় প্রকৃতির ওপর তা নির্ভর করে। অনেকটা কেটুটের বয়সের রহস্যময়তার মতো। মাঝে মাঝে তা হাতে গোনা যায় মাঝে মাঝে অনুভব করে বের করা হয়।

ইতোমধ্যে এও প্রমাণিত হয়েছিল যে আমি আসলে বুঝতেই পারিনি বালিতে সম্পত্তির দাম এত বেশি কেন। বালিতে সব কিছুরই দাম খুব কম তাই সে হিসেবে আপনার মনে হবে জমির দামও কম হবে কিন্তু সে ধারণাটা ভুল। বালিতে জমি কেনা, বিশেষ করে উবুদে, টোকিও ওয়েস্টচেস্টারে বা রডিও ড্রাইভে জমি কেনার মতোই মূল্যবান। ব্যাপারটা অযৌক্তিক কেননা একবার যদি আপনি একটা জায়গা কিনে ফেলেন তা থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে তেমন কোনো আয় আসবে না। এক একর জমির জন্য হয়ত আপনি দেবেন প্রায় পঁচিশ হাজার ডলারের মতো। এখানকার এক একর বলতে এস ইউ বি এর পার্কিং জোনের চেয়ে অল্প একটু বড় এবং সেখানে একটা দোকান দিতে পারেন যেখানে প্রতিদিন একটা সেরং একজন পর্যটকের কাছে বিক্রি করে লাভ হতে পারে মাত্র পঁচিশ সেন্ট। ব্যাপারটা হতাশাজনক।

কিন্তু বালিনিজরা তাদের জমির মূল্য মানুষের ক্রয় সীমার বাইরে রেখেছে। যেহেতু এখানে জমির মালিকানাই সত্যিকার অর্থ সম্পত্তি তাই বালিনিজদের কাছে এই দাম ন্যায়সঙ্গত। একজন মাসাইয়ের কাছে তার গরুর যেমন দাম আমার পাঁচ বছর বয়সী ভাতিজির কাছে তার লিপ-গ্লসের যেমন দাম সম্পত্তির মূল্য এখানে ঠিক সেরকম। যদি আপনি তা সহজে না পান তাহলে একবার পাওয়ার পর আপনি অবশ্যই তার মর্যাদা দেবেন এবং পৃথিবীতে এটার ওপর আপনার পুরো অধিকার থাকবে।

ইন্দোনেশিয়ান রিয়েল এস্টেট জগতে নারিনার মতো অভিযান চালিয়ে আগস্ট মাসে যা বুঝেছিলাম তা হলো, কখন কোন জমি বিক্রি হবে তা বোঝা অসম্ভব সেখানে। যেসব বালিনিজরা তাদের জমি বিক্রি করবে তারা চায় না সবাই তা জানুক। আপনারা সবাই ভাবতে পারেন এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া লাভজনক কিন্তু বালিনিজরা এমনভাবে না। আপনি যদি একজন বালিনিজ কৃষক হয়ে আপনার জমি বিক্রি করতে চান তাহলে বোঝা যাবে আপনার টাকার খুব প্রয়োজন আর এটা এখানে অপমানজনক। আবার যদি আপনার প্রতিবেশী আর আত্মীয়রা জানতে পারে আপনি জমি বিক্রি করছেন তাহলে তারা টাকা ধার চাইতে পারে। তাই কোনো জমি বিক্রি হবে কিনা তা কেবল একটা গুজবের মতো শোনা যায় এখানে। তাই এখানে সকল জমির কেনাবেচা ছদ্মবেশে এবং খুব গোপনে চলে।

আমি ওয়াইয়ানের জন্য জমি কিনে দিচ্ছি শুনে এখানকার বহিরাগত ভিনদেশীরা আমার সাথে দেখা করতে শুরু করেছিল। তাদের দুঃস্বপ্নময় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আমাকে সতর্ক করতে এসেছিল। তারা আমাকে সতর্ক করেছিল, 'তুমি কখনোই বুঝতে পারবে না রিয়েল এস্টেট নিয়ে এখানে কি হচ্ছে।' যে জমিটা আপনি কিনতে যাচ্ছেন তার মালিক হয়ত তিনি না যিনি এটা বিক্রি করছেন। যাকে মালিক দেখাচ্ছে সে হয়ত তার মালিক না সে হয়ত সেই মালিকের অসন্তুষ্ট ভাতিজা যে কিনা পারিবারিক ঝামেলার জন্য তার চাচার সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে চায়। এমন আশা করা যাবে না যে সীমানা কখনো পরিষ্কার জানা যাবে। কখনো হয়ত জানা যাবে

www.pathagar.org

আপনার কেনা স্বপ্নের জমিটা একটা মন্দিরের খুবই কাছে আর তাই হয়ত কোনো দালান করার অনুমতি আপনি পাবেন না। যেখানে এই ছোট একটা দেশে বিশ হাজার মন্দির সেখানে ব্যাপারটা জটিলই বটে। এবং আপনাকে এও নিশ্চিত করতে হবে আপনি কোনো আগ্নেয়গিরির ঢালু অংশে বাস করতে যাচ্ছেন কি না হয়ত আপনি একটা ফল্ট লাইনের মাঝামাঝি অবস্থানে আছেন। বালিকে যতই শান্তশিষ্ঠ দেখাক না কেন একজন বুদ্ধিমান মানুষ এটা মাথায় রাখে যে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর একটা সর্ববৃহৎ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ যার ভেতরটা অস্থির, গ্যাস পাম্পের লোক থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সর্বত্র দুর্নীতির ছড়াছড়ি 'যারা সর্বোপরি ভাণ করে চলে।' যেকোনো ধরনের বিপ্লব এখানে যেকোনো সময় হতে পারে এবং জয়ীদের বন্দুকের মুখে আপনার সকল সম্পত্তি তারা নিয়ে নিতে পারে।

এইসব চতুর কাজকর্মের আলাপ-আলোচনা করার পর মনে হচ্ছিল যে সেখানে আমার যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা নেই। মানে আমি একটা বিবাহবিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে গেছি নিউইয়র্কে কিন্তু এটা তো কাফকা রহস্যের অন্য এক পৃষ্ঠা। এর মধ্যে আঠারো হাজার ডলার আমি, আমার বন্ধু এবং আমার পরিবার দান করেছে। সেটা এখন বাস্কে পরিণত হয়ে ব্যাংকে পড়ে আছে। বাস্ক এমন একটা মুদ্রা যার বিনা নোটিশে বাস্পের মতো উভে যাওয়ার ইতিহাস আছে। ওয়াইয়ানের সেপ্টেম্বরে তার দোকান থেকে উৎখাত হওয়ার কথা। তখন আমিও এই দেশ ছেড়ে যাব। এবং যা প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে।

কিন্তু সাথে এও দেখা গিয়েছিল ওয়াইয়ানের কাছে বসবাসযোগ্য বিবেচিত জমি খুব কমই আছে। সকল দিক ছেড়ে সে সকল জায়গার টাকসুর প্রতি জোর দিয়েছিল। টাকসু হচ্ছে আত্মা। একজন চিকিৎসক হিসেবে বালিনিজ মান অনুযায়ী ওয়াইয়ানের টাকসু নিয়ে বাড়াবাড়ি একটু বেশি। আমি একটা ভাল জায়গা পেয়েছিলাম কিন্তু ওয়াইয়ান সেটা বাতিল করে দিয়েছিল কারণ সেখানে খারাপ আত্মা থাকে। আর একটা ভাল জমি বাদ দেওয়া হয়েছিল নদীর তীরে অবস্থিত বলে। সবাই নাকি জানে সেখানে ভূত থাকে। তার পরের রাতে ওয়াইয়ান সেই জায়গাটা স্বপ্ন দেখেছে, সেখানে একজন সুন্দরী মহিলা কাঁদছে আর তার জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে তাই জায়গাটা কেনা যাবে না। তারপর আমরা শহরের কোনো একটা দোকান পেয়েছিলাম পেছনের বারান্দাসহ সকল সুবিধা আছে এমন। কিন্তু এটা নাকি সেখানকার সবাই জানে কেউ যদি তরুণ বয়সে মরতে চায় আর দেউলিয়া হতে চায় তারাই এমন কোণায় বাড়ি বানিয়ে থাকে।

ফিলিপ আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল,

আমাকে বিশ্বাস কর সোনা তুমি বালিনিজ ও তাদের টাকশুর ব্যাপারে নাক গলিও না। তাকে তুমি এ বিষয়ে কিছু বলো না।

তারপর গত সপ্তাহে ফিলিপ তার সকল শর্তানুযায়ী একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছিল। ছোটোখাটো সুন্দর একটা জমি, সেন্ট্রাল উবুদের কাছাকাছি একটা শান্ত রাস্তায় ধান ক্ষেতের পাশে বাগানের জন্য ভাল জায়গা আছে এবং আমাদের সাধ্যের ভেতরে। আমি যখন ওয়াইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওয়াইয়ান আমরা কি এটা কিনতে পারি?

www.pathagar.org

সে বলেছিল,

এখনো জানি না লিজ। তাড়াহুড়া করা যাবে না। আমি প্রথমে একজন পূজারীর সাথে কথা বলব।

সে ব্যাখ্যা করে বলেছিল, যদি সে এই জায়গাটা কিনতে চায় তাহলে আগে পূজারীর সাথে কথা বলতে হবে যাতে জমিটা কেনার একটা শুভ দিন সে নির্ধারণ করতে পারে। একটা শুভ দিন ঠিক না করে বালিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় না। কিন্তু আগে জায়গাটা কিনবে কিনা তা ঠিক না করে সে একজন পূজারীকে একটা শুভ দিনের কথা জিজ্ঞেস করতে পারবে না। একটা শুভ স্বপ্ন দরকার। তাই একটা শুভ স্বপ্নের আগে সে কোনো কথা দিতে পারবে না। আমার এখানে বাকি কয়েকদিনের কথা মাথায় রেখে একজন ভাল নিউইয়র্কারের মতো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

কবে তুমি একটা শুভ স্বপ্ন দেখার ব্যবস্থা করতে পারবে।

সে একজন ভাল বালিনিজের মতো বলেছিল, তাড়াহুড়ায় হবে না আমি যদি বালির একটা বড় মন্দিরে পুজো দিতে পারি তাহলে হয়ত তাড়াতাড়ি একটা শুভ স্বপ্ন আমি দেখতে পারব।

আমি বলেছিলাম,

ঠিক আছে। কাল ফিলিপ তোমাকে একটা বড় মন্দিরে নিয়ে যাবে তুমি দেবতাদের অনুরোধ করতে পারবে যাতে তারা তোমাকে দ্রুত কোনো স্বপ্ন দেখাতে পারে।

সে বলেছিল সেটা হলে খুব ভাল হতো। খুব ভাল একটা বুদ্ধি। একটাই সমস্যা এই সপ্তাহে তার মন্দিরে ঢোকার কোনো অনুমতি নেই কারণ এই সপ্তাহে তার ঋতুস্রাব চলছে।

১০৪

হয়ত আমি বুঝতে পারছিলাম না আসলে এগুলো কতটা হাসি আনন্দের। সত্য বলতে অদ্ভুত রকম সন্তোষজনক এই আনন্দ। কিংবা হয়ত আমি আমার জীবনের স্বপ্নিল সময়টা উপভোগ করছিলাম। কেননা প্রেমের সময় এমন হয়, পৃথিবীকে অনেক সুন্দর মনে হয় আসলে তা যত পাগলাটেই হোক।

আমি সব সময়ই ফিলিপকে পছন্দ করতাম। কিন্তু আগস্ট মাসে ওয়াইয়ানের বাড়ির কাহিনি আমাদের দুজনকে সত্যি কারের দম্পতির মতো কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বালিনিজ মহিলার কি হবে না হবে তা তার মাথা ঘামানোর বিষয় না। সে একজন ব্যবসায়ী। ফিলিপ পাঁচ বছর বালিতে কোনো ঝামেলা না জড়িয়ে কোনো জটিল আচার অনুষ্ঠানে না জড়িয়ে থাকতে পেরেছে। কিন্তু হঠাৎ সে আমার সাথে ধুলো কাদার ধান ক্ষেতে নেমে ওয়াইয়ানের জন্য একজন পূজারী খুঁজতে নেমে গিয়েছিল।

www.pathagar.org

ফিলিপ সব সময় বলত,

আমি আমার একঘেঁয়ে জীবনে পুরোপুরি খুশি ছিলাম।

এর আগে বালিতে সে খুব একঘেঁয়ে জীবন যাপন করেছিল। নিস্তেজভাবে সময় পার করা গ্রাহান গ্রিনের একটা চরিত্রের মতো ছিল সে। সেই অলসতা থেমে গিয়েছিল যখন আমাদের দেখা হয়েছিল। তখন আমরা একসাথে ছিলাম। আমি আমাদের দেখা হওয়ার গল্পের ফিলিপ ভার্সন শুনতাম, এত মজাদার একটা কাহিনি যা বার বার শুনেও আমি ক্লান্ত হতাম না। কিভাবে সে আমাকে সেই অনুষ্ঠানে দেখেছিল সেই গল্প। আমি তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং তার সাথে ধাক্কা না লাগা পর্যন্ত পিছন ফিরে তাকিয়ে নিজের চেহারা দেখানোর প্রয়োজন বোধ করছিলাম না। তার মনে হয়েছিল,

এই নারী আমার। আমি তাকে পেতে সব করতে রাজী আছি।

সে বলেছিল,

তোমাকে পাওয়া সহজ ছিল। আমাকে কাকুতি-মিনতি করতে হতো।

তুমি তা করনি।

তুমি আমার কাকুতি-মিনতি খেয়াল করনি।

সে বলেছিল, কিভাবে আমাদের পরিচয়ের প্রথম রাতে আমরা নাচতে গিয়েছিলাম এবং আমাকে সেই সুদর্শন ওয়েলসের প্রতি আকর্ষিত হতে দেখে তার কেমন লেগেছিল। সেই দৃশ্য দেখে তার হৃদয় কতটা ডুবে গিয়েছিল। সে মনে মনে বলেছিল,

আমি এই নারীকে প্রলুব্ধ করতে এত সব করলাম আর এখন এই সুদর্শন লোকটা তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে এবং মেয়েটার জীবন জটিল করে তুলবে। মেয়েটা যদি জানতো কতটা ভালোবাসা আমি তাকে দিতে পারি।

আসলেই ফিলিপ তা পারে। সে প্রকৃতিগত ভাবেই যত্নশীল। আমি অনুভব করতে পারতাম কিভাবে সে আমার কক্ষপথে ঘুরপাক খেত। আমাকে তার কম্পাসের লক্ষ্যবস্তু বানাত, আমার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে যেত। ফিলিপ এমন একজন পুরুষ যার জীবনে একজন নারীর খুব বেশী প্রয়োজন নয় এজন্য যে সেই নারী তার যত্ন নেবে বরং এজন্য যে তার যত্নের কেউ একজন থাকে, যার পাশে থেকে সে নিজেকে পবিত্র অনুভব করবে। তার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর সে তেমন কোনো সম্পর্কে জড়ায়নি। অনেকটা ভাসমান ছিল তার অবস্থা কিন্তু তখন সে আমার চারপাশে তার নিজেকে নতুন করে গড়ে নিয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে চমৎকার কিছু ছিল, কেউ আমাকে এভাবে নিয়েছে কিন্তু এতে আমি ভয়ও পেতাম। যখন ওপর তলায় অলসভাবে বই পড়তাম শুনতে পেতাম নিচ তলায় সে কোনো ব্রাজিলিয়ান সাম্বা গুনগুন করছে আর আমাকে বলছে, 'সোনা তোমার কি আর এক গ্লাস মদ লাগবে?' আমার অবাক লাগত। ভাবতাম, আমি যদি কারো জীবনের সূর্য হই, সব কিছুই হই, আসলে আমি কি কারো জীবনের কেন্দ্র হওয়ার মতো মাঝামাঝি অবস্থানে আছি? কিন্তু আমি যখন এক রাতে এই কথা উঠিয়েছিলাম সে বলেছিল,

আমি কি তোমাকে সেরকম একজন হতে বলেছি সোনা। আমি কি বলেছি আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হও?

www.pathagar.org

আমার সেই দম্ভের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে আমি লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম ছিঃ আমি ভেবেছিলাম সে আমার সাথে সারা জীবন থাকতে চায় এবং আমার খামখেয়ালিপনা প্রশয় দিতে চায়।

আমি বলেছিলাম,

আমি দুঃখিত। একটু বেশী ভেবে ফেলেছি তাই না?

সে স্বীকার করেছিল,

হ্যাঁ একটু।

তারপর আমার কানে চুমু খেয়ে বলেছিল,

কিন্তু খুব বেশি না সোনা। এটা এমন একটা সত্য যা আগে পরে আমাদের আলোচনা করতে হতই। আমি প্রচণ্ডভাবে তোমার প্রেমে পড়েছি।

শুনে আমার মুখ ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং সে তাৎক্ষণিক একটা কৌতুক করেছিল যাতে আমি স্বাভাবিক হই, 'আমি কাল্পনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছি,' কিন্তু একটু পরে সে আর লুকিয়ে না রেখে খুব গুরুত্বের সাথে বলেছিল,

দেখো আমার বয়স বাহান্ন। বিশ্বাস কর আমি বাস্তবতা সম্পর্কে জানি। আমি বুঝতে পেরেছি আমি যেভাবে তোমাকে ভালোবাসি তুমি ঠিক সেভাবে এখনো আমাকে ভালোবাসো না। সত্য বলতে আমার তাতে যায় আসে না। কেন জানি আমার বাচ্চাদের ব্যাপারে আমি যেমন অনুভব করি ঠিক তোমার ক্ষেত্রেও তেমন অনুভব করি। মানে আমার কাজ তাদের ভালোবাসা তারা আমাকে ভালোবাসল কিনা সেটা কোনো বিষয় না। তুমি যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পার কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং সব সময় তোমাকে ভালোবাসব। আমরা যদি একে অপরকে আর কখনো না দেখি তাতেও। তুমি আমাকে ইতোমধ্যে জীবন দিয়েছ এবং সেটাই যথেষ্ট। এটা ঠিক অবশ্যই তোমার সাথে জীবন কাটাতে চাইব। কিন্তু আমি জানি বালিতে তোমাকে কিই বা দিতে পারব।

আমি এই ব্যাপারে অবগত। আমি উবুদে অবস্থিত সেখানকার প্রবাসীদের দেখেছি এবং এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি সেখানে আমার জন্য কোনো জীবন নেই। সারা শহর জুড়ে আপনি একই ধরনের চরিত্র দেখতে পাবেন। যেসব পশ্চিমারা যারা খুব বাজেভাবে জীবনকে ছিঁড়ে খুঁড়ে অত্যাচার করে সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে তারাই বালিতে এসে অনিশ্চয়তার তরী ভিড়িয়েছে। যেখানে মাত্র ২০০ ডলারে চমৎকার একটা বাড়িতে থাকা যায়, একজন বালিনিজ মহিলা বা পুরুষ সঙ্গী নিয়ে রাত পর্যন্ত মদ গেলা যায়। যেখানে সময় খেয়াল করার প্রয়োজন না বোধ করে, কারো জন্য কিছু আসবাব রপ্তানি করে দুটো পয়সা আয় করা যায়। কিন্তু আসলে একটাই কারণ সেখানে থাকার তাদের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু চাইবে না। যাকে বলে কোনো দায় নেই। এই মানুষগুলো খুব উচ্চ পর্যায়ের বহুজাতিক, প্রতিভাবান এবং চালাক। কিন্তু আমি দেখেছি এখানে যাদের সাথে পরিচয় হয়েছে তাদের সবাই কেউ একসময় চাকুরিজীবী বা বিবাহিত ছিল। আর সেখানে তারা একটা বিশেষ কিছুর ওপর আত্মসমর্পণ ছাড়া থাকতে পারছে আর তা হলো, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বলার প্রয়োজন নেই যে প্রচুর মদ গেলাও একটা প্রধান কাজ সেখানে।

www.pathagar.org

অবশ্যই এটা সত্য যে বালিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ শহর উবুদ সময় নিয়ে সচেতনতা না রেখে ঘোরা ফেরার জায়গা। আমি বলছি সেই দিক দিয়ে এটা অনেকটা কি ওয়েস্ট, ফ্লোরিডা এবং আলাস্কা এবং মেক্সিকোর মতো। উবুদে বসবাসরত বেশির ভাগ প্রবাসীদের যদি জিজ্ঞেস করেন তারা সেখানে কত দিন ধরে আছেন তারা নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারবে না। এখানে যাওয়ার পর কতটা সময় চলে গেছে এটাও তারা ঠিকঠাক বলতে পারবে না। কিন্তু এটাও ঠিক তারা এটাও বলতে পারবে না, এখানে তারা আর কদিন থাকবে বা আসলেই আর থাকবে কি না। তারা নিশ্চিতভাবে সেখানকার না। কেউ কেউ ভাবতে পছন্দ করে তারা সেখানে কিছুদিনের জন্য আছে। একটা ট্রাফিক সিগন্যালে বসে থাকা অলস সময় কাটাচ্ছে। অপেক্ষা করছে কখন সবুজ বাতি জ্বলে উঠবে, কিন্তু সতের বছর পরও অবাক হতে হবে তাদের কেউ কি চলে গেছে আসলে?

তাদের এই অলস সঙ্গ অনেক উপভোগ্য, রবিবারের লম্বা সন্ধ্যা বাগানে বসে শ্যাম্পেইন খাওয়া এবং উদ্দেশ্যহীন কথা বলা। এখনো যখন আমি এই দৃশ্যের আশেপাশে থাকি আমারও জেডের ডড়থি ইন দ্য পপি ফিল্ডের লাইন মনে পড়ে, সাবধান এই চেতনানাশক ভোরে ঘুমিয়ে যেও না। তা না হলে সারাটা জীবন ঝিমিয়ে কাটাতে হবে।

তাহলে আমার এবং ফিলিপের কি হবে? এখন শব্দটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল 'আমার আর ফিলিপের'? খুব বেশিদিন হয়নি সে আমাকে বলেছিল, 'মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি যদি হারিয়ে যাওয়া ছোট মেয়ে হতে আমি তোমাকে টেনে তুলে বলতাম, এসো আমার সাথে থাকবে আমি সারা জীবন তোমার যত্ন নেব। কিন্তু তুমি হারিয়ে যাওয়া মেয়ে নও। তুমি একজন সচেতন মহিলা। তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। তুমি একজন যথার্থ শামুক। তুমি তোমার পিঠে তোমার বাড়ি নিজেই বহন করে আছ। যতদিন সম্ভব এই স্বাধীনতা ধরে রাখতে হবে। কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা হলো তুমি যদি এই ব্রাজিলিয়ান লোককে চাও তাহলে তুমি তা পাবে। কেননা সে এমনিতেই তোমার।

আমি জানতাম আমি কি চাই। কিন্তু এটা জানতাম না আমার একটা অংশ সবসময় শুনতে চাইত কেউ একজন বলছে, আমি চিরকাল তোমাকে যত্নে রাখব। কেউ আমাকে এর আগে এমন কিছু বলেনি। শেষের কয়েক বছর আমি তা শোনার আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। বরং শিখেছিলাম ভয় পাওয়ার সময় কিভাবে নিজেকে তা বলতে হয়। কিন্তু তখন একজনের মুখে তা শুনে, তাও এত নিষ্ঠার সাথে...

এক রাতে ফিলিপ ঘুমিয়ে যাওয়ার পর আমি এসব ভাবছিলাম এবং আমি তার পাশে কুঁকড়ে শুয়ে ছিলাম, অবাক হচ্ছিলাম আমাদের কি হবে? সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কী? আমাদের মাঝে ভৌগলিক অসমতার? বয়সের অসমতা? কিন্তু একদিন যখন আমি আমার মাকে ফোন করে বলেছিলাম, মা আমি তোমাকে একটা খবর দেই, আমি একজনের প্রেমে পড়েছি কিন্তু অবাক হবে তার বয়স বাহান্ন। সে নিঃস্পৃহ থেকে কেবল বলেছিল, ভালো, এবার আমি তোমাকে একটা খবর দেই লিজ। তোমার বয়স এবার পঁয়ত্রিশে পড়বে। ভাল যুক্তি মা, এমন বাড়তি বয়সের কাউকে পেয়ে আমি কিন্তু খুশি সত্যি বলতে আমার কাছে বয়স কোনো বিষয় না। আমার ভাল লাগে

www.pathagar.org

ফিলিপ আমার চেয়ে বয়সে এত বড়। এটা বরং আমাকে আরও বেশি ফ্রেঞ্চদের মতো আবেদনময়ী অনুভূতি দেয়।

আর আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল,

আমাদের কি হবে?

আমি কেন এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি?

আমি এখনো কেন দুশ্চিন্তা ছাড়তে পারিনি?

তারপর একটু পরে সকল ভাবনা বন্ধ করে দিয়ে ফিলিপের ঘুমন্ত শরীর জড়িয়ে ধরেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, হ্যাঁ আমিও এই লোকের প্রেমে পড়েছি। তারপর ঘুমিয়ে গিয়ে দুটো স্মরণীয় স্বপ্ন দেখেছিলাম।

দুটো স্বপ্নই আমার গুরুকে নিয়ে। আমার গুরু আমাকে জানাচ্ছেন যে তিনি তার আশ্রম বন্ধ করে দিচ্ছেন তাই তিনি আর কোনো কথা বলবেন না বক্তব্য দেবেন না বা বই প্রকাশ করবেন না। তিনি তার ছাত্রদের শেষ বক্তব্য দিয়েছিলেন। যেখানে তিনি বলছিলেন, তোমরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শিক্ষা পেয়েছ। স্বাধীন সত্তা পেতে কি করতে হবে তোমরা তা শিখেছ। এখন সময় হয়েছে তোমরা পৃথিবীতে বেরিয়ে পড় এবং একটা সুখি জীবন কাটাও।

পরের স্বপ্নটা আরও নিশ্চয়তার। আমি ফিলিপের সাথে নিউইয়র্কের একটা চমৎকার রেস্তোরাঁয় খাচ্ছিলাম। আমরা একটা ভেড়ার কাবাব এবং আর্টিকোক এবং দারুণ একটা মদ খেয়ে কথা বলছিলাম আর হাসছিলাম। আমি সেই রুমের আর এক প্রান্তে চেয়ে দেখেছিলাম স্বামীজি, আমার গুরুর শিক্ষক, যিনি ১৯৮২ সালে মারা গিয়েছেন। কিন্তু স্বপ্নে সেই মারদাঙ্গা নিউইয়র্কের রেস্তোরাঁয় তিনি তখন বেঁচে ছিলেন। তিনি তার একদল বন্ধুর সাথে রাতের খাওয়ার খাচ্ছিলেন এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার সময় খুব সুন্দর কাটছে। আমাদের চোখাচোখি হলে স্বামীজী হেসেছিলেন এবং আমার দিকে পেয়ালাটা উঁচিয়ে উল্লাসের ইশারা করেছিলেন।

এবং সেই প্রথম স্বামীজী কিছু বলেছিলেন। তত দূর থেকে মূল্যবান ছোট একটা ইংরেজি,

উপভোগ কর।

১০৫

অনেকদিন হয়ে গিয়েছিল কেটুট লিয়ারকে দেখি না। ফিলিপের সাথে জড়িয়ে যাওয়া এবং ওয়াইয়ানের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে দেওয়ার ঝামেলায় সেই কবিরাজের সাথে আত্মিক বিষয়ে দীর্ঘ উদ্দেশ্যহীন কথোপকথন অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি তার বাড়ির সামনে কয়েকবার একটা যোগ জিজ্ঞাসার জন্য থেমেছিলাম না হয় তার স্ত্রীকে কিছু ফল উপহার দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু জুন মাস থেকে আমরা তেমন কোনো বিশেষ সময় একসাথে কাটাইনি। যখনই আমি কেটুটকে

www.pathagar.org

আমার অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে যেতাম তখনই তিনি এভাবে হাসতেন যেন তিনি এমন একজন মানুষ যার কাছে মহাবিশ্বের সকল প্রশ্নের উত্তর আছে। তিনি বলেছিলেন,

সব ঠিকঠাক মতোই চলছে লিজ।

আমি তখনো এই বুড়ো মানুষটার অভাব বোধ করতাম। তাই সেই সকালে আমি তার সাথে আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে সবসময়ের মতো বলেছিলেন,

তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম। আমি কখনোই তার এই অভ্যাসকে বদলাতে পারিনি!

আমিও আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি কেটুট।

তুমি কি খুব দ্রুত চলে যাচ্ছ লিজ?

হ্যাঁ কেটুট। দুই সপ্তাহের মধ্যে। এই জন্য আমি আজ এসেছি। আমি আপনাকে সেই সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ দিতে এসেছি যা আপনি আমাকে দিয়েছেন। আপনি যদি না বলতেন তাহলে আমি এখানে কখনোই আসতাম না।

কোনো ভণিতা এবং সন্দেহ ছাড়া তিনি বলেছিলেন,

তুমি বালিতে সব সময় ছিলে। তুমি এখনো তোমার চার ভাইয়ের সাথে ধ্যান কর কী? যেভাবে আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম?

হ্যাঁ।

তুমি এখনো তোমার ভারতীয় গুরুর মতো ধ্যান কর কী?

হ্যাঁ।

তোমার এখন আর দুঃস্বপ্ন আসে?

না।

তুমি এখন ঈশ্বরের সাথে খুশি?

অনেক।

তুমি নতুন প্রেমিককে ভালোবাসো?

আমার সেরকমই মনে হয়।

তাহলে তোমার তাকে নষ্ট (মিলিত হওয়া) করা উচিত এবং তার ও তোমাকে নষ্ট করা উচিত।

ঠিক আছে। আমি কথা দিলাম।

তুমি আমার খুব ভাল বন্ধু। বন্ধুর চেয়েও বেশি। তুমি আমার মেয়ের মতো। (শেরনের মতো না...) আমি যখন মারা যাব তুমি বালিতে আসবে আমার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। বালিনিজ শেষকৃত্য অনুষ্ঠান অনেক মজার। তোমার ভাল লাগবে।

আমি আবার কথা দিয়েছিলাম,

ঠিক আছে।

তোমার বিবেক তোমার সহচর হোক। তোমার যদি কোনো পশ্চিমা বন্ধু থাকে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো হাত দেখে দেব। বোমা হামলার পরে ব্যাংকে কোনো টাকা নেই। আজকে একটা শিশুর অভিষেক অনুষ্ঠানে আমার সাথে আসতে চাও নাকি?

www.pathagar.org

আর এভাবেই একটা শিশুর মঙ্গল প্রার্থনার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলাম যার বয়স তখন ছয় মাস এবং যে কিনা তখন প্রথমবারের মতো পৃথিবীতে পা রাখতে তৈরি। বালিনিজ বাচ্চাদের জন্মের প্রথম ছয় মাস মাটিতে পা রাখতে দেওয়া হয় না। কেননা তারা মনে করে বাচ্চারা সরাসরি স্বর্গ থেকে এসেছে এবং তারা এমন মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে পারবে না যেখানে পায়ের নখের কাটা অংশ এবং সিগারেটের শেষটা ফেলা হয়। তাই তাদের প্রথম ছয় মাস এভাবে কোলে রাখা হয় যেন তারা ছোট দেবতা। কোনো বাচ্চা যদি ছয় মাস না হতেই মারা যায় তাহলে আলাদা অনুষ্ঠান পালন করতে হয় এবং তার মৃতদেহের ছাই সাধারণ শশ্মানে রাখা হয় না কারণ তারা কখনো মানুষ ছিল না তারা কেবল দেবতাই ছিল। কিন্তু যদি বেঁচে যায় তাহলে ছয় মাস পরে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের পা মাটিতে রাখা হয়। এভাবেই মানুষের খাতায় তারা নাম লেখায়।

সেই অনুষ্ঠানটা হচ্ছিল কেটুটের পাশের বাড়িতে। বাচ্চাটা ছিল একটা মেয়ে যার নাম পুটু। যাদের বাবা মা ছিল দুজন একইরকম সুন্দর দেখতে কিশোর-কিশোরী। যারা কেটুটের চাচাতো ভাইয়ের নাতি আর নাতবৌ বা সেরকমই কিছু। সে অনুষ্ঠানে কেটুট তার সবচেয়ে ভাল জামাটা পরেছিল। একটা সোনালি পাড় দেওয়া সাদা সাটিনের সেরং এবং একটা ফুলহাতার বোতাম দেওয়া কটি। বোতামগুলো সোনালি রঙের সাথে নেহেরু কলার দেওয়া। সেই পোশাকে তাকে কুলি বা বাসের কনডাক্টর বা কোনো দামি হোটেলের খানসামার মতো লাগছিল। তার মাথায় একটা সাদা পাগড়ি বাঁধা ছিল। সে গর্বসহকারে তার হাত আমাকে দেখিয়েছিল যেখানে সোনা এবং নানান জাদুর পাথরের আংটিতে ভরপুর ছিল। প্রায় সাতটা আংটি ছিল সব মিলিয়ে। সবগুলোই পবিত্র শক্তির অধিকারী। আত্মাদের ডাকার জন্য তার কাছে তার দাদার ঝকঝকে পেতলের ঘন্টি ছিল এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন আমি যেন তার অনেক ছবি তুলি।

আমরা তার প্রতিবেশীর বাড়িতে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলাম। দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। আমাদের সেই ব্যস্ত বড় রাস্তায় কিছুক্ষণের জন্যে হাঁটতে হয়েছিল। চার মাস ধরে আমি বালিতে ছিলাম কিন্তু কখনোই কেটুটকে তার আঙ্গিনা ছেড়ে উঠতে দেখিনি। তাকে সেই হাইওয়ের খেপা মোটর গাড়ির ভিড়ে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। তাকে খুব ছোট দেখাচ্ছিল। আধুনিক রাস্তার পটভূমিতে তাকে খুবই বেমানান লাগছিল। তাতে আমার কান্না পাচ্ছিল। অবশ্য সেদিন আমি একটু বেশি আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছিলাম।

আমরা যখন পৌঁছাই ততক্ষণে আরও চল্লিশ জন প্রতিবেশি পৌঁছে গিয়েছিল। পারিবারিক পূজোর বেদি নানান নৈবেদ্যে বোঝাই ছিল। হাতে তৈরি তালের পাতার ঝুড়ির স্তূপ আর তাতে ধান-চাল, ফুল, ধূপ ধানি, ভাজা শূকর, কিছু মৃত-হংসি এবং মুরগি, নারকেল এবং কিছু টাকার নোট যেগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সবাই যার যার সিল্ক এবং লেইসের তৈরি সেরা পোশাকে সজ্জিত ছিল। আমি ছিলাম কেবল সাদা মাটা। এতসব সুন্দরের মধ্যে বাইক চালিয়ে ঘেমে নেয়ে পুরোনো কুর্তা পরে নিজেকে লজ্জিত লাগছিল। এরকম অপ্রস্তুত পোশাকে এবং দাওয়াতহীন উপস্থিতিতে যেরকম স্বাগতম পাওয়ার কথা আমি তেমনই পেয়েছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু

www.pathagar.org

হেসে তারপর আমাকে উপেক্ষা করে সুন্দর পোশাক পরা সবাই একে অপরকে প্রশংসা করছিল।

কেটুটের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানটি শেষ হতে কয়েক ঘন্টা লেগেছিল। কেবল একজন নৃ-বিজ্ঞানী বা একজন দোভাষী বলতে পারত কি ঘটছে। তবে কেটুটের ব্যাখ্যায় আর আমি বই পড়ে কিছু আচার-অনুষ্ঠানের যা বুঝেছি সে অনুযায়ী, আশীর্বাদের প্রথম পর্যায়ে বাবা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে রাখে এবং মায়ের কাছে থাকে শিশুর একটা নকল প্রতিকৃতি আর যেটা হচ্ছে একটা নারকেলের খোল দেখতে অনেকটা বাচ্চার মতো। এই নারকেলকে একেবারে সত্যিকারের শিশুটির মতো আশীর্বাদ করে পবিত্র পানিতে নামানো হয় এবং বাচ্চার পা মাটিতে রাখার আগে এটাকে মাটিতে নামানো হয়। এটা কেবল এই জন্য যে যাতে ভূত-প্রেতদের বোকা বানানো যায়। যাতে তারা এই নকল বাচ্চাটাকে আক্রমণ করে এবং আসল বাচ্চাটাকে ছেড়ে দেয়।

আসল বাচ্চাটার পা মাটিতে পড়ার আগে কয়েক ঘন্টা ভজন করা হয়। কেটুট তার ঘন্টা বাজিয়ে অবিরত মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছিলেন আর বাচ্চার বাবা মা আনন্দময় ও গর্বের জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। অতিথিরা আসছিল যাচ্ছিল। খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে তাদের উপহার পেশ করে সেগুলো আবার যাওয়ার সময় অন্য কোনো কাজের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অদ্ভুত আচার তাদের কাছে স্বাভাবিক, অনেকটা গির্জার পেছনে বারান্দায় বন-ভোজন সম্মেলনের মতো।

কেটুট বাচ্চাটার জন্য যে মন্ত্র গাইছিলেন তা চমৎকার শোনাচ্ছিল। বিশুদ্ধতা এবং স্নেহের মিলিত এক সুর ছিল তাতে। যখন মা শিশুটিকে ধরে বসেছিল তখন কেটুট নানান খাবারের নমুনা, ফল, ফুল, পানি, ঘন্টা, একটা ভাজা মুরগির ডানা, কিছুটা শূকর, একটা ফাটিয়ে রাখা নারকেল প্রতিটা নতুন পদ নিয়ে তিনি গাইছিলেন, শিশুটি হাসছিল এবং হাততালি দিচ্ছিল, এবং কেটুটও হাত তালি দিচ্ছিলেন এবং গাইছিলেন।

আমি সেই শব্দগুলো আমার নিজের ভাষায় কল্পনা করে বলছি,

আমার ছোট বাচ্চা, এই যে তোমার খাবার জন্য মুরগি ভাজা, একদিন তোমার এটা খেতে খুব ভাল লাগবে এবং আমরা আশীর্বাদ করি তুমি যাতে এটা অনেক খেতে পাও। ছোট সোনা, এই যে ভাতের দলা আশীর্বাদ করি যাতে তুমি যেন সব সময় চাইলেই তা খেতে পাও, তোমার ওপর যেন সদা ভাতের বৃষ্টি ঝরতে থাকে। ছোট সোনা এই যে একটা নারকেল। কি অদ্ভুত না দেখতে এটা তাই না, আশীর্বাদ করি সব সময় যেন তুমি নারকেল খেতে পাও। এই যে ছোট বাচ্চা এখানে তোমার পরিবার তুমি কি দেখছ না তারা তোমাকে কত ভালোবাসে। আহ ছোট সোনা তুমি পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি। তুমি সবচেয়ে ভাল ছাত্র হবে একদিন। তুমি আমাদের সবচেয়ে দামি কিছু। তুমি গুগুলি পুগলি পুতুপুতু। আহ্ ছোট সোনা তুমি আনন্দময় দোলার সামগ্রী, তুমিই সব কিছু।

সবাই পবিত্র পানিতে ভেজানো ফুলের পাপড়ি দিয়ে বাচ্চাটাকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছিল। কেটুট যখন প্রাচীন মন্ত্র পড়ছিলেন তখন পুরো পরিবার গুনগুন

www.pathagar.org

করতে করতে বাচ্চার আশেপাশে ঘুরছিল। এমনকি তারা আমার জিন্স পরা অবস্থায়ও কিছুক্ষণের জন্য বাচ্চাটাকে আমার কোলে দিয়েছিল। আমি তাকে আমার নিজের মতো করে আশীর্বাদ করেছিলাম, কানে কানে বলেছিলাম 'সৌভাগ্যবতী হও, সাহসী হও।' ত্রিপালের নিচেও প্রচণ্ড গরম ছিল। বাচ্চাটার তরুণী মা উদ্ধত রকম লেসের কটির নিচে হাতা কাটা আঁটসাঁট সেরং পড়ে ঘামছিল। আর বাবাটা যে কিনা গর্বিত বাঁকা হাসি ছাড়া কোনো অভিব্যক্তি জানে না সেও ঘামছিল। সকল ধরনের নানি-দাদিরা নিজেদের বাতাস করছিল, উঠছিল, বসছিল, ভাজা শূকরের প্রসাদ নিয়ে হৈ-চৈ করছিল, কুকুর তাড়াচ্ছিল। কেউ কেউ ছিল ইচ্ছুক, অনিচ্ছুক, ক্লান্ত, হাস্যরত, উৎসুক। কিন্তু কেটুট এবং বাচ্চাটা একে অপরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করছিল। সারাটা দিন বাচ্চাটা কবিরাজের ওপর থেকে চোখ সরায়নি। কেউ কখনো শুনেছেন এমন সরাসরি করা রোদে টানা চার ঘণ্টা কোনো শিশু কান্না না করে, বিরক্ত না করে, না ঘুমিয়ে কৌতূহল নিয়ে একজনকেই দেখে যেতে পারে?

কেটুট তার কাজ ভাল মতোই করেছিলেন, সাথে বাচ্চাটাও। দেবীর অবস্থান থেকে মানুষের অবস্থানে রূপান্তরিত হওয়ার আচার-অনুষ্ঠানে বাচ্চাটা পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে উপস্থিত ছিল। আচারে পা বাড়িয়ে, নিজের বিশ্বাসে আত্মবিশ্বাসী থেকে, সংস্কৃতিতে চাহিদার প্রতি বাধ্যগত থেকে একজন আদর্শ বালিনিজ মেয়ের মতো সে তার দায়িত্ব চমৎকারভাবে পালন করেছিল।

ভজনের শেষে বাচ্চাটাকে একটা সাদা লম্বা চাদরে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল যা তার পা থেকে ঝুলছিল তাতে তাকে আর একটু লম্বা ও রাজকীয় দেখাচ্ছিল, হ্যাঁ। একটা খাঁটি অভিষেক। কেটুট একটা পাত্রের মাঝে মহাবিশ্বের চার দিকের একটা ছবি এঁকে সেটা মাটিতে রেখে তাতে পবিত্র পানিতে পূর্ণ করে রেখেছিল। সেই হাতে আঁকা কম্পাসই সেই জায়গা যেখানে বাচ্চাটা প্রথম পা রাখতে যাবে।

তারপর পুরো পরিবার বাচ্চাটার চারপাশে জড়ো হয়েছিল। মনে হচ্ছিল একই সাথে সবাই বাচ্চাটাকে স্পর্শ করতে চাচ্ছিল। সে ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছিল, বাচ্চাটার পা সেই পবিত্র পানিতে পূর্ণ পাত্রের উপরে আঁকা মহাবিশ্বের কম্পাসের ওপর হালকাভাবে ছুঁইয়ে তার পায়ের তলি দিয়ে পৃথিবীর মাটি প্রথমবারের মতো ছোঁয়ানো হয়েছিল। যখন বাচ্চাটাকে উঠানো হয়েছিল তখন তার ছোট পায়ের হাল্কা ছাপ মাটিতে থেকে গিয়েছিল, শেষমেশ পুটু মহান বালিনিজ জালিতে সুসংবদ্ধ হয়েছিল। তথ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল সে কে এবং সে কোথায়। সবাই আনন্দে তাদের হাত নাড়ছিল। সেই ছোট বাচ্চাটা তখন আমাদের একজন। একজন মানুষ। একই সাথে মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জটিল আবির্ভাব ঘটার সকল ঝুঁকি এবং সকল রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির ধারক।

বাচ্চাটা উপরে দেখছিল, চারদিকে তাকাচ্ছিল, হাসছিল। সে তখন আর দেবী ছিল না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে আর কোনো কিছুতেই কিছু মনে করছে না, ভয় পাচ্ছে না। এ পর্যন্ত সে যে সিদ্ধান্তই নিয়ে এসেছে তাতে সে সন্তুষ্ট।

www.pathagar.org

১০৬

ওয়াইয়ানের সাথে চুক্তিটা ভেঙে গিয়েছিল। যেটা ফিলিপ তার জন্য খুঁজে দিয়েছিল সেটাও কোনো একটা কারণে হয়নি। যখনই আমি ওয়াইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কি সমস্যা? সে তেমন একটা যুতসই উত্তর দিতে পারেনি। এখন আমার মনে হচ্ছে ওর বলা একটা কাহিনিও সত্য না। যে জমির ব্যাপারেই চুক্তি হচ্ছিল সেটাই ভেঙে যাচ্ছিল। ওয়াইয়ানের বাড়ির পুরো ব্যাপারটায় এখন আমার ভয় লাগতে শুরু করেছিল। আমি তাকে তাড়া দিয়ে বলেছিলাম, 'ওয়াইয়ান আমি আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকা চলে যাব। আমার যেসব বন্ধুরা আমাকে টাকাটা দিয়েছিল আমি তাদের মুখ দেখাতে পারব না বলতে পারব না তুমি এখনো বাড়ি কেনোনি।'

কিন্তু লিজ টাকগু ছাড়া একটা বাড়ি আমি কিভাবে কিনি?

মানছি প্রত্যেকের জীবনে আলাদা আলাদা জিনিসের গুরুত্ব আছে। কিন্তু কয়েকদিন পর ওয়াইয়ান ফিলিপের বাড়িতে অস্থির হয়ে ফোন করেছিল। সে নাকি অন্য একটা জমি খুঁজে পেয়েছে এবং সেটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে। একটা শান্ত রাস্তায় বিস্তৃত ধানের জমি, একেবারে শহরের কাছে। সেই জায়গার টাকগুটাও নাকি ভালো। ওয়াইয়ান আমাদের বলে জমিটা একজন কৃষকের যে কিনা ওয়াইয়ানের বাবার বন্ধু ছিল। সে মোট সাত একর জমি বিক্রি করবে তার টাকার খুবই প্রয়োজন কিন্তু তখনই টাকা লাগবে বলে সে তার কাছে দুই একর বিক্রি করতে রাজী হয়েছে। সেসময় তার জমিটা পছন্দ হয়েছে। আমার পছন্দ হয়েছে। ফিলিপের পছন্দ হয়েছে। এমনকি, একটা জুলি এনড্রিও-এর ছোট বালিনিজ সংস্করণ টুটিও সেটা পছন্দ করে আনন্দে সেই জমিতে হাত ছড়িয়ে, গোল হয়ে ঘুরেছে।

আমি ওয়াইয়ানকে বলেছিলাম,

কিনে ফেল।

কিন্তু কয়েকদিন পর সে আবার গড়িমসি শুরু করেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কি জায়গাটা কিনতে চাও নাকি চাও না?'

সে আরও কিছুটা গড়িমসি করে কাহিনি বদলে ফেলেছিল। এক সকালে সে বলেছিল, সেই কৃষক তাকে ফোন করে বলেছে সে মাত্র দুই একর জমি বিক্রি করতে পারবে কিনা সে নিশ্চিত না। সাত একর জমি কিনলে তার জন্য ভাল হয়। জায়গাটা তার স্ত্রীর আর সেটাই সমস্যা। কৃষকটির তার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে হবে সে যদি জায়গাটা ভেঙে বিক্রি করতে রাজী হয় তাহলে সে হ্যাঁ বলবে।

ওয়াইয়ান বলেছিল,

যদি আমার কাছে আরও কিছু টাকা থাকত...

www.pathagar.org

হা ঈশ্বর সে আমার কাছে এসেছে যাতে তাকে আমি পুরো জমিটা কিনে দেই। যাতে আমি উপায় বের করি আরও বাইশ হাজার আমেরিকান ডলার কিভাবে ব্যবস্থা করা যায়। আমি তাকে বলেছিলাম,

না ওয়াইয়ান আমি পারব না। তুমি কৃষককে বোঝাতে পার কিনা দেখ?

তারপর আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে আর একটা জটিল কাহিনির অবতারণা করেছিল। সে বলেছিল, সে নাকি আগের দিন একজন গুপ্ত বিদ্যায় পারদর্শী একজনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। লোকটা ধ্যানে গিয়ে তাকে বলেছিল, যদি সে একটা ভাল নিরাময় প্রতিষ্ঠান খুলতে চায় তাহলে তাকে পুরো সাত একর জমিই কিনতে হবে। এটা তার ভাগ্য এবং কেন জানি সেই লোক বলেছে ওয়াইয়ান যদি সেই পুরো জায়গাটা কিনতে পারে তাহলে কোনো এক দিন এখানে একটা অভিজাত হোটেল সে তৈরি করতে পারবে।

একটা অভিজাত হোটেল!

আহ!

তখন হঠাৎ আমি কানে শুনতে পাচ্ছিলাম না। পাখিরা গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, ওয়াইয়ানের মুখ নড়ছিল কিন্তু নাহ আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে একটা হিজিবিজি বিশ্রী ধারণা এসেছিল আর তা হলো যেন টেক্সাসের রিচার্ড বলছিল,

সে তোমাকে ঠকাচ্ছে, মুদি দোকান।

আমি দাঁড়িয়ে ওয়াইয়ানকে বিদায় জানিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে বাসায় ফিরে এসেছিলাম। ফিলিপের কাছে তার মতামত জানতে চেয়েছিলাম।

সে কি আমাকে ঠকাচ্ছে?

হ্যাঁ সোনা। অবশ্যই সে তোমাকে ঠকাচ্ছে।

আমার হৃদয় যেন টুকরো টুকরো হয়ে আমার নাড়িভুঁড়িতে সেঁধে গিয়েছিল।

'কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে নয়। বালির লোকজনের মন মানসিকতা তোমাকে বুঝতে হবে। এখানকার মানুষদের জীবনধারাই এমন। তারা এভাবেই যতটা পারে পর্যটকদের কাছ থেকে বাগিয়ে নেয়। এখানে এভাবেই সবাই বেঁচে থাকে। তাই সে এখন সেই কৃষক সম্পর্কে কিছু কাহিনি বানিয়েছে। সোনা একজন বালিনিজ কৃষক তার স্ত্রীকে না জানিয়ে কোনো কাজ করে না। কোনো লোকটা ঠিকই তার ছোট অংশ বিক্রি করতে রাজি আছে কিন্তু ওয়াইয়ান এখন পুরো জমিটা চায় এবং সে চায় তুমি এটা তাকে কিনে দাও।'

আমি তাতে একমত হইনি দুটি কারণে। প্রথমত ওয়াইয়ানকে নিয়ে এমন ভাবতে আমার ঘৃণা লাগছিল। দ্বিতীয়ত ফিলিপের আর একটা সংস্কৃতিকে অপবাদ দেওয়াটা আমার ভাল লাগেনি। সাদা মানুষদের ঔপনিবেশিকতার গন্ধ, পুরুষ তন্ত্রের 'এই লোকগুলো এমনই' তর্ক।

কিন্তু ফিলিপ ঔপনিবেশিক জাতির নয়। সে ব্রাজিলিয়ান। সে ব্যাখ্যা করেছিল, 'শোনো। আমি দারিদ্রতার মধ্য দিয়েই বড় হয়েছি। তুমি কি মনে কর আমি এই ধরনের দারিদ্র বুঝি না? ওয়াইয়ান যে পরিমাণ টাকা জীবনে চোখে দেখেনি তুমি তাকে সেই পরিমাণ টাকা দিয়েছ কিন্তু এখন তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার জানা মতে তুমি তার জীবনে জাদুময়ি সুবিধা প্রদানকারিণী এবং এটাই হয়ত তার শেষ

www.pathagar.org

সুযোগ। তাই তুমি চলে যাওয়ার আগে সে যা পারে নিয়ে নিতে চাইছে। ঈশ্বর সাক্ষী! চার মাস আগে এই মহিলার তার মেয়েকে দুপুরের খাবার খাওয়ানোর যোগ্যতা ছিল না কিন্তু এখন সে একটা হোটেল চায়?'

আমার কি করা উচিত?

'যাই ঘটুক তাতে উত্তেজিত হয়ো না। তুমি যদি রেগে যাও তুমি তাকে হারাবে। সেটা খুব খারাপ হবে কেননা সে একজন চমৎকার ব্যক্তি এবং তোমাকে ভালোবাসে। এটা তার বেঁচে থাকার একটা কৌশল কেবল এটা মেনে নাও। এটা ভেবো না সে খারাপ মানুষ বা তার আর তার বাচ্চার তোমার সাহায্যের দরকার নেই। কিন্তু তাকে সুযোগ নিতে দিও না সোনা। আমি এই রকম ঘটনা অনেকবার দেখেছি। যেসব পশ্চিমারা বহুদিন ধরে এখানে থাকে তারা দুই দলে পড়ে। তারা প্রথমে মুগ্ধ হতে থাকে বলে, আহ এই চমৎকার বালিবাসীরা খুব মিষ্টি ও উদার। তারপর ঝগড়া বা ঝামেলা হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাকি অর্ধেক মানুষ এই ঝামেলার কারণে তাদের ঘৃণা করা শুরু করে। আর যেটা খুবই বাজে ব্যাপার কেননা তাতে অনেক ভাল বন্ধুও হারিয়ে যায়।'

তাহলে আমার কি করা উচিত?

তোমার এই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে হবে। তার সাথে এক ধরনের খেলা খেলো যেরকম সে তোমার সাথে খেলছে। তাকে ভয় দেখাও কাজটা করার জন্য। তুমি তার উপকার করবে কারণ তার বাড়িটা দরকার।

আমি কোনো খেলা খেলতে চাই না ফিলিপ।

ফিলিপ আমার কপালে চুমু খেয়ে বলেছিল,

তাহলে তুমি বালিতে টিকতে পারবে না, সোনা।

এর পরের দিন সকালে আমি আমার পরিকল্পনা করে যাই। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে আমি একটা শুদ্ধ ও সৎ জীবনের জন্য সংগ্রাম করছি সেই আমি কিনা এমন একটা ডাহা মিথ্যা কথা বলতে যাচ্ছিলাম। বালিতে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে আমি এই মিথ্যাটা বলতে যাচ্ছিলাম, যে আমার বোনের মতো, যে একসময় আমার কিডনি পরিষ্কার করে দিয়েছে। হা ঈশ্বর আমি টুটির মাকে মিথ্যা বলতে যাচ্ছিলাম।

আমি ওয়াইয়ানের দোকানে হেঁটে গিয়েছিলাম। ওয়াইয়ান আমাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি তাকে সরিয়ে আলগা কাঠিন্য নিয়ে বলেছিলাম,

তোমার সাথে একটা জরুরি বিষয় নিয়ে কথা আছে ওয়াইয়ান।

কি নিয়ে? ফিলিপকে নিয়ে কিছু?

না তোমাকে নিয়ে।

সে এভাবে আমাকে দেখছিল যেন মূর্ছা যাবে। আমি বলেছিলাম,

ওয়াইয়ান, আমার আমেরিকার বন্ধুরা খুব রেগে গেছে।

আমার ওপর কেন বোন?

কারণ চারমাস হয়ে গেছে তারা তোমাকে অনেকগুলো টাকা দিয়েছে যাতে তুমি একটা বাড়ি কিনে নাও। কিন্তু তুমি এখনো তা কেননি। প্রতিদিন তারা আমাকে ইমেইল পাঠাচ্ছে, জিজ্ঞেস করছে ওয়াইয়ানের বাড়ি কোথায়? আমাদের টাকা কই? তারা এখন মনে করছে তুমি তাদের টাকা চুরি করেছ যেটা তুমি বাড়ি নয় অন্য কোনো কাজে লাগাবে।

www.pathagar.org

আমি চুরি করছি না।

ওয়াইয়ান আমার আমেরিকান বন্ধুরা ভাবছে তুমি একটা ভণ্ড।

সে এভাবে শ্বাস নিচ্ছিল দেখে মনে হচ্ছিল সে বাতাসের নলে মুখ দিয়ে আছে। তাকে খুব আহত দেখাচ্ছিল। আমি এক মুহূর্তের জন্য টলে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম এবং বলতে যাচ্ছিলাম,

না না এটা সত্যি না। আমি বানিয়ে বলছি।

কিন্তু আমাকে এই খেলা বন্ধ করতেই হতো। হা ঈশ্বর তাকে তখন পরিষ্কারভাবে টলিয়ে দিচ্ছিল। অন্য কোনো শব্দের চেয়ে ভণ্ড এমন একটা শব্দ যা বালিনিজদের আবেগে আঘাত করে। বালিতে এর চেয়ে খারাপ কোনো গালি নেই। এমন একটা দেশে যেখানে মানুষ একে অপরকে সকালের নাশতার আগে ডজন খানেক বার ঠকিয়ে থাকে, যেখানে ভণ্ডামি একটা বিনোদন, একটা শিল্প, একটা অভ্যাস, একটা বেঁচে থাকার কৌশল সেখানে একে অপরকে ভণ্ড বলা মানে হুমকি দেওয়া। প্রাচীন ইউরোপের মতো যেখানে এরকম কিছু বলা মানে ছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করা।

চোখ ভরা পানি নিয়ে সে বলেছিল,

আমি ভণ্ড নই লিজ।

তারপর আমার হাত তার হাতে নিয়ে বলেছিল,

তোমাকে এত বড় বিপদে ফেলে আমি দুঃখিত।

এটা অনেক বড় বিপদ। আমার বন্ধুরা রেগে আছে। তারা বলেছে আমি আমেরিকা যাওয়ার আগে তোমাকে অবশ্যই একটা বাড়ি কিনতে হবে। তারা বলেছে তুমি যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো বাড়ি না কেন তাহলে তারা তাদের টাকা ব্যাংক থেকে ফিরিয়ে নেবে।

তখন তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সে মূর্ছা নয় মারাই যাবে। সেই গরিব মহিলাকে এত বড় মিথ্যা বলে আমার জীবনের ইতিহাসে অনেক বড় লজ্জা পেয়েছিলাম। যে বুঝতেই পারছিল না আমি যেমন তার ইন্দোনেশিয়ান নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারি না তেমনি আমি চাইলেই তার ব্যাংক একাউন্ট থেকে টাকা ফেরত নিতে পারি না। কিন্তু সে কিভাবে বুঝবে? সে ভেবেছিল যেখানে আমি জাদুর মতো তার একাউন্টে এত টাকা এনে দিয়েছি সেখানে তা উধাও করাও বুঝি আমার কাছে কোনো ব্যাপার না।

আমাকে বিশ্বাস কর বোন। আমি এখন জমি খুঁজব। চিন্তা কর না খুব দ্রুত আমি জমি খুঁজব। দয়া করে চিন্তা কর না... হয়ত আগামী তিন দিনের মধ্যে আমি এটা শেষ করব। কথা দিচ্ছি।

এটা কোনো অভিনয় নয় বুঝতে পেরে আমি আরও জোর দিয়ে বলেছিলাম,

অবশ্যই তোমাকে তাই করতে হবে।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে তা করতেই হবে তার বাচ্চার একটা বাড়ি দরকার। খুব শীঘ্র তাকে উৎখাত করা হবে। ঠকানোর সময় এখন আর তার হাতে নেই। আমি বলেছিলাম,

আমি ফিলিপের বাড়ি যাচ্ছি। যখন বাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলবে আমাকে জানিও।

তারপর আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। জানতাম সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু আমি তার দিকে ফিরে না তাকানোর সিদ্ধান্ত

www.pathagar.org

নিয়েছিলাম। ফেরার সময় পুরোটা সময় আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, এটাই যেন সত্য হয় যে সে আমাকে ঠকাচ্ছে। কারণ যদি সে আসলেই আঠারো হাজার ডলারে কোনো জমি কিনতে অসমর্থ হয় তাহলে আসলেই অনেক বড় বিপত্তি হবে। এই গরিব মহিলা হয়ত আর কখনো দারিদ্রতা থেকে নিজেকে টেনে তুলতে পারবে না। আর যদি সে আমাকে ঠকিয়ে থাকে তাহলে একটা আশার আলো আছে। এতে বোঝা যাবে সে ছলনা জানে এবং এই অস্থির পৃথিবীতে সে মানিয়ে নিতে পারবে।

আমি ফিলিপের বাড়ি গিয়ে বলেছিলাম, যদি ওয়াইয়ান জানতো আমি তার পেছনে কি জটিল পরিকল্পনাই না করেছি...

বাক্যটা শেষ করেছিল ফিলিপ,

...পরিকল্পনাটা তার সফলতা এবং খুশির জন্য।

চার ঘন্টা পর, মাত্র চার ঘন্টার মধ্যে ফিলিপের বাড়িতে ফোন বেজে উঠেছিল। ওয়াইয়ান ফোন করেছিল। সে একটানে বলে চলছিল, সে আমাকে জানাতে চায় তার সব কাজ শেষ। সে এইমাত্র সেই কৃষকের কাছ থেকে দুই একর জমি কিনেছে, যার বৌ হঠাৎ জমি ভেঙে বিক্রি করতে রাজি হয়ে গেছে। তখন দেখা গিয়েছিল শুভ স্বপ্ন, পূজারীর মতামত, টাকশু এসবের কোনো কিছুরই দরকার নেই। ওয়াইয়ান ইতোমধ্যে জমির দলিল হাতে নিয়ে নিয়েছে এবং নোটারি পাবলিক করা শেষ। সে আমাকে এও নিশ্চিত করেছিল যে সে এরই মধ্যে সংস্থাপন সামগ্রী এবং শ্রমিকের ফরমায়েশ দিয়ে দিয়েছে। আমি যাতে যাওয়ার আগে তার বাড়িটা দেখে যেতে পারি। সে বলেছিল, আমি যেন তার ওপর রাগ না করি। সে আমাকে তার নিজের শরীর, নিজের জীবন এবং এই সমগ্র পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

আমি তাকে বলেছিলাম, যে আমিও তাকে ভালোবাসি। এবং তার বাড়িতে অতিথি হয়ে যাওয়ার জন্য আমার তর সইছে না। আমি তার সম্পত্তির মালিকানার একটা ফটোকপি নিয়ে যাব।

আমি যখন ফোনটা ছেড়ে দিয়েছিলাম ফিলিপ তখন বলেছিল, ভাল মেয়ে।

জানি না ফিলিপ কথাটা কাকে বলেছিল। আমাকে না ওয়াইয়ানকে। কিন্তু এরপর সে একটা মদের বোতল খুলে আমাদের বালিনিজ বন্ধু এবং জমির মালিক ওয়াইয়ানের পক্ষে গ্লাস উঁচিয়ে উল্লাস জানিয়েছিল।

তারপর বলেছিল,

দয়া করে। আমরা কি এখন একটা ছুটিতে যেতে পারি?

১০৭

ছুটি কাটাতে আমরা যে জায়গাটা বেছে নিয়েছিলাম সেটা লম্বকের উপকূলে, বালির শেষ প্রান্তে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার একটা ছেঁড়া দ্বীপ। আমি সেই দ্বীপে আগেও গিয়েছিলাম তবে সেবার শুধু ফিলিপকে দেখাতে চেয়েই যেতে চাওয়া।

www.pathagar.org

গিলি মেনোর এই দ্বীপটা আমার কাছে পুরো পৃথিবীর মধ্যে একটা বিখ্যাত জায়গা। দুই বছর আগে বালিতে যখন প্রথম গিয়েছিলাম তখন এই দ্বীপে আমি একা গিয়েছিলাম।

সেবার ম্যাগাজিনের একটা কাজে ছুটিতে যোগাসন নিয়ে লিখতে গিয়ে সবেমাত্র দুই সপ্তাহের বলবর্ধক যোগ প্রশিক্ষণ শেষ করেছিলাম। এতদূর থেকে এশিয়া গিয়েছিলাম বলে আমি কাজটা শেষ হওয়ার পরও আমার ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছিলাম। চাইছিলাম দশ দিনের জন্য খুব দূরে কোথায় গিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ এবং নীরব কিছু দিন কাটাতে।

বিগত চার বছরের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পেতাম আমার বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, আমার সত্যিকারের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটছে, এভাবে আমার সমগ্র ব্যথা আমার সামনে ভেসে উঠত। তার মধ্যে যে মুহূর্তে আমি সেই দ্বীপটাতে গিয়েছিলাম তখন সেই কালো অধ্যায়ের সবচেয়ে খারাপ অংশটা চলছিল। সকল দুঃখের মধ্যবর্তী একটা অবস্থান। বিবাদে জড়ানো দৈত্যদের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল তখন আমার মন। যখনই আমি একটা অচেনা জায়গায় দশদিন বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা এবং নীরবতায় কাটাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি আমার ভেতরের বিদ্রোহী এবং দ্বিধাগ্রস্ত অংশকে বলেছিলাম– 'আমরা সবাই এখন এখানে একসাথে আছি, একেবারে একা। তাই আমরা একটা চুক্তি করতে যাচ্ছি কিভাবে একটা উপায় বের করে ভাল থাকা যায়। তা না হলে আগে হোক বা পরে আমরা সবাই একসাথে মারা পড়তে যাচ্ছি।'

কথাগুলো হয়ত বলিষ্ঠ এবং আত্মবিশ্বাসী শুনিয়েছিল কিন্তু অস্বীকার করব না একেবারে একা সেখানে যাওয়া আমার জীবনে সবচেয়ে ভয়ের একটা ব্যাপার ছিল। আমি পড়ার মতো কোনো বই নেইনি তখন, এমন কিছু নেইনি যা আমাকে ব্যস্ত রাখত, শুধু আমি এবং আমার মন এবং একটা শূন্য মাঠ ছিল। যেখানে আমাদের দেখা হতে যাচ্ছিল। আমার মনে আছে আমার পা দৃশ্যত কাঁপছিল। তারপর আমি আমার গুরুর বলা প্রিয় একটা লাইন মনে করেছিলাম,

ভয়... কে মাথা ঘামায়?

লাইনটা উচ্চারণ করে একাই কাজে নেমে গিয়েছিলাম। আমি কয়েক ডলার দিয়ে সৈকতে একটা ছোট কেবিন ভাড়া নিয়েছিলাম। আমার মুখ বন্ধ করে রেখেছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা না খোলার যতক্ষণ না আমার ভিতরে সবকিছু বদলে যায়। গিলিমেনো ছিল আমার চরম সত্যের পূর্ণশুনানী। সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আমি উপযুক্ত জায়গাই বেছে নিয়েছিলাম সেই কাজটা করার জন্য। দ্বীপটা ছোট, প্রাকৃতিক, বালুময় নীল পানি এবং তাল গাছে ঘেরা। একটা পথেরই উৎকৃষ্ট বৃত্ত সৈকতের চারপাশ জুড়ে। পুরো এলাকাটা ঘুরে আসতে এক ঘণ্টা লাগে। এটা একেবারে নিরক্ষ রেখার মধ্যখানে অবস্থিত তাই দৈনিক সময়ের চক্রের সেখানে কোনো হেরফের নেই। দ্বীপের এক পাশ থেকে সকাল সাড়ে ছয়টায় সূর্য ওঠে এবং অন্যপাশে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় অস্ত যায়। কিছু মুসলিম মৎস্যজীবী এবং তাদের পরিবাররাও সেখানে থাকে। সেই দ্বীপের এমন কোনো জায়গা নেই যেখান থেকে আপনি সমুদ্রের শব্দ শুনতে পাবেন না। সেখানে কোনো মোটরচালিত গাড়ি নেই।

www.pathagar.org

জেনারেটরের ভট ভট শব্দ কেবল সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টা শোনা যায়। এমন নিরিবিলি জায়গা আমি আর দেখিনি।

প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় আমি এই দ্বীপের পরিধি জুড়ে হাঁটতাম এবং সন্ধ্যায় আর একবার হাঁটতাম। বাকি সময়টা আমি কেবল বসে বসে দেখতাম। দেখতাম আমার ভাবনা, আমার আবেগ আর সেই জেলেগুলোকে। যোগী রীতিতে বলা হয় মানুষের সকল দুঃখের মূল হচ্ছে শব্দ এবং সুখের মূলও এটাই। আমরা আমাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য শব্দ তৈরি করি এবং সেই শব্দগুলো আবেগের দোসর নিয়ে আসে যা আমাদের গলায় দড়ি লাগানো কুকুরের মতো টেনে বেড়ায়। আমরা আমাদের নিজেদের মন্ত্রে বিমোহিত হয়ে যাই-আমি ব্যর্থ...আমি একা...আমি ব্যর্থ...আমি একা- এবং তারপর আমরা এই মন্ত্রের স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে যাই। কিছুক্ষণের জন্য কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া মানে শব্দের শক্তির ওপর কিছু খাঁজ কেটে দেওয়া, শব্দ নিয়ে বিষম খাওয়া বন্ধ করা, আমাদের নিজস্ব শ্বাসরোধ করা মন্ত্রের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া।

একটি সত্যিকারের নীরবতায় ডুবে যেতে আমার অল্প কিছুক্ষণই লেগেছিল কিন্তু আবিষ্কার করেছিলাম আমি তখনো শব্দ দ্বারা গুঞ্জিত হচ্ছি। আবিষ্কার করেছিলাম সকল ধরনের শব্দ বন্ধ করে দেওয়ার অনেক পর পর্যন্ত আমার বাকযন্ত্র এবং সেখানকার মাংসপেশি, আমার মস্তিষ্ক, জিহ্বা, বুক, ঘাড়ের পিছন দিক তার প্রতিক্রিয়ায় কাঁপছে। আমার মাথা শব্দের পুনঃ উচ্চারণে ঢেকে আছে যেভাবে একটা আভ্যন্তরীণ সুইমিং পুলে বাচ্চারা সেদিনকার মতো চলে যাওয়ার পরও সারাক্ষণ সেই শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি চলতে থাকে। সকল কথোপকথন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও তার ঘূর্ণি থামাতে অবিশ্বাস্য রকম বেশি সময় লাগে। হয়ত তিন দিন লেগেছিল।

তারপর সবকিছু আসতে শুরু করেছিল। সেই মনের সেই নিরিবিলি শূন্য মাঠে সকল ঘৃণা আর সকল ভয়গুলো দৌড়-ঝাপ করছিল। আমি বিষাক্ত নেশায় মাতাল হয়ে পড়েছিলাম, বিষ আমার সারা সত্তা জুড়ে আন্দোলন করছিল। আমি অনেক কেঁদেছিলাম প্রার্থনা করেছিলাম এবং সেটা ছিল ভয়াবহ। কিন্তু এইটুকু কেবল জানতাম যে আমি সেখানে আমার পাশে কাউকে চাইনি। কেবল জানতাম আমাকে তা করতে হবে এবং সেটা এককভাবে।

সেই দ্বীপে অল্পকিছু পর্যটক ছিল। বেশির ভাগ মধু চন্দ্রিমায় আসা দম্পতি। গিলি মেনো এত দূরে আর এত সুন্দর যে কেবল পাগলরাই সেখানে একা যাওয়ার কথা ভাবতে পারে। আমি সেই দম্পতিদের প্রেম দেখে কিছুটা হিংসা করতাম। কিন্তু নিজেকে বলতাম, এটা তোমার কারো সঙ্গ পাওয়ার সময় নয় লিজ। তোমার এখানে অন্য একটা কাজ আছে। আমি সবার কাছ থেকে দূরে থাকতাম এবং মানুষজনও আমাকে একা ছেড়ে দিত। আমার মনে হয় আমি কিছু ভূতুড়ে আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। সারাটা বছর ধরে তখন অসুস্থ ছিলাম। নিঃসন্দেহে আমাকে মানসিক রোগীর মতো লাগত। এত নির্ঘুম রাত কাটিয়ে, ওজন হারিয়ে, অনেক ক্রন্দনের ফলে আমাকে সাইকোর মতো লাগত না তো আর কেমন লাগত। তাই হয়ত কেউ আমার সাথে তখন কথা বলত না।

www.pathagar.org

আসলে একেবারে তা ঠিক নয়। প্রতিদিন একজন আমার সাথে কথা বলত। সে ছিল একটা ছোট ছেলে। সৈকতে দৌড়ে দৌড়ে পর্যটকদের কাছে যারা তাজা ফল বিক্রি করত তাদের একজন। ছেলেটা হয়ত নয় বছরের ছিল কিন্তু তাকে দেখে নেতা গোছের মনে হতো। যাকে বলে উড়া-ধুরা। দ্বীপে যদি কোনো রাস্তা থাকত তাহলে তাকে আমি রাস্তার চটপটে ছেলে বলতাম। আমি মনে করি সে ছিল সৈকতের সবচেয়ে চটপটে ছেলে। যেকোনোভাবে সে চমৎকার ইংরেজি শিখেছিল হয়ত সৈকতের পর্যটকদের বিরক্ত করে করে। সে আমার পেছনেও লেগেছিল। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করত না আমি কে? কেউ বিরক্ত করত না। কিন্তু সেই নির্দয় ছেলেটা প্রতিদিন আমার পাশে বসত এবং নানান প্রশ্ন জানতে চাইত। তুমি কখনো কোনো কথা বল না কেন? তুমি এমন অদ্ভুত কেন? ভাণ কর না তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না, আমি জানি তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ। তুমি সব সময় এত একা থাক কেন? তুমি কখনো সাঁতার কাটতে যাও না কেন? তোমার প্রেমিক কই? তোমার কোনো স্বামী নেই কেন? তোমার সমস্যাটা কি?

মনে মনে বলতাম, চলে যাও বাচ্চা। তুমি কেন আমার খারাপ ভাবনাগুলো নকল করে এই প্রশ্নগুলো করে যাচ্ছ?

একটা শান্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকে ভাগিয়ে দিতে চাইতাম কিন্তু আমাকে উত্তেজিত না করা পর্যন্ত যেন তার শান্তি ছিল না। আমার মনে আছে একবার আমি তার ওপর খুব রেগে গিয়ে বলেছিলাম, আমি কথা বলছি না কারণ আমি একটা অভিশপ্ত ভ্রমণে বের হয়েছি। পাকা বাঁদর ছেলে এখান থেকে ভাগো।

যখনই তাড়া দিতাম সে হাসতে হাসতে দৌড়ে চলে যেত। সে আমার দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেলে আমিও সবসময় হাসতাম। আমি একইভাবে সেই দুষ্ট ছেলেটাকে ভয় পেতাম এবং খুঁজতাম। একটা কঠিন ভ্রমণের মধ্যে সে আসলেই একটা হাস্য কৌতুকের যতি চিহ্ন ছিল। সেন্ট এন্থনি একবার এ-বিষয়ে লিখেছিলেন। কোনো মরুভূমি বা জনশূন্য স্থানে গেলে সকল ধরনের দৃশ্যের হামলা হতে পারে- শয়তান এবং ফেরেশতা দুটোরই। সে বলেছিল তার নিঃসঙ্গতায় সে মাঝে মাঝে শয়তানের মুখোমুখি হয়েছিল যে দেখতে ছিল ফেরেশতার মতো আবার মাঝে মাঝে ফেরেশতার রূপ নিয়ে শয়তানের সামনাও হয়েছিল। যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কিভাবে বুঝতে পেরেছেন কে কোনটা? তোমরা তা বলতে পারবে সেই জীবটা তোমার সঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কেমন অনুভব কর তার ওপর ভিত্তি করে। সেটা চলে যাওয়ার পর তোমার যদি মন ভার হয়ে যায় তাহলে বুঝবে একটু আগে যে এসেছিল সে একজন শয়তান আর তুমি যদি আলোকিত বোধ কর তাহলে বুঝবে সেটা ছিল একজন ফেরেশতা।

আমার ধারণা আমি জানি সেই দুষ্ট পাকা ছেলেটা কি ছিল। সে সবসময় আমার ভেতর থেকে হাসি বের করে আনত।

আমার নীরবতার নবম দিনে সন্ধ্যায় আমি সৈকতে ধ্যানের জন্য গিয়েছিলাম এবং মধ্যরাত পর্যন্ত সেখানে থেকে উঠে দাড়াইনি। আমার মনে আছে আমি কি ভাবছিলাম। মনকে বলছিলাম, এটাই লিজ। এটাই তোমার সুযোগ লিজ। আমাকে সেসব কিছু দেখাও যা তোমার কষ্টের কারণ। আমাকে সবটা দেখতে দাও। কোনো

www.pathagar.org

কিছু লুকিও না। ভাবনা, স্মৃতি, দুঃখগুলো একে একে হাত তুলে দাঁড়িয়ে তাদের উপস্থিতি জানিয়েছিল। আমি প্রত্যেক ভাবনার দিকে তাকিয়েছিলাম, প্রতিটি দুঃখের এককের দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম। আমি তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলাম এবং তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা না করে তার ভয়াবহ ব্যথা অনুভব করেছিলাম। তারপর আমি সেই দুঃখগুলোকে বলেছিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে মেনে নিলাম। আমার হৃদয়ে চলে আস। সব শেষ হয়ে গেছে। আমি সত্যি সত্যি অনুভব করছিলাম দুঃখগুলো যেন তারা একটা জীবন্ত অস্তিত্ব, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করছে, যেন আমার হৃদয় একটা সত্যিকারের কামরা তারপর আমি বলেছিলাম, এরপর? এবং এরপর অনুশোচনা সামনে আসে। আমি তাকে গুরুত্ব দেই, তাদের অনুভব করি, আশীর্বাদ করি এবং তাকে আমার হৃদয়ে জায়গা করে দেই। আমার জীবনের প্রতিটা দুঃখজনক ভাবনা মনে করি, খুঁজে খুঁজে মনে করি, যেন কিছুই বাদ না পড়ে।

তারপর আমি আমার মনকে বলেছিলাম, এখন তোমাদের রাগ দেখাও তারপর আমার জীবনের সকল রেগে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রতিটা অবিচার, প্রতিটা বিদ্রোহ, প্রতিটা ক্ষতি। একেক করে আমি তাদের সবাইকে দেখেছিলাম তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলাম। আমি প্রতিটা রাগের টুকরো পুরোপুরি অনুভব করেছিলাম যেন প্রথমবার ঘটছে ঘটনাগুলো এবং তারপর আমি বলেছিলাম, আমার হৃদয়ে চলে আসো। এখানে আরাম কর। এখানে নিরাপদে থাকবে তুমি। সব শেষ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। এবং এ-নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল। তারপর আমি এর একদম বিপরীত মেরুর অভিজ্ঞতা অনুভব করেছিলাম। আমার হৃদয়ে ঢোকার সাথে সাথে রাগগুলো একেবারে প্রাণবন্ত, ঠাণ্ডা হয়ে, সহোদরের মতো ঝগড়া ভুলে একসাথে মিলেমিশে সেখানে অবস্থান নিয়েছিল।

তারপর সবচেয়ে কঠিন অংশটা আমি আমার মনকে বলেছিলাম 'তোমাদের লজ্জাগুলো দেখাও।' হা ঈশ্বর আমি ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাই যখন তাদের দেখি। আমার ব্যর্থতা, আমার মিথ্যাচার, আমার স্বার্থপরতা, হিংসা, অহংকার সব যেন একসূত্রে বাঁধা ছিল। আমি পলক ফেলতে পারছিলাম না। তারপরও বলেছিলাম, দেখাও সবচেয়ে খারাপ যা কিছু আছে তাও। তারপর আমি তাদের আমার হৃদয়ে আহ্বান করতে চেষ্টা করেছিলাম। দরজায় এসে সবাই অস্বস্তিতে ভুগে বলছিলাম, না তুমি চাও না আমি সেখানে যাই। তুমি কি জানো না আমি কি করেছি? এবং আমি বলেছিলাম, আমি তবু তোমাকে চাই। তুমি যাই কর না কেন তবুও এখানে তোমাকে স্বাগতম জানাই। তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তুমি আমার একটা অংশ। তুমি এখানে বিশ্রাম করতে পার। সব শেষ হয়ে গেছে।

যখন সব শেষ হয়ে গিয়েছিল আমি শূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুই বাকি ছিল না আর। আমার মনে আর কিছুই যুদ্ধ করছিল না। আমি আমার হৃদয়ে তাকিয়েছিলাম, আমার নিজের সৎগুণগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম এবং এর সামর্থের দিকে খেয়াল করেছিলাম। আমি দেখেছিলাম আমার হৃদয়ের তখনো অনেক জায়গা খালি। এতসব বিপন্ন দুঃখের স্তূপ, রাগ, লজ্জা ঠেসে ঢুকানোর পরও আমার হৃদয়ে তখনো আরও অনেক কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল। এর

www.pathagar.org

ভালোবাসার ক্ষমতা ছিল অসীম। তারপর আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঈশ্বর আমাদের সবাইকে ভালোবেসে গ্রহণ করেন। আমাদের নিজের ভয়াবহ মন ছাড়া নরক বলে কিছু নেই। কারণ একজন ভেঙে পড়া সীমাবদ্ধ মানুষই যখন তার নিজের সত্তাকে ক্ষমা করে দেওয়া আর মেনে নেওয়ার এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে তাহলে শুধু কল্পনা করুন ঈশ্বর তার সামগ্রিক সমবেদনা আর ভালোবাসা দিয়ে কতটা ক্ষমা আর মেনে নিতে পারেন।

আমি কিভাবে যেন এটাও বুঝেছিলাম যে শান্তির সেই অনুভূতিটা সাময়িক ছিল। আমি জানি আমার হৃদয় থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এইসব দুঃখ, রাগ, লজ্জা বারবার পালিয়ে আমার মাথায় গিয়ে স্থান নেবে। ধীরে ধীরে, আমি এও বুঝতে পেরেছিলাম যতদিন পর্যন্ত না পাকা-পোক্তভাবে আমি আমার জীবন পাল্টাতে পারি ততদিন পর্যন্ত এদের সাথে এই টানাপোড়ন চলতেই থাকবে। কাজটা করা আমার জন্য কঠিন কিছুই হবে। কিন্তু সেই সৈকতের আঁধার কালো নীরবতায় আমার হৃদয় আমার মনকে বলেছিল, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না। আমি সব সময় তোমার যত্ন নেব। প্রতিজ্ঞাটা আমার হৃদয় থেকে ভেসে ভেসে আমার মুখে এসে স্থির হয়েছিল। সেটার স্বাদ নিয়ে আমি হেঁটে হেঁটে আমার কেবিনে ফিরে এসেছিলাম। আমি একটা শূন্য নোটবই খুঁজে পেয়ে তার প্রথম পৃষ্ঠা খুলে আমার মুখ থেকে সেই শব্দগুলো বাতাসের বুকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। আমি সেই শব্দগুলো দিয়ে আমার নীরবতা ভেঙেছিলাম এবং আমার পেনসিলকে অনুমতি দিয়েছিলাম সেই বিশাল উক্তিটা লিখে রাখতে।

আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না। আমি সব সময় তোমার যত্ন নেব।

সেটাই ছিল প্রথম শব্দগুচ্ছ যা আমি আমার ব্যক্তিগত নোটবই-এ লিখেছিলাম এবং সেই মুহূর্ত থেকে আমি এটা সবসময় বহন করেছি এবং এর পরবর্তী দুই বছর যখনই প্রয়োজন বোধ করেছি পৃষ্ঠা উল্টে সাহায্য চেয়েছি। এ সব সময় এই উত্তরগুলোই পেয়েছি। এমন কি ভয়াবহ দুঃখ ও ভয়ের সময়ও আমি একইরকম উত্তর পেয়েছি। সেই নোটবুক জুড়ে ভালোবাসার প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করেই মূলত পরবর্তী দুই বছর আমি বেঁচে ছিলাম।

১০৮

আর তখন আমি গিলি মেনোতে একেবারে অন্য একটা পরিস্থিতিতে অবস্থান করছিলাম। সেখানে প্রথমবার যাওয়ার পর থেকে কত কি ঘটে গেছে। আমি পৃথিবী জুড়ে ঘুরেছি, আমার সাবেক স্বামীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদের কার্যক্রম শেষ করেছি, ডেভিডের সাথে ছাড়াছাড়ি করেছি, সকল মেজাজ নিয়ন্ত্রণকারী ঔষধ বাদ দিয়েছি, একটা নতুন ভাষা শিখেছি, ভারতের কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্তে ঈশ্বরের হাতের

www.pathagar.org

তালুতে বসে থেকেছি, একজন ইন্দোনেশিয়ান কবিরাজের কাছে আত্মিক বিষয়ে শিখেছি এবং একটা বিপন্ন পরিবারের জন্য বাড়ি কিনে দিয়েছি। আবার সেই সুন্দর দ্বীপটায় আমার ব্রাজিলিয়ান প্রেমিকের সাথে গিয়েছি। অবশেষে আমি এখন খুশি, স্বাস্থ্যবান এবং ভারসাম্যপূর্ণ। সব কিছু তখন অনেকটা গৃহিণীদের স্বপ্নের একটা ছেঁড়া পাতার মতো হয়ে গিয়েছে। অবশ্য অনেক বছর আগের আমার নিজের স্বপ্নের ছেঁড়া পাতাও এমনই ছিল।

আমি মানছি আমার পুরো গল্পটা একেবারে হাস্যকর রূপকথার গল্পের মতো হয়ে গেছে তবে যে সত্যটা আমাকে এই রূপকথার গল্পে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যেতে দেয়নি তা হলো, 'কোনো রাজপুত্র আমাকে উদ্ধার করেনি, আমাকে উদ্ধার করেছি আমি নিজে।'

আমার ভাবনা যেন শ্রমণদের অনুকরণীয় একটা বিশ্বাসের মতো হয়ে গেছে, তারা বলে যে একটা ওক গাছ সৃষ্টি হয় একই সাথে দুটো শক্তির ওপর নির্ভর করে। একটা হচ্ছে তার বিচি বা শাঁস যেটা থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয় এবং যা সকল প্রতিজ্ঞা এবং সম্ভাবনা ধারণ করে গাছে রূপান্তরিত হয়, যেটা সবাই দেখতে পায়। কিন্তু খুব কম মানুষই খেয়াল করে যে সেখানে আরও একটা শক্তি একই সাথে কাজ করে। সেই ভবিতব্য বৃক্ষটি চরমভাবে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করতে নিজেকে জড় বীচি থেকে জীবন্ত গাছে পরিণত করছে, চারাকে উদাত্তভাবে শূন্যে বিকাশ করতে সাহায্য করছে, অপরিণত থেকে পরিণত রূপান্তরের ধারা পরিচালনা করছে। সে হিসেবে জৈনরা বলে এটা সেই ওক গাছই যা বীচিটা সৃষ্টি করেছে এবং সেখান থেকে নিজেও জন্ম নিয়েছে।

অবশেষে এখন আমি যেমন মহিলা হয়েছি তা নিয়ে ভাবি, ভাবি যে জীবনটা আমি এখন যাপন করছি তা নিয়ে। এমন একটা মানুষ হতে আগে কতো চেয়েছি! যাক এখন অন্য কেউ হয়ে ওঠার সেই মিথ্যা প্রহসন হতে আমি মুক্ত। এখন ভাবি এই পর্যন্ত আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি কত কি সয়েছি, অন্যকে দেখে আফসোস করেছি। আহা আমি যদি এমন হতাম! মানে আমি বলতে চাচ্ছি সেই সুখি এবং ভারসম্যপুর্ণ আমি যে কিনা এখন একটা ছোট ইন্দোনেশিয়ান নৌকায় ঝিমাচ্ছিলাম সেই কি আমার অপরিণত, দ্বিধাগ্রস্ত, সংগ্রাম রত সত্তাকে সেই কঠিন সময়টাতে এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। সেই অপরিণত আমিটা ছিলাম সেই সম্ভাবনাময়ী শ্বাস। আর বর্তমান আমি আমার পরিণত অংশ, ইতোমধ্যে বিদ্যমান ওক গাছ যে সব সময় বলে এসেছে হ্যাঁ বেড়ে ওঠ, বদলাও, গজাও। আস এবং আমার সাথে এখানে দেখা কর যেখানে আমি ইতোমধ্যে আমার পূর্ণতা এবং পরিণতবোধ নিয়ে বিদ্যমান। আমি চাই তুমি আমার মধ্যে বেড়ে ওঠো। এবং সেটা ছিলাম এই পরিপূর্ণ কার্যকর আমি যে কিনা সেই চারবছর আগে গোসলখানার মেঝেতে কান্নারত মেয়েটির মাঝে ঝুলছিলাম। হয়ত সেটাই ছিলাম এই বর্তমান আমি যে ভালোবাসায় তার কানে কানে বলেছিলাম, বিছানায় যাও লিজ। যে আমিটা আগেই জানতাম সব ঠিক হয়ে যাবে এবং সবকিছু সমানভাবে আমাদের একসাথে এসে মিলিত করবে এখানে, এই মুহূর্তে। যেখানে আমি সব সময় শান্তি এবং সন্তুষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম আমার আগমন এবং আমার সাথে মিলনের।

www.pathagar.org

তারপর ফিলিপ জেগে উঠেছিল। আমরা দুজন একত্রে ইন্দোনেশিয় পারাপারের নৌকার পাটাতনে সারা সন্ধ্যা ঝিমিয়েছিলাম। সমুদ্র আমাদের দুলিয়েছিল, সূর্য তার কিরণ দিয়েছিল। আমি তার বুকে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিলাম। ফিলিপ আমাকে বলেছিল, যখন সে ঘুমাচ্ছিল তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। সে বলেছিল, 'তুমি তো জানোই আমি সব সময় বালিতে থাকতে চেয়েছি কেননা আমার ব্যবসা এখানে আর এটা অস্ট্রেলিয়ার খুব কাছে। সেখানে আমার বাচ্চারা থাকে। এবং আমার প্রায়ই ব্রাজিল যেতে হয় যেখানে জেমস্টন কোম্পানি এবং আমার পরিবার আছে। তোমাকেও অবশ্যই আমেরিকা ফিরে যেতে হবে কারণ তোমার চাকরি সেখানে। তোমার পরিবার, তোমার বন্ধুরা। তাই আমি ভাবছিলাম হয়ত আমরা দুজন মিলে এমন একটা জীবনের কথা ভাবতে পারি যেটাকে কোনোভাবে এই চার দেশে ভাগ করা যায়, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, বালি।

এমন কথার উত্তরে আমি হেসেছিলাম, কেননা তা খুব মজার কিছু হওয়ার কথাই। আমি জানি এমন একটা জীবন হয়ত অনেকের কাছেই পাগলামি মনে হবে, একেবারে মূর্খতা হিসেবে দেখবে। তবে এটা অনেকটা আমার মন মতো হয়েছে। হ্যাঁ আমি জানতাম এভাবেই আমাদের এগুনো উচিত। এর কাব্যিক আমেজটাও আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। আমাকে বলতেই হবে সারাটা বছর জুড়ে আলাদা আলাদা নিরাতঙ্ক আই শব্দ দিয়ে শুরু দেশে ঘোরার পর ফিলিপ তখন আমাকে ভ্রমণের একটা নতুন তত্ত্ব দিয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, বালি, ব্রাজিল–এ এ বি বি।

একেবারে ধ্রুপদী কবিতার মতো, একজোড়া অন্ত্যমিল শ্লোকের মতো।

ছোট জেলে নৌকাটা গিলি মেনোর সৈকতে নোঙর ফেলেছিল। সেই দ্বীপে কোনো ডক নেই। আপনাকে আপনার প্যান্ট গুটিয়ে নৌকা থেকে লাফ দিতে হবে এবং নিজের শক্তি দিয়ে ঢেউ ঠেলে সামনে এগুতে হবে। না ভিজে বা কোরালে বাড়ি না খেয়ে তা করতে পারার কোনো কায়দা নেই। কিন্তু তবুও তা অনেক দামি কেননা সৈকতটা অন্যরকম মহিমায় সমৃদ্ধ এবং সুন্দর। তাই আমি এবং আমার প্রেমিক আমাদের জুতো খুলে ফেলে, আমাদের ব্যাগ আর অল্পকিছু মালামাল মাথায় নিয়ে সেই নৌকার প্রান্ত থেকে সমুদ্রে লাফ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।

মজার ব্যাপার কি জানেন। ফিলিপ এত ভাষা জানে কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে প্রেমময় ভাষা ইটালি ভাষায় কথা বলতে জানে না। আমি তবু এগিয়ে গিয়ে লাফ দেওয়ার সময় বলেছিলাম,

আত্রাভারসিয়ামোহ– এসো পার হই।

www.pathagar.org

www.pathagar.org

চূড়ান্ত স্বীকারোক্তি ও নিশ্চয়তা

ইন্দোনেশিয়া থেকে চলে যাওয়ার কয়েক মাস পরে ভালোবাসার মানুষদের সাথে দেখা করতে, ক্রিসমাস ও নিউইয়র্ক পালন করতে আবার সেখানে ফিরে যাই। দক্ষিণ এশিয়াতে ভয়াবহ সুনামি আঘাত করার দুই ঘন্টা আগে আমার প্লেন বালি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। পরিচিত এবং আত্মীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করে জানতে চায় আমি ভাল আছি কিনা এবং আমার ইন্দোনেশিয়ার বন্ধুরা ভাল আছে কিনা। মানুষজনকে এই দুশ্চিন্তা করতে দেখা গেছে, ওয়াইয়ান ও টুটি কি ভাল আছে? উত্তরটা হচ্ছে সুনামি বালিতে কোনো ভাবেই আঘাত করেনি। সবাইকে সুরক্ষিত পেয়েছিলাম। ফিলিপ আমার জন্য এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল। এরপর আমরা আরও অনেক এয়ারপোর্টে দেখা করতে থেকেছি। কেটুট লিয়ার ঠিক আগের মতোই তার উঠানে বসে ধ্যান ও ঔষধ বানাচ্ছিল। ইউধি কিছু অভিজাত রিসোর্টে গিটার বাজানোর কাজ নিয়েছে এবং ভাল করছে। ওয়াইয়ানের পরিবার বিপজ্জনক কোস্টলাইন থেকে দূরে, উঁচু ধান ক্ষেতের সারির ভেতর নিরাপদ ও সুখে শান্তিতে তাদের নতুন বাড়িটিতে বসবাস করছিল।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই, ওয়াইয়ানের পক্ষ থেকে, সবার প্রতি যারা যারা ওয়াইয়ানের বাড়িটাতে সাহায্য করেছিলেন।

সাক্ষী এগ্রিওজ্জি, সাবিত্রী আক্সেলর্ড, লিন্ডা ও রিনি বড়াই, লিসা বুন। সুসান বাউন, গেরি ব্রেনার, মনিকা ক্রুক এবং কারেন কুদেজ, সান্দি কারপেন্টার, ডেবিড ক্যাশিওন, এনি কনেল– যে জানা আইসেনবার্গের মতো শেষ মুহূর্তে সাহায্য করার ওস্তাদ, মাইক এবং মিমি দে গ্রুয়ে, আর্মেনিয়া ডি অলিভেরিয়া, রায়া ইলিয়াস এবং গিগি মেডাল, সুসান ফ্রেডি, ডেভিন ফ্রায়েড ময়ান, ডোয়াইট গার্নার এবং ক্রি লি ফেবর, জন এবং কার্লো গিলবার্ট, মেমি হিলে। এনি হাবার্ড এবং সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ব্যাপার হার্বে স্কুরার্টজ, বব হিউজেস, সুসান কিটেন প্ল্যান, মাইকেল এবং জিল নাইট, ব্রেইন এবং লিন্ডা নপ, ডেবোরাহ লোপেজ, ডেবোরাহ লিউপ্নিটজ, ক্রেইগ মার্ক্স এবং রিনি স্টিংকি, এডাম মেকয় এবং শিরা পিভয়, জনি এবং কেট মাইলস, শেরাইল মনার, জন মর্স এবং রোজ পিটারসন, জেমস এবং ক্যাথরিন মার্ডক, নিক এবং মিমির আশির্বাদসহ, জোজ নানস, এনি পেগ্রিয়ালুরো, চার্লি পেট্রেন, লরা প্লেটার, পিটার রিচমন্ড, টবি এবং বেভার্লি রবিনসন, নিনা বার্স্টাইন শিমনস, স্টেফিয়ানা সোমেয়ার, নাতালি স্টান্ডিফোর্ড, স্টাসি স্টিরস, ডার্সি স্টিংকি, দ্য থরসন গার্লস ন্যান্সি, লরা এবং মিস রেবেকা, ডেফনে ইউভিলার, রিচার্ড ভগট, পিটার এবং জিন

www.pathagar.org

ওয়ারিংটন, ক্রিস্টিন ইউনার, স্কট ওয়াস্টারফেল্ড এবং জাস্টিন লারবারস্টেয়ার, বিল ইউয়ি এবং কারেন জিমেট।

অবশেষে একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ– ভ্রমণের বছরটায় আমাকে সকল ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য স্নেহপরায়ণ টেরি আংকেল এবং ডেবোরাহ চাচির উপকার স্বীকার করার সঠিক ভাষা বা সঠিক উপায় আমার জানা নেই। একে প্রযুক্তিগত সহায়তা বলা হলে তাদের অবদান খাঁটো করে দেখা হবে। তারা দুজন মিলে আমার আঁটসাঁট দড়ির নিচে যে জাল বুনেছিলেন তার জন্যই আমি এই বইটা লিখে শেষ করতে পেরেছি তারা না থাকলে এটা সম্ভব হতো না।

সবশেষে বলব, যারা আমাদের জীবনটা যাপন করতে সহায়তা করে আমাদের সকলের তাদেরকে প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। হয়ত মানুষের অভাবনীয় উদারতার কাছে আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সারাটা জীবন নিষ্ঠার সাথে সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে থাকাই উচিত, যতদিন আমাদের কণ্ঠে স্বর আছে।

-o-

www.pathagar.org

Eat Pray Love জীবনের গোপনীয়তার মতো এক নারীর কাছ থেকে আর এক নারীর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।

–সানডে টাইমস

এপর্যন্ত যত আত্মজীবনী পড়েছি তাদের মধ্যে সেরা এটি। দারুণ।

–টনি কলেট

প্রতিটা নারীর এই বইটা পড়া উচিত।

–এলে ম্যাকফারসন

লেখিকার সুখ এবং আত্ম অনুসন্ধানের এটি একটি সত্য বর্ণনা।

–হার্পার বাজার

একজন নারীর সুখ খোঁজার নিবিড় এবং মজাদার বর্ণনা এটা।

–ক্লোজার

আমি এই বইটা ভীষণ ভালোবাসি।

–হিলারি ক্লিনটন

ISBN 978 984 92298 9 6

9 789849 229896